শ বর্ষ] ১৩৪৭ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

শিল্পিগণের নামানুক্রমিক চিত্রসূচী

নর্ত্তকী

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস

১৯শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৪৭ [১ম সংখ্যা

"দেবতা-মীমাংসা"

মহর্ষি জৈমিনি-কৃত পূর্ব্ব-মীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসা অথবা ধর্ম্মমীমাংসা দর্শনের সূত্রাবলী বর্ত্তমানে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে এই মীমাংসা-শাস্ত্রকে 'দ্বাদশ-লক্ষণ (১) জৈমিনীয় দর্শন' বলা হইয়া থাকে। আবার মহর্ষি বাদরায়ণ-রচিত উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসা অথবা বেদান্ত-দর্শনের সূত্রসমূহ চারিটি অধ্যায়ে সজ্জিত। এই হেতু বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্রকে 'চতুর্লক্ষণ বৈয়াসিক দর্শন' বা 'চতুর্লক্ষণ শারীরক-সূত্র' নাম দেওয়া হয়।

কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা একই বৃহত্তর মীমাংসা-শাস্ত্রের দুইটি অবান্তর ভেদ মাত্র, কিংবা উহারা পরস্পর সম্বন্ধবিহীন দুইটি পৃথক্ শাস্ত্র,—ইহা লইয়া বহু প্রাচীন কাল হইতেই পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসাদর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। ভগবৎপূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা সম্পূর্ণ পৃথক্ শাস্ত্র। পক্ষান্তরে, শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন যে, পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসা একই মীমাংসাশাস্ত্রের দুইটি বিভিন্ন অংশ মাত্র। এ সম্বন্ধে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের আচার্য্যবৃন্দ যে বিরাট বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ বা সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু এই প্রসঙ্গে উভয় মীমাংসার সন্ধিস্থলে যে আর একটি তৃতীয় মীমাংসা অতি অস্পষ্ট-ভাবে আত্মপ্রকাশের প্রয়াস পাইতেছে, তাহার স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভব কি না, তাহাই আপাততঃ আলোচ্য।

পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসার একশাস্ত্রতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে আচার্য্য শ্রীরামানুজ তাঁহার 'শ্রীভাষ্যে'র উপক্রমেই (২) বৃত্তিকার ভগবান্ বোধায়নের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—"তদাহ বৃত্তিকারঃ—বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্মবিবিদিষেতি। বক্ষ্যতি চ—কর্ম্মব্রহ্মমীমাংসয়োরৈকশাস্ত্র্যং সংহিতমেতচ্ছারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেনেতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিরিতি।" অর্থাৎ—চতুরধ্যায়ী শারীরক-মীমাংসা ষোড়শাধ্যায়ী জৈমিনীয়-মীমাংসার সহিত মিলিত হইয়া একটি শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

আচার্য্য রামানুজ ও তাঁহার প্রমাণভূত ভগবান্

(১) 'লক্ষণ' শব্দের অর্থ 'অধ্যায়'।

(২) বোম্বাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থমালা, নং ৬৮—শ্রীভাষ্য প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২।

বৃত্তিকারের মত স্বীকার করা বা না করা—স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত বাক্যটির মধ্যে যে বলা হইয়াছে—ষোড়শাধ্যায়ী জৈমিনীয়-মীমাংসা ("জৈমিনীয়েন ষোড়শ-লক্ষণেন")—তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বর্ত্তমানে উপলভ্যমান জৈমিনীয়-মীমাংসা ত মাত্র দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত দৃষ্ট হয়! এরূপ অবস্থায় 'ষোড়শলক্ষণ' শব্দটির সার্থকতা রক্ষা করা যায় কি প্রকারে?

এই গোলমালের সমাধান করিতে যাইয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকারের অভিমত প্রদত্ত হইল—

(১) পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয় তাঁহার শ্রীভাষ্যের সংস্করণে (পৃঃ ৭, পাদটীকা) বলিয়াছেন যে, মহর্ষি জৈমিনি-কৃত কর্ম্মমীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায় ও মহর্ষি বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মমীমাংসার চারিটি অধ্যায় মিলিয়া একত্রে ষোড়শ অধ্যায় হইয়াছে।

কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে উক্ত মতের অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় না—

(ক) এইরূপে একশাস্ত্রতাসিদ্ধি ঘটিলে 'মোট ষোড়শলক্ষণ' মীমাংসাশাস্ত্র পাওয়া যায়; উহার মধ্যে 'দ্বাদশলক্ষণ' মাত্র মহর্ষি জৈমিনি-কৃত ও 'চতুর্লক্ষণ' মহর্ষি বাদরায়ণ-কৃত। অতএব, এ প্রকার ব্যাখ্যায় 'জৈমিনীয় ষোড়শলক্ষণ'—এই বাক্যাংশের সার্থকতা রক্ষিত হয় না।

(খ) আচার্য্য রামানুজ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ভগবান্ বৃত্তিকারের বাক্যাংশটি দেখিলেই মনে হয় যে, 'জৈমিনীয় ষোড়শলক্ষণ' শাস্ত্র ও চতুর্লক্ষণ 'শারীরক' শাস্ত্র—ইহারা উভয়েই এক পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসা শাস্ত্রের দুইটি অবান্তর বিভাগ। অতএব, উভয়ে মিলিয়া মোট 'বিংশতিলক্ষণ' গ্রন্থ হওয়া উচিত—'ষোড়শলক্ষণ' নহে।

(গ) এই স্থলে পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসার একশাস্ত্রতারূপ প্রতিজ্ঞা সাধ্য। কিন্তু 'জৈমিনীয় ষোড়শলক্ষণ' কথাটির পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে সাধ্য প্রতিজ্ঞাকে সিদ্ধ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়।

এই সকল কারণে উক্ত ব্যাখ্যা সকলের মনঃপূর্ত হয় না।

(২) পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"যদ্যপি জৈমিনীয়ং দ্বাদশলক্ষণং তথাপ্যধ্যায়চতুষ্টয়াত্মকেন সঙ্কর্ষকাণ্ডেন সহ ষোড়শলক্ষণং বোধ্যম্" (৩)।

অর্থাৎ—যদিও জৈমিনীয় কর্ম্মমীমাংসা দ্বাদশাধ্যায় পরিমিত, তথাপি চতুরধ্যায়াত্মক 'সঙ্কর্ষকাণ্ডে'র সহি[ত] যোগ করিলে উহাকে ষোড়শলক্ষণ বলা যাইতে পারে।

শাস্ত্রীজী খুব চতুরতার সহিত কার্য্য শেষ করিয়াছেন। 'সঙ্কর্ষকাণ্ড' কাহার কৃত—উহা মুদ্রিত কি অদ্যাপি অমুদ্রিত—তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। অতএব, 'সঙ্কর্ষকাণ্ড' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

খৃষ্টীয় ১৮৯৪ অব্দে কাশীর 'পণ্ডিত' পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া 'সঙ্কর্ষকাণ্ডম্' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ভূমিকায় গ্রন্থ-সম্পাদক সৎসম্প্রদায়াচার্য্য পণ্ডিতস্বামী শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 'সঙ্কীর্ণার্থনিরূপণপর' বলিয়া গ্রন্থখানির নাম হইয়াছে সঙ্কর্ষকাণ্ড। এ বিষয়ে প্রচলিত মতের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, জৈমিনি-কৃত ষোড়শাধ্যায়ী ধর্ম্মমীমাংসার শেষ চারি অধ্যায় 'সঙ্কর্ষ' (পরিশিষ্ট) কাণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রমাণস্বরূপ তিনি সঙ্কর্ষকাণ্ডের টীকাকার ভাস্করভট্টের নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"খণ্ডদেবকৃতভাট্টদীপিকা লক্ষণৈঃ কতিপয়ৈরসংস্কৃতা।
ইত্যবেক্ষ্য বুধভাস্করাগ্নিচিদ্ভারতী বরিভরাম্বভূব তাঃ ॥২॥
অদ্যাবধি কৃতিরেষাদ্যন্তবিহীনেতি দীপিকাখ্যাসীৎ।
ষোড়শকলাভিরধুনা পরিপূর্ণা ভাট্টচন্দ্রিকাত্বমগাৎ ॥৩॥
আসীৎ ষোড়শলক্ষণী শ্রুতিপদা যা ধর্ম্মমীমাংসিকা
সঙ্কর্ষাখ্যচতুর্থভাগবিধুরা কালেন সাজায়ত।
গায়ত্রী ত্রিপদাত্মিকেব বিধুধৈরন্যাপি পাপঠ্যতে
তাং পূর্ণামকরোচ্ছ্রমেণ মহতা গম্ভীরজো ভাস্করঃ" ॥৪॥

(ভাস্করভট্টের ভাট্টচন্দ্রিকার উপসংহার)

অর্থাৎ—খণ্ডদেব-(৪)-কৃত 'ভাট্টদীপিকা' কতিপয় অধ্যায়ে

---

(৩) বোম্বাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থমালা নং ১২—শ্রীভাষ্য দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫।

(৪) এই খণ্ডদেব ছিলেন একজন অতি প্রসিদ্ধ [ভাট্ট] মীমাংসক। তিনি কাশীধামে অধ্যাপনা করিতেন। জগন্নাথ পণ্ডিত-রাজ (দারার সংস্কৃতাধ্যাপক) এই খণ্ডদেবের নিকট হইতে মীমাংসা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—ইহা তিনি 'রসগঙ্গাধরে' উল্লেখ করিয়াছেন—"দেবাদেবাধ্যগীষ্ট স্মরহরনগরে শাসনং জৈমিনীয়ম্" (২)।

অসম্পূর্ণ দেখিয়া অগ্নিহোত্রী পণ্ডিত ভাস্করের বাণী তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দিল।

অদ্যাবধি খণ্ডদেবের এই গ্রন্থ আদ্যন্তবিহীন বলিয়া 'দীপিকা' (ছোট দীপ) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। অধুনা ষোল কলায় (ষোড়শ অধ্যায়ে) পরিপূর্ণ হইয়া উহা 'ভাট্ট-চন্দ্রিকা'ত্ব প্রাপ্ত হইল।

ষোড়শাধ্যায়ী শ্রুতিমূলা ধর্ম্মমীমাংসা কালক্রমে সঙ্কর্ষ-নামক চতুর্থভাগবিহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ত্রিভাগ-মাত্রাবশিষ্ট ধর্ম্মমীমাংসা অদ্যাপি ত্রিপদা গায়ত্রীর মতই পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পঠিত হইয়া থাকে। গম্ভীরের পুত্র ভাস্কর তাহা অধুনা বহুশ্রমে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

বর্ত্তমানে যাহা সঙ্কর্ষকাণ্ড নামে উপলভ্যমান, ভাস্কর-ভট্টরচিত ভাট্টচন্দ্রিকাই তাহার একমাত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ। শুনা যায় যে, আচার্য্য শবরস্বামী সঙ্কর্ষকাণ্ডের উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। রামমিশ্র শাস্ত্রী মহোদয় তাহার সঙ্কর্ষকাণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, গ্রন্থান্তরে শবরস্বামি-কৃত সঙ্কর্ষ-ব্যাখ্যানের দুই একটি বাক্য উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই সকল উদ্ধৃত বাক্য হইতে সঙ্কর্ষকাণ্ড কাহার রচিত, তাহা স্থির করার কোনও উপায়ই নাই। অতএব, চন্দ্রিকা-কার ভাস্করভট্টের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে হইলে সঙ্কর্ষকাণ্ড মহর্ষি জৈমিনি-কৃত বলিয়াই ধরিতে হয় (৫)। আর ইহাতে 'জৈমিনীয় ষোড়শলক্ষণ' কথাটির সার্থকতাও কোনরূপে রক্ষিত হইতে পারে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় আছে। বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সঙ্কর্ষকাণ্ড জৈমিনি-রচিত কি না, তৎসম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান। কারণ—

(ক) সঙ্কর্ষকাণ্ডের সূত্ররচনাশৈলী মহর্ষি জৈমিনি বা বাদরায়ণের সূত্ররচনা-রীতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবশ্য সঙ্কর্ষকাণ্ড জৈমিনি-রচিত নহে—ইহা প্রতিপাদন করিবার পক্ষে এই যুক্তিটি খুব সুদৃঢ় নহে। বরং কেহ কেহ এরূপ মতও প্রকাশ করেন যে, কাশীতে মুদ্রাপিত যে পুস্তকখানি অধুনা সঙ্কর্ষকাণ্ড বলিয়া প্রচলিত, তাহাকে মহর্ষি জৈমিনি-কৃত আসল সঙ্কর্ষকাণ্ডরূপে গ্রহণ করার বিপক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি নাই; তবে উক্ত সংস্করণে সূত্ররূপে যে সকল শব্দ বা শব্দসমষ্টি ছাপা হইয়াছে, সেগুলি পূর্ণাবয়ব সূত্র নহে—সূত্রৈকদেশমাত্র। ভট্ট ভাস্কর তাঁহার টীকামধ্যে সূত্রাবয়বমাত্রই প্রতীকরূপে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ সূত্রগুলি উদ্ধৃত করেন নাই। এই কারণেই সঙ্কর্ষকাণ্ডের সূত্রৈকদেশগুলি জৈমিনীয় কর্ম্মমীমাংসা বা বাদরায়ণের ব্রহ্ম-মীমাংসার সূত্রসমূহ হইতে ভিন্নজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণের সূত্রৈকদেশ প্রতীকরূপে উদ্ধার করার প্রথা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ—উহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই (৬)।

(খ) শ্রীভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদে আচার্য্য রামানুজ সঙ্কর্ষকাণ্ডের একটি সূত্রোল্লেখ করিয়াছেন—"তদুক্তং সঙ্কর্ষণে—'নানা বা দেবতা পৃথক্‌ত্বাদি'তি" (৭) ভগবৎ পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করও ঐ সূত্রটির নিম্নলিখিত-রূপে উদ্ধার করিয়াছেন—"তদুক্তং সঙ্কর্ষে—'নানা বা দেবতা পৃথগ্‌জ্ঞানাদি'তি" (৮)। কিন্তু বর্ত্তমানে উপ-লভ্যমান সঙ্কর্ষকাণ্ডের কুত্রাপি ঐরূপ সূত্র পাওয়া যায় না। কেবল দ্বিতীয়াধ্যায়ের (চতুর্দ্দশাধ্যায়ের) দ্বিতীয়পাদে দুইটি পৃথক্ সূত্র পাওয়া যায়—"তেষাং পৃথক্" (১৪।২।১৪) ও "নানা বা" (১৪।২।১৫)। ইহা হইতে কি এরূপ অনুমানের কোন বাধা হইতে পারে যে, আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বা শ্রীরামানুজ সঙ্কর্ষকাণ্ডের যে সংস্করণ দেখিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সঙ্কর্ষকাণ্ড (অন্ততঃ কোন কোন অংশে) তাহার অনুরূপ নহে? (৯)

---

(৫) "জৈমিনের্বিমলসূক্তিতুষ্ট্যাং মগ্নমাপ শুচিতাং মম চেতঃ" ভাট্টচন্দ্রিকা—উপসংহার শ্লোক ১) ভট্ট ভাস্করের এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি সঙ্কর্ষকাণ্ডকে জৈমিনি-রচিত বলিয়া প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চাহিয়াছেন।

(৬) "...সম্ভাব্যতে কদাচিদ্ বৃত্তিকারেণ ভাস্করেণ সূত্রৈক-দেশা এব প্রতীকতয়া উদ্ধৃতা ন তু সাকল্যেন সূত্রাণীতি, প্রাচাং হি বিদুষামসকৃদ্ দৃষ্টচরীয়ং রীতির্যত্তে একদেশমুপক্ষ্যৈব ব্যাখ্যাতুমার-ভন্তে......" সঙ্কর্ষকাণ্ড, কাশীসংস্করণ, রামমিশ্রশাস্ত্রি-কৃত ভূমিকা পৃঃ ১২।

(৭) ব্রহ্মসূত্র (৩।৩।৪২)—প্রদানাধিকরণ, বোম্বাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থমালা, নং ৬৮—শ্রীভাষ্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৫৭।

(৮) ব্রহ্মসূত্র (৩।৩।৪৩)—প্রদানাধিকরণ, শাঙ্করভাষ্য—রত্নপ্রভা-ভামতী-ন্যায়নির্ণয় সহ— বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণ, পৃঃ ১১৩৮।

(৯) শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী এই অসঙ্গতিটুকু উড়াইয়া দিবার জন্য

ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্কর ভাষ্যের 'রত্নপ্রভা' ও 'ন্যায়নির্ণয়' টীকাদ্বয়ে সঙ্কর্ষকাণ্ডের নামান্তর উল্লিখিত হইয়াছে—দেবতাকাণ্ড'। এই 'দেবতাকাণ্ড' শব্দটি এস্থলে বিশেষ-রূপে আলোচনার যোগ্য। শ্রীভাষ্যের 'তত্ত্বটীকা' নামক ব্যাখ্যানে 'তত্ত্বরত্নাকর' নামক গ্রন্থান্তর হইতে একটি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসুগণের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিবে—এই বিবেচনায় উক্ত বচনটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"কর্ম্ম-দেবতা ব্রহ্ম-গোচরা সা ত্রিধোদ্ভবৌ সূত্রকারতঃ।
জৈমিনের্মুনেঃ কাশকৃৎস্নতো বাদরায়ণাদিত্যতঃ ক্রমাৎ॥"
(তত্ত্বটীকা, বৃন্দাবন-সংস্করণ, পৃঃ ৭৯)

অর্থাৎ—জৈমিনি, কাশকৃৎস্ন ও বাদরায়ণ—এই তিন জন সূত্রকার হইতে যথাক্রমে কর্ম্ম, দেবতা ও ব্রহ্ম-বিষয়িণী মীমাংসা ত্রিধা বিভক্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল।

এই শ্লোকটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাহা সাধারণতঃ সঙ্কর্ষকাণ্ড বলিয়া খ্যাত, তাহারই অপর নাম 'দেবতাকাণ্ড' বা 'দেবতামীমাংসা' ও উহা জৈমিনি-রচিত নহে—"কাশকৃৎস্ন"-কৃত (১০)। তবে বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সঙ্কর্ষকাণ্ড আর কাশকৃৎস্ন-রচিত 'দেবতামীমাংসা' একই গ্রন্থ কি না, বলা বড়ই কঠিন।

বলিয়াছেন যে, শাঙ্করভাষ্যে বা শ্রীভাষ্যে সঙ্কর্ষকাণ্ডের 'সূত্রানুপূর্ব্বী' উদ্ধৃত হয় নাই—কেবল 'অর্থকথন' মাত্র করা হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটি প্রাচীন ভাষ্যেই যথাযথভাবে সূত্র উদ্ধৃত হইল না—অর্থ মাত্র কথিত হইল—ইহা বিশ্বাস করিতে কেমন যেন একটু বাধ-বাধ ঠেকে না কি?

(১০) মহর্ষি কাশকৃৎস্ন—অদ্বৈতবেদান্ত-সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন আচার্য্য। মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে (১।৪।২২) অতিশয় শ্রদ্ধাভরে মহর্ষি কাশকৃৎস্নের মতোল্লেখপূর্ব্বক স্বকীয় মতের পোষকতা করিয়াছেন।

এইবার শ্রীভাষ্যে উদ্ধৃত ভগবান্ বৃত্তিকারের বচনের অন্তর্নিহিত গূঢ় অভিপ্রায়ের আলোচনা প্রয়োজন। শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধি-প্রসঙ্গে বৃত্তিকার বলিতে চাহিয়াছেন যে, পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রকার মহর্ষি জৈমিনির প্রতিভা বিস্তৃতি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেবতামীমাংসাকার মহর্ষি কাশকৃৎস্নের নাম ক্রমশঃ বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিতে আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমে লোক ভুলিয়া গেল যে, দেবতামীমাংসা কাশকৃৎস্ন-কৃত। পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনির নামেই উহা চলিতে লাগিল। অবশেষে দ্বাদশাধ্যায়ী পূর্ব্বমীমাংসার তুলনায় চতুরধ্যায়ী দেবতামীমাংসার তুচ্ছত্ব লোকচক্ষুতে প্রতিপন্ন হওয়ায় উহার পঠন-পাঠন পর্য্যন্ত লোপ পাইল। শুধু কিংবদন্তী রহিয়া গেল যে, জৈমিনিই সঙ্কর্ষকাণ্ডের রচয়িতা। সঙ্কর্ষকাণ্ডের বৃত্তিকার ভট্ট ভাস্কর এই নিমিত্ত সমগ্র ষোড়শলক্ষণী ধর্ম্মমীমাংসা জৈমিনি-কৃত বলিয়া গোল বাধাইয়াছেন।

জৈমিনির দ্বাদশাধ্যায়ী 'কর্ম্মমীমাংসা' ও কাশকৃৎস্নের চতুরধ্যায়ী 'দেবতামীমাংসা' একত্রে মিলিয়া যেরূপ 'জৈমিনীয় ষোড়শলক্ষণী' ধর্ম্মমীমাংসা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেইরূপ জৈমিনীয় ষোড়শলক্ষণী ধর্ম্মমীমাংসা ও বাদরায়ণের চতুর্লক্ষণী ব্রহ্মমীমাংসা (শারীরক) মিলিয়া একত্রে বৃহত্তর 'বিংশতিলক্ষণী মীমাংসা' রূপে চলিয়া যাইবার পক্ষে বাধা কি থাকিতে পারে? বৃত্তিকার ভগবান্ বোধায়নের এই নিগূঢ় অভিসন্ধিই পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসার একশাস্ত্রতা প্রতিজ্ঞা স্থাপনের মূল বলিয়া বোধ হয়। এই বিষয়ে সুধীগণের অবধান বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

যদি

আমি যদি পুষ্প হ'য়ে ফুটিতাম স্বর্গ-রমণীয়,
তাহ'লে হতাম সখি তব কাছে সব চেয়ে প্রিয়,

আকীর্ণ অলক-প্রান্তে শোভা পেয়ে আমি অনুপম
বিরহজ্বালায় তব আনিতাম মধু-গন্ধে মম
চিত্তকোষে কি প্রশান্তি; কভু প্রেম-ফুলমালা হ'য়ে
নন্দন-মদির-হর্ষ, সুরভিত মধু-নিশা ব'য়ে
তব প্রাণ-বীণা মাঝে তুলিতাম অপূর্ব্ব ঝঙ্কার,
সার্থক জীবনখানি স্বপ্নসাধে পূর্ণিত আমার।

কখনো ছিঁড়ি সে মালা বিরচিতে নব অনুরাগে.
আবার সে গ্রন্থি টুটে' ঢল-ঢল ওষ্ঠ-অগ্রভাগে
চুম্বন করিতে শুধু, কভু পুনঃ পরশ-পীড়নে
ঝরায়ে দিতে গো মোরে শ্যামস্নিগ্ধ নিকুঞ্জ-কাননে
অলীক স্বপন হায় নাহি ফোটে পরিপূর্ণতায়,
যদি তা ঘটিত কভু রহিতাম ক্লান্ত প্রতীক্ষায়।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার [illegible]

বংশ-গৌরব

(উপন্যাস)

১

প্রথম বৈশাখের স্নিগ্ধ প্রভাত। সুনীল আকাশে প্রভাতারুণের প্রভা তখনও প্রখর হয় নাই। দামোদরের বক্ষঃ-প্রবাহিত সুশীতল সমীরণ তখনও ধরণীকে মৃদু ব্যজন করিতেছে। প্রভাতের আলোক-প্লাবনে চারিদিক স্নাত, বিধৌত; বিহঙ্গের সুমধুর কল-কাকলীতে চতুর্দ্দিক মুখরিত। সমগ্র প্রকৃতি যেন উৎসবের সজ্জায় সুসজ্জিত।

রেলপথের শাখার প্রান্তবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে একটি যুবক পাদচারণ করিতেছে। যুবকের মুখে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বের আভাস প্রতিফলিত আর ধৈর্য্য ধারণ করা তাহার যেন অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই, তথাপি সন্তোষের মন শান্ত হইতেছে না। যদি সুনীল না আসে, তাহা হইলে যে তাহার এত আয়োজন সকলই বৃথা হইবে;—এত আশা, আনন্দ অপূর্ণ রহিয়া যাইবে। সুনীল যদি আসে, তবে তাহাকে যত্নে ও আদরে পরিতৃপ্ত করিবার আনন্দ এবং তাহাকে নিরাপদে কলিকাতায় তাহার স্ব-গৃহে পুনঃ প্রেরণের চিন্তাই এখন সন্তোষের ব্যাকুলচিত্ত আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। ট্রেণের কিছু বিলম্ব আছে, কাজেই সুনীল আসিবার অনুমতি কি ভাবে পাইয়াছে—সন্তোষ তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

সুনীলের পিতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কখনও পল্লী-গ্রাম দর্শন করেন নাই; সভ্য জগতের লোক পল্লীগ্রামে যাইতে বা সেখানে বাস করিতে পারে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহার ধারণা, কলিকাতার বাহিরে বঙ্গভূমির সকল স্থানই বিপদ-সঙ্কুল!—সর্পাদি সরীসৃপের ও ম্যালেরিয়ার ভয়ই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সন্তোষ তাঁহাকে কত বুঝাইয়াছে যে, গ্রীষ্মের সময় পল্লী-অঞ্চলে ম্যালেরিয়াও থাকে না, এবং সর্পাদিও সর্ব্বদা বাহির হয় না। তথাপি বীরেন বাবুর আতঙ্ক দূর হইল না; অথচ সন্তোষের বিনীত অনুরোধও তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় একটি রাত্রির জন্য তিনি সুনীলকে তাহার বন্ধুর পল্লীভবনে গমনের অনুমতি দিলেন। সুনীল রৌদ্রে বাহির হইবে না, পুষ্করিণীতে স্নান করিবে না, সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহিরে পা বাড়াইবে না, জল ফুটাইয়া-লইবার পর সেই জল ঠাণ্ডা হইলে তাহাই পান করিবে, ইত্যাদি ব্যবস্থা অনুসারে কাজ হইবে—সন্তোষের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়া বীরেন বাবু অবশেষে অগত্যা পুত্রকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন; কিন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর হইল না।

এইরূপ স্থির হইলেও বীরেন বাবু শেষ-মুহূর্ত্তে পাছে মত পরিবর্ত্তন করিয়া বসেন, ইহাই সন্তোষের ভয়! ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া থামিলে সুনীলকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া সন্তোষের আনন্দের আর সীমা রহিল না। কয়েক জন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এবং সন্তোষের কয়েকটি সহপাঠীও সেই ট্রেণেই কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌছিলেন। অন্যান্য অতিথি অপরাহ্নের ট্রেণে আসিবেন, এইরূপ স্থির ছিল। প্রথমে অন্য অতিথিগণকে সম্মুখের দুই তিনখানা গাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া সন্তোষ সুনীল ও অন্যান্য সহাধ্যায়ীগণকে শেষ গাড়ীতে তুলিয়া-লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

পল্লীগ্রামের মনোরম দৃশ্য-বৈচিত্র্যের সহিত সুনীলের এই প্রথম পরিচয়। কনকপুরের পথে আসিয়া চতুর্দ্দিকে

দৃষ্টিপাত করিয়া অভিনব পল্লীদৃশ্যে তাহার পিপাসিত চিত্ত আনন্দ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইল। এইরূপ সুন্দর পাকা রাস্তা, তাহার দুই দিকে বাঁধা-রোসনাই পূর্ব্বে সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহার দুই তিন জন সহপাঠী বলিল, এমন পরিপাটী পথ পল্লীগ্রামে সচরাচর দেখা যায় না, বিশেষতঃ বাঁধা-রোসনাই তো গ্রামাঞ্চলে একেবারে নূতন। তাহারা সন্তোষকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "হাঁ, ওগুলা নূতন হয়েছে বটে, আর রাস্তা সুরক্ষিত ক'রতে ইউনিয়ন বোর্ডে বিস্তর দরবার ক'রতে হয়েছে, অর্থব্যয়ের তো কথাই নেই।"

দুই পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এই গ্রাম্য-পথ। পথের ধারে কোথাও ফলের বাগান, কোথাও শ্যামল কদলীকুঞ্জ, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত কৃষকদের পল্লী। প্রায় দুই ক্রোশ পথের মধ্যে স্থানে স্থানে দুই ধারেই বন; ঘনসন্নিবিষ্ট অশ্বত্থ ও বটের নিবিড় শাখা-পল্লব পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হওয়ায় পথ ছায়াচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহাদের শাখায় শাখায় লতা; গুল্মাদিতে তাহাদের তলদেশ আবৃত। এই সব বনের ভিতরেও পল্লীবাসীদের পরিত্যক্ত পুরাতন গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যাইতেছে। এত অল্প সময়ে কি করিয়া এই সকল বনের প্রাদুর্ভাব হইল, কেহ কেহ তাহাই ভাবিতে লাগিল। যাহারা এই অঞ্চলের জমির উর্ব্বরতার কথা জানিত, তাহারা এই সকল দ্রুত-বর্দ্ধনশীল আগাছার প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল না।

দেখিতে দেখিতে পথ কাঞ্চনপুর গ্রামে প্রবেশ করিল। পথের ধারে স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত বিধ্বস্ত অট্টালিকার ভগ্ন-স্তূপ দেখিয়া সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব ভাঙ্গা বাড়ী কাদের?"

সন্তোষ বলিল, "গ্রামের ধনীদের পরিত্যক্ত বাস-ভবন। কলিকাতার বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গৃহস্বামীরা জন্মভূমিকে ভুলেছিলেন; আর তাঁদের বংশধররা নিজ গ্রামের গৌরব কোনও দিন দেখেন নাই। তাঁরা ভুলেও কোন দিন গ্রামে আসেন না। অট্টালিকাগুলি সংস্কারের অভাবে ক্রমে জীর্ণ হ'য়ে ভেঙ্গে প'ড়েছে, তাই তাদের ঐ অবস্থা।"

সুনীল তখন একখানি সুরম্য অট্টালিকা দেখাইয়া বলিল "আর ওটা? ওটা দেখে তো মনে হয় এখন ওখানে ভদ্রলোক বাস করচে।"

সন্তোষ বলিল, "ঐটিই তো জ্ঞানেন্দ্র কাকার বাড়ী। জ্ঞানেন্দ্র কাকা বাবার বাল্য-সহচর ছিলেন। তিনি এখন কাঞ্চনপুরের জমিদার। কাঞ্চনপুরের বসুরা কনকপুরের মিত্র-বংশের দৌহিত্র-সন্তান। বসুরা এখন ছয় পুরুষ কাঞ্চনপুরে জমিদারী করছেন।"

দেখিতে দেখিতে ঘোড়ার গাড়ী কনকপুরস্থ বাস-ভবনের দ্বারদেশে উপনীত হইল। সেই স্থান হইতে বাড়ীর প্রায় কোন অংশই দেখা যায় না, ভিতর পর্য্যন্ত গাড়ীর পথ, কিন্তু বৃদ্ধ অভয়াচরণ মিত্র মহাশয় আজ দ্বারদেশে অতিথিদের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার আদরিণী পৌত্রীর বিবাহ উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, তাহা সমস্তই স্বয়ং অভ্যাগত অতিথিগণকে দেখাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। উৎসবের সজ্জা আজ দ্বারদেশ হইতে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে কনকপুরের জমিদার-ভবন আজ সুসজ্জিত ইন্দ্রালয়ের ন্যায় সুষমামণ্ডিত। অভয়াচরণ বাবুর অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজ যেন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না। কোথায় তাঁহার আধুনিক বিলাসিতার প্রতি বীতরাগ, আর কোথায় বা অতীতকালের গ্রাম্য প্রথা! তাঁহার সুবিস্তীর্ণ বাসভবন আজ বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় উদ্ভাসিত, এমন কি, অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষ-সমূহের শাখায় শাখায় আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে মহা সমারোহে প্রয়োজনীয় উপকরণ সমস্ত আনীত হইয়াছে। অভয়াচরণ বাবুর বহু বৎসরের অতৃপ্ত আনন্দের রুদ্ধ উৎসমুখ হইতে সকল বাধা অপসারিত হওয়ায় সেই উৎস যেন আজ সবেগে শতধারায় চতুর্দ্দিকে উৎসারিত হইয়াছে। বহির্জগতও তাঁহার এই অনাবিল আনন্দে যোগদান করিয়াছে। অভয়াচরণ বাবুর স্বহস্তরচিত প্রমোদোদ্যান তাঁহার অন্তরের বিপুল পুলকের আভাস পাইয়াই যেন আজ অজস্র পুষ্পসম্ভারে অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছে;—স্বর্গের হর্ষমুখরিত নন্দনকানন যেন আজ এই পল্লীবক্ষে তাহার সকল শোভাসম্পদসহ অবতীর্ণ হইয়াছে।

গ্রামবাসীরাও আজ হর্ষোন্মত্ত। ধনী, দরিদ্র, রোগী, ভোগী, যুবা, বৃদ্ধ, বালক, বালিকা সকলেই আজ এই

আনন্দসূত্রে সম্বদ্ধ। সকলে অক্লান্তভাবে উৎসবের আয়োজনে যোগ দিয়াছে। গ্রামবাসীরা তাহাদের জমিদার-বাড়ীতেই গত পাঁচ দিন অতিবাহিত করিয়াছে,—তাহাদের কাহারও গৃহে উনন জ্বালিবার প্রয়োজন হয় নাই। সকল উৎসব আজ চরম সীমায় উঠিবে; আজ জমিদার বাবুর পৌত্রী শেফালিকার শুভ বিবাহ।

২

অতিথিগণের জিনিসপত্রাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিয়া সন্তোষ বন্ধুবর্গ সহ গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইয়া পড়িল। জমিদার-ভবনের পার্শ্বেই গ্রামের পাঠাগার; এরূপ বৃহৎ ও সযত্নরক্ষিত সুবিন্যস্ত পাঠাগার সচরাচর কোন সহরেও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যানুরাগী অভয়াচরণ বাবু এই পাঠাগারে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা বিদ্যানুশীলনে রত থাকিতেন। গ্রামের অন্য কোন অধিবাসী এই পাঠাগারের সদ্ব্যবহার করে না, এজন্য তিনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করেন। তবে সন্তোষকুমার যখন গ্রামে আসে, তখন তাহার অবসর-কাল এই পাঠাগারেই অতিবাহিত হয়। পাঠাগারের অপর দিকে পাশাপাশি দুইটি সারস্বত প্রতিষ্ঠান,—একটি বালকদের ও অন্যটি বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইহার অল্প দূরে বালকদিগের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস। নিকটস্থ বহু গ্রামের বালকরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে। দূরস্থ গ্রামের ছাত্রগণ ছাত্রাবাসেই বাস করে।

জমিদার-ভবনের উত্তরে প্রথমেই জমিদারী সেরেস্তা; ইহার একটি কক্ষে অভয়া বাবু প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিতেন, তাহাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করিতেন। অভয়া বাবুর চেষ্টায় তাঁহার গ্রামে বা মহলে এখন আর বাদ বিসম্বাদ বড় একটা নাই। এমন কি, প্রজাদের প্রতিকল্পে অভয়া বাবুর চেষ্টায় কাঞ্চনপুরের জমিদারদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধেরও অবসান হইয়াছে। এই জন্য জমিদার-বাড়ীর উদ্যানের ব্যবধানে যে প্রাচীর ছিল, তাহাতে দ্বার কাটিয়া অভয়া বাবু দুই বাড়ীর বালক-বালিকাদের এক সঙ্গে খেলা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমে জ্ঞানেন্দ্র বাবু ও সন্তোষের পিতা ছিলেন খেলার সাথী; পরে এক সঙ্গে থাকিত একদিকে সন্তোষের ভগিনী শেফালিকা ও জ্ঞানেন্দ্র বাবুর কন্যা সুপ্রিয়া; আর অন্যদিকে সন্তোষ ও সুপ্রিয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রণেন্দ্র। খেলাধূলায় সন্তোষ ও রণেন্দ্র রণেন্দ্রের কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতাকে ও গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের খেলার সঙ্গী করিত। যখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষের বিদ্যানুরাগ বাড়িতে আর রণেন্দ্র অবনতির পথে নামিতে লাগিল, তখন তাহাদের এই বাল্যবন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন হইল। বসু-বংশে মিত্র-বংশের মত প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ ছিল না।

জমিদারী সেরেস্তা-সংলগ্ন গৃহে দাতব্য চিকিৎসালয় অভয়া বাবুর প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিকটস্থ ভূমিতে একটি নলকূপ করাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন, অদূরে যে সুন্দর পুষ্করিণী আছে, অভয়া বাবুর যত্নে ও চেষ্টায় তাহাতে বস্ত্রাদি ধৌত-করা এবং স্নান নিষিদ্ধ হইয়াছে,—তাহা কেবল পানীয় জলের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কিছু দূরে কৃষকদিগের পল্লী,—তাহাদের ক্ষুদ্র মৃন্ময় কুটীরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাহাদের চারিদিকে শস্যক্ষেত্র। সন্তোষের বন্ধুরা এই সকল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিল, "কনকপুর সত্যই সোণার পল্লী।"

গ্রাম-পরিদর্শনের পর তাহারা গৃহে ফিরিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইল। অন্তঃপুরের দক্ষিণদিকের বাগানের ভিতর দিয়া সকলে দামোদরের বাঁধান ঘাটে স্নান করিতে চলিল; কিন্তু সন্তোষের আপত্তিতে সুনীলের যাওয়া হইল না। সুনীলকে সে মর্ম্মর-মণ্ডিত পারিবারিক স্নানাগারে লইয়া গেল।—স্নানাগার দেখিয়া সুনীলের মনে হইল, সে কোনও আধুনিক সহরে আছে।

সুনীল স্নান সমাপন করিয়া আরামগৃহে আসিল। সন্তোষ ও অন্যান্য বন্ধুরা তখনও নদী হইতে ফিরিয়া আসে নাই। তাহাদের সঙ্গে নদীতে স্নানের সুযোগে বঞ্চিত হইয়া সুনীলের মনে হইল, পল্লী-প্রবাসের আনন্দ সে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পাইল না।

সেই কক্ষে একাকী বসিয়া অতীতের কত কথাই সুনীলের মনে পড়িয়া গেল। সে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা; সুনীল তখন সবে কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। সন্তোষ সেই বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতায় তাহার সহিত একই কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। উভয়েই তখন আই. এস্. সি শ্রেণীর ছাত্র।

কয়েক দিনের মধ্যেই উভয়ের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইয়াছিল। সুনীল তাহার বন্ধুকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হওয়ায়, ধনীগৃহে যাইতে সন্তোষকুমারের ইচ্ছা না থাকিলেও বন্ধুর আগ্রহপূর্ণ আমন্ত্রণ সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। সন্তোষের কলিকাতার বাসা সুনীলদের বাড়ীর অদূরে অবস্থিত। ক্রমশঃ উভয় বন্ধুর যাতায়াত খুব বাড়িয়া গেল।

এই ঘনিষ্ঠতার সংবাদ ব্যারিষ্টার মিষ্টার বি. ডাটের (বীরেন্দ্রনাথ দত্তের) কর্ণগোচর হইলে তিনি সুনীলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ছেলেটা কে ?"

সুনীল—"ও এবার ম্যাট্রিকুলেশনে ফার্ষ্ট হয়েছে।"

বীরেন্দ্র—"তা' তো হ'ল, কিন্তু ও কে—নাম-ধাম কিছু জান ?"

সুনীল—"ওর নাম সন্তোষকুমার মিত্র। ওদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার কনকপুর গ্রামে।"

বীরেন্দ্র—"ওর আছে কে ?"

সুনীল—"দেশে আছেন ওর পিতামহ, তিনি বৃদ্ধ, গ্রামের জমিদার। ওর পিতা পশ্চিমাঞ্চলে ডাক্তার ছিলেন, ওর বাল্যকালেই তিনি মারা গেছেন।"

বীরেন্দ্র—"পাড়াগেঁয়ে নগণ্য ঘরের কোন ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব—মানে—বেশী মিশামিশি না করাই ভাল; —তবে ছেলেটা লেখা-পড়ায় ভাল শুনছি, তা পড়াশুনার সুবিধা হয় তো ওর সঙ্গে আলাপ রাখা অবিশ্যি মন্দ নয়। তা তোমাদের কলেজে তো অনেক বড় লোকের ছেলেও পড়ে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পার না ?"

সুনীল পিতার আদেশ পালন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু সুনীলের হৃদয় তখন সন্তোষের সহিত যে সুদৃঢ় বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ, সেই সূত্র ছিন্ন করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। যাহা হউক, পিতার আদেশে সে সন্তোষের সহিত পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়া দিল,—তাহাতে সে লাভবানই হইল। সাহিত্যে বিজ্ঞানে সে বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিল এবং তাহার জ্ঞানতৃষ্ণাও সমধিক বর্দ্ধিত হইল।

এইভাবে প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হাইকোর্ট বন্ধ হওয়াতে মিষ্টার ডাট্ সপরিবারে শিমলা-শৈলে বায়ু-সেবন করিতে গিয়াছেন। সুনীলের কলেজ বন্ধ হয় নাই, বিশেষতঃ কয়েক মাস পরেই তাহার পরীক্ষা—সুতরাং তাহাকে একাই বাড়ীতে থাকিতে হইয়াছে। সন্তোষ প্রত্যহই প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সুনীলের বাড়ীতেই আসিয়া তাহার সহিত পাঠাভ্যাস করে। একদিন সন্ধ্যাকালে হঠাৎ সুনীলের ভেদ ও বমন আরম্ভ হইল। সন্তোষ ইহাতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে এক জন খ্যাতনামা ডাক্তারকে রোগী দেখিতে অনুরোধ করিল। সন্তোষ জানিত, বাঙ্গালী ডাক্তারের উপর দত্ত সাহেবের আস্থা নাই; এই জন্য সে যাঁহাকে ডাকিল তিনি ইংরেজ ডাক্তার। ডাক্তার আসিয়া সুনীলের রোগ পরীক্ষা করিয়া তাহার কলেরা হইয়াছে বলায় সন্তোষ তাঁহাকে দিয়াই সুনীলের পিতার নিকট শিমলায় তার পাঠাইল। বাড়ীর ডাক্তারবাবুও আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই ইংরেজ ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে সন্তোষ সকল ব্যবস্থা শেষ করিল। সারারাত্রি ধরিয়া তিন জনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পরদিন প্রভাতে সুনীলের রোগের প্রকোপ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল।

সেবার ব্যবস্থা ডাক্তার বাবুকে করিতে বলিয়া সাহেব-ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সন্তোষ নার্স আনিতে রাজী হইল না। সে নিজেই সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহার পীড়িত বন্ধুকে সুস্থ করিয়া তুলিবে। সন্তোষের আহার-নিদ্রার চিন্তা নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আর অধিক বিলম্ব নাই, সেদিকেও তাহার লক্ষ্য রহিল না। বন্ধুর শুশ্রূষায় সে মনপ্রাণ বিনিয়োগ করিল। ডাক্তার বাবু আসিয়া নিজে রোগীর কাছে বসিয়া স্নানাহারের জন্য সন্তোষকে জোর করিয়া তুলিয়া দিতেন।

চারি দিন পরে সুনীলের পিতা-মাতা গৃহে ফিরিলে সন্তোষ বাসায় যাইবার সুযোগ পাইল; পড়াশুনার কথা আবার তাহার মনে পড়িল। তাহাকে দেখিয়াই সুনীলের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আবার এ সময় এখানে কি করছ? রোগীর কাছে তোমার কি কাজ?" ডাক্তার বাবু তাঁহাকে বলিলেন, "সন্তোষের এখানে কি প্রয়োজন, তাই জিজ্ঞাসা করচেন? সন্তোষ এখানে না থাকলে আপনি এসে আপনার ছেলেকে দেখতে পেতেন কি? এরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে অক্লান্তভাবে সেবা ক'রতে আমি কখন কাউকে দেখিনি।"—এ কথা শুনিয়া মিঃ ডাট সন্তোষকে

ধন্যবাদ জানাইতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সন্তোষ তখন অদৃশ্য হইয়াছে; সেখানে নাই। সন্তোষ বুঝিল, তাহার দায়িত্ব ফুরাইয়াছে, তাহার উৎকণ্ঠারও কারণ দূর হইয়াছে। সুতরাং সেখানে আর তাহার থাকিবার প্রয়োজন ছিল না। পরদিন সন্তোষ সুনীলের সংবাদ লইতে আসিলে সুনীলের মাতা তাহাকে ডাকাইয়া মিষ্টবাক্যে আদর করিলেন। মিঃ ডাটও তাহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। সন্তোষ ইহাতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু সেই সময় হইতেই দত্তগৃহে সন্তোষ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল। সুনীলের মা তাহাকে স্নেহ-চক্ষে দেখেন, সুনীলের পিতাও পুত্রের সহিত সন্তোষের ঘনিষ্ঠতায় আর আপত্তি করিতেন না। সেই জন্যই সন্তোষ তাহার ভগিনীর বিবাহে সুনীলকে নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলে মিষ্টার ডাট্ তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। সুনীলকে সন্তোষের পল্লীভবনে যাইতে দিতে তাঁহার আপত্তি থাকিলেও তিনি মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা করিতে পারিলেন না। তিনি সুনীলের সকল দায়িত্বভার সন্তোষের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার গমনের অনুমতি দিলেন। পাঠক তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন।

এই সুযোগে সুনীলের বহুদিনের আশা পূর্ণ হইল। সে পল্লীজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভেরও সুযোগ পাইল। সন্তোষদের গৃহ দেখিয়া তাহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। তাহাদের সচ্ছল অবস্থার কথা সুনীল পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, কিন্তু এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা, তাহাদের গৃহস্থালীর সুব্যবস্থার কথা, তাহাদের বংশ-গৌরবের পরিচয় প্রভৃতি তাহার অজ্ঞাত ছিল। বিনয়ী সন্তোষ কোন দিন প্রসঙ্গক্রমেও এ সকল বিষয়ের আভাস তাহার বন্ধুর নিকট প্রকাশ করে নাই।

সহযাত্রীদের আগমনে সুনীলের চিন্তায় বাধা পড়িল; তাহারা বলিল, "নদীতে স্নানে এমন আনন্দ তুই তো পেলিনে। ওবেলা আমরা কোনও আপত্তি শুন্‌ব না, তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবই। সন্তোষের কথা আমরা শুন্‌ব না।"

সুনীল নিজেই রাজী হইল। সন্তোষ ভয়ে ভয়ে এবার আপত্তি করিলেও বুঝিল, তাহার আপত্তি বৃথা।

৩

সেই দিন অপরাহ্নে স্নানার্থ নদীর ঘাটে উপস্থিত হইলে, যতীন, শচীন প্রভৃতি সুনীলকে ধরিয়া এক-রকম জোর করিয়াই জলে নামাইল। সে পূর্ব্বে কোন দিন নদীতে নামিয়া স্নান করে নাই, এজন্য জলে নামিতে তাহার বড়ই ভয়! তাহার কাতরতা লক্ষ্য করিয়া সন্তোষ তাহার পাশে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং তাহাকে অল্প জলে টানিয়া আনিয়া নির্ভয় করিল। তাহার পর বন্ধুদের জলবিহার আরম্ভ হইল। তাহাদের আনন্দের আর সীমা নাই।

কিছুকাল পরে সেই ভৃত্য আবার নদীতীরে আসিয়া সন্তোষকে জানাইল, "আর দেরী করবেন না, কর্ত্তাবাবু ডাকছেন।"—অস্তোন্মুখ লোহিত তপন তখন পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে; নির্ম্মল নীলাকাশে ভাসমান কয়েকখানি অল্প শুভ্র মেঘের প্রতিবিম্ব নদীবক্ষে প্রতিফলিত। দূরাকাশের কোথাও তপনকিরণানুরঞ্জিত মেঘগুলি স্বর্ণাভ। অল্প পরেই দিবাকর পশ্চিম দিগন্তসীমায় নামিয়া পড়িলে, দামোদরের বক্ষে যেন বিগলিত স্বর্ণের স্রোত বহিতে লাগিল। আকাশে মেঘের কোলে নানা রঙের খেলা চলিল। ক্রীড়ারত যুবকবৃন্দের ইচ্ছা নহে যে, সেই স্থান ত্যাগ করে; কিন্তু সন্তোষের জন্য সকলকেই উঠিতে হইল। তাহারা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিল।

সন্ধ্যাসমাগমে গৃহ ও উদ্যানস্থিত বিদ্যুতের দীপমালা প্রজ্বলিত হওয়ায়—গৃহ অলকাপুরীর শোভা ধারণ করিল। সেই অট্টালিকা কিরূপ বৃহৎ ও কত সুন্দর, সন্তোষের বন্ধুরা এইবার তাহা বুঝিতে পারিল। এক জন বলিল, "সন্তোষ, এবারকার এ আসা মঞ্জুর নয়। আবার আমাদের আস্‌তে হবে।" অন্য সকলে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেও সুনীল নীরব রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া প্রমথ বলিল, "কি সুনীল, তুমি চুপ ক'রে রইলে যে? তোমার বুঝি আর এখানে আস্‌তে ইচ্ছা নাই?"

সুনীল,—"আস্‌বার ইচ্ছা থাকলেও আমার কি আর তা ঘ'টে উঠ্‌বে?"

যতীন,—"না এলে পল্লীজীবন কি ক'রে দেখা হবে? কাজের বাড়ীতে সন্তোষদের কিছুই এবার দেখাবার সময় হ'ল না। এমন কি, ওর ঠাকু'মা আর বোনের সঙ্গে পরিচয় পর্য্যন্ত হ'ল না।"

সুনীল কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—"সবই সত্য, কিন্তু বাবা আর যে রাজী হবেন না।"

বাড়ী ফিরিয়া সন্তোষ নিজের ঘরে যাইবার সময় বলিয়া গেল, "তোমরাও ভাই আমায় একটু ছুটী দিয়ে নিজের বাড়ীর মত যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াও।"

সে পুরাতন প্রাচীন ভৃত্যকে বলিল, "ভোলা কাকা, তুমি এঁদের জল-খাবার আর চা এনে দাও, দেখো, এঁদের যেন কোন অসুবিধে না হয়।"

সুনীল যখন অভয়া বাবুর নিকট উপস্থিত হইল, তখন বৈঠকখানায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। অভয়াচরণ বাবু হাসিমুখে সকলের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। তিনি সন্তোষকে দেখিয়া বলিলেন, "এস দাদা, প্রস্তুত ত? তুমি তোমার পিসেমশায়ের সঙ্গে বর আন্‌তে যাও।" অনন্তর তিনি তাঁহার একমাত্র জামাতা প্রতুলচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, আজ বিমল নাই, তুমিই আমার ছেলের কাজ কর। সন্তোষ ছেলেমানুষ, তোমারই উপর সব ভার। আমি এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, সর্ব্বাঙ্গ আমার শিথিল হয়ে পড়েছে; উৎসাহ আছে, কিন্তু শক্তির অভাব। আজ যেন সকলের মান-মর্য্যাদা বজায় থাকে, সে ভারও তোমার উপর। আমার ভরসা ক'রো না, আমি অকর্ম্মণ্য। যাঁদের কাজ তাঁরা আজ নেই, তাদের ভার-বওয়া কি আমার সাধ্য?"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

প্রতুল বাবু ও সন্তোষ তাঁহার আদেশ পালনে অগ্রসর হইলেন। সেই সঙ্গে অভয়া বাবু ও অন্যান্য অনেকে ফটক পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা যখন গাড়ীতে উঠিবেন, সেই সময় দেখা গেল, নায়েব বসুমহাশয় দ্রুতপদে সেই দিকে আসিতেছেন। তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া ইহার কারণ জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইলেন। এ সময় ত তাঁহার ষ্টেশনেই থাকিবার কথা। বর ও বরযাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে না থাকিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন কেন?

তিনি নিকটে আসিলে অভয়া বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি বোসজা! তুমি যে এরই মধ্যে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলে?"

নায়েব মহাশয়ের সর্ব্বশরীর তখনও উত্তেজনায় ও ক্রোধে কম্পমান; তাঁহার মুখে কথা নাই!—তিনি একখানি পত্র অভয়া বাবুর হাতে দিয়া মনস্থির করিবার চেষ্টা করিলেন। অভয়া বাবুর পত্রপাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বেই নায়েব মহাশয় কিঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "বর আসবে পরের গাড়ীতে, কিন্তু বরযাত্রীরা আগের গাড়ীতেই এসেছে। সঙ্গে এসেছেন বরের কাকা। তিনি গাড়ী থেকে নেমেই বল্লেন, 'আমরা তোমাদের সব জুয়াচুরি টের পেয়েছি! নিজে যে-বউ ঘরে তোলে-নি, তা'রই মেয়ে আমাদের গছানোর চেষ্টা! ও-সব এমনি হয় না, তার জন্য টাকা খরচ করতে হয়।'—বাবু, ওঁরা ভদ্রলোক হ'লে কি এ-সব কথা মুখে আন্‌তে পারতেন?"

পত্র পাঠ করিয়া অভয়াচরণ বাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বাবা প্রতুল, এরা বলতে চায় যে, আমি ছেলের বিবাহ দিয়ে কুলভ্রষ্ট হয়েছি; তাই আমাকে জাতে উঠবার জন্যে নগদ কুড়ি হাজার টাকা ওদের দিতে হবে। হাঁ, ওদের ঘুস দিতে হবে! এ অপমান বরদাস্ত করা আমার অসাধ্য। এই সব ইতরপ্রকৃতি লোকের সঙ্গে আমি আত্মীয়তা করতে চাইনে। তুমি যাও, ওদের সঙ্গে দেখা ক'রে বল, ওদের বংশে আমি কন্যা সম্প্রদান করব না। যে ঘরে আমার পৌত্রী নববধূর উপযুক্ত মর্য্যাদার সঙ্গে সাদর অভ্যর্থনা না পাবে, যে ঘরে আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী স্বর্গীয়া কুলবধূর সম্মান ও মর্য্যাদা অটুট থাক্‌বার সম্ভাবনা নেই, সে ঘরে আমার পৌত্রী পদস্পর্শ ক'রে তার পা কলুষিত করবে না।"

বৃদ্ধ ক্রমে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আমার পাপের আজ প্রায়শ্চিত্ত হ'ল! আমার স্বর্ণপ্রতিমা গৃহলক্ষ্মীকে ঘরে না আনার ফলে আমার গৃহ আজ লক্ষ্মীছাড়া হ'য়েছে।"—আরও কি বলিতে গিয়া অভয়া বাবু চেতনা হারাইলেন। সন্তোষ নিকটেই ছিল, তাঁহাকে ধরিয়া, অন্য কয়েক জনের সাহায্যে হাতের উপর শায়িত অবস্থায় একেবারে তাঁহার শয়ন-কক্ষে লইয়া চলিল। গ্রামের ডাক্তার তখন দাতব্য চিকিৎসালয়ে কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া পড়িলেন। রোগীকে সাবধানে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, কর্ত্তাবাবুর এখনই চেতনা-সঞ্চার হ'বে। তবে এখন ওঁকে সাবধানে রাখতে হবে; কোনও রকম উত্তেজনা বিপজ্জনক হ'তে

পারে। অনেক দিন ধ'রে ওঁর blood-pressure বেড়েছে। এর পর বাড়াবাড়ি হ'লে সামলিয়ে উঠা কঠিন হবে।"

এই আকস্মিক দুঃসংবাদে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গ্রামের গণ্যমান্য সকলেই, এবং নিমন্ত্রিত বিচক্ষণ ব্যক্তিরা প্রতুল বাবুকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা পরামর্শ দিতে লাগিলেন। প্রথমে কথা উঠিল, গাত্রহরিদ্রার পর বিবাহ অসমাপ্ত রাখা সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য। এই প্রসঙ্গে এক জন মুরুব্বি বলিলেন, "এমন সময় আর অন্য পাত্র পাবে কোথায়? কর্ত্তাবাবুর পক্ষে ২০০০৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা আদৌ কঠিন নয়; তারা যখন দাবী ক'রেছে, তখন ঐ টাকা দিয়ে সাতপাকটা ত শেষ কর; তার পর এক-রকম ক'রে বিয়েটা এখন হ'য়ে যাক। পরে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

কিন্তু কন্যাপক্ষের অনেকেই এই অশোভন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "সে কিছুতেই হবে না, হ'তে পারে না। এ রকম অভদ্র ব্যবহার অসহ্য;—তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, সকলে দল বেঁধে গিয়ে বরটিকে জোর ক'রে এনে বিয়ে দেওয়া যা'ক।"—সন্তোষের বন্ধুরা সেই স্থানেই ছিল, তাহারা সকল কথা শুনিয়া সবিনয়ে বলিল, "বরং চলুন, আমরাও আপনাদের সঙ্গে যাই। বর আমাদের সমবয়সী শিক্ষিত যুবক, তাকে আমাদের সঙ্কটের কথা বুঝিয়ে ব'লে বিয়েতে রাজি করা হয় ত তেমন শক্ত হবে না। তা'র মত হ'লে তার অভিভাবকরা হ'য় ত বুঝতে পারবেন যে, তাঁদের প্রস্তাব ভদ্রোচিত হয়নি। আর সেই সঙ্গে আপনিও বরের বাবাকে ভাল ক'রে বলবেন। তিনি এত বড় কুলীন, বিশেষতঃ রাজা খেতাব পেয়েছেন—তাঁর মন কি এতই সঙ্কীর্ণ হবে? সমাজের কল্যাণের চেয়ে টাকা কি বড় মনে করবেন?"—সংসার-অভিজ্ঞতাহীন শিক্ষিত যুবকরা স্বাভাবিক উদারতা বশতঃ কাজটি সুসাধ্য বলিয়াই মনে করিল!

কিন্তু প্রতুল বাবু সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "টাকা দেওয়া কোন মতেই চলবে না। চেতনা হওয়ার পর বাবা যদি শুনতে পান—তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে কাজ করা হয়েছে, তাহ'লে তিনি এতই রাগবেন যে, তা সামলাতে না পারায় হয় ত তাঁর প্রাণের হানি হবে। রাগ হ'লে তাঁর জ্ঞান থাকে না। আর এ কাজে পণ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্কল্পও অটল। তবে যদি বরের বাপ দেনা-পাওনার কথা না তোলেন, তা'হলে তাঁর ভাইয়ের এই অশিষ্ট ব্যবহার বাবা ক্ষমা করতেও পারেন। দেখা যাক্ কি হয়।"

অতঃপর প্রতুল বাবু সন্তোষের কয়েক জন বন্ধু ও গ্রামের প্রধান দুই-চারি জনকে সঙ্গে লইয়া রেলষ্টেশনে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। বরকে সন্তোষের বন্ধুরা বুঝাইবার চেষ্টা করিলে সে বলিল, "আমার বাবা কাকা যা' ক'রবেন, তার ওপর আমার কি করবার থাকতে পারে? আমি তাঁদের অবাধ্য হওয়ার শিক্ষা পাইনি মশায়!" তাহার মন্তব্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ যুবকরা তাহাকে বিলক্ষণ দু'কথা শুনাইয়া দিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

রাজা-সাহেবও প্রতুল বাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন, "অর্থ বিনিময়ে যে আপনাদের মেয়ে নিতে রাজী হয়েছি, তাতে আপনারা ধন্য হয়েছেন মনে করা উচিত। গায়ে-হলুদ ঐ মেয়ের সঙ্গে হয়েছে ব'লেই আমরা এতখানি ভদ্রতা দেখিয়েছি; কিন্তু আপনারা যদি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ টাকা দিতে না পারেন, তা হ'লে অনর্থক আর দোকানদারী করবেন না। আমার ছেলের বিয়ের জন্যে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই; এই বোকামীর ফল আপনারাই ভোগ করুন।"

আর অপমানের বোঝা বাড়াইয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া—প্রতুল বাবুরা হতাশমনে গৃহে ফিরিলেন। কাঞ্চনপুর দিয়া যাইবার সময় তাঁহারা দেখিলেন, জ্ঞানেন্দ্র বাবুর গৃহে মহা-সমারোহ আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধান লইয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন, সেই রাত্রিতেই তাঁহার কন্যা সুপ্রিয়ার বিবাহ হইবে। পরে সকলে জানিতে পারিলেন, পূর্ব্বদিন জ্ঞানেন্দ্র বাবুই লোক পাঠাইয়া বরপক্ষকে সকল কথা জানাইয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রাজা-সাহেব যদি তাঁহার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি ২৫০০৲টাকা নগদ ও ২৫০০৲ টাকার অলঙ্কারাদি বর-কনেকে যৌতুক দিবেন। এ বিবাহটা জ্ঞানেন্দ্র বাবুই ভাঙ্গিয়া দিয়া শেষ-মুহূর্ত্তে নিজের কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন।

এখন উপায়? সকলেই এই চিন্তায় কাতর। [ক্রমশঃ

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

আঘাটার পিছল

নদীতে বা পুকুরে নামিতে তীরে অনেক সময় ভীষণ পিছলে পা পিছলাইয়া আছাড় খাইতে হয়। পিছলে হড়কাইয়া না পড়িয়া পা রাখিয়া নামিবার সহজ উপায়—একখানা পুরাতন মোটর-

পিছল-ঘাটে সহায়

টায়ার ফেলিয়া সেই টায়ারে পা রাখুন; খুব সহজে নামিতে পারিবেন। যে-জায়গায় টায়ার রাখিবেন, সে জায়গায় আগে হইতে বালি ছড়াইয়া তবে টায়ার বিছাইবেন। তাহা হইলে পিছলে পা হড়কাইবার কোনো আশঙ্কা থাকিবে না।

বাইসিক্লের নব কলেবর

ইতালীতে নব কলেবরে বাইসিক্ল তৈয়ারী হইতেছে। এ গাড়ীর সামনে দেওয়া হইতেছে খুব ছোট একটি চাকা; অর্থাৎ পিছনের চাকার আকার যেমন আছে, তেমনি রাখা হইয়াছে; শুধু সামনের চাকাখানি খুব ছোট করা হইয়াছে। এ গড়নের বাইসিক্লে

বাইসিক্লের নূতন রূপ

উঠা-নামা করা খুব সহজ অথচ গাড়ীর গতিতে এতটুকু প্রভেদ ঘটিবে না।

আগুনের সঙ্গে লড়াই

লণ্ডনের ফায়ার-ব্রিগেডে অগ্নি-রক্ষকদিগের কাজ খুব নিরাপদ করা হইয়াছে। মানুষের প্রাণ এবং সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য রক্ষকদিগকে জ্বলন্ত লেলিহান অগ্নি-মুখে প্রবেশ করিতে হয়। ধাতব আচ্ছাদনে সে সময় অগ্নিতাপ হইতে নিজেদের রক্ষা করা যায় না। এখন অগ্নি-রক্ষকদিগের জন্য এ্যাশবেষ্টশ-নির্মিত ছাতা, এ্যাশবেষ্টশ-নির্মিত পরিচ্ছদ, দস্তানা ও মুখোশ প্রভৃতি

আগুনের বুকে দাঁড়াইয়া আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ

হইয়াছে। এ পোষাক অঙ্গে পরিয়া অগ্নিসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেও গায়ে এতটুকু আঁচ লাগিবে না!

—

রক্ষা-লেপ

এ যুদ্ধে লণ্ডনের অধিবাসীদের মনে সর্ব্বদাই আতঙ্ক—বিমান-পথে

ওভারকোট্-লেপ

জার্ম্মাণরা সহসা আসিয়া যদি আক্রমণ করে, কি করিয়া প্রাণ বাঁচিবে? আক্রমণ আসন্ন হইবামাত্র তীব্র শব্দ-ঝঙ্কারে সকলকে সঙ্কেত দিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, সে ব্যবস্থা নাকি খুব পাকা! রাত্রে লণ্ডনের অধিবাসীরা নূতন প্রণালীতে প্রস্তুত এই লেপ গায়ে চাপাইয়া শয়ন করিবেন এবং সঙ্কেত জাগিবামাত্র এই লেপে ঢাকিতে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া নির্দ্দিষ্ট নিরাপদ নীড়ে গিয়া আশ্রয় লইতে পারিবেন। এ লেপ হইতে দুই দিকে ক্যাপ-সমেত ওভার-কোট বনিয়া উঠিবে; এবং তাহাতে আপাদ-মস্তক ঢাকা যাইবে।

কুঞ্চিত-কেশিনী

মাথার চুল কুঞ্চিত করিয়া যে সব সুকেশিনী কেশের সজ্জা সাধন করিতে চান, তাঁদের জন্য এক রকম নূতন চিরুণী তৈয়ারী হইয়াছে। নকল ধাতুতে এ চিরুণী তৈয়ারী। চিরুণীর সঙ্গে কেশ কুঞ্চিত করিবার জন্য ছোট একটি যন্ত্র সংলগ্ন আছে। এই ছোট যন্ত্রটি চিরুণীর দ্বিধাভিন্ন হাতলে প্রবিষ্ট করিয়া একটু চাপিয়া দিলে চিরুণীর সঙ্গে লাগিয়া আঁটিয়া বসিবে; তখন এ চিরুণীতে মাথার চুল আঁচড়াইলে চুল কুঞ্চিত হইবে। সেই কোঁকড়া চুলে মাথার

কেশ-কুঞ্চন কাঁকুই

কাঁটা আটকাইয়া দিন, কোঁকড়া চুলের পাক খুলিবে না। নিত্য দিনের অভ্যাসে চুল ক্রমে চিরকুঞ্চিত শ্রীতে বিভূষিত থাকিবে।

গোলাপ-কুঁড়ি তোলা

গোলাপী আতর

প্রেগের বহু পল্লীগ্রামে গোলাপ ফুলের বড় বড় বাগিচা আছে। গ্রামের কৃষকেরা গোলাপ ফুলের ফশল ফলায়! এই ফুল হইতে তারা যে-ভাবে গোলাপ-নির্য্যাস বা আতর প্রস্তুত করে, তার প্রণালী সহজ। অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ-কুঁড়ি বিপুল ভাবে সংগ্রহ করিয়া বেতের ঝুড়িতে রাখা হয়। তার পর বোঁটা কাটিয়া ফুলের গোটা পাপড়ি লইয়া সেগুলি তামার পাত্রে রাখিয়া সে পাত্রে পরিষ্কার জল দেয়; দিয়া কাঠের জ্বালে ফুটাইয়া লয়। ফুটাইবার সময় তামার পাত্রটি কয়লা দিয়া ঢাকিয়া রাখে। আগুনের তাপে জল শুকাইয়া বাষ্পে পরিণত হয়। তখন পাপড়িগুলি সন্তর্পণে ছাঁকিয়া এক প্রকার 'কনভেন্সি' তৈলপ্রয়োগে তাহাকে তরল করা হয়, এই তরল-সার আবার কাঠের মৃদু জ্বালে চড়াইলে তৈল-বাষ্পে গোলাপ-সুরভিত ঘন নির্য্যাস মিলে। এই নির্য্যাস 'অটো-রোজ'!

ফুটবল-খেলোয়াড়ের বর্ম্ম

ফুটবল খেলিতে গিয়া ধাক্কাধাক্কিতে আছাড় খাইয়া কত খেলে হাত-পা, গলার হাড়, অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া জন্মের মতো অকর্ম্মণ্য হই

পোষাক পরিয়া যেমন খুশী ঝাঁকুন-ঘুরুন

খেলার বর্ম্ম
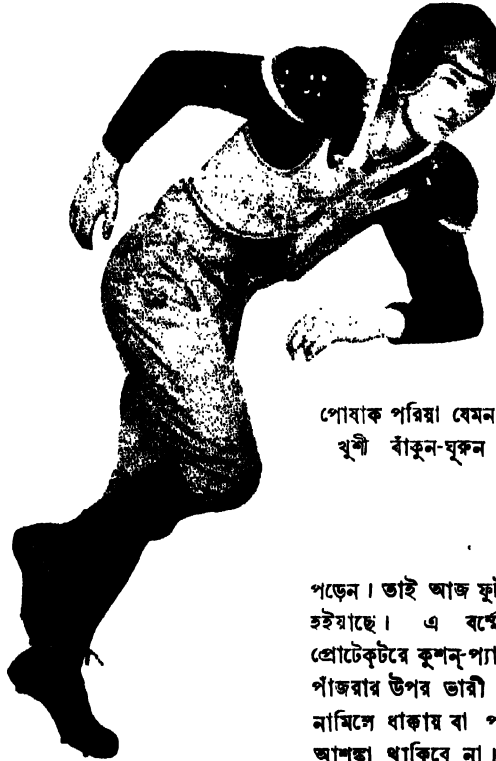
পড়েন। তাই আজ ফুটবল-খেলোয়াড়ের দেহ-রক্ষার জন্য বর্ম্ম নির্ম্মি হইয়াছে। এ বর্ম্মের নাম "ফুটবল প্রোটেক্টর-গার্ড"। প্রোটেক্টরে কুশন্-প্যাড দেওয়া আছে। সে প্যাড কাঁধে, বুকে পাঁজরার উপর ভারী চামড়ার ষ্ট্রাপের সাহায্যে আঁটিয়া খেলা নামিলে ধাক্কায় বা পতনে দেহের অস্থি-পঞ্জর ভাঙ্গিবার বিন্দুমা আশঙ্কা থাকিবে না। এ প্রোটেক্টর ইলাষ্টিক (স্থিতিস্থাপক কাজেই সর্ব্ববিধ-ভাবে নড়িতে-চড়িতে ছুটিতে-পড়িতে খেলোয়াড়ে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবে না।

সচল বাড়ী

আমেরিকার কারখানায় বাড়ী-ঘরের অর্ডার দিলে তারা খাট-পালঙের মত বাসোপযোগী কাঠের বাড়ী-ঘর তৈয়ারী করিয়া দিতেছে। বাড়ী-ঘর তৈয়ারী হইলে ট্রাক-গাড়ীতে করিয়া সে বাড়ী-ঘর ঠিকানা-মাফিক পৌছাইয়া দেয়। 'কটেজ' ও 'বাঙলো' প্যাটার্ণের বাড়ী-ঘর তৈয়ারী হইতেছে। তবে অনেক বেশী কামরার প্রয়োজন থাকিলে টেবিল, আলমারি, খাটের ব্যাটম, ছৎরী প্রভৃতির মতো স্বতন্ত্রভাবে সেগুলি আনিয়া আসল-বাড়ীর সঙ্গে কায়েমিভাবে আঁটিয়া লওয়া চলে। এ বাড়ী-ঘর ঝড়ে নড়িবে না—ভূমিকম্পে পড়িবে না—পোকা-মাকড়ে এ বাড়ী-ঘর কুরিয়া খাইবে না; এ সব ঘরের দেওয়াল আগাগোড়া ইঞ্চি পুরু। শুইবার ঘর; বসবার ঘর; রান্নাঘর; বাথরুম্—সমস্তই এ কারখানার কারিগরেরা কম্প্লীট ছাঁদে বানাইয়া

গাড়ীতে বাড়ী চালান

দালান্

সচল বাড়ীর ড্রয়িং-রুম

দিতেছে। ঘরের ছাদে কাঠ বা টালি রুচিমাফিক দেওয়া চলে। এ ঘর-বাড়ীতে ব্যয় পড়ে অল্প তার উপর স্ক্রুপের প্যাচ খুলিয়া যেখানে খুশী প্যাক করিয়া লগেজের মতো বাড়ী-ঘর বহিয়া লইয়া যান্—কোন অসুবিধা নাই!
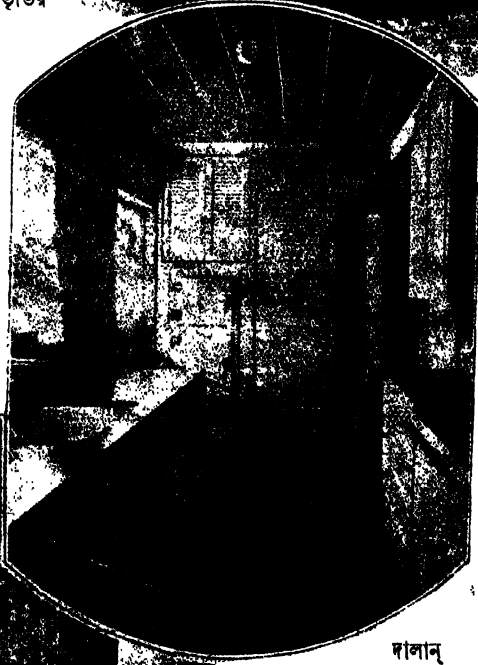
ঘরের বিস্কুট

ইলেক্‌ট্রিসিটির কল্যাণে অনেকেই আজ ঘরে বহু অসাধ্য-সাধন করিতেছেন। বেশভূষার কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচিত্র ভোজ্য-রচনায় বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আজ বহু গৃহিণীকে বহুভাবে গৃহস্থালী-কাজে সহায়তা করিতেছে। সম্প্রতি এক রকম বৈদ্যুতিক উনুন (oven) তৈয়ারী হইয়াছে; এ উনুনের কল্যাণে ঘরে

ঘরে বিস্কুট তৈয়ারী

বসিয়া সাত মিনিটে একরাশ বিস্কুট তৈয়ারী করিতে পারেন। উনুনের আকার বৈদ্যুতিক ইস্ত্রীযন্ত্রের অনুরূপ।

বিষবাষ্প-রোধের পোষাক

যুদ্ধের সঙ্কট-নিবারণের জন্য পাৎলা অয়েল-সিল্কে এক রকম পোষাক

পোষাক গায়ে

পোষাক হাতব্যাগে

তৈয়ারী হইয়াছে। এ পোষাক প্রমাণ-সাইজের; অথচ মুড়িলে মুঠার মধ্যে ভরা যায়! মুড়িয়া এ পোষাক হাত-ব্যাগের মধ্যে অনায়াসে তুলিয়া রাখুন; প্রয়োজন-মতো বাহির করিয়া গায়ে দিবেন! পোষাকটি পুরা প্রস্থের—অর্থাৎ টুপি, ব্লাউজ, ট্রাউজার, দস্তানা এবং জুতা সব আছে। এ পরিচ্ছদের কোথাও এতটুকু অঙ্গহানি হয় নাই।

এক-পায়া টেবিল

সেলাই, খেলা, চা-পান, লেখাপড়া—স্বচ্ছন্দভাবে এ সব কাজ করিবার জন্য একপায়া টেবিলের সৃষ্টি হইয়াছে। একটিমাত্র পায়ায় খাঁজ কাটিয়া বড় স্ক্রুপ আঁটিয়া দিন। ব্যবহারের সময় চেয়ারের দুই হাতার উপর কিম্বা খাটের উপর তক্তাখানি বিছাইয়া নিন—এক দিকে পায়ার উপর তক্তার ভর থাকিবে এবং চেয়ারের হাতা বা খাটের উপর থাকিবে আর এক দিককার ভর। এখন এ টেবিল স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করুন। স্ক্রুপ টানিয়া টেবিলকে যেমন-খুশী উঁচু-নীচু করিতে পারেন।

এক-পায়া টেবিল

ফাটা ডিশ

ডিশ, পেয়ালা প্রভৃতি যদি ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে সে ফাটা পেয়ালা-ডিশ ফেলিয়া দিবেন না! কড়ায় নাটা-তোলা দুধ ঢালিয়া সেই দুধের সঙ্গে দুধের পাত্রে ফাটা ডিশ-পেয়ালা রাখিয়া দুধের সঙ্গে 'বয়েল্' বা সিদ্ধ করিয়া লইবেন। ফাটার জন্য প্লেট-ডিশে অসুবিধা ভোগ করিবেন না; ফাটা ডিশ-প্লেট এ প্রক্রিয়ার ফলে আস্ত ডিশ-পেয়ালার মতোই ব্যবহারযোগ্য, মজবুত এবং দীর্ঘায়ু হইবে।

দুধের পাত্রে ফাটা ডিশ

(উপন্যাস)

৮
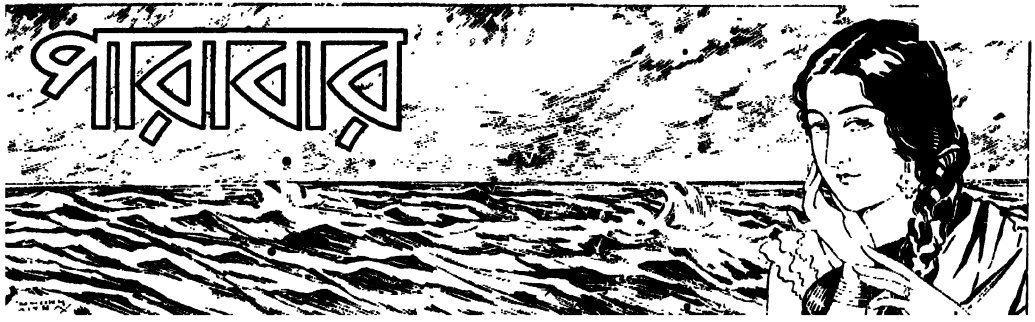
ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিতে উষাঙ্গিনী দেখে, ট্রেন চলিয়াছে এবং শীটে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া বীণা খোলা জানলা দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া আছে··· অনিদ্রায় চিন্তায় মলিন মুখ—দু'চোখে যেন রাজ্যের চিন্তা বিজড়িত! বীণা বসিয়া আছে পুতুলের মতো···যেন চেতন-হারা!

পাশাপাশি কামরায় বসিয়া যাত্রীরা ঘুমাইতেছে। তিনকড়িও নিদ্রাচ্ছন্ন। বীণা শুধু জাগিয়া আছে।

উষাঙ্গিনী ডাকিল—সলিলা···

বীণা চমকিয়া উঠিল···বুকের মধ্যে সে চমকের ঢেউ লাগিল।

বীণা ফিরিয়া চাহিল।

উষাঙ্গিনী বলিল,—সারা রাত এমনি জেগে বসে' আছো?

মৃদু মলিন হাস্যে বীণা বলিল—ঘুম হলো না। ট্রেণে ঘুমের অভ্যাস নেই তো।···তোমার ঘুম হ'য়েছিল পিশিমা? কোনো কষ্ট হয়নি?

উষাঙ্গিনী বলিল,—না।···

কথাটা বলিয়া উষাঙ্গিনী বাহিরের পানে তাকাইল··· বাহিরে সবুজ মাঠ-বাটের ফাঁকে-ফাঁকে বাঙলার পল্লী দেখা দিয়া আবার তখনি বনের আড়ালে লুকাইতেছে··· উষাঙ্গিনী বলিল,—বোধ হয় এসে পড়েছি। মাঠ-জলার পরে মাঝে মাঝে লোকালয় দেখা যাচ্ছে···তুমি মুখ-হাত ধোবে না? এ-সব কামরার নতুন বাথরুমগুলো দেখছি, ভালো···

বীণা বলিল,—তুমি আগে মুখ ধুয়ে এসো। তার পর তুমি এলে আমি যাবো'খন!

উষাঙ্গিনী বাথরুমে ঢুকিল···

বীণার এবার সত্যই চেতনা ফিরিয়াছে! এতক্ষণ যেন কোন্ স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছিল! রাত্রে অন্ধকারের আব্‌ছায়ায় বসিয়া-বসিয়া শুধু দেখিয়াছে, বাহিরে নানা বেশে ছায়ার ছুটাছুটি···মাঝে-মাঝে সে ছুটাছুটির উপর দাঁড়ি পড়িয়াছে,—তখন স্তিমিত আলোয় ···ঘুমঘোরে দু'চারি জন লোকের ছুটাছুটি, একটু কলরবের ঝাপ্‌টা—তারপর আবার সেই মাঠে-বাটে ছায়ার ছুটাছুটি···

এখন উষাঙ্গিনীর কথায় মনের ঘোর কাটিয়া চোখে পড়িল জীবন্ত পৃথিবীর নূতন রূপ! মনে পড়িল, কোথা দিয়া একটা রাত্রি কাটিয়া গেছে! কাল সে কোথায় ছিল··· তার পর চকিতে কোথা দিয়া কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! যেথানে আসিয়াছে, এখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, সে উপায় নাই! সামনে অগ্রসর হইতে হইবে! ফিরিয়া যাইবে,— পিছনে সে-পথের চিহ্ন-অবধি মুছিয়া ফেলিয়া আসিয়াছে! উষাঙ্গিনী বলিল, আসিয়া পড়িয়াছি। তার মানে···?

বীণা শিহরিয়া উঠিল।···

চোখের সামনে আলো স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে··· যেখানে যত আব্‌ছায়া ছিল, আবরণ ছিল, অস্পষ্টতা ছিল, তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আলো প্রবেশ করিয়া এখন সব সুস্পষ্ট রেখায় ফুটাইয়া তুলিতেছে!···

রাত্রির সে-অস্পষ্টতায় নিজেকে ঢাকিয়া-ঢুকিয়া কোনোমতে চালাইয়া লওয়া যায়···কিন্তু দিনের এ আলোয় ছদ্ম-আবরণকে কি করিয়া ঢাকিবে?···চোখের সামনে ছায়া-মূর্তিতে আসিয়া দাঁড়াইল সন্তোষ, সলিলা, ক্ষীরোদাময়ী, পিণ্ট-মিণ্ট-সিণ্ট···কাতু-মাসীর বাড়ী···

সে-বাড়ীতে কাজের ভিড়…সে-ভিড়ে জ্যোতি…বিজয়া!… মহাদেওয়ের সেই হাসি-ভরা মুখখানা পর্য্যন্ত…

তারা ছিল যেন মস্ত সহায়!…এখন…যদি তারা জানিতে পারে, কি দুঃসাহসে ভর করিয়া বীণা কতখানি মিথ্যা-ছলনার আশ্রয় লইয়াছে…

বীণার দু'চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল…

নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা ভাবিল, তাই করিবে না কি? ফিরিয়া যাইবে? তিনকড়ি গাঙ্গুলির পানে চাহিল। এখনো ঘুমাইতেছেন! সরল ভদ্রলোক! কি-বিশ্বাসে তাকে সঙ্গে আনিয়াছেন! আর এই উষাঙ্গিনী…

রোগে যে ব্যথাই পাক্, তার মতো উষাঙ্গিনীর মনে ভয় নাই…শঙ্কা নাই!

বীণার বুকের উপর দিয়া যেন সারি-সারি কামানের গাড়ী চলিয়াছে!

উষাঙ্গিনী আসিয়া পাশে বসিল, বলিল,—এবার তুমি যাও সলিলা…মুখচোখ ধুয়ে এসো। এই নাও তোয়ালে আর সাবান…

বীণার হাতে উষাঙ্গিনী সাবান ও তোয়ালে দিল। তার পর বাহিরের পানে তাকাইয়া বলিল,—এবারে বোধ হয় বর্দ্ধমান আসবে…মনে হচ্ছে যেন! কতবার গেছি তো এ-পথে! তুমি বোধ হয় এদিকে কখনো আসোনি?

যেন কোন্ অতল পাতাল-গহ্বর হইতে বীণা বলিল, —না…

উষাঙ্গিনী বলিল যাও, দেরী করো না। তুমি এলে বাবাকে ডেকে দেবো। তার পর তিনজনে বসে গল্প করবো। …একবার রাজপুরীতে প্রবেশ ক'রলে তোমার সঙ্গে হয় তো আর এমন গল্প করা হবে না।… এত ভালো লাগছে তোমায় যে সে কি বলবো!

বীণার বুকখানা যেন ফাটিয়া চূর্ণ হইবে!…কি দুর্ভাগিনী সে! এমন স্নেহের কথা বলিবে এমন আপন-জন তার কেহ নাই! বেচারী সলিলা! তার জন্য পৃথিবীতে স্নেহ-প্রীতির এমন ভাণ্ডার…এ সব ছাড়িয়া কোথায় গেল সলিলা? যাইবার তার কি প্রয়োজন ছিল?

মুখ-হাত ধুইয়া বীণা ফিরিয়া আসিল…মনকে সবল সুদৃঢ় করিয়া। না, পুরানো কথার চিন্তায় মনকে আচ্ছন্ন হইতে দিবে না! যে-বাস্তব কঠিন বেশে সামনে আসিতেছে, তার সামনে দাঁড়াইবে…দাঁড়ানো ছাড়া এখন আর তার অন্য উপায়ও নাই!

উষাঙ্গিনী বাহিরের পানে চাহিয়াছিল; বীণাকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল,—বসো…

বীণা বলিল,—না, বসবো না পিশিমা! তোমাকে খেতে দিতে হবে। কমলালেবু আনি…

—থাক্, লেবু খেয়ে খেয়ে লেবুতে অরুচি ধরে গেছে…

—তা'হলে আপেল খাও…

উষাঙ্গিনী বলিল,—না, গাড়ীতে আর খাবো না। একেবারে সেই বাড়ীতে গিয়ে খাবো'খন!…বাবাকে ডাকি… তার পর দু'জনে ব'সে চারিদিক দেখি আর গল্প করি।

তিনকড়িকে উষাঙ্গিনী ডাকিয়া দিল। তিনি উঠিলেন। বলিলেন—বাঃ, সকাল হ'য়ে গেছে! তাই তো…বর্দ্ধমান পেরিয়ে এসেছি না কি রে?

উষাঙ্গিনী বলিল,—বোধ হয়, না!

তিনকড়ি বলিলেন,—তা'হলে বর্দ্ধমানে পৌঁছুলেই চায়ের ব্যবস্থা করা। আমার দিদি চা খাবেন তো?

বীণা বলিল—আমি?…না ছোট দাদু…চা আমি খাই না।

তিনকড়ি বলিলেন,—ভালো, ভালো দিদি…ও অভ্যাসটা আর করো না। পৃথিবীতে খাবার মতো কত জিনিষ রয়েছে…তা ছেড়ে চা খাবে কি-দুঃখে?…তা'হলে তোমরা কিছু খেয়ে নাও! ফল রয়েছে…জামাই মিষ্টি কিনে দেছে। দু'জনে খাও…

উষাঙ্গিনী বলিল—আমি কিছু খেতে পারবো না, বাবা! সলিলা খাক্।

উষাঙ্গিনীর মুখে সলিলা-নাম শুনিয়া বীণা আবার চমকিয়া উঠিল। কিন্তু না, চমকাইলে চলিবে না…চম্‌কানো নয়…

বীণা বলিল,—আমিও খাবো না। খিদে নেই ছোট দাদু…

তিনকড়ি বলিলেন,—এ-বয়সে তোমাদের খিদে আর থাকবে কি দিদি! খিদে পেতে দেবে না!…খিদের বয়স আসুক, তখন বুঝবে, অখিদে কি-বস্তু…

কথাটা বলিয়া তিনকড়ি হাসিলেন।

তার পরে বলিলেন,—না, না···তা হয় না। বেশ, ফল না খাও, বর্দ্ধমান আসছে · বর্দ্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা···তাই খেয়ো !···পশ্চিমেই রইলে দিদি···বাঙলা দেশের খাবার তো খেলে না! খেয়ো এই বর্দ্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা···খাশা জিনিষ! তোমার পশ্চিমের লোক কি মিষ্টি তৈয়েরী করতে জানে?···হুঁঃ···দুধ জমিয়ে তাতে ঠেশে চিনি-গুড় মিশিয়ে খালি ঐ প্যাঁড়া আর প্যাঁড়া!···এই যে তোমার পিশিমা···শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসে আগে-আগে কেবল বলতো, কান্না পায় বাবা মিষ্টি মুখে দিতে বসে! তোমার পিশিমা মিষ্টিটা খুব ভালোবাসে কি না সন্দেশ, রসগোল্লা, লেডিগেনি···

তিনকড়ি গাঙ্গুলি আবার হাসিলেন···

সলজ্জ-হাস্যে উষাঙ্গিনী বলিল—তুমি মুখ-হাত ধোও গে···না হ'লে কখন বর্দ্ধমান এসে যাবে, তোমার আর সীতাভোগ-মিহিদানা কেনা হবে না!

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বাথরুমে গেলেন।

উষাঙ্গিনী বলিল—সত্যি সলিলা, এদেশের মিষ্টি খুব ভালো···

বীণা বলিল,—কিন্তু কাশীতেও সন্দেশ, রসগোল্লা, লেডিগেনি—এ-সব পাওয়া যায়, পিশিমা···

হাসিয়া উষাঙ্গিনী বলিল—কেন পাওয়া যাবে না? বাবার ঐ রকম কথা! বাবা সন্দেশটা খুব ভালোবাসেন। ···আমি তখন এলাহাবাদে···বাবা গিয়ে দু'দিন ছিলেন। ওখানকার বাঙালীর দোকান থেকে ফরমাশ দিয়ে তোমার পিশেমশায় বাবার জন্যে সন্দেশ তৈয়েরী করিয়ে আনালেন। একটুখানি মুখে দিয়ে বাবা আর খেলেন না। কত বললুম, বাবা বললেন – ছ্যাঃ, এদেশের সন্দেশ না কি আবার মানুষে খায়! তোমার পিশেমশায় বললেন—বাঙালীর দোকান···তারা কলকাতা থেকে ময়রা আনিয়ে ভিয়েন করাচ্ছে! বাবা বললেন—ময়রা এলে কি হবে? সে ময়রা বাঙলা দেশের গরুর দুধ এখানে পাবে কোথায়? সে ছানা? এখানকার জল-বাতাসে সে-ছানা তৈয়েরী হয় না···সে-পাকও এখানে হয় না···তার উপর আবহাওয়া বলে' একটা বস্তু আছে তো!

কথা শেষ করিয়া উষাঙ্গিনী হাসিতে লাগিল।

বীণার চমৎকার লাগিল। এ-মানুষটিকে ক'ঘণ্টাই বা দেখিয়াছে! প্রথম যখন দেখে, তখন তার মনের মধ্যে চলিয়াছে বজ্র-বিদ্যুতের ঘনঘটা··লেলিহান অগ্নিশিখার যেমন মুহুর্মুহু শিহরণ, তেমনি প্রাণঘাতী গর্জ্জন! তার পর ঐ শান্ত স্বর, মিষ্টমধুর বাণী! সে-স্বরে কত স্নেহ-মমতা! তারপর বীণাকে নিঃসংশয়ে এতখানি বিশ্বাস! তার পর ষ্টেশন, ট্রেণ···এবং দেখা হইল এই উষাঙ্গিনীর সঙ্গে!··· এই একটি রাত্রির পরিচয়ে তিনকড়ি গাঙ্গুলিকে এমন নির্ভরযোগ্য স্নেহশীল পরমাত্মীয় বলিয়া মনে হইয়াছে! ভাবিল, যদি তেমন হয়···তিনকড়ি গাঙ্গুলিকে সব কথা বুঝাইয়া বলিবে···তিনি হইবেন সহায়!

কিন্তু এ-কথা বার-বার কেন ভাবে? না, না, না··· আর সে ভাবিবে না। সে বীণা নয়, বীণা নয়। বীণা মরিয়াছে। সে সলিলা···

উষাঙ্গিনী বলিল—বাড়ীর কাছে যতই আসছি, মন তত যেন আকুল হয়ে উঠছে! কেবলই মনে হচ্ছে, ট্রেণটা যদি আরো জোরে চলতো! তোমার কি মনে হচ্ছে, সলিলা?

উষাঙ্গিনী বীণার পানে চাহিল···বীণার চোখে কেমন ছায়া! সে-ছায়ার স্পর্শে তার দৃষ্টি যেন ক্লান্ত, আতুর!

উষাঙ্গিনীর মনে হইল, ভয়? বীণার মনে ভয় হইবার কারণ আছে। যাঁদের কখনো জানে নাই··যাঁদের কখনো দেখে নাই···জানার মধ্যে যাঁদের সম্বন্ধে জানিয়াছে শুধু বিরোধ আর অপ্রীতি···সে-বিরোধের ফলে বাপ নির্ব্বাসিত, মায়ের মর্য্যাদা লাঞ্ছিত! আজ চিঠি পাইলে কি হইবে, যাকে লইয়া ও-বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক, সেই সন্তোষদা··· তাঁকে বিসর্জ্জন দিয়া ও-রাজ্যকে বীণার কি আজ রাজ্য বলিয়া মনে হইবে?···

এ কথা মনে হইবামাত্র উষাঙ্গিনী চুপ করিল···. নিমেষের জন্য। তার পর বলিল,—তোমার গা ছম্‌ছম্ করছে···না? যত আপন-জনই হোন্, এ্যাদ্দিন যাঁদের চেনো না, জানো না···বিশেষ সন্তোষদার কথা, বৌদি'র কথা বড্ড মনে জাগছে···না? শুয়ে আমি অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারিনি! কেবলি ওই কথা ভেবেছি। মনে হচ্ছিল, আহা, আজ যদি সন্তোষদা থাকতো, বৌদি থাকতো, তোমার এ আসা কত সুখের হতো···কতখানি সার্থক হতো!

প্রত্যেকটি কথা তীরের মতো বীণার বুকে বিঁধিতেছিল! বুকের ভিতরটা রক্তে রক্তময়! বীণা কিছু বলিল না …তার চোখের কোণে একরাশ বাষ্প ঠেলিয়া আসিল।

উষাঙ্গিনী বলিল—সন্তোষদার কথা মনে পড়ছিল। কাকেও কোনো দিন ভয় করেনি। যা ভালো বলে' নিজে বুঝেছে, কারো কথায় তা ত্যাগ করেনি!…জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তর্ক হতো! দেখেছি তো!…একটা ব্যাপার আমার আজো মনে আছে!…ঐ পিশিমা…পিশিমার কে গুরু ছিল …সেই গুরু এসে ও-বাড়ীতে ক'দিন ছিল। একদিন পাশের কোন্ দোকানে সন্তোষদা বুঝি গুরুকে দেখে, চপ-কাটলেট্ খাচ্ছে। দেখে গুরুকে বলে—এ কি গুরুজী! আমাদের ওখানে নিরিমিষ ছাড়া কিছু ছুঁতে চান্ না—আর এখানে বসে' এই কার্য্য করছেন! গুরু ভয়ে এতটুকু! তার পর বাড়ীতে এসে গুরু বুঝি পিশিমাকে বলে, এখনি চলে যাবো; তোমাদের কর্ত্তাবাবুর ছেলে আমাকে যা-তা বলে' অপমান করেছে। পিশিমা হৈ-হৈ রব তুললে। সন্তোষদা তখন গুরুর হাঁড়ি দিলে হাটে ভেঙ্গে। পিশিমা বললে,—প্রণাম কর্, পায়ের ধুলো নে, নিয়ে মাপ চা। সন্তোষদা বললে, কেন? কি দোষে? কখ্খনো না! উনি খেলেন চপ্-কাট্‌লেট্…আর আমি চাইবো মাপ? না!…পিশিমা এক-দিন এক-রাত্রি কিচ্ছু মুখে দিল না। জ্যাঠামশায় বললেন, ওরে, শোন্ বাবা কথাটা! সন্তোষদা বললে, দোষ করতুম, উনি আমাকে ধরে' সাতশো ঘা জুতো মারলেও কথা কইতুম না। তা নয়…কিছুতে সন্তোষদাকে কেউ নোয়াতে পারেনি! এ তো ছোট কথা…তবে কাণ্ডটা চোখে দেখেছি কি না…

বীণার মুখে কথা নাই। দু'চোখের বাষ্প-রাশি তখন কথার বাতাসে জলধারায় পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে!

উষাঙ্গিনী দেখিল, বীণার চোখে পুঞ্জিত অশ্রু… বলিল—কেঁদো না সলিলা…অদৃষ্ট…না হ'লে এমন হবে কেন, বলো? তবু জ্যাঠামশায়ের মন হয়েছে… তোমাকে ফিরিয়ে আনলেন…এতে আমাদের অনেক দুঃখ ঘুচলো তবু!

বীণা নিরুত্তর। চোখের সামনে বহির্বিশ্ব ছায়ার মতো ছুটিয়া-ছুটিয়া সরিয়া চলিয়াছে…ও-বিশ্ব যেন নিজেকে সরাইয়া বীণাকে কলিকাতার কাছে, আরো-কাছে ঠেলিয়া দিতেছে!

উষাঙ্গিনী বলিল—তোমার কাছে সন্তোষদার আর বৌদির ছবি আছে সলিলা?

ছিল ছবি…সন্তোষ, চারুলতা ও সলিলার ফটো… গ্রুপ্-ছবি…সেখানা বীণা রাখিয়া আসিয়াছে; সঙ্গে আনে নাই! আর একখানা ছবি…সন্তোষের আর চারু-লতার। সে ছবি বীণা সঙ্গে আনিয়াছে। কি জানি, যদি কেহ প্রমাণ চাহিয়া বসে?

বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে বীণা কহিল,—আছে।

উষাঙ্গিনী বলিল—এখন নয়, পরে দেখিয়ো। বৌদি'র ছবি আছে?

মুখে কথা ফুটিল না। মাথা নাড়িয়া বীণা জানাইল, আছে।

উষাঙ্গিনী বলিল—একবারটি দিয়ো…বাবাকে দিয়ে তার এনলার্জমেণ্ট করিয়ে আমি কাছে রাখবো। বৌদির কি নাম ছিল সলিলা? তোমার মার নাম?

কম্পিত-কণ্ঠে বীণা বলিল—চারুলতা দেবী।

ট্রেণের গতি ঈষৎ মন্থর…

উষাঙ্গিনী বলিল—নিজের বোনের মতো আমায় দেখতো সন্তোষদা…তেম্‌নি ভালো বাসতো।…কর্ম্মচারীর মেয়ে ব'লে ভাবতো না!…কি-মানুষ যে ছিল…

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বাথরুম হইতে আসিলেন, আসিয়া খোলা জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—বর্দ্ধমান এসে গেল রে…এক-গাদা সিগনাল দেখা যাচ্ছে…

কামরার ঘুমন্ত যাত্রীরা জাগিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিতেছিল।

৯

বর্দ্ধমান। তিনকড়ি গাঙ্গুলি ছাড়িলেন না। নামিয়া গিয়া আট-দশ টাকার সীতাভোগ-মিহিদানা কিনিয়া আনিলেন।

হাসিয়া উষাঙ্গিনী বলিল—ট্রেনে যেতে হ'লে বর্দ্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা কিনতেই হয়, না বাবা?

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—এ-কথা বললি কেন রে?

উষাঙ্গিনী বলিল—এখনকার কথা জানি না। বিয়ের

াগে যদ্দিন তোমাদের কাছে ছিলুম, দেখেছি তো. ট্রেনে ’রে বাইরে গেলে ফেরবার সময় তুমি সীতাভোগ-মিহিদানার ঝুড়ি নিয়ে ফিরেছো…

উচ্চহাস্য করিয়া তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—যা ালেছিস্! জিনিষটায় আমার মোহ আছে। শুধু আমি কন, বাঙালী-প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ক’জন না কিনে ছাড়ে ল্তো?…এই ট্রেনেই তার প্রমাণ পাবি…আমাদের এই ামরাতেই স্থাখ্…

তারপর তিনকড়ি গাঙ্গুলি বীণার পানে চাহিলেন, লিলেন—এ-জিনিষ তুমি কখনো খেয়েছো দিদি?

বীণা বলিল,—না…

—খাও, খাও…বেশী নয়। একটা-একটা ক’রে! খে দিলে বুঝবে, বুড়ো ছোট দাদু কেন এত সাধ্য-সাধনা রছিল। খাও দিদি…লক্ষ্মীটি!

স্নেহের এ অনুরোধে ‘না’ বলা চলিল না। বীণাকে াইতে হইল একটা সীতাভোগ, একটা মিহিদানা।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি সাগ্রহ-দৃষ্টি মেলিয়া দেখিলেন—লিলেন তোমাকে যা বলেছিলুম, কেমন, ভালো নয়?

বীণা বলিল,—ভালো।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন—তবু আগেকার মতো ার হয় না। ফাঁকির কারবার সুরু হয়েছে দিদি!…ালের দস্তুর! গিয়ে তোমার দাদুকে বরং জিজ্ঞাসা করো…নেশা তাঁর আরো বেশী। দু’জনে একবার আসছিলুম ঝি গয়া থেকে, বর্দ্ধমান পাশ করবার আগে থেকে কর্ত্তা ার-বার আমাকে তাগিদ দিয়ে ব’ললেন, আমার কামরায় াকো…টাইমটেব্‌ল্ দেখে ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে াখো…ট্রেন কখন বর্দ্ধমানে পৌছুবে! থামলে, অন্ততঃ াঁচ টাকার সীতাভোগ-মিহিদানা আমার চাই। বুঝলে দিদি, এই তো তোমার সঙ্গে চললো সীতাভোগ-মিহিদানার ড়ি…হয় তো তোমার চেয়ে এদের সেখানে বেশী আদর দখে তোমার হিংসা হবে!…বুঝলে?

এ-কথা, এ-হাসি বীণার কাণে শুধু স্পর্শ দিতেছিল; াণ ছাড়িয়া মনে প্রবেশ করিল না। প্রবেশের থ নাই। দুশ্চিন্তার বোঝা জমিয়া পথ বন্ধ করিয়া াখিয়াছে!

ট্রেন চলিয়াছে…দু’পাশে সূর্য্য-কিরণে উজ্জ্বল কত পল্লী…কত মাঠ…কত পথ…দীঘি-পুকুর…লোকজনের কত স্নেহ-নীড়…

অবশেষে হাওড়া ষ্টেশন…

বীণা বসিয়া আছে নিস্পন্দের মতো…তিনকড়ি গাঙ্গুলি লগেজপত্র গুছাইতে ব্যস্ত…ঊষাঙ্গিনী বলিল—এবার নামতে হবে। ট্রেন থামবে।

যাত্রার শেষ হইয়া গেল?…

কোথা হইতে কে আসিয়া কাণের কাছে কেবলই বলিতে লাগিল—পিশিমা…পিশিমা…পিশিমা!

ট্রেন থামিল!

কুলি ডাকিয়া তার ঘাড়ে লগেজপত্র চাপাইয়া তিনকড়ি গাঙ্গুলি নামিলেন…সঙ্গে ঊষাঙ্গিনী ও বীণা।

প্ল্যাটফর্ম্মে দু’পা অগ্রসর হইতেই লোকনাথের সঙ্গে দেখা। লোকনাথ বলিল,—কর্ত্তা নিজে এসেছেন। ষ্টেশনের বাইরে মোটরে ব’সে আছেন…

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—একেই বলে’ রক্তের টান!

বলিয়া তিনি ফিরিলেন বীণার পানে; বলিলেন—দাদু তোমাকে নিয়ে যেতে নিজেই এসেছেন দিদি…

সামনে লোকনাথকে দেখিয়া বীণা ভাবিল, ইনিই তবে? তার পা কেমন বাধিয়া গেল। চকিতে সে নিস্পন্দ, নিথর।

আশ-পাশ দিয়া যাত্রীর দল ভিড় করিয়া চলিয়াছে…যেন তরঙ্গ!

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—তিনি গাড়ীতে ব’সে আছেন। আর ইনি হ’লেন কর্ত্তাবাবুর দূত। আমাদের লোকনাথদা’।

পাকা চুল, সাদা গোঁফ…মনটি স্নেহে-ভরা…মুখে মিষ্ট হাসি…লোকনাথ বলিল,—দেখি দিদি…একবার দাঁড়াও তো…

লোকনাথ একাগ্র দৃষ্টিতে বীণার মুখের পানে চাহিয়া রহিল; তার পর বলিল,—সন্তোষের মুখের সঙ্গে মিল আছে তিনকড়ি…?

বীণা শিহরিয়া উঠিল…সন্দেহ করিয়াছে?

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—আছে ছোট-জেঠু…ঠাউরে দেখুন…

চোখ দু'টিতে যেন সন্তোষদা'র চোখ বসানো রয়েছে! চোখ দু'টি দেখলেই সন্তোষদাকে মনে পড়ে…

লোকনাথ বলিল,—হবে! আমাদের এ বায়ান্তুরে চোখ…আমাদের চেয়ে তোমরা স্পষ্ট দেখবে মা! এসো দিদি…

যেন লোকারণ্য…পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি ঠাশাঠাশি…শুধু লোক আর লোক! বীণা কাহাকেও চেনে না…কাহাকেও জানে না! পৃথিবীতে এত লোক আছে…বীণা কখনো কল্পনা করে নাই। বিমূঢ়-দৃষ্টিতে দেখিয়া বীণা ভাবিতেছিল, এত লোক কোথায় ছিল? কোথায় চলিয়াছে? তার মতো এরাও…

লোকনাথ আর তিনকড়ি চলিয়াছে আগে-আগে; পিছনে পাশাপাশি চলিয়াছে সে আর ঊষাঙ্গিনী। বীণার হাত ঊষাঙ্গিনী আঁটিয়া ধরিয়াছে…হঠাৎ বীণার খেয়াল হইল—এমন করিয়া তাকে ধরিয়াছে কেন? বীণা পাছে পলায়?

পলাইবার জন্য প্রাণ তার অস্থির! যেখানে যত ভয় ছিল, সব ভয় তার মনে আসিয়া জড়ো হইয়াছে! বুকের মধ্যে যা' হইতেছে…

বীণা চলিয়াছে…নিজের গতিবেগে নয়…চলিয়াছে ঊষাঙ্গিনীর টানে…

ঐ মোটর। মোটরে বসিয়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। এত বয়সেও চোখ মুখের দীপ্তি মলিন হয় নাই। ভদ্রলোক সাগ্রহ দৃষ্টিতে লোকারণ্যের পানে তাকাইয়া ছিলেন…তিনকড়িকে দেখিবামাত্র নামিয়া আসিলেন…ভিড় ঠেলিয়া…আবেগ-ভরে।

ডাকিলেন - তিনকড়ি…

তিনকড়ি বলিলেন—এই যে…আপনার হারামণি এনেছি…

—কৈ? কৈ?

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—দাদু…

চকিতের জন্য তারাচরণ রায়ের দৃষ্টির সহিত বীণার চোখের দৃষ্টি মিলিল…সে দৃষ্টি বীণা বার-বার দেখিল—সঙ্গে সঙ্গে মনের যত ভয়, যত সংশয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

ভিড়ের মাঝখানেই ভূমিষ্ঠ হইয়া বীণা তারাচরণের পায়ে প্রণাম করিল…পায়ের ধুলা লইল।

উত্তেজনার ঘোরে সে পড়িয়া যাইতেছিল, তারাচরণ র সাবেগে বীণাকে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন…বীণ মাথায় মাথা রাখিলেন। বুকে এতদিন যত বেদনা য হাহাকার পুঞ্জিত ছিল, সে-সব বীণার বুকের স্প যেন মুছিয়া ফেলিবেন!

তার পর দু'হাতে বীণাকে ধরিয়া বলিলেন— একব ভালো ক'রে দেখি দিদি…

তারাচরণের মুখের পানে বীণা চাহিয়া রহিল। ম বলিতে লাগিল, আমাকে আশ্রয় দাও গো—তোমার গভী স্নেহে নিরাপদ আশ্রয়! আমি নীচ…আমি হীন…আ চোর! জীবনের এ পারাবারে কোথাও কূলের রেখা দে নাই! নৈরাশ্যে দুঃখে আমি বড় কাতর…এত-বড় পৃথিবীত কোথাও আমার কেহ নাই যে স্নেহ করে! তোমার স্নেহে ধারায়…ওগো তুমি…

বীণার দুই চোখ নিমীলিত হইয়া আসিল—দেহে মনে অবসাদ…

কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে বীণার পানে চাহিয়া থাকিবা পর তারাচরণ রায় মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

তার পর তিনকড়ির পানে চাহিয়া বলিলেন,—বাড়ী চলো। তোমরাও এসো…এসো মা ঊষা…

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—আমরা আলাদা গাড়ী করছি; মোট-ঘাট আছে।

তারাচরণ বলিলেন,—না, না, না। লোকনাথ আছে—তাকে মোটঘাট বুঝিয়ে দাও…লোকনাথ ট্যাক্সিতে ক'রে মোটঘাট নিয়ে আসবে। তোমরা এসো আমার গাড়ীতে। আমরা একসঙ্গে যাবো…আমার দিদি, আমি, ঊষা আর তুমি…

তাহাই হইল। চার জনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ড্রাইভার গাড়ী ছাড়িল।…

তারাচরণ রায়ের মুখে কথা নাই…বীণা নীরব নিস্পন্দ। তার মনে হইতেছিল, সে যেন আর এক দেশে আর এক মূর্ত্তিতে নূতন জন্ম লইয়াছে!…সঙ্গে সঙ্গে মনের দ্বারে আবার আসিয়া দাঁড়াইল ক্ষীরোদাময়ী…মিণ্টু, পিণ্টু, সিণ্টু…তাদের পিছনে সেই মহাদেও…

গাড়ী আসিল হাওড়ার পুলের উপর…

তারাচরণ কহিলেন—ঊষা এখন কেমন আছিস মা?

—ভালো আছি, জ্যাঠামশায়।

তারাচরণ কহিলেন—এ-বয়সে তোরা আর শান্তিতে বাস করতে দিলিনে মা···এ কি কম যাতনা!

উষাঙ্গিনী বলিল—রোগের যাতনার চেয়ে ঐ যাতনা আমারো আরো বেশী মনে হয় জ্যাঠামশাই! আমরা একটু ভালো থাকলে তোমরা কত ভালো থাকো! তবু···

তারাচরণ রায় বলিলেন—দু'জনে ভাব হয়েছে তো?··· মানে সলিলার সঙ্গে?

উষাঙ্গিনী বলিল—হয়নি? খুব ভাব হয়েছে। চমৎকার মেয়ে সলিলা। সন্তোষদার গুণগুলি সব পেয়েছে ও। জানো জ্যাঠামশাই, কিছুতে সেকেণ্ড ক্লাশে এলো না। বললে, না একসঙ্গে যাবো···পিশিমার অসুখ ···পিশিমার কখন কি দরকার হবে না হবে!...গাড়ীতে আমার কত সেবা করেছে···যেন গিন্নী-বান্নী মা-ঠাকরুণ! সত্যি জ্যাঠামশাই!

উষাঙ্গিনীর মুখে উচ্ছ্বসিত বাক্যলহরী···তারাচরণ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন বীণার পানে আর বীণা বসিয়া আছে কাঠের পুতুল!

উষাঙ্গিনী বলিল—একটি রাত্রে সলিলা আমায় এমন করেছে জ্যাঠামশায় যে আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ওকে ছাড়বো না···ওর সঙ্গে তোমার ওখানে গিয়ে উঠি···ওর পাশে-পাশে থাকি!

তারাচরণ কহিলেন—তাই চ' না···আমাদের ওখানেই থাকবি।

উষাঙ্গিনী কোনো জবাব দিল না।

তারাচরণ বলিলেন—দোটানায় পড়ে গেলি···না? ও-বাড়ীতে মা···এ-বাড়ীতে সলিলা···এ্যাঁ?···তা বেশ, বাড়ীতে গিয়ে মাকে দেখে-শুনে তারপর আসবি···কেমন? মা আসতে দেবে তো?

উষাঙ্গিনী বলিল—কেন দেবে না?

—তা'হ'লে?

উষাঙ্গিনী বলিল—আজ থাক জ্যাঠামশাই! তোমার নাৎনি এলো···চেনো না, জানো না···আজ ওকে কাছে-কাছে রেখে ওর সঙ্গে ভাব করো···আমরা তো আছিই··

তারাচরণ রায় বলিলেন—আসিস্ মা! তোর সঙ্গে যখন ভাব হয়েছে,···নাহ'লে ওর মন কেমন করবে তো! প্রথম-প্রথম···নতুন জায়গা···চারদিকে সব নতুন···

উষাঙ্গিনী বলিল—আসবো বৈ কি জ্যাঠামশাই, আমি রোজ আসবো।

—তাই আসিস মা···

তার পর সকলে চুপ···

তারাচরণ রায় এ নীরবতা ভঙ্গ করিলেন, ডাকিলেন—তিনকড়ি···

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বসিয়াছিলেন সামনের শীটে ড্রাইভারের পাশে···তারাচরণ রায়ের আহ্বানে বলিলেন—ডাকচেন?

তারাচরণ কহিলেন—হ্যাঁ। সেখানে তারা কোনো আপত্তি করেনি?

সংক্ষেপে সারিবার জন্য তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন—না·· আপত্তি করবে কেন?

তারাচরণ রায় বলিলেন—আমার বড্ড ভয় হ'য়েছিল। ভেবেছিলুম, হয় তো বলবে, এ্যাদ্দিন দাদুর এ-মায়া কোথায় ছিল? তাতে আর কিছু না হোক, সলিলা মনে ব্যথা পেতো।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে ···আর হবে না বা কেন? কি বাপের মেয়ে!···আমাকে কি যত্ন-আদর করলে, দাদুর কাছ থেকে গিয়েছি···দাদুর লোক!··ভগবানের দেওয়া মায়া···ওর কি মার আছে?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—হুঁ···

তার পর আবার স্তব্ধতা···

তারাচরণ রায় আবার কথা কহিলেন, বলিলেন—তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবো? না, আগে আমরা নামবো?

উষাঙ্গিনী কহিল—আগে তোমরা নামো জ্যাঠা-মশায়! সলিলা কাল সারা-রাত ঘুমোয়নি···ঠায় জেগে কাটিয়েছে!···তোমাদের দেখবে বলে কতখানি ব্যাকুল··· ওতে কি ঘুম হয়! ও বড্ড ক্লান্ত হয়েছে···ছেলেমানুষ···

তারাচরণ রায় বলিলেন,—বেশ···তাই হবে। আগে আমাদের নামিয়ে তার পর তোমরা বাড়ী যেয়ো···

আবার নীরবতা···

বাহিরে সারা সহর ইহারি মধ্যে কাজের নেশায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে···

বীণা চাহিয়াছিল বাহিরের দিকে···এ যেন আর এক পৃথিবী! এর কোনোখানটার সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নাই! ··এত ভিড়···এত লোক···এত গাড়ী-ঘোড়া···

উষাঙ্গিনী ডাকিল—সলিলা···

নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা উষাঙ্গিনীর পানে চাহিল।

উষাঙ্গিনী বলিল,—কেমন লাগছে কলকাতা?

মৃদু-কণ্ঠে বীণা কহিল—ভালো।

তারাচরণ রায় বলিলেন—আর এই বুড়ো দাদুকে?

বীণা তারাচরণ রায়ের পানে চাহিল। মনে হইল, যে স্বপ্ন! মুখে কথা ফুটিল না।

নিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন—আমাে ভালো লাগছে না? না দিদি?

মাথা নাড়িয়া কম্পিত মৃদু-কণ্ঠে বীণা কহিল—ভাে লাগছে দাদু।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অভিমানী

সেদিন নীরবে নিয়েছে বিদায়, কোন কথা নাহি বলে',
শুধু একবার নীরবে চাহিয়া নীরবে গিয়াছে চলে'!
তবুও তাহার চিঠি পাব বলে পিয়নের পথ চাহি,
বুকেতে লইয়া অভিমান-জ্বালা বেদনার গান গাহি!
ভাবি গেছে ভুলে ভুলের স্বপনে অতীত মিলন-গীতি,
থেকে-থেকে শুধু বুকে জ্বলে' উঠে মধুর মিলন-স্মৃতি!

ফাগুন নিশায় ব্যথা বেদনায় তারি ছবি মনে জাগে,
নব রূপ ধরে' তারি মুখখানি নব নব অনুরাগে!
জীবনের মোর সব কাজ মাঝে আসিয়া চলিয়া যায়;—
একা আমি বসে' অভিমান বুকে কাঁদি ব্যথা-বেদনায়!
তারে কত দুষি,—কভু ভাবি সে ত হয় ত সুখেতে আছে,
আমার প্রেমের মূল্য কিছুই নাহিক তাহার কাছে!
এমনি করিয়া দিন চলে যায় রাত্রি ফিরিয়া আসে,
স্বপনে তাহার সেই মুখখানি অভিমান-ভরে হাসে।

হঠাৎ সেদিন পিয়ন আসিয়া দিয়ে গেল চিঠিখানি,
কম্পিত-হাতে তুলিয়া লইয়া পড়িনু কয়টি বাণী—
"আজ কয়দিন রাণী গেছে ছেড়ে পৃথিবীর সব মায়া,"—
চোখের উপর বিশ্ব লাগিল ছায়া পুতলীর ছায়া।
আরো লিখিয়াছে—'আজ কটা দিন তোমার কথাটি বলে
মরণ-ক্ষণের প্রহর গণেছে ভাসিয়া নয়ন-জলে'।
কত অভিমান বুকে করে' করে' ভুল বুঝিয়াছি তা'রে,
সব ব্যথা আজি কাঁটা হ'য়ে বুকে ফুটে উঠে বারে বারে।

ওগো অভিমানী! ভুল বুঝে গেছ মনটি দেখনি ভুলে,
সারাটি জীবন—জীবন কাঁদিছে তোমারি চরণ-মূলে।
আমার বুকের গোপন বারতা এবারও রহিল বুকে,
কত অভিমান কাঁদিয়া মরেছে ফোটেনি কখন মুখে!
তোমার বুকের সব অভিমান হেথায় গিয়াছ রেখে।
আমার বুকের অভিমান জ্বালা জীবনে গেলে না দেখে।

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার (বি-এল)

মুক্তির মূল্য

১৬

কাশেম রসুলানের জন্য প্রবেশ-দ্বারের পরপারে অপেক্ষা করিতেছিল। সেদিন কেন যে এক জন বাঁদী রসুলানের সহিত আসিল, তাহা সে অনুমানও করিতে পারে নাই। গৃহে যাইয়া বাঁদীকে অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া রসুলান বলিল, "এই বার।"

কাশেম বলিল, "কি?"

রসুলান বলিল, "এই বার কেল্লা ফতে।"

"ব্যাপার কি?"

তখন রসুলান সে দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল, [illegible]দিন নেজমার মহলে নবাবের আগমনের পূর্ব্বেই সে [illegible]জমার উদ্ধার সাধন করিবে। তাহার সাফল্যে দৃঢ় [illegible]শ্বাস কাশেমকে বিস্মিত করিল। কথায় বলে না [illegible]চাইলে (আহার্য্য যে খাওয়া যাইবে সে) বিশ্বাস নাই। [illegible]ই প্রাসাদ হইতে ছদ্মবেশে রসুলান নেজমাকে লইয়া [illegible]সিবে—কেহ জানিতে পারিবে না; তাহার পর তাহারা [illegible]ই রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইবে—কেহ বাধা দিতে পারিবে [illegible]—ইহাও কি সম্ভব হইবে? পদে পদে বিপদের যে সম্ভাবনা [illegible]ছে, তাহা কি রসুলান ধারণাও করিতে পারে না?

রসুলান বলিল, "আমার কায—আমি নেজমাকে [illegible]মার কাছে আনিয়া দিব। আমার কায সেই পর্য্যন্ত; [illegible]হার পর—" রসুলান কটাক্ষে যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া [illegible]সিয়া বলিল—"তাহার পর তুমি যদি স্পর্শমণি পাইয়া [illegible]হা রক্ষা করিতে না পার, তবে সে তোমার ভাগ্য বা [illegible]মার দোষ।"

কাশেম সে কথায় চমকিয়া উঠিল। যে আশঙ্কা [illegible]কে অধিকার করিয়াছিল, তাহার বন্ধন যেন দৃঢ়তর হইল।

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া রসুলান বলিল, "তোমরা যে স্ত্রীলোককে ভীরু বল, সে কেবল তোমাদের দৌর্ব্বল্য গোপন করিবার জন্য।"

কাশেম সে কথার যাথার্থ্য অনুভব করিল। রসুলান এই ব্যাপারে যে সাহস দেখাইয়াছে, তাহা তাহার কল্পনাতীতই বটে। সে-ই ভীত—রসুলানের ভয় নাই; সে-ই দ্বিধাবিচলিত—রসুলান দৃঢ় সঙ্কল্প। সে বলিল, "রসুলান, তোমাদের সম্বন্ধে কাফেরদিগের ধারণাই বোধ হয় সত্য।"

সহসা কাফেরদিগের ধারণার কথায় রসুলান বিস্মিতা হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"হিন্দুরা নানারূপ দেবীমূর্ত্তি পূজা করে—দেবীর আসন বা বাহন সিংহ, দেবীর হস্তে অস্ত্র, দেবীর সংহারমূর্ত্তি।"

শুনিয়া রসুলান বিস্মিতা হইল। সে কখন কোন হিন্দু দেবীপ্রতিমা দেখে নাই। সে বলিল, "কিন্তু তুমিই ত বলিয়াছিলে, হিন্দুনারীরা স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিত!"

কাশেম বলিল, "তোমরা সবই পার। এই দেখ—তুমিই কি করিতেছ। আমার জন্য তুমি কি বিপদের সম্মুখীন হইতেছ। আমার ভয় হইতেছে—তোমার ভয় নাই।"

স্বামীর কথায় রসুলানের মনে হইল, তাহার সব চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। সে চেষ্টা যে সফল হইবে, সে বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। সে স্বামীকে বলিল, "আমি নেজমাকে আনিয়া দিব। তাহার পর কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে স্থির করিতে হইবে।"

কাশেম এই বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে রসুলানের পরামর্শাধীন করিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি করিতে বল?"

"সে কথা আমার নহে।"

কাশেম ভাবিতে লাগিল।

রসুলান বলিল, "প্রাসাদের লোক জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে এ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে।"

রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলেও যে বিপদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে, তাহা কাশেম জানিত—কারণ, বোম্বাই সহরে বাওলা নামক ধনী ব্যবসায়ীর হত্যার কথা দিল্লীতে বিশেষ ভাবেই আলোচিত হইয়াছিল। বিশেষ কয়খানি সাম্প্রদায়িকতা-প্রচারক সংবাদপত্র নর্ত্তকী মমতাজ ও বাওলা উভয়েই মুসলমান বলিয়া বাওলার হত্যা যে হিন্দু সামন্ত রাজার জন্য সঙ্ঘটিত হইয়াছিল—সন্দেহ করা হয়, তাহাকে উগ্রভাবেই গালি দিয়াছিল। কিন্তু পাশা যখন হস্তচ্যুত হইয়াছে, তখন আর ভাবিয়া ফল নাই—"দান" যাহা পড়িবে—তিনটিই হউক, আর ছ'তিন-নয়ই হউক, আর কচে বারই হউক—তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সে পলায়নের পন্থা নির্ণয়ে মনোনিবেশ করিল।

শেষে স্থির হইল, রাজ্যসীমার বাহিরে যে রেলষ্টেশন আছে, তথা হইতে ভাড়াটিয়া মোটর যান আনা হইবে এবং নেজমা যদি আইসে, তবে সেই মোটরে তিন জন পলাইয়া সেই ষ্টেশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণে উঠিবে। কিন্তু কোথায় যাইবে? কাশেম বলিল, দিল্লীতে যাওয়া নিরাপদ হইবে না। বাঘ শিকার করিয়া যে জীবের শব পরে—আহারের জন্য রাখিয়া দেয়, তাহার গুহা হইতে কেহ তাহা লইয়া যাইলে সে যেমন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাহার সন্ধান করে, নবাব দিল্লীতে যে তেমনই ভাবে নেজমার ও তাহাদিগের সন্ধান করিবেন—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। সুতরাং দিল্লী তাহাদিগের পক্ষে নিরাপদ না হইয়া বিপদের কেন্দ্রই হইবে।

রসুলান বলিল, "তবে কোথায় যাইবে?"

কাশেম বলিল, "আপাততঃ নিরুদ্দেশ যাত্রা। যে কাযের যে ফল, তাহাই ফলিবে। আপাততঃ প্রদেশের বাহিরে কোথাও যাইতে হইবে, তাহার পর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা।

এই বার রসুলান একটু আশঙ্কানুভব করিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া কাশেম বলিল, "তোমার সাহসই আমাকে ভীতি হইতে রক্ষা করিয়াছে—এখন কি তুমি ভয় পাইলে?"

রসুলান বলিল, "না।"—কিন্তু তাহার সেই অস্বীকৃতি প্রকাশের ভাবেই তাহার ভাবান্তর বুঝা গেল।

কাশেম বলিল, "তবে চল, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই করা যাউক। নেজমা বেগম-মহল আলো করিয়া থাকুক, আমি আমার কুটীরের আলো লইয়া নিরাপদ স্থানে ফিরিয়া যাই।"

"না, তাহা হইবে না। সাফল্যের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া কে কবে পলাইয়া যায়?"

কাশেম বলিল, পরদিন সে যখন ট্যাক্সী ভাড়া করিতে রেল-ষ্টেশনে যাইবে, তখন ষ্টেশনে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া আসিবে—আপাততঃ তাহারা কোথায় যাইবে। রসুলানের নিকট কত টাকা ছিল, তাহাও কাশেম জানিয়া লইল।

সমস্ত রাত্রি কাশেমের নয়নে নিদ্রার স্পর্শ অনুভূত হইল না। সে ভাবিতে লাগিল, এ যেন একান্ত অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া সে তরঙ্গচঞ্চল সমুদ্রে তরী ভাসাইতেছে। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল—কুক্ষণে সে নেজমাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল, আর তদপেক্ষাও কুক্ষণে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এখন কি সত্য সত্যই ফিরিয়া যাইবার পথ রুদ্ধ? নেজমার উদ্ধার-সাধন যদি হয়, তবে—তাহার পর? তাহাতে তাহার যেমন কেবল দায়িত্বভার বর্দ্ধিত হইবে, তেমনই নেজমার হয়ত কেবল অনিষ্ট করাই হইবে। নবাবের অন্তঃপুরে স্থানলাভ অনেক নারী সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করে—ইরাণী-পল্লীতে অনেকেই নেজমাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়াছে। হয়ত তথায় সে নবাবের চিত্তহরণ করিতে পারিবে। কিন্তু তথা হইতে পলাইয়া আসিয়া তাহার অনিশ্চিত অদৃষ্ট কর্ত্তৃক সে কোথায় নীতা হইবে? এ সব কথা কি রসুলান বুঝিবে না?

রসুলান গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ছিল—সাফল্যের সম্ভাবনায় আনন্দলাভ করিয়া সে ঘুমাইয়াছিল।

রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাশেম স্ত্রীকে জাগাইল। জাগিয়াই রসুলান বলিল, "তুমি কি এখনই ষ্টেশনে যাইবে?"

কাশেম হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। সে রসুলানকে তাহার চিন্তার কথা বলিল।

রসুলান কিন্তু কোন কথাই "কাণে তুলিল" না। সে

বলিল, "যদি শেষ মুহূর্ত্তে এমন করিবে, তবে দিল্লী হইতে আসিলে কেন—এত কষ্টই বা সহ্য করিলে কেন?"

কষ্ট কে সহ্য করিয়াছে, তাহা কাশেম বিশেষরূপই জানিত—সব কষ্টই রসুলান সহ্য করিয়াছে। কাযেই এখন যদি রসুলান ফিরিয়া যাইতে অসম্মত হয়, তবে তাহা অসঙ্গত মনে করা যায় না। তাহার জন্যই রসুলান বিপদ গ্রাহ্য করে নাই। অগত্যা কাশেম বলিল, "ভাল—তুমি যাহা বলিবে, তাহাই হইবে।"

রসুলান বলিল, "তুমি সকালেই যাইয়া গাড়ী ঠিক করিয়া আইস। গাড়ী যেন অপরাহ্ণেই আসিয়া অপেক্ষা করে। গাড়ী আসিলে, দেখিয়া আমি প্রাসাদে যাইব।"

"আজ কি অপরাহ্ণে বেগম-মহলে যাইবে?"

রসুলান হাসিয়া বলিল, "সন্ধ্যার অন্ধকার সহায় না হইলে কি 'বেগম-মহলের' আলো চুরী করিয়া আনা যায়?"

দোকান-ঘরের দ্বার মুক্ত করিয়াই কাশেম দেখিল, সম্মুখের গৃহের যে যুবকের সহিত সে এক দিন রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিল, সে অন্য দিনেরই মত দ্বারের পার্শ্বে মোড়ায় বসিয়া একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে। কাশেম পথ পার হইয়া তাহার সম্মুখে যাইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কাছে কি কোন কায আছে?"

কাশেম বলিল, "এখানে কি একখানা বাইসাইকল ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে?"

"তাহা ত বলিতে পারি না। তবে—বাইসাইকলের দাম যাহা হইয়াছে, তাহাতে ভাড়া লওয়া অপেক্ষা কিনাই ভাল।"

"আমার এক ঘণ্টার জন্য এক বার প্রয়োজন।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "এ-ই কথা। কখন প্রয়োজন?"

"এখন।"

"যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমার গাড়ীখানি লইলে আমি বাধিত হইব।"

"ধন্যবাদ।"

যুবক যাইয়া গাড়ী আনিয়া দিল।

সেই বাইসাইকলে কাশেম তখনই রাজ্যের সীমার বাহিরে রেল-ষ্টেশনে গেল।

রসুলান উৎকণ্ঠিতা হইয়া স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া নিম্নতলে যাইয়া অর্গলবদ্ধ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কাশেম আসিলেই সে দ্বাররুদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল?"

রুমালে কপালের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে কাশেম বলিল, "তোমার কায, না হইলে কি চলে?"

রসুলান বলিল, "কাযটা কাহার তাহা তুমি ভালরূপই জান। তবে তোমার কায আমি আমার বলিয়াই মনে করি।"

স্ত্রীকে আদর করিয়া কাশেম বলিল, "সে কথা কি আবার আমাকে বলিয়া দিতে হইবে?"

তাহার পর সমস্ত দিন উভয়ে পরামর্শ হইল। রসুলানের মনে আশা ও আগ্রহ; কাশেমের মনে আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা। রসুলান যথারীতি গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বস্ত্রাদি গুছাইতে আরম্ভ করিল। তাহার ইচ্ছা, যেন একটুও বিলম্ব না হয়। বিলম্বে যে বিপদের সম্ভাবনা, তাহা কাশেমও বুঝিয়াছিল—রসুলানের অপেক্ষাও অধিক বুঝিয়াছিল।

আহারাদির পরই রসুলান সব কায শেষ করিয়া লইল—একটা পাত্রে সামান্য কিছু আহার্য্যও লইল; ফিরিয়া আসিবার পর আর আহার করিবার সময় হইবে না।

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল। কাশেম বার বার গবাক্ষের নিকটে যাইয়া ট্যাক্সী আসিল কি না, লক্ষ্য করিতে লাগিল। বার বার যাইয়া ফিরিয়া আসিবার পর যে বার সে দেখিতে গেল, সেই বার দেখিল, ট্যাক্সী আসিয়াছে। তাহার সহিত চালকের ব্যবস্থা ছিল, চালক একটি হরিদ্রা-বর্ণের পাগড়ী পরিধান করিয়া আসিবে। চালক জানিত, সামন্ত রাজ্যে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে—সেই জন্য সে তাহার কাযের জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিকও স্থির করিয়া লইয়াছিল এবং কথা ছিল, গাড়ীতে উঠিয়াই সব টাকা দিতে হইবে।

গাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া রসুলান নিশ্চিন্ত হইল।

সে তাহার হাত-বাক্সটিতে গোটা কয়েক সামান্য পণ্য তুলিয়া লইল এবং সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কাশেমকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল।

কাশেমের মনে তখন আশা অপেক্ষা আশঙ্কাই প্রবল হইয়াছে। তাহার মনে হইল, সে রসুলানকে বলে—

"ট্যাক্সী আসিয়াছে—চল, আমরা দুই জন চলিয়া যাই।" কিন্তু রসুলানের আগ্রহ দেখিয়া এবং রসুলান যে কখনই নিরস্ত হইবে না তাহা বুঝিয়া, সে আর কোন কথা বলিল না।

কিন্তু সে রসুলানের সঙ্গে সঙ্গে যেন কলে চালিত হইয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। সে প্রাসাদের যত নিকটে আসিতে লাগিল, তাহার মন ততই অধিক শঙ্কাকুল হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে তাহার বক্ষের স্পন্দন-শব্দ শুনিতে পাইতেছে।

পথ শেষ হইল। উভয়ে বেগম-মহলের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে আসিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। বেগম-মহলের নিয়ম সন্ধ্যার পর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাহিরের কোন লোককে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সেই জন্য প্রহরীরা দ্বার মুক্ত করিল না —রসুলান ছাড় দেখাইলেও বলিল, "তুমিই ত তোমার ছাড়—বেগম-মহল ত তোমার ঘর হইয়াছে—তোমার ভাগ্য ভাল, প্রতিদিনই তোমার জিনিষ বিক্রয় হয়। কিন্তু—"

রসুলান বলিল, "কিন্তু কি?"

"দিনের আলো নিভিলেই ডবল ছাড় প্রয়োজন হয় —তাহাই নিয়ম।"

"আমি বেগম-সাহেবার আদেশে তাঁহার কাযে আসিয়াছি—আমার জন্য নহে। আমার কাছে তাঁহার আদেশই নিয়ম। যদি যাইতে না দাও, আর আমার সন্ধানে তিনি লোক পাঠান, তবে তাঁহাকে বলিয়া দিব— যাইতে দেও নাই।"

সে কপট কোপ প্রকাশ করিয়া কাশেমকে বলিল, "আমরা ফিরিয়াই যাইব।"

রসুলান জানিত, বেগম-মহলে বেগম-সাহেবার নামে সকলেই ভয় পায়। তাহার কথা শুনিয়াই প্রহরীর ভাবান্তর লক্ষিত হইল। সে বলিল, "অত রাগ কর কেন?"

তাহার পর প্রহরী রুদ্ধ দ্বারের অপর দিকে প্রহরিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিব?"

প্রহরিণী একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিল। বেগম-মহলে সকলেই জানিত, এই পণ্যবিক্রয়কারিণী খাস বেগম-সাহেবার অনুগ্রহ অর্জ্জন করিয়াছে। যে স্থানে ভাল কেহ করিতে পারুক আর না-ই পারুক, মন্দ সকলেই করিতে পারে, সে স্থানে সকলকেই ভয় করিয়া চলিতে হয়। প্রহরিণী বলিল, বিক্রয়কারিণী প্রতিদিনই আসিয়া থাকে; সে নিশ্চয় বেগম-সাহেবার আদেশে যাইতেছে—দ্বার মুক্ত করা হউক।

সন্ধ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারে তালা বন্ধ করা হইয়াছিল বাহিরে প্রহরী ও ভিতরে প্রহরিণী চাবী খুলিল। তাহার পর দ্বার অনর্গল হইল। তখন বেগম-মহলের মধ্যে বাহিরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে।

রসুলান বেগম-মহলের মধ্যে যাইলেই প্রধান প্রহরি[ণী] জিজ্ঞাসা করিল, "আজ অসময়ে কেন?"

রসুলান বলিল, "বেগম-মহলের ব্যাপারে কখন সম[য়] আর কখন অসময় বুঝা দায়। আজ নবাব কোন নূত[ন] বেগমের মহলে যাইবেন। প্রসাধিকাকে নূতন বেগ[ম] বলিয়াছেন, দিল্লীর সুরমায় তিনি নয়ন-পল্লব রঞ্জিত করি[তে] চাহেন। বেগম-সাহেবা সেই জন্য এই গরিবকে আদে[শ] করিয়াছেন—দিল্লীর সুরমা আনিয়া দিতে হইবে।"

"তাহাতে আর দুঃখ কি? বুঝিয়া মূল্য লইও।"

"পরিশ্রমের মত মূল্য দরিদ্ররা কি কখন পায়? এই ত আমার প্রভুকে দিল্লীতে যাইতে হইয়াছিল তিনি আসিয়াছেন—আর আমি আদেশ পালন করি[তে] আসিয়াছি। এত শ্রমের ও ব্যয়ের পরিবর্ত্তে কি পাই তাহা বেগম-সাহেবাই বলিতে পারেন।"

"দেখ, সে তাঁহার মর্জ্জি, আর তোমার ভাগ্য।"

"গরিবের ভাগ্য সর্ব্বদাই দুর্ভাগ্য—মাতা নহে- বিমাতা।"

রসুলান মহলের দিকে চলিয়া গেল।

১৭

বেগম-মহলে প্রবেশ করিয়া রসুলান যথারীতি পরিদর্শিকা[র] নিকটে গমন করিল। পরিদর্শিকা অসময়ে তাহাকে দেখিয়া তাহার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলি[ল], "বাঁদী আপনাকে বলে নাই যে, আজ নবাব সাহেব নেজ[...] বেগমের মহলে যাইবেন?"

শুনিয়া পরিদর্শিকা হাসিল—বলিল, "সে সংবাদও [...]

তুমি আমাকে দিবে? কিন্তু নবাব সাহেব সেই মহলে আসিবেন—তাহাতে তোমার কি? তুমি কি—?"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে রসুলান বলিল, "কাল আমি যখন আসিয়াছিলাম, সেই সময় আমাকে দিল্লীর সুরমা আনিতে আদেশ করা হইয়াছিল। কালই দিল্লীতে লোক পাঠাইয়া উহা আনাইয়া আমার প্রভু পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

"বেগম-সাহেবার ফরমায়েশ?"

"হাঁ—তবে নেজমা-বেগমের জন্য।"

"নেজমা বেগমের সৌভাগ্য।"

সন্ধ্যা হইলে বেগম-মহলের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ হয়—তখন আর বাঁদী ব্যতীত প্রায় কেহ মহলে থাকে না; সেই জন্য দিনের সতর্কতায় শৈথিল্য লক্ষিত হয়। পরিদর্শিকার নিকট দিবাভাগে সর্ব্বদাই একজন বাঁদী থাকে—কখন কি প্রয়োজন হয়। এখন কেহ তথায় ছিল না। একবার "বাঁদী" বলিয়া ডাকিয়া কাহাকেও না পাইয়া পরিদর্শিকা রসুলানকে বলিল, "তুমি ত পথ জান—বেগম-সাহেবার মহলে যাও।"

রসুলান যাহা চাহিতেছিল, তাহাই পাইল। সে বেগম-সাহেবার মহলে যাইয়া তথা হইতে নেজমা-বেগমের মহলে গেল।

মহলের সে অংশে আজ যেন উৎসবের সজ্জা। বারান্দায় চীনামাটীর টবে—প্রস্ফুটিত-কুসুম নানা ফুলগাছ, বারান্দার মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা—গোলাবজল পাঁচটি ধারায় উঠিয়া আধারে পড়িতেছে,—সুগন্ধ ছড়াইতেছে, বারান্দার হর্ম্ম্যতল রক্তবর্ণ কোমল গালিচায় মণ্ডিত—তাহার আভা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে প্রাচীরে প্রতিফলিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র মর্ম্মরের টেবলের উপর উজ্জ্বল ধাতুপাত্রে গুগ্‌গুল পুড়িতেছে,—রসুলান তথায় উপনীত হইয়া বাঁদীকে বলিল, "বেগম-হেবা যে সুরমা আনিতে হুকুম করিয়াছিলেন—তাহা ানিয়াছি, নেজমা বেগমকে দিতে হইবে।"

বাঁদী বলিল, "এত দেরী?"

"কি করিব বল, দিল্লীতে লোক পাঠাইয়া আনাইতে ইয়াছে।"

"কিন্তু প্রসাধিকা ত বেগমকে সাজাইয়া চলিয়া ায়াছে।"

"তুমি সংবাদ দাও—সুরমা আমিও পরাইতে পারি।"

"এখন বেগম বিশ্রাম করিতেছেন"—বলিয়া বাঁদী অনিচ্ছায় পর্দ্দার বাহির হইতে ভিতরে যাইবার অনুমতি চাহিল।

নেজমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাহ?"

"দিল্লীর সেই বেচনেওয়ালী সুরমা লইয়া আসিয়াছে।"

"আসিতে দাও।"—সে কি রসুলানের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল?

বাস্তবিক নেজমার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল—কেন না, সে একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মহলে তাহার অধিকৃত অংশে নবাব সাহেব আসিবেন, বেগম-সাহেবার এই নির্দ্দেশদানের পর হইতে তাহাকে আর বিশ্রাম দেওয়া হয় নাই। উপদেশে ও প্রসাধনে—আয়োজনে ও সজ্জাপরিবর্ত্তনে সে এতটুকু অবকাশ লাভ করিতে পারে নাই। নবাব স্বামী নহেন—প্রভু ও নবাব। সেকালে রঙ্গালয়ে অভিনয়-কালে রাজা যেমন কখন রাজবেশ ত্যাগ করিয়া দেখা দিতেন না, নবাব তেমনই তাঁহার বেগমদিগের নিকটেও নবাব ব্যতীত কখন আর কিছু নহেন। দেবতাও তাঁহার তুলনায় সহজলভ্য; কারণ, সাধনার পর তাঁহাকে—

"যে চিনিতে পারে জিনিতে পারে
কিনিতে পারে বিনামূলে।"

সেই খসের গন্ধে সুরভিত কিংখাবের আবরণাবৃত গৃহসজ্জায় সুসজ্জিত কক্ষে—বিলাস-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রসুলান চমকিয়া উঠিল। প্রসাধিকা নেজমার প্রসাধন শেষ করিয়া গিয়াছিল—একখানি পুরু গদীওয়ালা চেয়ারে অঙ্গ এলাইয়া দিয়া নেজমা বিশ্রাম করিতেছিল—সে বিশ্রাম দেহের, মনের নহে। কারণ, তাহার মন চিন্তায় ও আতঙ্কে চঞ্চল হইয়াছিল। ঘরের আলোক নির্ব্বাপিত ছিল—কেবল পার্শ্বে বেশ-পরিবর্ত্তন কক্ষের মুক্ত দ্বারপথে একটি সবুজ বাতির মৃদু আলোক কক্ষে ক্ষীণ আলোক বিস্তার করিতেছিল। পর্দ্দা সরাইয়া রসুলান যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন বাঁদী বাহির হইতে বোতাম টিপিয়া দিলে ঘরের বৈদ্যুতিক বর্ত্তিকার ঝাড়ে সব বর্ত্তিকায় আলোক

জলিয়া উঠিল। রসুলানের মনে হইল, কে যেন শত শত উজ্জল আলোকস্ফুলিঙ্গ কক্ষে প্রক্ষিপ্ত করিল। নেজমার অঙ্গের অলঙ্কারের হীরকগুলি হইতে সেই সব আলোক-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। কি ঐশ্বর্য্য! ইহা তাহার মত লোকের কল্পনাতীত।

তাহার পর রসুলান প্রশংসমান দৃষ্টিতে কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি যখন সেই ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্রে অবস্থিতা ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণীর উপর পতিত হইল, তখন সে যেমন মনে করিল—সে ঐশ্বর্য্য সেই রূপবতীর উপযুক্ত বটে, তেমনই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল—তাহার মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুলেপ, তাহার দৃষ্টিতে আতঙ্ক—শিকারী চিতাবাঘ যখন হরিণীকে ধরিবার মত নিকটস্থ হয়, তখন বুঝি হরিণীর চক্ষুতে এমনই আতঙ্ক-বিকাশ দেখা যায়।

গত রাত্রিতে সে গোপনে রসুলানের প্রদত্ত দ্রব্য পরীক্ষা করিয়াছে—বাঁদীর বসন। কিন্তু সে রসুলানের অর্থাৎ কাশেমের উহা প্রদানের কারণ, অনেক চিন্তা করিয়াও, বুঝিতে পারে নাই। সে ঐ বেশে বেগম-মহল হইতে পলায়ন করিবে, ইহাই কি সঙ্কেত? যদি তাহাই হয়, তবে সেই বিপদবহুল পথে সে কোথায় যাইবে? দীর্ঘকাল যে পক্ষী পিঞ্জরে বদ্ধ থাকে, সে যদি ঘটনাক্রমে এক দিন পিঞ্জর-দ্বার মুক্ত দেখিয়া বাহির হয়, তবে তাহাতেই সে মুক্তি লাভ করে না। উড়িবার অনুশীলনাভাবে তাহার গতি মন্থর হয়, আর অপরিচিত অবস্থায় তাহার অন্য পক্ষীর শিকার হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক হয়। সে কি করিবে? সত্য বটে, রসুলান সন্ধ্যায় প্রস্তুত থকিবার কথা বলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে নেজমা নির্ভর করিতে পারে নাই—সন্ধ্যাও অতীত হইয়া গিয়াছিল। নেজমা রসুলানের দিকে চাহিল।

রসুলান জিজ্ঞাসা করিল, "প্রস্তুত?"

নেজমা বলিল, "হাঁ।"

"বাঁদীর পোষাক কোথায়?"

নেজমা উঠিল—পার্শ্বের কক্ষে যাইয়া যে স্থানে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থান হইতে সেটি বাহির করিল। রসুলান বলিল, "বেগমের বেশ ত্যাগ করিতে যদি অনিচ্ছা না হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিয়া বাঁদীর বেশে ঐ রূপ আবৃত কর।"

রসুলান নেজমাকে সেই কক্ষে রাখিয়া আপনি সম্মুখের কক্ষে আসিল—যদি বাঁদী কোন সংবাদ দেয়।

অল্পক্ষণ পরে নেজমা বাঁদীর বেশে—সেই বোরকায় অঙ্গ আবৃত করিয়া আসিয়া রসুলানের সম্মুখে দাঁড়াইল।

রসুলান বলিল, "এই বার একটা জিনিষ আনিবার ছল করিয়া বাঁদীকে সরাইয়া দিতে হইবে।"

এই সময় মহলে একটা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মহলে বাঁদী বদলের তাহাই সঙ্কেত।

নেজমা বলিল, "বাঁদী এখনই চলিয়া যাইবে।"

বলিতে বলিতে বাহির হইতে বাঁদী যাইবার অনুমতি চাহিল।

নেজমা বলিল, "যাও।"

রসুলান নেজমাকে বলিল, সে কথায় কথায় বাঁদীদিগের নিকট জানিয়া লইয়াছিল, বাঁদী বদলের সময় সকল বাঁদীকে বড় বাঁদীর ঘরে উপনীত হইতে হয়—যে দল কায করিতেছিল, তাহারা ছুটি পায়—আর এক দল তখন কাযে প্রেরিত হয়। বেগম-মহলের কায—তাড়াতাড়ি হয় না; এই সময় কিছুক্ষণ অনেক মহলাংশে বাঁদী থাকে না। সে নেজমাকে বলিল, "ভগবান আমাদিগের সহায়। চল। তুমি দ্রুত যাইও, যেন বাঁদীর বড় বাঁদীর ঘরে যাইতে বিলম্ব হইয়াছে—সে সেই জন্য দ্রুত যাইতেছে।"

নেজমা এই ব্যাপারে সর্ব্বোতোভাবে রসুলানের উপর নির্ভর করিয়া কায করিতেছিল; সব বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। সে জানিত, রসুলান উপলক্ষ-মাত্র—সে কাশেমের বুদ্ধিতেই চালিতা হইতেছে। যে কাশেম তাহাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য অসাধ্য সাধন করিয়াছে, তাহার প্রতি নির্ভরশীলতা নেজমার হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিয়াছিল। সেই নির্ভরশীলতার ভাব তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল—অদৃশ্য কালীতে কিছু লিখিলে তাহা যেমন তাপ পাইলে প্রকাশ পায়, কাশেমের প্রতি তাহার আকর্ষণ তেমনই প্রকাশ পাইয়াছিল। সে কি ভালবাসার তাপে?

কক্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নেজমা রসুলানের নির্দ্দেশে কক্ষের আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

কক্ষ হইতে বাহির হইয়া নেজমা রসুলানের উপদেশানুসারে একটু দ্রুতগতিতে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর

হইল। মনে মুক্তির আনন্দ, আশঙ্কাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিল। কিন্তু রসুলান অবিচলিত ধৈর্য্যে অগ্রসর হইল। এত দিন সে তাহার কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারে নাই—আজ সে তাহা অনুভব করিতেছিল। আজ সামান্ত একটু ক্রটি হইলে আর রক্ষা নাই। পিচ্ছিল পার্ব্বত্য পথে যাহাকে অগ্রসর হইতে হয়, এক বার পদ-স্খলনেই তাহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। আজ ধরা পড়িলে তাহাকে যে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে, তাহা নিষ্ঠুরতায় অতুলনীয়। আর সে অবস্থা কেবল তাহারই হইবে না—নেজমারও তাহাই হইবে। আজ সে কেবল আপনার জন্তই দায়ী নহে।

মহলের একাংশের পর অপরাংশ অতিক্রম করিয়া উভয়ে অগ্রসর হইল। তখনও কোন কোন বাঁদী নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতেছিল—কারণ, যাহারা বেগমদিগের কাযে ব্যস্ত ছিল, তাহারা কায শেষ না করিয়া যাইতে পারে না।

রসুলানের পরিচিত বেশই তাহার ছাড় ছিল। বেগম-সাহেবার মহলের একজন বাঁদী বলিল, "কি ভগিনী, আজ কত পাইলে?"

রসুলান বলিল, "হিসাব হয় নাই।"

"কিন্তু আমাকে যেন ভুলিও না।"

"ভগিনী কি ভগিনীকে ভুলে?" বলিয়া সে বলিল, "আমার পথটা ঠাহর হইতেছে না—দেখাইয়া দিবে?"

"চল"—বলিয়া বাঁদী পথিনির্দ্দেশ করিয়া দিল। রসুলান ও নেজমা সেই পথে অগ্রসর হইল এবং হর্ম্ম্য অতিক্রম করিয়া উদ্যানের পথে আসিয়া উপনীত হইল।

যে সময় বাঁদী বদল হয়, সেই সময় উদ্যানের ও পথের আলোকের অর্দ্ধাংশ নির্ব্বাপিত হয়। আলোকের মৃদুতা রসুলানের সহায় হইল।

উভয়ে রুদ্ধ দ্বারের নিকটে আসিলে প্রহরিণীদিগের এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "কায শেষ হইল?"

"হাঁ—আধা-শেষ।"

"সে কি?"

"দেখিতেছ না, বাঁদীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি?"—সে নেজমাকে দেখাইল।

"কেন?"

রসুলান মৃদুস্বরে বলিল, "নেজমা-বেগমের জন্ত সুরমা দিতে গিয়াছিলাম, দেখিয়া বেগম-সাহেবার সখ হইল—তাঁহারও সুরমা চাহি!"—বলিয়া রসুলান একটু চাপা হাসি হাসিল।

প্রহরিণী বলিল, "বল কি? হাতীর চোখে সুরমা!"

"চুপ! চুপ! যদি কেহ শুনিতে পায়, তোমারও ধড়ে মাথা থাকিবে না—আমারও নহে।"

প্রহরিণী সে কথার যাথার্থ্য অনুভব করিল; বলিল, "আবার কি আসিতে হইবে?"

"না। বাঁদীই সুরমা লইয়া আসিবে।"

প্রহরিণী দ্বারের চাবী খুলিয়া মহলের দিকের অর্গল সরাইয়া দিল—বাহিরে প্রহরীদিগকে বলিল, দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে—বেগম সাহেবার আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে সে বলিয়া দিল—বাঁদী ফিরিয়া আসিবে। ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য—প্রহরীরা যাইবার সময় নূতন দলকে সে কথা বলিয়া যাইবে।

বাহিরের দিকেও চাবী খুলা হইল। দ্বার মুক্ত হইলে রসুলান ও নেজমা বেগম মহল হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাশেম চিন্তাকুলচিত্তে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। বাহির হইয়াই রসুলান তাহাকে বলিল, "বেগম সাহেবার আদেশ, আজই তাঁহার জন্ত সুরমা দিতে হইবে। তাঁহার বাঁদী সঙ্গে যাইতেছে, লইয়া আসিবে। বড়লোকের খেয়াল।"

প্রহরী রঙ্গ করিয়া বলিল, "টাকায় বাঘের দুধও পাওয়া যায়।"

রসুলান বলিল, "কিন্তু যাহারা সে দুধ সংগ্রহ করিতে যায়, তাহাদের যে জীবনান্তও হইতে পারে।"

"লোভ।"—তাহার পর রসুলানকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিল, "আজ যে সুগন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছ!"

সুগন্ধ নেজমার কেশ ও অঙ্গ হইতে বাহির হইতেছিল। প্রহরীর কথায় রসুলান চমকিয়া উঠিল—তবে কি সে বিপদ অতিক্রম করিতে পারিল না? প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া সে বলিল, "কেন, গরিবের কি কোন সখ হয় না?"

প্রহরী বলিল, "বিশেষ সে যদি বেগম-মহলে গতায়াত করে।"

"আমি সুরমা দিতে যাইতেছিলাম; আর নেজমা

বেগমের প্রসাধন শেষ করিয়া প্রসাধিকা বাহির হইতে-ছিল—যে বাটিতে তেল ঢালিয়া সে বেগমের চুলে দিয়াছিল, তাহা তাহার হাতে ছিল। সে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল আর আমি ঘরে প্রবেশ করিতেছিলাম—ধাক্কা লাগিয়া বাটির তেল ছিটকাইয়া আমার বোরকায় পড়িয়াছে।"

"তোমার ভাগ্যে বেগমগিরীর ঐটুকুই ছিল।"—বলিয়া প্রহরী অশিষ্টভাবে হাস্য করিল।

রসুলান, কাশেম ও নেজমা বেগম-মহল পশ্চাতে রাখিয়া একটু অগ্রসর হইলে রসুলান নেজমাকে বলিল, "বোরকায় রূপ ঢাকিয়াছ—গন্ধ লুকাইতে পার নাই।"

রসুলানের ব্যবহারে কাশেমের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

তাহারা কাশেমের অধিকৃত গৃহে আসিল—দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় নেজমা বাঁদীর বেশ বর্জ্জন করিয়া রসুলানের একটি বোরকা পরিধান করিল।

তিন জন ট্যাক্সীর কাছে আসিয়া গাড়ীতে উঠিবার আয়োজন করিলে চালক বলিল, "ভাড়া?"

কাশেম প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল—তাহাকে টাকা দিল। চালক তাহা গণিয়া লইল।

ট্যাক্সী চলিল। [ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

খেয়া-ঘাটে

দিবালোক যায় চ'লে পশ্চিমে পড়েছে ঢ'লে
ক্ষীণ-তেজা দিনান্ত তপন।
মাথার উপর দূরে বক-পাঁতি যায় উড়ে
কেশে রেখে তাদের স্বপন।
ওপারের পানে চাহি বসে আছি, তরী বাহি
কাণ্ডারী করিছে খেয়া পার।
খেয়াঘাটে বসি হেরি, আমারো ত নেই দেরি,
কে যেন গো ডাকে বার বার।
মানভার, লজ্জাভার, ঋণভার, সজ্জাভার,
মায়া-মোহ-শৃঙ্খলের বোঝা
সাথে মোর হাতে ঘাড়ে, শির পৃষ্ঠ ন্যুব্জ ভারে
পার হওয়া মোর নয় সোজা।
ভারমুক্ত নাহি হ'লে 'মোরে পার কর' ব'লে
কাণ্ডারীরে ডাকিব কি করি?
তরী বাহি যায় আসে কোন ভার লয় না সে
কোন ভার সয় না সে তরী।
সব চেয়ে গুরু ভার মনোবাস বাসনার
ভারী যেন বিশাল পাষাণ।
কেমনে এ ভার কাটে ভাবি ব'সে পার-ঘাটে,
স্মরি নৌকা-বিলাসের গান।
* * *
"মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কলকল,
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ,
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নেই কেউ।*
দুকূলে বহিছে বায় কাঁপিছে রাধার গায়
নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী,
তরণী নবীন নয় ভর দিতে করি ভয়
ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি।"
কানু কয়, "এই নদী পার হ'তে সাধ যদি
দূর কর—ছুড়ে ফেল ভার।"
পুন কয় নীলমণি, "ক্ষীর-সর-দধি-ননী
ডারো সব নীরে যমুনার।
বলয় নূপুর হার আদি সব অলঙ্কার,—
এ সবের রেখ না মমতা,
অই সব ভার ধরি টলমল মোর তরী
লঘু কর তব তনুলতা।
শুধু এই ভার কেন? তব বসনেরো জেন,
ভারটুকু এ তরী না সয়।
পার হবে ভরা নদী, জয় কর ত্বরা যদি
সব মায়া সব লজ্জা ভয়।"
* * *
জানি না কি ভাবি কবি এঁকেছেন এই ছবি
হয় ত বা রসেরই কৌশল!
আজি খেয়া-ঘাটে পড়ি অই চিত্র শুধু স্মরি
চোখে মোর ঝরে অশ্রুজল।
বেদনা-বিধুর চিতে সেই অশ্রুজলে তিতে
বাসনা-বসন হয় ভারী।
বসনে গুণ্ঠিত মন বাসনা-কুণ্ঠিত জন
অকূলে কেমনে দিবে পাড়ি!

শ্রীকালিদাস রায়

* জ্ঞান দাস

দেশাত্মবোধের বাণী
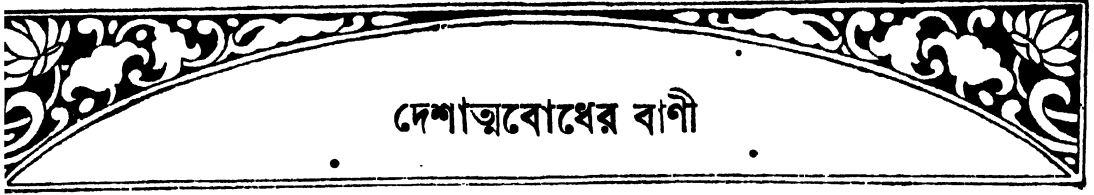
(ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে)

দালা সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটকাদি সংস্কৃত বা ইংরেজী উপাখ্যান বা নাটক অবলম্বনে, অথবা াজিক ব্যাধির প্রতিকারকল্পে প্রধানতঃ রচিত হয়। রাচরণ সিকদারের 'সুভদ্রা হরণ,' রামনারায়ণ তর্করত্নের ণী সংহার,' 'রত্নাবলী,' 'শকুন্তলা,' কালীপ্রসন্ন সিংহের ক্রমোর্ব্বশী,' 'মালতী-মাধব,' 'সাবিত্রী-সত্যবান,' মধু-নের 'শর্ম্মিষ্ঠা', হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস,' ৗরববিয়োগ নাটক' প্রভৃতিতে কিম্বা কৌলিন্যপ্রথার দোষ র্শনার্থ রচিত রামনারায়ণের 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকে ৱরা দেশাত্মবোধের সেই বাণীর প্রতিধ্বনি শুনিতে ই না, যে বাণী রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখো-াায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, িককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ বাগ্মীদের োন্মাদিনী বক্তৃতায়, কিম্বা রাজা রামমোহন রায়, শচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দু-পেট্রিয়ট'-এর প্রবর্ত্তক ও লী'র-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নূতন জাতীয় নের স্রষ্টা মনীষীদের উদ্দীপনাময়ী রচনায় ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিল।

বাঙ্গালী নাট্যকারদের মধ্যে, বোধ হয়, দীনবন্ধুই সর্ব্ব-মে তাঁহার চিরস্মরণীয় 'নীলদর্পণ' নাটকে দেশের ত অবস্থার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া াদের হৃদয়ে দেশাত্মবোধের বীজ রোপন করেন। তিনি ার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল শ্রেণীর ব্যক্তির সহিত য়া অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, এবং উদার ভূতির সহিত তাঁহার পরিদৃষ্ট বিষয়ের চিত্রগুলি সুনিপুণ ায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ-সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন ী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন াচনীয় অবস্থা। তাহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের সার্থক হয়, তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশবৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ বা অতিরিক্ত দুই চারিখানা পল্লীগ্রাম বা দুই একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথ-ঘাট, বাগান-বাগিচা, হাট-বাজার। লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। দেশ-সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যে জ্ঞান, তাহা সচরাচর সংবাদপত্র হইতে

দীনবন্ধু মিত্র

প্রাপ্ত। সংবাদপত্র-লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরাজেরা ত বটেনই। কাজেই তাঁহাদের কাছেও দেশ-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা দার্শনিকদিগের ভাষায় রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন বলিতেছি না যে, কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম-প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই, অনেকে করিয়াছেন; কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি ? না মিশিলে যাহা জানিয়াছেন, তাহার মূল্য কি ?

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন।"

'নীলদর্পণে' জাতি-বৈরভাব পোষণ করিয়া দীনবন্ধু বিদেশীয় নরনারীর চরিত্র-দোষ অতিরঞ্জিতভাবে আঁকিয়াছেন কি না এবং তাহাদিগকে দেশবাসীর নিকট অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন কি না সে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। নীলদর্পণের প্রথম কম্ম সংক্রান্তে দীনবন্ধু স্বগ্রামের প্রতি যে মমতা জাগাইয়া তুলিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগে (যখন Back to the villages ধুয়া উঠিয়াছে—দেশবাসীকে গ্রামাভিমুখী করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে, তখন) তাহা বিশেষভাবে আমাদিগকে আকৃষ্ট করে:—

"সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসী হলে খাটে।

"গোলোক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাতপুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমাজমী ক'রে গিয়েছেন, তাতে কখনও পরের চাকরী স্বীকার কত্তে হয়নি। যে ধান জন্মায়, তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০।৭০ টাকার বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোণার স্বরপুর, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?"

কবিবর হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' প্রভৃতি রচিত হইবার পরে, রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠার পরে, বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রেম বিশেষভাবে নাট্য-সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা পায়। বাণীর বর-সন্তান শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর ও শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের খুল্লমাতামহ কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ভারতমাতা" নামক যে একাঙ্ক নাটিকা লিখিয়াছিলেন, তাহা ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অভিনীত হয় এবং দর্শকমণ্ডলীর প্রাণে অননুভূতপূর্ব্ব দেশপ্রেমোদ্দীপক ভাবের সঞ্চার করে। সূত্রধারের মুখোচ্চারিত নিম্নোদ্ধৃত স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক সঙ্গীতটি উদ্ধৃত হইল:—

"হে ভ্রাতঃ ভারতবাসী দেখ না চাহিয়ে।
পাইতেছ কি যাতনা মোহ-মদে মাতিয়ে।
রিপুর হইয়ে দাস, করিতেছ সর্ব্বনাশ,
ভুগিছ অশেষ ভোগ, লোভ-কূপে পড়িয়ে।
হিংসারূপা পিশাচিনী, অতিশয় মায়াবিনী,
মজ না মজ না হায় তার প্রেমে ভুলিয়ে।"

তৎপরে সূত্রধার অভিনয়ের উদ্দেশ্য এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছে;—

"ভারত-ভূমির ও ভারতসন্তানগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা দর্শনই "ভারতমাতার" উদ্দেশ্য। যদ্যপি সমাগত সুধীমণ্ডলীর একজনও এই অভিনয় দর্শনে ভারতমাতার দুঃখ দূর কোর্‌তে একদিনও যত্ন পান, তাহা হ'লেই আমার ও গ্রন্থকর্ত্তার শ্রম সফল।"
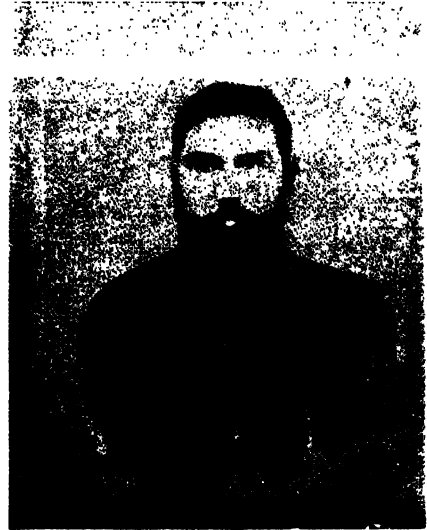
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থমধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি" ইত্যাদি পদসম্বলিত সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশ-সঙ্গীত এবং উক্ত ভাবোদ্দীপক আরও কয়েকটি সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। যে স্থানে অত্যাচার-প্রপীড়িতা ভারতমাতা তাঁহার পরলোকগত সুসন্তান—হিন্দুপেট্রিয়ট-সম্পাদক স্বদেশবৎসল হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলীর' প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও 'ভারতবর্ষের ডিমস্থিনিস্' দেশহিতৈষী বাগ্মী রামগোপাল ঘোষকে সাশ্রুনয়নে করুণস্বরে ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছা গেলেন, এবং অলস সুখসুপ্ত সন্তানগণকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন;—

"ঈশ্বর তুমি কোথায়? হতবিধে! তোর মনে কি এই ছিল? ঃ, বাবা! তোরাই কি আমার তারা রে? আমার সেই একদিন মার এই একদিন! কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ, কোথায় ামমোহন, কোথায় রামগোপাল।"

—সেই স্থানটি দর্শকগণকে বিশেষভাবে বিচলিত করিত। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি, যে, যে মর্ম্মভেদী করুণকণ্ঠে ভারতমাতা তাঁহার আক্ষেপোক্তি উচ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে চল্লিশ বৎসর পরেও তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মনীষী রাজকৃষ্ণ

'বেঙ্গলী-সম্পাদক' গিরিশচন্দ্র ঘোষ

খোপাধ্যায়ের "ভারতমাতা (জাতীয় নাট্যশালা)" শীর্ষক বিতায় এই নাটিকা অভিনয়ের বর্ণনা আছে। কবিতাটির শষ কয় পংক্তি এইরূপ :—

"দেখিয়া দুখিনী জাহ্নব্যন্ত ভূমি,
বলে "ওহে বিধি, কোথা আছ তুমি?
ছাড়িলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে,
কেন না গেলাম ডুবিয়া পাতালে?

কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ,
কোথা ফেলি গেলি মায়।"

'ভারতমাতা'র শেষভাগে রঙ্গমঞ্চে "একতা" আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন,—

"ভ্রাতৃগণ, অনৈক্য, আত্মাভিমান ও স্বজাতি-হিংসাই তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল। যতদিন তোমাদের অন্তর হতে এ সকল ভাব দূরীভূত না হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এখন সকলে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর ও কায়মনোবাক্যে জননীর দুঃখনাশ ব্রতে ব্রতী হও।

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়',
ছিন্ন-ভিন্ন হীনবল,
ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল ক'রতে কি ভয়?"

দেশপ্রেমোদ্দীপক উৎকৃষ্ট নাটকের অভাবে নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রঙ্গমঞ্চে হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' প্রভৃতি দেশাত্ম-বোধক কবিতা এই সময়ে আবৃত্তি করা হইত। যখনই কোন বস্তুর অভাব তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হয়, তখনই তাহার সৃষ্টিও হইয়া থাকে,—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক নাটক রচয়িতারও আবির্ভাব হইল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "পুরুবিক্রম" রচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহাকে "বীররসের খতিয়ান" বলিয়াছিলেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে উহার অভিনয় বাঙ্গালীকে নবভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। রসরাজ অমৃতলাল বলিয়াছেন, "পুরুবিক্রমের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম।" পুরুরাজ যেখানে গ্রীক(=Ionian=যবন)দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতেছেন, ওজস্বিতায় তাহার তুল্য বাণী বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ :—

ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দ্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।

হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ
শত্রুদল করহ নিঃশেষ ॥
বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তরবার,
জ্বলন্ত অনল সম চল সবে রণে।
বিজয়-নিশান দেখ উড়িছে গগনে ॥

যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান,
যবন-শোণিত বৃষ্টি করুক্ বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাতে হোক ফলবান।

এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারত-ভূমে,
পুরুষ নাহিক একজন?
"বীর-যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী,"
না জানে একথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত দেখুক বিক্রম ॥

ক্ষত্রিয় বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী,
জ্বলুক ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক শুনি সেই ধ্বনি।

পিতৃ-পিতামহ সবে, ছাড়ি দুঃখময় ভবে,
গিয়াছেন চলি যারা পুণ্য দিব্যধাম।
রয়েছেন নেত্রপাতি, দে'খ যেন যশোভাতি,
না হয় মলিন,—থাকে ক্ষত্রকুল নাম ॥

স্বদেশ-উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক্ সেই কাপুরুষে, শতধিক্ তারে ॥
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে ॥

যায় যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলবার,
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব ॥

এইবার বীরগণ! কর সবে দৃঢ়পণ,
মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন।

পুরুবিক্রমের পর "আলাউদ্দীনে"র সময়ের ঘটনা লইয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনীমুখে "সরোজিনী" নাটকের সৃষ্টি। উহার একস্থলে বিজয় সিংহের মুখ দিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

"সর্ব্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা করে থাকলে মনুষ্য দ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য্য ত আমরা করি, তারপর যা হ'বার তা হ'বে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কর্ত্তে গেলে আমাদের পদে পদে ভীত হ'তে হয়। না মহারাজ! ভবিষ্যদ্বাণী, দৈববাণীর কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য ক'র্ত্তে বলচেন, তখন তাই যথেষ্ট, আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা সত্য; কিন্তু মহারাজ! কীর্ত্তিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দিকপাত না করে, পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বলবে,—চলুন আমরা সেইখানেই যাই।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই নাটকেরই একস্থানে রাজপুত-রমণীগণের চিতায় জীবনাহুতির দৃশ্যে—

"জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা"—

প্রভৃতি গীতাংশ বঙ্গরমণীর হৃদয়ে পতিপ্রেম ও দেশপ্রেমের বন্যা বহাইয়া দিত, এমন কি, অভিনেত্রীরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া রঙ্গমঞ্চের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সংস্পর্শে আসিয়া কেশ-বেশ পুড়াইয়া ফেলিত!

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রাণা প্রতাপসিংহকে অবলম্বন করিয়া

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'অশ্রুমতী' নামক যে নাটক রচনা করেন, তাহাতে প্রাতঃস্মরণীয় রাণার স্বদেশপ্রেম স্বভাবতঃই প্রতিফলিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী লেখকগণকে প্রেরণা দান করিয়াছে। তাহার পরে রচিত 'স্বপ্নময়ী' নাটকেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি বিদ্রোহী শোভা সিংহকে দেশপ্রেমিকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। শোভা সিংহের নিকট দেশপ্রেমে দীক্ষিতা স্বপ্নময়ী যথার্থ মাতৃমূর্ত্তির দর্শন পাইয়া একস্থানে বলিতেছেন :—

"কে আমারে বক্ষে ক'রে করেছে পোষণ ?
কে মোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে ?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা ?
ধন-ধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার ?
কে মোর পিতার পিতা, মাতার জননী ?
কোথা হতে পিতা মোর পেয়েছেন জ্ঞান ?
কোথা হতে মাতা মোর পেয়েছেন স্নেহ ?
কে তিনি আমার মাতা ?—তিনি জন্মভূমি।
মা সেই জননী মম মোর জন্মভূমি।
সেই মাতা স্নেহময়ী জননী মোদের।
দ্যাখো দ্যাখো আজি তাঁর একি দুরদশা,
বাম হস্তে ছিল যাঁর কমলার বাস
দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল।"

আর একস্থানে দেখিতে পাই, শোভা সিংহ তাঁহার অনুচরগণকে দেশজননীর কিরীটশোভার জন্য স্বাধীনতারত্ন অর্জ্জন করিয়া আনিতে এই ভাবে উদ্দীপ্ত করিতেছেন :—

"দূর আকাশের তলে ওই যে রতন জ্বলে
আনিতে কে যাবি তোরা
এই বেলা আয় রে—
মায়ের আঁধার ভালে পরাবি ও রত্নখানি
কে আসিবি আয় তোরা
মিছা দিন যায় রে।
সমুখে দুর্গম পথ প্রত্যেক কণ্টক তার
মাড়াইতে হবে বটে
রক্তময় চরণে.
কিন্তু রে কিসের ভয়, আসুক সহস্র বাধা
মাতৃমুখ উজ্জলিবি
কি ভয় রে মরণে!"

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সুকবি মনোমোহন বসু, যিনি পূর্ব্বেই 'রামাভিষেক' ও 'সতী নাটক' লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি বহুবাজারস্থ বঙ্গ-নাট্যসমাজের অভিপ্রায়ানুসারে 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। উহা পৌরাণিক নাটক হইলেও রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত, বিশ্বামিত্র মুনির প্রতিনিধি তুঙ্গ দ্বীপের নাগেশ্বরের শাসন-পদ্ধতির যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে সহজেই স্বদেশবাসীর মনে বিদেশীয় শাসকের অকল্যাণকর শোষণনীতির স্বরূপ বোধগম্য হইয়াছিল, এবং স্বাদেশিকতার ভাব বদ্ধমূল করিয়াছিল। এই গ্রন্থেই—

মনোমোহন বসু

"দিনের দিন, সবে দীন, হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ।"

এবং—

"আয়-কর শুনে গায়ে আসে জ্বর।
অম্বিভেদী রথ্যা-কর কি দুষ্কর!
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর!"

প্রভৃতি সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট ছিল।

এই সময়েই হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্র, বাঙ্গালার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সমাজ-সংস্কারক উপেন্দ্রনাথ 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামক দুইখানি নাটকে স্বদেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম জাগরিত করেন।

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের সমালোচন প্রসঙ্গে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় শিশিরকুমার ঘোষ লিখিয়াছিলেন :—

"নীলদর্পণের পর আর যত নাটক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের মঙ্গল হয় নাই তাহা আমরা বলি না, কিন্তু 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র গ্রন্থকর্ত্তা নাটক লেখার একটী নূতন আকার দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, একজন গ্রন্থকর্ত্তা নির্জ্জন গৃহে অবস্থিতি করিয়া গ্রন্থরচনা দ্বারা দেশের কত মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারেন। যিনি বেঙ্গল থিয়েটরে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনি দৃঢ়রূপে জানিতে পারিয়াছেন যে, এদেশের ম্যাজিষ্ট্রেটেরা কিরূপ অখণ্ড প্রবল প্রতাপান্বিত, ষ্টীফেন সাহেবের নূতন দণ্ডবিধি আইন তাহাদের হস্তে কি ভয়ানক যন্ত্র, কারাগারবাসীরা কত কৃপার পাত্র, এবং তাহাদের উপর গভর্ণমেণ্ট কত নিষ্পীড়ন করেন। যাঁহারা এইরূপ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহারা দেশের পরমোপকারী এবং যাঁহারা দেশহিতৈষী, তাঁহাদের সকলের এইরূপ গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত।"

মনোমোহনের 'হরিশ্চন্দ্র' এবং উপেন্দ্রনাথের 'শরৎ-সরোজনীর' অভিনয় বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উহা হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া উহার বিস্তৃততর পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ (পরে সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড)কে হাইকোর্টের জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরিকাগণ অভ্যর্থনা করিলে তৎকালে হিন্দুসমাজ উহার তীব্র প্রতিবাদ করে। উহাতে জাতীয়তার অপহ্নব ঘটিয়াছে এবং জাতির দাস-মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে মনে করিয়া 'বাজীমাতে'র কবি হেমচন্দ্রপ্রমুখ বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জগদানন্দের কার্য্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তীব্র বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথ দাসও এই সময়ে 'গজদানন্দ নাটক', 'হনুমান-চরিত' প্রভৃতি রচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন, এবং পুলিশ-কমিশনার স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ-এর আদেশে পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার ল্যাম্ব উক্ত প্রহসনগুলির অভিনয় বন্ধ রাখিতে অনুরুদ্ধ হইলে Police of Pig & Sheep নামে তাঁহাদের বিদ্রূপ করেন। অনেকে অনুমান করেন, এই বিরাগ-বশতঃ 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে য়ুরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের মানহানি ও অশ্লীল দৃশ্য প্রদর্শনের জন্য উপেন্দ্রনাথ ও রসরাজ অমৃতলাল বসু পুলিশ কোর্টে অভিযুক্ত হইয়া এক মাসের জন্য দণ্ডাজ্ঞালাভ করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে আপীলে উভয়েই নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি পান। কিন্তু সরকার এই ঘটনার পর প্রয়োজন অনুসারে কোন বিশেষ নাটকের অভিনয় বন্ধ করিতে পারেন এইরূপ আইন (Dramatic Performance's Control Act) বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। উহাতে নাট্য-সাহিত্য রচনায় গ্রন্থকার-গণের স্বাধীনতা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়, এবং দেশপ্রেমোদ্দীপক নাটকাবলী রচনার পরিবর্ত্তে তাঁহারা প্রধানতঃ সামাজিক ও ধর্ম্মমূলক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। দেশ-প্রেমোদ্দীপক উৎকৃষ্ট নাটকের অভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশ দত্তের উপন্যাসাবলী, এবং মাইকেল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বীররসাত্মক কাব্যাদি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত।

নাট্য-কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌরাণিক নাটকাবলীই সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত হইলেও তাঁহার বহু নাটক স্বদেশবাসীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ও বিকাশ করিয়াছিল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তদ্বিরচিত 'গিরিশ-প্রতিভায়' "জাতীয়তায় গিরিশচন্দ্র" শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন, "গিরিশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম খাঁটি বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রেম, তাঁহার রাজনীতি গভীর দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত। তাঁহার দেশানুরাগে বিলাতীর নাম মাত্র গন্ধ নাই, খাঁটি বাঙ্গালার জল-মাটীর উহা অনুরূপ। গিরিশচন্দ্র যে স্বদেশ-প্রেম প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রথম ভিত্তি জাতির আত্ম-বোধ জাগরণে, পথ আত্মনির্ভরশীলতায় ও আত্মত্যাগে, বিকাশ আত্মবিকাশে।" যদিও তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ-প্রেমোদ্দীপক নাটকাবলী—সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজী,—স্বদেশী যুগে,—বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত, তথাপি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-পাদে রচিত তাঁহার বহু নাটকে দেশাত্মবোধের বাণী প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "চণ্ড" নাটকে চণ্ডের দেশ-প্রেমের কথা স্মরণ করুন। যিনি যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক, তিনিই ধীরভাবে চণ্ডের ন্যায় আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন,—

"অন্তরের গূঢ় স্থল কর, অন্বেষণ
মন। পশি অভ্যন্তরে গুহ্যতম স্তরে
হের কোথা স্বার্থ লুক্কায়িত। উচ্চ আশ,
উন্নতি প্রয়াস, আছে কি গোপনে ধরি

স্বদেশ-বৎসল ভাব ? আধিপত্য-লিপ্সা,
কিবা চিতোরের হিতে চালিত অন্তর ?
সত্য-তত্ত্ব কর নিরূপণ। দেখ মন,
স্বার্থশূন্য নহে কি অন্তর ? কহ তব
আছে কি সন্দেহ তায় ? প্রকাশ সত্বর।
পাপ ইচ্ছা লুক্কায়িত রহে ধর্ম্ম-ভাণে,
ভুলায় মানবে, পুষ্ট হয় হৃদি মাঝে,
শেষে করে আপন প্রকাশ, কৃতদাস
হেবে যবে মন।"

নাট্য-কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস উপলক্ষে প্রকাশিত "মহাপূজা" নামক 'রূপকে'ও তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন,

"শিখো হৃদি উচ্চশিক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা রহ জননী-সেবায়।"

দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিনা যে দেশোন্নতির উপায় নাই, একথা তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।—তিনি লক্ষ্মীর মুখে ব্রিটনিকাকে বলিয়াছেন,—

"কিন্তু এই দুঃখ মনে, ভারত-সন্তানগণে,
কোন মতে শিখিল না আপন নির্ভর ;—
শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত করিল না কর।
এ দুঃখ কহিব কারে, তব শ্বেত পুত্র দ্বারে,
পরিধেয় বস্ত্র তরে অধীন সকলে,—
শ্বেতপুত্র শিল্পবলে গৃহে দীপ জ্বলে !
লবণের প্রয়োজন, নিত্য জানে জনে জন,
তব পুত্র হতে তাহা ক্রয় করি আনে ;
শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচজ্ঞানে।
প্রিয় ভগ্নী সরস্বতী, নানা বিদ্যা দিল সতী,
করিতেন যদি হায় এই ভ্রান্তি দূর—,
ভারতের সমকক্ষ হ'ত কোন পুর ?
সুজলা সুফলা বামা, ফল ফুলে সাজে শ্যামা,
বৈজ্ঞানিক শিল্প-বিনা সকলি বিফল,
শারীরিক শ্রম বিনা শরীর দুর্ব্বল।"

যখন ব্রিটনিকা সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বল সখি, কি কারণে, ভারত সন্তানগণে,
এতদিন শিল্প বিদ্যা করনি প্রদান,—
চিরদিন শিল্প জ্ঞান উন্নতি-সোপান।"—

তখন সরস্বতী বলিতেছেন,—

"অনুমতি মম প্রতি, কর নাই ভাগ্যবতি,
রাজোৎসাহ একমাত্র শিল্পের সহায় ;—
সে সাহায্য-বিনা শিল্প সদা নিরুপায়।
ছিল শিল্প নানা মত, শ্বেত-শিল্প-তেজে হত,
নিরুৎসাহে শিল্পকার্য্য না করে গ্রহণ ;—
ভারতসন্তানে দেহ আশ্বাস বচন।"

জাতীয় মহাসম্মেলন সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র একস্থানে বলিতেছেন :—

"ইহার প্রথম উদ্দেশ্য, ভারতের ভ্রাতৃভাব। এ বিস্তীর্ণ ভারত-ভূমের নানা প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণের পরস্পর আলিঙ্গন ; আমরা জাতিতে ভিন্ন,—পরস্পর ধর্ম্মে ভিন্ন,—কর্ম্মে ভিন্ন,—ভাষায় ভিন্ন,—কিন্তু এক দেশবাসী ও এক রাজ্যেশ্বরীর প্রজা, রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা একজাতি ; ভারতের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থ একীভূত ; ভারতের ধনাগমে আমরা ধনী, ভারতের সম্মানে আমরা মানী, ভারতের উন্নতিতে আমাদের উন্নতি ; একত্রে—রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিব।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রচিত ও অভিনীত 'হীরক জুবিলী'তে গিরিশচন্দ্র এইরূপ আভাস দিয়াছেন যে, রাজোৎসাহ পাইলে ভারতবর্ষ কেবল বাণিজ্য, কৃষি ও শাসন-কার্য্যেই যে উন্নতি লাভ করিতে পারে এরূপ নহে, দেশরক্ষার অধিকার পাইলে একতাবদ্ধ ভারতবাসী তাহাও করিতে সমর্থ।

"কেন মা দুর্গ-নির্ম্মাণ ? কেন এত বেতনভোগী গোরা সৈন্য ? কেন এত অর্থব্যয় ? চেয়ে দেখ তোমার রাজপুত সন্তান দণ্ডায়মান,

চেয়ে দেখ, রণব্রত রাজবৎসল শিখ, মারহাট্টা, মান্দ্রাজী, পার্শি অসিকরে দণ্ডায়মান। দুর্গের প্রয়োজন নাই, আমরাই তোমার দৃঢ়প্রাচীর। তোমার শিক্ষা, তোমার নামে রণদীক্ষা; ভুবনে কে এমন অস্ত্রধারী আছে যে, এ প্রাচীর ভেদ করতে পারে? আমরা একতাবিহীন, কিন্তু তোমার নাম দৃঢ়একতা-বন্ধন। যদি প্রয়োজন হয়, জগজ্জন দেখবে যে, ভারতে ভিক্টোরিয়ার অধিকার-আক্রমণ বাতুলের স্বপ্নমাত্র। মা! অস্ত্রধারী সন্তানের কামনা পূর্ণ কর, ভারত-রক্ষার অধিকার দাও।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দেই প্রকাশিত "মায়াবসান" নাটকে গিরিশচন্দ্র কালীকিঙ্করের মুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি একস্থানে বলিতেছেন,—

"আমি ইংরাজের অনুকরণের বিরোধী। ইংরাজের আচার-ব্যবহার ইংরাজের উপযোগী,—ভারতের অহিতকর।"

অন্যত্র,—

"আপনারা বলেছেন, পলিটিক্যাল ইউনিটী হয়েছে, আর রাজ্য শাসনের ব্যয় কমাতে চান; ভাল, সে ব্যয়-কমান আপনাদের হাতে আছে, সেইটে আগে করুন। গ্রাম, পল্লী, সহর মোকদ্দমায় উৎসন্ন যাচ্ছে, সব বড় লোক একত্র হয়েছেন, পঞ্চায়েত করে মোকদ্দমার সর্ব্বনাশ নিবারণ করুন; তাতে বিস্তর জজের মাইনে কমে যাবে, কোর্ট-ফি বেঁচে যাবে, কৌন্সুলীরা কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা নিয়ে যাচ্ছে, সে টাকা দেশে থাক্‌বে।"

* * * * *

"মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দিন। বড় লোক একত্র হয়েছেন, যে মদ খাবে, তাকে সামাজিক শাসন করুন; নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন। চক্ষের উপর দেখ্‌ছেন, দীন দরিদ্র প্রভৃতি ইংরেজী চালে চলে, আয় অনুসারে ব্যয় করতে পারে না; তাতে যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন। এমন কুটীর নাই, যেখানে মদের বোতল, শ্লিপ বোতাম, সাবান সেঁধুন নাই; যদি বড় লোক একত্র হয়ে থাকেন, সাধারণকে সুনীতি শিক্ষা দিন, পরিমিতাচারী হ'তে বলুন, বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে, সেই টাকায় দীন দরিদ্রের সাহায্য করুন।"

এইরূপে নানাস্থানে গিরিশচন্দ্র আমাদিগকে স্বদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রতি অবহিত হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, "যিনি যথার্থ লোকহিতকারী, তিনি একাই সহস্র, তাঁর কার্য্য কখনই বিফল হয় না।"

রসরাজ অমৃতলাল তাঁহার প্রহসনগুলিতে ভণ্ড তথা-কথিত দেশহিতৈষিগণকে শ্লেষ ও বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত করিয়া যেভাবে প্রকৃত দেশাত্মবোধে উদ্বোধিত করিয়া-ছেন, সেরূপ অতি অল্প নাট্যকারই পারিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর সর্ব্বত্রই স্বদেশের প্রতি ভক্তি, স্বকীয় সমাজের প্রতি দরদ এবং স্বধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা প্রকটিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে যদৃচ্ছক্রমে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। "বাবু"তে স্বদেশসেবক (!) ষষ্ঠীকৃষ্ণ ভ্যাটাভ্যাল কোন দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্রামবাসীকে বলিতেছেন:—

"এঁ্যা, ইংরেজী জানেনা; তবে সে গ্রাম থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি, সে গ্রামের জন্য আমি কিছু করতে পারিনে তা হ'লে গোড়ায় একটা বড়-রকম চাঁদা তুল্‌তে হবে; হাল গরু লাঙ্গল সব বেচে আমায় একটা ফণ্ড তুলে দিক্, আমি সেখানে একটা স্কুল খুলে দিচ্ছি, আগে ইংরেজী পড়্‌তে শিখুক, তবে তাদের জন্য আমাদের মত সভ্য লোকেদের দয়া হবে, Sympathy পাবে।"

পুনশ্চ,—

"দেখ্‌ছি তোমরা অতি অসভ্য জায়গায় থাক; দেশহিতৈষিতার কি কি দরকার, কিছুই জান না, তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষের

রসরাজ অমৃতলাল বসু

প্রতিকার করতে যাব, আমি ইণ্টারমিডিয়েটে গেলে আমায় চিনবে কে? ফাষ্ট ক্লাশে যাবার-আসবার টিকেটের ঠিক কর, আর আমি কেল্‌নারের হোটেলে খাব, লেকচার দেব, তার জন্য একজন ফিরিঙ্গী রিপোর্টার এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে, তার সেকেণ্ড ক্লাশের ভাড়া—আর ফি যে ক'টাকা নেয়। তার পর আমি যাচ্ছি, তার জন্যে রাজসাহী, ঢাকা, যশোর, পাটনা, বেনারস, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সিলোন, বিলেত আর যে যে জায়গায় আমাদের ব্রাঞ্চ সভা আছে, সেখানে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে:—ষ্টেসন থেকে গ্রামে গ্রামে যাবার জন্য পাল্কী ঠিক ক'রো আর গ্রামে ঢুক্‌তেই দেবদারু-পাতা দিয়ে নিশেন-টিশেন দিয়ে একটা ফটক বাঁধা থাক্‌বে,—রাত্রিতে আলো হওয়া চাই, আর নহবত—আর কল্‌কাতা থেকে একদল গোরার কন্‌সাট নিয়ে যেতে পার ত ভাল হয়।"

"কালাপানি"তে বিলাতগমনেচ্ছু দেশবাসীকে সর্ব্বাগ্রে দেশের সহিত ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ স্থাপনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

যথা,—

"সাধুরাম। সমুদ্রযাত্রা না করলে, নানাবিধ দেশ না দেখলে মনের উন্নতি হয় না।

তিনকড়ি। ভারতবর্ষের ভিতর বোধ হয় বরানগর, হাওড়া, দমদমা, বালিগঞ্জ প্রভৃতি এক রাজার দেশ থেকে অন্য রাজার দেশ সকলগুলিই মশা'য়ের দেখা হয়েছে, এখন বাকি খালি বিলাত!

সাধু। ভারতবর্ষে আবার দেখবার আছে কি? ভারতবর্ষ কি আবার একটা দেশ! এই ভারত উদ্ধার করবার জন্যই ত আমরা বিলাত যেতে চ ছি।

তিন। চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধারের জন্যে তো বাবা, গয়ায় গিয়ে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডি দিতে হয়, বিলাতে গিয়ে বাবা, ভারতের পিণ্ডিটা কার পাদপদ্মে দেবে?

মাখন। যখন বিলাত থেকে ভারত উদ্ধার করে ফিরে আসবো, তখন টের পাবে কি পিণ্ডি কার পাদপদ্মে দিয়েছি। স্বাধীনতা কাকে বলে তা'তো জান না? খালি দাসত্ব করতে শিখেছ, এই যে ভারতবাসীরা বড় চাকরী পায় না, দেখ দেখি তার একটা উপায় করে আসতে পারি কি না?

তিন। এ কথার আর উত্তর নাই, চাকরী না করলে কি স্বাধীনতা বজায় থাকে!

দুলাল। আচ্ছা রেখে দাও, চাকরীকে নাই স্বাধীনতা বল্লে, যদি জাহাজে করে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মণি, আমেরিকা এসব জায়গায় না যাওয়া যায়, তাহ'লে বাণিজ্যের উন্নতি করা যাবে কি প্রকারে? বৈদেশিক বাণিজ্য ভিন্ন কখনও জাতীয় উন্নতি হ'তে পারে না।

তিন। দেশে যে বাবা, এমন কিছু বাণিজ্যের ফ্যালাও করে বসেছ, তাতো কৈ দেখতে পাচ্ছিনে; উন্নতি তো পরে করবে, স্বরুটা এখান থেকে করে নমুনা দেখাও না কেন? এই যে পুরুষানুক্রমে রেয়তের রক্ত, হাণ্ডনোট, আর কোম্পানীর কাগজের সুদে দেহখানা পুষ্ট কচ্ছো, অপাত্রে দানের ভয়ে মুষ্টি ভিক্ষা পর্য্যন্তও তো বন্ধ করা হয়েছে।

উভয়ে। Hear! Hear!

তিন। জমিয়েছ তো বিস্তর, কিছু ভাঙ্গিয়ে কেন ব্যবসা বাণিজ্য কর না; তিসি ভুষি-ঘাঁটা অসভ্যতা হয়, কে মাথার দিব্য দিয়ে বারণ করেছে বাবা, কলকজ্জা কর না; বিলাত থেকে, মার্কিণ থেকে কাপড়ের, কাগজের, ছুরি কাঁচির কল আনাও; আপাততঃ না হয় ইংরেজ চাকর রেখে চালাও, ক্রমে শিখে নাও।

* * * * *

সাধু। শুধু দেশী বাণিজ্যতে ভালরকম লক্ষ্মী-শ্রী হয় না, দেশের ধনবৃদ্ধি করা চাই।

তিন। এই এক কথা শিখেছ কি না, "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ"—ভাল, তার পরের কথাটা জানা আছে কি? "তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—আচ্ছা, লক্ষ্মীর একবারে কোটা বালাখানা করতে না পার, নেহাত হালফিল একখানা আটচালা-মতন করে দাও না বাবা। কৃষিকর্ম্মে তো বাণিজ্যের অর্দ্ধেক ফল, তা চাষ বাস কর না কেন?" দেশ-যুড়ে মাঠ পড়ে আছে, তা ত আর বিলাত থেকে মাথায় করে আনতে হবে না?

দুলাল। এইবার মামা ধরা পড়েছে, আপনার ফাঁদে আপনি পড়েছে।

মাখন। Trap in his own catch.

দুলাল। বিলাত না গেলে, ভাল রকম বৈজ্ঞানিক চাষবাস শেখা যাবে কোত্থেকে? হাঁ হাঁ বাবা, মামা এর জবাব আর তোমার গাঁজার বুদ্ধিতে কুলুচ্ছে না।

তিন। বাবা, দেশে থেকে দাড়ি-টানাটা রপ্ত কর না, তার পর যখন মহামহিম পাঠ লেখবার উপযুক্ত হবে, তখন বিলাত-ফিলাত যাবার কথা বোঝা যাবে। এই তো বাবা তুমি একজন দিগ্‌গজ জমীদার, একেবারে বিলাতি রকম না হয়, নিজের এলেকাতে পয়লা পয়লা একটু দেশী-রকম চাষ আরম্ভ কর দেখি, কেমন না ফল হয় দেখা যাক। এই তো বাবা বারমেসে দুর্ভিক্ষ লেগেই রয়েছে। এ বছর কি? না, বৃষ্টি হয়নি, সব শুকিয়ে গেল। যত দোষ সেই বুড়ো বেটা ভগবানের উপর চাপান হচ্ছে, কিন্তু আসল কথাটা তলিয়ে একবার কেউ দেখেন না।

* * * * *

মাখন। আচ্ছা, তুমি বিলাত যাওয়ার উপর এত চটা কেন?

তিন। কৈ চটার কথা তো কিছু কইনে বাবা; প্রাণে বিশেষ সখ থাকে বা বেশী প্রয়োজন হয়, তুমি যমালয়ে গেলেও আমার আপত্তি নাই; তবে আমার কথাটা হচ্ছে যে, এখনও ঢের কাজ আছে যা—দেশে থেকেই করতে পার।

"একাকারে"ও অনেকস্থানে দেশীয় কৃষি-শিল্পের উন্নতি দ্বারা স্বাধীনভাবে দেশোন্নতি ও জাতীয় ভাবসংরক্ষণের ইঙ্গিত আছে। একস্থানে লিখিত আছে:—

"আমাদের উন্নতি কর্ত্তে হ'লে তোমরা যাকে পেছনো মনে কর, সেই পেছুতে হবে, সাহেবী-ধরণ সামনে আদর্শ রেখে হিন্দু উন্নতি কর্ত্তে হ'লে যতই চেষ্টা করবে, ততই অধঃপাতে যাবে; হিন্দুর উন্নতির উপায় সেই পুরাতন হিন্দুর আদর্শ।"

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

ষষ্ঠ পর্ব্ব

ডাইনী-বুড়ীর ভবিষ্যদ্বাণী

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

আমসের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মেরী নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে তাহার জন্য আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইল। আম্‌স আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে না বলিলেও আমি দ্রুতবেগে সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম; অবশেষে তাহাকে গিরিপাদমূলে এক খণ্ড পাথরের উপর উপবিষ্ট দেখিলাম। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার বুকফাটা রোদনে আমি বড়ই বিচলিত হইলাম। আমি তাহার সমদুঃখী।

আমি মেরীর সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কোমল স্বরে বলিলাম, "মেরী!"

মেরী আমার আহ্বানে সাড়া দিল না। আমি পুনর্ব্বার ডাকিলাম, "মেরী!"—এবার মেরী মাথা তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। শুভ্র নক্ষত্ররাশির মৃদু আলোকে দেখিলাম, তাহার মুখমণ্ডল শোণিত-সংস্পর্শরহিত, এবং অশ্রুধারায় প্লাবিত।

মেরী ভগ্নস্বরে বলিল, "পিটার, উঃ কি কষ্ট!"

আমি কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে তাহার পাশে বসিয়া-পড়িলাম; তাহার পর তাহার হাতখানি নিজের হাতের ভিতর লইয়া সহানুভূতিভরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখনও কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল; ধমনীতে শোণিতের স্রোত প্রখর।

মেরী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "পিটার, বাবা আমাকে কি বলিল, তাহা তুমি শুনিয়াছ কি?—কি ভয়ানক কথা!"

আমি বলিলাম, "মেরী, উহার কথায় তুমি কাণ দিও না। উহার কথাই ঐ রকম! তোমার বাবা এক এক সময় আমাকে কি রকম ভয়ানক কথা বলে, তাহাও তুমি জান ত? কিন্তু সে সকল কথা কোন দিন আমি কাণে তুলি না। কি বলিতেছে, তাহা না বুঝিয়াই যা' তা' বলা উহার অভ্যাস! তাহা শুনিয়া রাগ করিতে নাই।"

মেরী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না পিটার, তোমারই বুঝিবার ভুল! বাবা যাহা বলে, তাহা বুঝিয়াই বলে। আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচিতাম; আর একদিনও এখানে আমার থাকিবার ইচ্ছা নাই। আমি এই কদর্য্য স্থান হইতে চিরবিদায় লইতে চাই, পিটার!"

আমি বলিলাম, "সে যাহা হয় পরে হইবে, এখন ঘরে চল মেরী!"

মেরী অধীর স্বরে বলিল, "তুমি আবার আমাকে বাবার কাছে যাইতে বলিতেছ? ঐ সকল দুর্ব্বাক্য শুনিতে যাইব? ছিঃ!"

আমি বলিলাম, "তোমাকে আর কোন কথা শুনিতে হইবে না; তোমার বাবা এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"

মেরী আমার কথার আর প্রতিবাদ না করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; আমি তাহার হাত ধরিয়া এক-রকম টানিয়া-লইয়াই বাড়ীর দিকে চলিলাম।

কয়েক মিনিট পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমার অনুমান সত্য নহে, আমস্‌ তখনও শয়ন করে নাই; সে তখন পাকশালার অগ্নিকুণ্ডের অদূরে বসিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ধূমপান করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া মেরী আর মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে না দাঁড়াইয়া দ্বিতলে তাহার শয়ন-কক্ষে চলিয়া গেল। সুতরাং আমস্‌ তাহাকে আর কোন কথা বলিবার সুযোগ পাইল না।

মেরী কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, আমস্‌ সে কথা

আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "কাল সকালে আমি স্থানান্তরে যাইব, তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে; তুমি খুব সকালে উঠিয়া আমার সঙ্গে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইবে।"

আমি তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে; আমরা কি চিরদিনের জন্ম এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব?"

আমস্ মাথা-নাড়িয়া গর্জ্জন করিল, "চিরদিনের জন্ম কোন্ চুলোয় যাইব? আমরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া চির-কালের জন্ম কোথাও যাইব না। কাল সকালে আমি স্কাইএ যাইব; তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে, এই কথা বলিয়াছি। এই সোজা কথাটাও তোমার বুঝিবার শক্তি নাই! তোমার মত নিরেট গাধা আর কখনও দেখি নাই!"

আমি তাহার কথার প্রতিবাদ না করিয়া বলিলাম, "সেখানে আমাদের কত বিলম্ব হইবে?"

আমস্ বলিল, "কাল সন্ধ্যার পরই আমরা এখানে ফিরিয়া আসিব।"

আমি বলিলাম, "বুঝিলাম; কিন্তু আমাদের এখানে ফিরিবার পূর্ব্বেই যদি কোন 'ইউ'-বোট আসিয়া পড়ে?"

আমস্ কঠোর স্বরে বলিল, "দিনের আলো থাকিতে কোন 'ইউ'-বোট এখানে আসে না, তাহা কি তুমি জান না? এই সোজা কথাটা এতদিনে তোমার বুঝিতে পারা উচিত ছিল। হিটলারের অনুচরগুলা অন্ধকার গাঢ় না হইলে এখানে আসিবে না। কিন্তু ফার্গসের সন্ধান লইবার জন্ম অন্যান্য লোক এখানে আসিতে পারে। এই জন্মই আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। মেরীকে আমি বিশ্বাস করিতে পারি। আমি জানি, মেরীকে জেরা করিয়া কেহ তাহার মুখ হইতে সত্য কথা বাহির করিয়া লইতে পারিবে না, তাহার মুখ বুজিয়া থাকিবার অভ্যাস আছে; কিন্তু শয়তানী বুদ্ধিতে তুমি পরিপক্ক হইলেও সত্য কথা গোপন রাখিতে পারিবে না; জেরায় পড়িয়া তুমি সব গোলমাল করিয়া ফেলিবে, সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে,—এই জন্মই ত তোমাকে ভয়!"

তাহার এই মন্তব্য শুনিয়া আমার কিছুই বলিবার ছিল বিশেষতঃ, দীর্ঘকাল তাহার আশ্রয়ে বাস করিয়াও মিথ্যা কথা আমার মুখে বাধিয়া যাইত,—আমার এই ক্রটি অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। অগত্যা আমি নির্ব্বাক্ রহিলাম।

কিন্তু আমস্ তখনও আমাকে নিষ্কৃতি-দান করিল না; সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "আমার সেখানে যাইবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু বাধ্য হইয়া যাইতে হইতেছে। আমার ঘরে দুই সপ্তাহ চলিবার মত মদ সঞ্চিত ছিল। ফার্গস্ আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মরিল তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আধ-জার মদ সমস্তই সে গিলিয়া সাবাড় করিয়া মরিয়াছে! ঘরে আর একবিন্দুও মদ নাই। কাজেই উহা সংগ্রহ করিবার জন্ম স্কাইএ না যাইলে চলিতেছে না। তা' ছাড়া, সেখানে যাইবার আরও একটি কারণ আছে।"

সেই কারণটি কি, আমস্ আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিল না; আমিও সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম না। সে তাহার মেটে পাইপটা পুনর্ব্বার মুখে গুঁজিয়া, অগ্নিকুণ্ডের আরও নিকটে সরিয়া বসিল। আমি পাক-শালার এক কোণে বসিয়া রহিলাম। সে আপন মনে বিড়্-বিড়্ করিয়া কি বলিতে লাগিল।

কথাগুলি সে অনুচ্চ স্বরে বলিলেও আমি তাহা শুনিতে পাইলাম।

আমস্ বলিল, "কাজটা করিতে আমার সাহস হয় না। অন্য লোক এতদিন তাহার মুণ্ডপাত না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না; কিন্তু আমি শুনিয়াছি, তাহাকে হত্যা করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। সে শাপ দিলে তাহা হাড়ে-হাড়ে ফলিয়া যাইবে। জানি না, এ কথা সত্য কি না; কিন্তু সত্য হইতেও পারে। বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছি! কি যে করিব—কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না! বুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে আমি নিরাপদ নহি।"

হঠাৎ সে নীরব হইল, এবং তাহার কথাগুলা আমি শুনিতে পাইয়াছি ভাবিয়া সে সক্রোধে আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার ভাল চোখটা হইতে যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল! তাহার পর সে আমাকে বলিল, "হরিকেন লণ্ঠনটা লইয়া তুমি সমুদ্রতটে যাও; যদি আজ রাত্রে হঠাৎ কোন 'ইউ'-বোট আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে সাঙ্কেতিক আলো দেখাইবে।"

তাহার আদেশ শুনিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং বলিলাম, "বেশ, আমি যাইতেছি।"

চর্ম্মনির্ম্মিত পুরাতন জ্যাকেটটা তাড়াতাড়ি পরিয়া লইলাম। আমার গরম কোট নাই; 'ইউ'-বোটের প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল সমুদ্রতীরে বসিয়া-থাকিয়া শীতে কষ্ট পাই দেখিয়া কোন কাপ্তেন দয়া করিয়া উহা আমাকে উপহার দিয়াছিল। সেই জ্যাকেট দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া, আমি হরিকেন লণ্ঠনটি জালিয়া-লইয়া মেঘান্ধকার-সমাচ্ছন্ন বর্ষণোন্মুখ রাত্রিতে একাকী বিজন সমুদ্রকূলে যাত্রা করিলাম। নির্ম্মল আকাশে অল্প সময়ের মধ্যেই মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া 'ইউ'-বোটের প্রতীক্ষায় আমি গিরিপাদমূলে বসিয়া রহিলাম। অবশেষে নিশাবসানে উষালোকে চরাচর উদ্ভাসিত হইল। সারা রাত্রি আমাকে জাগিয়া কাটাইতে হইল। আমি ভাবিলাম, রাত্রির ত অবসান হইল, কিন্তু জীবনে আমার এই তমোময়ী দুঃখ যামিনীর অবসান হইবে কি?

প্রভাতে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সারারাত্রি এক স্থানে বসিয়া-থাকায় হাত-পা আড়ষ্ট হইয়াছিল। প্রভাতে 'ইউ'-বোট আসিবে না বুঝিয়া আমি আড়ষ্ট হাত-পা ডলিয়া অবসাদ-শিথিল দেহে বাড়ী ফিরিলাম।

দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া-থাকায় আমার চক্ষু জ্বালা করিতেছিল; নিদ্রাঘোরে চক্ষুর পাতা জড়াইয়া আসিতেছিল। আমি পাকশালায় প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি আমার পরিচ্ছদ ও বুট-জোড়াটা খুলিয়া ফেলিলাম, এবং বিচিলীগুলি সেই কক্ষের এক কোণে বিছাইয়া-লইয়া তাহার উপর শ্রান্ত দেহ প্রসারিত করিলাম। শয়ন মাত্রই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সূর্য্যোদয়ের পর আমসের আহ্বানে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি তত-বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছি—এই ভাবে আমস্ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া জামা-জুতা পরিয়া সমুদ্রতটে তাহার অনুসরণ করিলাম। আকাশে তখনও অল্প অল্প মেঘ ছিল; এবং বায়ুর বেগ প্রবল হইলেও তাহা আমাদের অনুকূল ছিল। আমস্ আমাকে তাহার বোটে তুলিয়া লইলে বোটখানি অনুকূল বায়ুপ্রবাহে স্কাই-দ্বীপ অভিমুখে ধাবিত হইল।

আমস্ কি উদ্দেশ্যে স্কাই দ্বীপে যাইতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে বলিয়াছিল বটে যে, মদ্য সংগ্রহের জন্য তাহার সেখানে গমন করা প্রয়োজন, কিন্তু তাহার সেখানে গমনের অন্য কারণ ছিল—তাহাও সে বলিয়াছিল; আমার মনে হইল, সেই কারণটি সে আমার নিকট প্রকাশ না করিলেও তাহাই প্রধান কারণ।

আমস্ বোটে উঠিয়া আমাকে কোন কথা বলিল না; সে নির্নিমেষ নেত্রে আমাদের দ্বীপের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি আর কখন আমাদের বাসস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করি নাই। এই জন্য নূতন স্থানে যাইতেছি ভাবিয়া আমার মনে যথেষ্ট আনন্দ হইলেও আমসের ভাবভঙ্গি দেখিয়া সেই আনন্দ স্থায়ী হইল না; বরং কি এক অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যাহা হউক, দীর্ঘকাল পরে স্কাই দ্বীপের গিরিমালা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলে আমার মনের ভার লঘু হইল। আরও কিছুকাল পরে আমরা স্কাই দ্বীপের বালুকাময় তটদেশে অবতরণ করিলাম।

তখন মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছিল। বায়ুর উদ্দাম বেগ তখন হ্রাস হইয়াছিল। দ্বীপটির চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ; কোনও দিকে জনমানবের সাড়া-শব্দ পাইলাম না। সমুদ্রতট হইতে আমি আমসের অনুসরণ করিলাম। বহু দূর হইতে সমুদ্রচর গল পক্ষীর কণ্ঠস্বর আমাদের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। সেই তীব্র স্বরে যেন ক্ষুধিত জীবনের আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইতেছিল।

জীবনে সর্ব্বপ্রথম এই নূতন স্থানে আসিয়া চলিতে চলিতে আমার মন উত্তেজনায় পূর্ণ হইল। এখানে কি দেখিব, কি নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না!

কিছু দূর চলিতে চলিতে আমরা উচ্চ ভূমিখণ্ড অতিক্রম করিলাম। তাহার পর পথের মোড়-ঘুরিতেই প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে অবস্থিত একখানি ক্ষুদ্র কুটীর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। কুটীরখানির ছাদ টালিনির্ম্মিত, এবং তাহার দেওয়ালগুলি চুণকাম-করা। দেওয়ালের স্থানে স্থানে ছিদ্র, সেই সকল ছিদ্র-পথে বিবর্ণ শিলাখণ্ড দেখা যাইতেছিল। সেই সকল প্রস্তর দ্বারা পুরাতন প্রাচীরের জীর্ণ-সংস্কার হইয়াছিল। কুটীরের নিকটে উপস্থিত

হইয়া বুঝিতে পারিলাম—কুটীরখানি বহু পুরাতন, এবং অত্যন্ত নোংরা, যেন দীর্ঘকাল সেখানে সম্মার্জ্জনী ব্যবহৃত হয় নাই!

কুটীরের সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র বাগান, তরি-তরকারীর বাগান বলিয়াই মনে হইল; কিন্তু তাহাতে যত্নের কোন পরিচয় পাইলাম না। বাগান জঙ্গলে পূর্ণ; কয়েকটা মোরগ সেই বাগানের নিকট চরিয়া বেড়াইতেছিল। অপরাহ্নের রৌদ্র প্রতিফলিত হওয়ায় সেই স্থানটি শ্রীভ্রষ্ট ও পরিত্যক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

স্থানটি আমসের সুপরিচিত বলিয়াই মনে হইল; কারণ, সে অসঙ্কোচে কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইয়া ঝাঁপের দরজায় একটা ধাক্কা দিল।

দরজা অল্প খোলা ছিল। তাহার করাঘাতের শব্দে একটি বৃদ্ধা কুটীরের ভিতর হইতে নীরস সুতীব্র খন্‌খনে আওয়াজে বলিয়া উঠিল, "এসো আমস্ ক্রোবি! কুটীরের ভিতরে এসো; আমি তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমার প্রতিপালিত ছেলেটি তোমার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাকেও লইয়া এসো।"

আমস্ আমাকে তাহার অনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিয়া সেই কুটীরে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত পরে আমিও সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটীরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। কুটীরের ভিতর এরূপ দুর্গন্ধ যে, সেই বদ্ধ বায়ুতে আমি হাঁপাইতে লাগিলাম। আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল!

সেই কুটীরের অন্ধকার আমার চক্ষুতে সহ্য হইলে আমি সম্মুখে চাহিয়া অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বস্থ একখানি টুলের উপর উপবিষ্টা একটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলাম। বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া আতঙ্কে আমার চক্ষু কপালে উঠিল! সেরূপ অদ্ভুত—সেরূপ ভীষণ কদাকার নারীমূর্ত্তি আমি কখন কল্পনা করিতে পারিতাম না। সে নারী, কি কোন হিংস্র জন্তু তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না!

সে বৃদ্ধা; তাহার দেহ এরূপ ক্ষীণ যে, অস্থির উপর কুঞ্চিত ত্বকের আবরণ ভিন্ন দেহে মাংসের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হইল না। বাদামী ত্বকের নীচে স্থূল শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখ পেচকের মুখের মত, কিন্তু দীর্ঘ নাসিকার অগ্রভাগ বক্র; চক্ষু দু'টি কোটরগত, কিন্তু চক্ষু-তারকা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল,—তাহা ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহার দন্তহীন মুখে পাতলা ওষ্ঠ। হাতের আঙুলগুলি অস্থিসার ও দীর্ঘ; আঙুলাগ্রে দীর্ঘ নখগুলি বক্রাকার। তাহার হাতে একখান লাঠী, কিন্তু হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। মস্তকের রুক্ষ কেশদাম ঊর্ণার মত; তৈলাভাবে তাহাতে জট বাধিয়াছিল। বিবর্ণ কুঞ্চিত ললাটে স্থূল শিরাগুলি ফুলিয়া-উঠিয়া মুখমণ্ডলের ভীষণতা বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তাহার স্কন্ধের হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মাথায় একটা ক্ষুদ্র, বিবর্ণ, জীর্ণ ছত্রিদার টুপি। কৃষ্ণবর্ণ আলখেল্লা এরূপ দীর্ঘ যে, তাহা তাহার পদদ্বয় আবৃত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল।

বৃদ্ধা নীরস স্বরে বলিল, "সরিয়া এসো আমস্ ক্রোবি! আমার আরও কাছে এসো। হাঁ; নিক ও আমি সত্যই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

তাহার কথা শুনিয়া ভাবিলাম—নিক আবার কে?

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ কি-একটা চতুষ্পদ জন্তু পশ্চাৎ হইতে বৃদ্ধার পাশে লাফাইয়া পড়িল। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, তাহা একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল! যেন কালো বাঘ! বিড়াল অত বড় হয়, এরূপ আমার ধারণা ছিল না। তাহার সুগোল চক্ষু দু'টি যেন আগুনের ভাঁটা! বিড়ালটা তৎক্ষণাৎ টুলে উঠিয়া বৃদ্ধার পাশে গুঁড়ি-মারিয়া বসিয়া পড়িল। বিড়ালটাকে দেখিয়া ভয়ে ও ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; মনে হইল, শয়তান এই বিড়ালের মূর্ত্তিতে বৃদ্ধাকে সকল বিপদে রক্ষা করিতেছে। বিড়ালটার যে চক্ষুতারকা কিছুকাল পূর্ব্বে অগ্নিবর্ণ দেখিয়াছিলাম, ক্ষণকাল পরে তাহা গাঢ় সবুজবর্ণে পরিণত হইল।

বৃদ্ধার আহ্বানে আমস্ তাহার ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা তাহার কোলের কাপড়ের উপর ফেলিয়া দিল; তাহার পর নীরস স্বরে বলিল, "আমার বরাতি মদ এবং অন্যান্য জিনিসের জন্য এই টাকাগুলি তোমাকে দিলাম। মদ চোলাই করিয়া ঘরে রাখিয়াছ ত? তাহা লইয়া আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাকে বাড়ী ফিরিতে হইবে।"

বৃদ্ধা আমসের কথা শুনিয়া ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলিল, "হাঁ, তোমাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিতে হইবে তাহা

জানি। তুমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী না ফিরিলে রাত্রিকালে যদি জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোট আসে, তাহা হইলে তোমার জিম্মায় তাহাদের যে তেল আছে, তাহা কিরূপে তাহারা সংগ্রহ করিবে? কিন্তু আমস্ ক্রোবি, তুমি টাকার লোভে যে খেলা আরম্ভ করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা! হাঁ, সাংঘাতিক বিপজ্জনক! যাহা হউক, তুমি বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে আমার দুই হাতের মুঠা-ভরিয়া টাকা দিয়া যাও, তাহা হইলে আমি তোমার ভাগ্য-ফল গণনা করিয়া বলিয়া দিব।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা হী-হী শব্দে হাসিয়া টাকার জন্য আমসের সম্মুখে উভয় করতল প্রসারিত করিল।

আমস্ বৃদ্ধার মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীরস স্বরে বলিল, "তোমার জন্য যে টাকা আনিয়া-ছিলাম, তাহা সমস্তই তোমাকে দিয়াছি; তথাপি তোমার আশা মিটিতেছে না! বুড়া হইয়াছ, তবু তোমার এত লোভ!—কিন্তু তুমি জানিয়া রাখ—ভাগ্যফল জানিবার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। আমি তাহা শুনিতে চাই না।"

বৃদ্ধা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "শুনিতে চাও না? হাঁ, তুমি তাহা শুনিতে চাইবে না বটে; কারণ, তাহা শুনিবার জন্য যে সাহসের প্রয়োজন, সে সাহস তোমার নাই। তা, আমি তোমার নিকট টাকা পাই বা না-পাই, তোমার ভাগ্যফল আমি এখনই গণিয়া—"

বৃদ্ধার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মুখ বুজিয়া বসিয়া থাক্ হারামজাদি বুড়ি! যদি ও-সব কথার একটাও আবার মুখে আনিস্—তাহা হইলে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, আমার বলিতে লজ্জা হইতেছে—আমস্ বৃদ্ধার সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার গালে প্রচণ্ড বেগে এক চড় মারিল!

আমার মনে হইল, সেই চড় খাইয়া বুড়ী তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া-পড়িয়া পঞ্চত্ব লাভ করিবে; কিন্তু বুড়ীর কঠিন প্রাণ, সে মরিল না। সে তাহার শোণিত-সম্পর্কহীন, বিবর্ণ, শুষ্ক গালে আমসের স্থূল, পরিপুষ্ট করতলের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়া কোটরগত চক্ষুর যে দৃষ্টি আমসের মুখের উপর নিক্ষেপ করিল, সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির দাহিকাশক্তি থাকিলে সেই স্থানেই আমস্‌কে ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে হইত!

বৃদ্ধার একক জীবনের একমাত্র সঙ্গী 'নিক্' নামক সেই কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার হোঁদা বিড়ালটা বৃদ্ধার কোলের কাছে বসিয়া ছিল। আমস্ বৃদ্ধার গালে চড় মারিবামাত্র বিড়ালটা অগ্নিময় দৃষ্টিতে আমসের মুখের দিকে চাহিয়া, তীক্ষ্ণ দন্তশ্রেণী উদ্ঘাটিত করিয়া ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিল; তাহার সর্ব্ব-শরীরের লোমরাজি কদম্বকেশরের ন্যায় কণ্টকিত হইয়া শরীরটা তিনগুণ ফুলিয়া উঠিল, এবং ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যে ভাবে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে—সে আমসের কণ্ঠনালি লক্ষ্য করিয়া সেই ভাবে লাফাইতে উদ্যত হইল; তাহা দেখিয়া বৃদ্ধা বিড়ালটার পিঠে হাত বুলাইয়া মৃদু স্বরে তাহাকে কি আদেশ করিল। বিড়ালটা অত্যন্ত গম্ভীর 'ম্যাও' শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্থির ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার লোমাঞ্চিত দেহ মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল।

অতঃপর বৃদ্ধা আমসের মুখের উপর অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে তীব্র স্বরে বলিল, "আমস্ ক্রোবি! বিনা-দোষে তুমি এই অসহায়া, দুর্ব্বল বৃদ্ধাকে যে প্রহার করিলে, তোমাকে শীঘ্রই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। তোমার ভাগ্যে কি আছে তাহা শুনিতে চাও না, সে সাহস তোমার নাই, তাহা আমি জানি; তথাপি এখনই তোমাকে তাহা শুনাইয়া দিতেছি।—আমি বৃদ্ধা, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, এজন্য আমি দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না; দেখিতেছি—কেবল শীতের প্রভাতের পুঞ্জী-ভূত শুভ্র কুজ্ঝটিকাস্তর! প্রভাত-রৌদ্রে ঐ কুজ্ঝটিকারাশি অপসারিত হইল; এবার আমি সেই স্থানে একটি প্রশস্ত আঙ্গিনা স্পষ্ট দেখিতেছি! উহা কোন কিল্লার প্রাঙ্গণ কি? ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না! কিন্তু সেই প্রাঙ্গণে একদল সুসজ্জিত সৈন্য দেখিতেছি; উহাদের প্রত্যেকের হস্তে উদ্যত রাইফেল! আর কিছু দূরে একটি প্রাচীরে পিঠ রাখিয়া একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে! মুখ দেখিয়া চিনিলাম, ঐ লোকটি তুমি! আমস্ ক্রোবি—তুমি! কিন্তু তোমার উভয় হস্ত রজ্জুবদ্ধ, এবং উভয় চক্ষু ব্যাণ্ডেজে আবৃত; দেওয়ালে পিঠ-দিয়া দাঁড়াইয়া তুমি কিছুই দেখিতে না পাইলেও আমি দেখিতেছি

সৈনিকেরা রাইফেল-হস্তে অদূরে দণ্ডায়মান দলপতির আদেশের প্রতিক্ষায়—"

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর কি উগ্র, কি ভীষণ! সুগম্ভীর বজ্রনাদের ন্যায় তাহার প্রত্যেক শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল! এই কঠোর বাণী আমসেরও বোধ হয় অসহ্য হইল; সে বৃদ্ধার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চিৎকার করিয়া বলিল, "শীঘ্র মুখ বন্ধ কর্ বুড়ি! যদি আর একটা কথাও তোর মুখ হইতে বাহির হয়—তাহা হইলে আমি"—ক্রোধে ভয়ে আমসের শুষ্ক কণ্ঠ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না।

কিন্তু বৃদ্ধা তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, নীরস স্বরে বলিল, "আমস্ ক্রোবি, আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, তোমার মাথায় খুন চাপিয়াছে। হাঁ, আমার কথা মনে হইলেই আমাকে খুন করিবার জন্য তোমার হাত নিস্-পিস্ করে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও তুমি কোন দিন আমাকে হত্যা করিতে পারিবে না। শুনিতেছ আমস্ ক্রোবি! আমাকে হত্যা করা তোমার অসাধ্য। এ পুরুষ মানুষের কাজ, এ কাজ তোমার নয়।"

আমস্ যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল, "এ কাজ মানুষেরই হউক, আর পিশাচের হউক, তোমার মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, বুড়ি! শীঘ্রই তোমাকে কাহারও হাতে মরিতে হইবে, এ কথা স্থির জানিও। যাহা হউক, তুমি মূল্য পাইয়াছ, আমার জন্য মদ চোলাই করিয়া কোথায় রাখিয়াছ বল, তাহা লইয়া চলিয়া যাই।"

বৃদ্ধা ঘরের কোণে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঘরের ঐ কোণে ভাঁড় আছে, লইয়া যাও। কিন্তু এ কথা যেন তোমার স্মরণ থাকে যে, তোমার জীবনের যে সূতা তুমি প্রতিদিন পাকাইয়া সরু করিতেছ, তাহা এই বৃদ্ধা যে কোন মুহূর্ত্তে ছিঁড়িতে পারিবে, ইহা ভুলিও না আমস্ ক্রোবি!"

আমস্ বৃদ্ধার কুটীর-দ্বারে আসিয়া বলিল, "কিন্তু তুমিও স্মরণ রাখিও—শীঘ্রই একদিন আমি তোমার ও-মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিব।"

বৃদ্ধা বলিল, "একদিন আমাকে হত্যা করিবে? কিন্তু সে জন্য আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি? আমি দুর্ব্বল, বৃদ্ধা—সম্পূর্ণ অসহায় বৃদ্ধা, আজই আমাকে হত্যা করিতে বাধা কি? যখন এখানে আসিয়া পড়িয়াছ—তখন কাজটা শেষ করিয়াই যাও না।"

কিন্তু আমস্ আর কোন কথা না বলিয়া, আমাকে তাহার অনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিয়া পথে বাহির হইল।

আমি নিঃশব্দে আমসের অনুসরণ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম, এবং বোটে উঠিয়া বসিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, যেরূপেই হউক, বৃদ্ধা আমস্‌কে মুঠায় পুরিয়াছিল; ইচ্ছা হইলেই সে তাহাকে চূর্ণ করিবে। আমস্‌ও তাহা জানিত। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আমসের বোট আমাদের দ্বীপের দিকে ফিরিয়া চলিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সেই জন্য আমরা আকাশের কোন দিকে একটিও নক্ষত্র দেখিতে পাইলাম না। আমস্ নিঃশব্দে বোট চালাইতে লাগিল।

আমরা দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলে আমস্ সমুদ্রের অন্য দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "দেখ দেখ, ঐ ডাহিনে চাহিয়া দেখ।"

আমি সেই দিকে চাহিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্র-বক্ষে একটি উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইলাম। উহা জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটের সাঙ্কেতিক আলোক!

আমি আমস্‌কে বলিলাম, "একখান 'ইউ'-বোট আসিয়াছে দেখিতেছি!"

আমস্ কর্কশ স্বরে বলিল, "তাহা আমার জানা আছে। আমি যে মুহূর্ত্তে তোমাকে তীরে নামাইয়া দিব, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি আমার পাকশালায় গিয়া হরিকেন লণ্ঠনটা লইয়া তাড়াতাড়ি সাগর-বেলায় ফিরিয়া আসিবে। উহারা দীর্ঘকাল আমাদের জন্য ওখানে প্রতীক্ষা করিবে না। প্রায় এক ঘণ্টা হইল অন্ধকার হইয়াছে; সুতরাং উহারা বোধ হয় এক ঘণ্টা ধরিয়াই আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে।"

আমি বাড়ী হইতে হরিকেন লণ্ঠন লইয়া সমুদ্রতটে ফিরিয়া আসিলাম। লণ্ঠনটা উর্দ্ধে তুলিয়া সাঙ্কেতিক আলোক দেখাইলে 'ইউ'-বোটের কাপ্তেন পিউজেল তাহার 'ইউ'-বোট হইতে তীরে আসিল।

আমি কাপ্তেন পিউজেলকে পূর্ব্বেও দেখিয়াছিলাম। লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান; কর্কশভাষী এবং অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় নাজী।

কাপ্তেন পিউজেল তীরে আসিয়া, আমসের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সক্রোধে বলিল, "তুমি কোথায়

গিয়াছিলে ক্রোবি! আমি এক ঘণ্টা ধরিয়া সাঙ্কেতিক আলোক দেখাইতেছি, কিন্তু তোমার সাড়া নাই!"

আমস্ বলিল, "উহা তোমার মিথ্যা কথা; সন্ধ্যার পর এখনও এক ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয় নাই। তুমি কি বলিতে চাও, সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্ব্বেই তোমার 'ইউ'-বোট জলের উপরে উঠিয়াছিল? আমি জানি, অন্ধকার গাঢ় না হইলে তোমাদের এখানে আসিবার নিয়ম নাই।"

কাপ্তেন বলিল, "তুমি ঐভাবে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিও না; আমি তোমার স্পর্দ্ধা ক্ষমা করিব না ক্রোবি!"

আমস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "স্পর্দ্ধা আবার কি? যাহা সত্য কথা তাহাই বলিয়াছি। সত্য কথা বলিতে ভয় পাইব, আমাকে সেরূপ কাপুরুষ মনে করিও না। আমি তোমাদের আশ্রয়দাতা, এবং তোমরা আমারই অনুগ্রহপ্রার্থী, এ কথা ভুলিও না।—আমি নিজের কোন কাজে একটু দূরে গিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদের অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছি; এখন হাতের কাজ শেষ করিয়া সরিয়া পড়। তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক করিবার স্পৃহা আমার নাই।"

আমসের মন ভাল নাই, এবং এ সময় তাহাকে চটাইয়াও লাভ নাই বুঝিয়া কাপ্তেন আর কোন কথা না বলিয়া বোটের সাহায্যে তৈলের গুদাম হইতে তৈল সংগ্রহ করিতে লাগিল।

কাপ্তেনের 'ইউ'-বোটে তৈলের পিপাগুলি উত্তোলিত হইলে কাপ্তেন আমাদের সঙ্গে আসিয়া আমসের পাকশালায় প্রবেশ করিল। আমস্ মেরীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, বড়-দেশ হইতে কোনও ব্যক্তি ফার্গসের সন্ধান লইতে আসে নাই। আমস্ এই সংবাদে নিশ্চিন্ত হইয়া অতিথিসৎকারে প্রবৃত্ত হইল। সে কাপ্তেন পিউজেলকে এক মগ মদ্য পান করিতে দিয়া অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে তাহার চেয়ারে বসিয়া পাইপ টানিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে আমস্ কাপ্তেন পিউজেলের চেয়ারের দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শোন কাপ্তেন, তোমাকে দুই একটি কথা বলিতে চাই। আজ আমি কোথায় গিয়াছিলাম, সে কথা তোমার নিকট প্রকাশ করা নানা কারণে আমি কর্ত্তব্য মনে করি।"

কাপ্তেন পিউজেল প্রস্তরনির্ম্মিত জার হইতে টিনের মগে আর খানিক মদ ঢালিয়া লইয়া বলিল, "বেশ ত, কি বলিবে বল। কিন্তু আমার সময় বড় অল্প, তোমার বেশী কথা শুনিতে পারিব না। আমাকে শীঘ্রই বোট লইয়া রওনা হইতে হইবে।"

আমস্ বলিল, "আমি সঙ্ক্ষেপেই সকল কথা শেষ করিতে পারিব। ইহা যে কেবল আমার নিজেরই কথা এরূপও নহে, এই ব্যাপারের সহিত আমার, তোমার, এবং প্রত্যেক 'ইউ'-বোটের কাপ্তেনেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।"

কাপ্তেন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "বটে! তবে ত আমাকে তাহা শুনিতেই হইবে।"

আমস্ কাপ্তেন পিউজেলের আরও নিকটে তাহার চেয়ারখানি সরাইয়া লইয়া-গিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "শোন পিউজেল, যদি আমি তোমাকে বলি, এখানে তোমরা 'ইউ'-বোটের তৈলাদি সংগ্রহের জন্য যে আড্ডা স্থাপন করিয়াছ—ইংরেজরা তাহার সন্ধান পাইবে এরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে,—তাহা হইলে সে কথা শুনিয়া তুমি কি করিবে?"

আমসের কথা শুনিয়া কাপ্তেন পিউজেল চমকিয়া উঠিয়া দুই এক মিনিট নির্ব্বাক্‌ভাবে বসিয়া রহিল; তাহার পর আমসের মুখের উপর প্রদীপ্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "তুমি কি বলিতে চাও, ঐরূপ বিপদের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে? কেহ কি তোমাকে সন্দেহ করিয়াছে?"

আমস্ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "না, আমাকে কেহ সন্দেহ করিয়াছে—এ কথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু তোমাদের 'ইউ'-বোটের এই আড্ডা যে সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে, ইহাও অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। একটি ব্যাপারে ইহার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে।"

কাপ্তেন্ পিউজেল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বটে! সেই ব্যাপারটি কি, আমি তাহা জানিতে চাই। তুমি আমাকে আর ধাঁধায় ফেলিয়া রাখিও না; ভণিতা রাখিয়া শীঘ্র সকল কথা খুলিয়া বল। ইহার উপর সমগ্র জার্ম্মাণ জাতির ভবিষ্যৎ সমর-নীতি নির্ভর করিতেছে।"

আমস্ বলিল, "এই অঞ্চলের একটি বুড়ী যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ না খুলিতেছে—ততক্ষণ তুমি, আমি, জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটের এই বিরাট প্রতিষ্ঠান নিরাপদ। কিন্তু আর কতদিন তাহার মুখ বন্ধ থাকিবে—তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য!"

কাপ্তেন পিউজেল নড়িয়া-চড়িয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না! তুমি হেঁয়ালীর ভাষা ত্যাগ করিয়া সরল ভাবে সকল কথা খুলিয়া বলিবে আমস্ ক্রোবি?"

আমস্ বলিল, "আমার কথা যে জটিল বা দুর্ব্বোধ্য—এরূপ মনে করিবার কারণ কি? আমার কথার মর্ম্ম অত্যন্ত সহজ। আমি বলিতেছি—তুমি যে মদ্যপান করিয়া এত খুসী হইয়াছ—এই মদ আমি অদূরবর্ত্তী স্কাই দ্বীপের কুটীরবাসিনী এক বৃদ্ধার নিকট হইতে কিনিয়া আনি; সে স্বয়ং ইহা সেখানে চোলাই করে। তুমি শুনিয়া শঙ্কিত হইবে যে, তোমরা এখানে কি করিতেছ—তাহা সেই বৃদ্ধার অজ্ঞাত নহে। জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটের পেট্রলের গুদাম-সংক্রান্ত সকল কথাই তাহার সুবিদিত!"

কাপ্তেন মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "তুমিই বুঝি মদের ঝোঁকে ঐ সকল কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছ?"

আমস্ বলিল, "আমি? আমি ত পাগল নহি যে, নিজের হাতে গলায় ছুরি দিব! ও সম্বন্ধে আমি কোন কথাই তাহাকে বলি নাই।"

কাপ্তেন অবিশ্বাসভরে বলিল, "তুমি তাহাকে না বলিলে এ কথা সে কিরূপে জানিতে পারিল?"

আমস্ বলিল, "সে কিরূপে জানিতে পারিল, তাহা আমি কিরূপে বলিব? কিন্তু যেরূপেই হউক, সে ইহা জানিতে পারিয়াছে, এবং সে জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই তাহার মুখ বন্ধ রাখিবার জন্য তাহাকে ক্রমাগত টাকা দিতে হইতেছে।"

কাপ্তেন বলিল, "ঘুস্?"

আমস্ বলিল, "ঘুস ভিন্ন আর কি? কথাটা সে কাশ করিবে, এই ভয় দেখাইয়া আমার নিকট যখন-খন টাকা আদায় করিতেছে। এইভাবে জার্ম্মাণ সরয়ের নৌ-বিভাগকে সাহায্য করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত ামি যত টাকা পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশই ঐ বুড়ীর টে গিয়াছে, তথাপি তাহার আশ মিটিতেছে না! কথাটা কাশ করিয়া দিবে বলিয়া আমাকে সর্ব্বদা ভয় দেখাইছে। দিবারাত্রি আমার মন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ; আমার াণে এক বিন্দু শান্তি নাই! যদি আমি কোন দিন তাহাকে টাকা দিতে না পারি, তাহা হইলে উপকূলের ইংরেজ প্রহরীর নিকট এ কথা সে প্রকাশ করিবে; এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কাপ্তেন বলিল, "অবস্থা যখন এইরূপ সঙ্কটজনক, তখন তুমি ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন কেন? আমি কখন উহাকে এভাবে প্রশ্রয় দিতাম না।"

আমস্ বলিল, "প্রশ্রয় দিতে না? তুমি কি করিতে, বল ত শুনি।"

কাপ্তেন বলিল, "ঐ রকম একটা দুর্ব্বল, অসহায় বৃদ্ধার মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে সরাইয়া-দেওয়া আমি আদৌ কঠিন মনে করিতাম না। এত দিন তাহাকে সাবাড় করিতাম।"

আমস্ তীব্রস্বরে বলিল, "তুমি তাহাকে হত্যা করিতে, এই কথা বলিতে চাহিতেছ? ও কথা আমিও ভাবিয়াছি; কিন্তু—" আমস্ কথাটা শেষ না করিয়া হঠাৎ নীরব হইল।

কাপ্তেন পিউজেল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কিন্তু আবার কি? 'কিন্তু' বলিয়া থামিলে কেন? অতি সহজ কাজ; ইহাতে চিন্তার কি কারণ থাকিতে পারে?"

আমস্ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আসল কথাটা কি জান? ঐ কাজ করিতে আমার সাহস হয় নাই; তাহা বুঝিতে পারিয়া বুড়ীটা আমাকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিতেছিল; বলিতেছিল, উহা পুরুষ মানুষের কাজ।"

কাপ্তেন সবিস্ময়ে বলিল, "তোমার সাহস হয় নাই! এ রকম সহজ কাজে সাহস না হইবার কারণ কি? তুমি যে এ রকম ভীরু, কাপুরুষ—তাহা আমার জানা ছিল না।"

আমস্কে ভীরু বলায় সে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল; উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়াছ; আমি ভীরু বা কাপুরুষ নহি। এই বুড়ীটা ডাইনী। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—যে ব্যক্তি ডাইনীকে হত্যা করে, তাহার জীবন অভিশপ্ত হয়, ইহলোকে এবং পরলোকেও তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না! আমার অভিশাপ-ভাজন হইবার ইচ্ছা নাই।"

কাপ্তেন অবিশ্বাসভরে হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "তোমার দেখিতেছি কুসংস্কারের অন্ত নাই! ইহা তোমাদের ইংরেজ-জাতেরই বৈশিষ্ট্য! একটা অসহায় দুর্ব্বল বৃদ্ধা—তুমি বলিতেছ সে তোমার কষ্টোপার্জ্জিত

সমস্ত অর্থ ধাপ্পা দিয়া আত্মসাৎ করিতেছে, অথচ এই উৎপীড়নের প্রতিকার করিবে, ততটুকু শক্তি তোমার নাই! তাহার অভিসম্পাতের ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছ! এই বীরত্বে নির্ভর করিয়া তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছ, এবং বলে ও কৌশলে আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে বলিয়া ঘরে-বাহিরে দম্ভপ্রকাশ করিতেছ! তোমার কথা শুনিয়া হাসি পাইতেছে ক্রোবি!"

কাপ্তেন পিউজেল এই সকল কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তুমি যে বিষয়ের উল্লেখ করিলে উহার আরও একটা দিক্ আছে আমস্ ক্রোবি! তোমাকে ভয় দেখাইয়া উৎকোচ আদায় করা অপেক্ষা তাহা অধিকতর সঙ্কটজনক। তুমি যাহা বলিলে তাহা হইতে বুঝিতে পারিলাম, এই বুড়ী পিশাচী যদি তোমার নিকট আশানুরূপ অর্থ না পাওয়ায় আমাদের এই গুপ্ত আড্ডার কথা শত্রুপক্ষের নিকট প্রকাশ করে, তাহা হইলে ইংরেজ ফৌজ হঠাৎ কোন দিন এই দ্বীপ আক্রমণ করিয়া সব লুঠ করিয়া যাইবে। তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, এবং আমাদের 'ইউ'-বোটের কার্য্য-পরিচালনও অসাধ্য হইবে। তাহার ফলে ইংরেজের ও নিরপেক্ষ জাতি সমূহের জাহাজ নির্ভয়ে সমুদ্রে সমুদ্রে বিচরণ করিবে। জার্ম্মাণীর ভবিষ্যতের আশা বিলুপ্ত হইবে। জার্ম্মাণীর এই ক্ষতি পরিপূরণের আশা নাই।"

আমস্ উৎসাহভরে বলিল, "হ্যাঁ, ও-কথা সম্পূর্ণ সত্য; এ অবস্থায় তুমি কি করিতে চাও? আমি ত সকল অসুবিধার কথাই তোমার নিকট প্রকাশ করিয়াছি। এখন ইহার সকল দায়িত্ব তোমাদের।"

কাপ্তেন পিউজেল টেবিলের উপর সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া আবেগভরে বলিল, "হাঁ, ইহার সকল দায়িত্ব আমাদের। তুমি কি আশা করিতেছ, আমাদের ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে আমি সকল কথা জানিয়াও এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া, এবং ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না করিয়া—এখান হইতে প্রস্থান করিব? না, আমার সহযোগিগণকে ভবিষ্যতে এখানে আসিয়া বিপন্ন হইতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া—এই বুদ্ধার কণ্ঠ চির-নীরব না করিয়া আমি এই স্থান ত্যাগ করিব না।"

আমস্ আশ্বস্তচিত্তে বলিল, "এই কাজ তুমি কিরূপে সম্পন্ন করিবে? তোমার অভিপ্রায় কি?"

কাপ্তেন বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া সগর্ব্বে বলিল, "আমার অভিপ্রায় কি, তাহা তুমি শীঘ্রই জানিতে পারিবে। আমি আজ রাত্রেই এরূপ ব্যবস্থা করিব যে, সেই স্ত্রীলোকটা ভবিষ্যতে আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারে। আজ রাত্রেই তাহার কণ্ঠ চির-নীরব হইবে। তোমরা ইংরেজরা কোন দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কেবল চিন্তা কর, সেই সুযোগে আমরা সবেগে কার্য্যক্ষেত্রে লাফাইয়া-পড়িয়া কার্য্যোদ্ধার করি। সোভিয়েট সরকারের ন্যায় মহাশত্রুর সহিত হঠাৎ আমরা চুক্তি করিয়া ফেলিব, ইহা কি তোমরা কোন দিন আশা করিয়াছিলে? আমরা যখন অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রাধান্য স্থাপন করিলাম, তখন তোমরা দূরে দাঁড়াইয়া কেবল তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলে! আমরা যখন কাজ করি, তখন তোমরা বক্তৃতা কর; আমাদের প্রতি দস্যুবৃত্তির আরোপ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ কর। কিন্তু 'বলং বলং বাহুবলং' এ কথা তোমাদের স্মরণ থাকা উচিত। আমি কি ভাবে এখানে কাজ শেষ করি, তাহা আজ রাত্রেই জানিতে পারিবে।"

আমস্ বলিল, "জটিল সমস্যা বটে, তোমাদের লেফ্‌টেনাণ্ট হাগেন আমার আশ্রয়ে বাস করিয়া, একজন নিরপরাধ ইংরেজকে হত্যা করিয়া রাতারাতি 'ইউ'-বোটে উঠিয়া পলায়ন করিল; তাহার অপকর্ম্মের জের আমাকেই সামলাইতে হইতেছে! আবার তুমি ঐ ডাইনী বুড়ীকে হত্যা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিবে; কিন্তু এই সকল অপকার্য্যের পরিণাম কি, তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? আমি কিন্তু গভীর রহস্যান্ধকারে বিন্দুমাত্র আলো দেখিতে পাইতেছি না। এই প্রকার জবরদস্তির সাহায্যে সত্য কত দিন গোপন থাকিবে?"

কাপ্তেন কোন উত্তর না দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
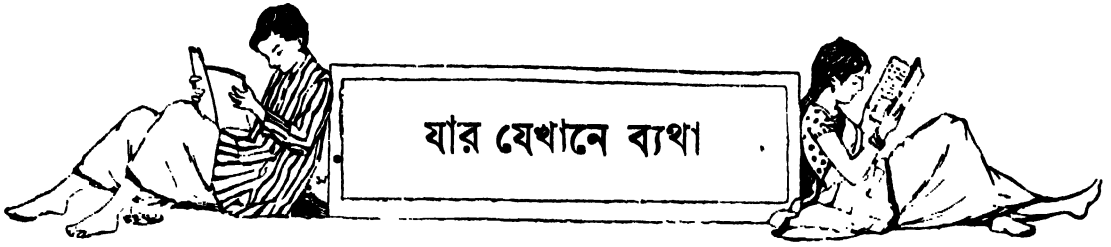
যার যেখানে ব্যথা

মালতী তার স্বামীকে চিঠি লিখিতেছিল। না লিখিয়া উপায় নাই; চিঠি না পাইলে বাবুর ভারী রাগ হয়। অথচ চিঠি লিখিবার তার কত যে অসুবিধা এখানে, তা সে হয় তা বোঝে না। কাগজ, দোয়াত, কলম—এ সব সরঞ্জাম কোথায় যে থাকে, তা' খুঁজিয়া পাওয়াই ভার। নানা প্রলোভনে ছোট ভাইটিকে বশীভূত করিয়া তবে লিখিবার সরঞ্জামগুলির জোগাড় হইয়াছে।

কিন্তু কয়েক লাইন লিখিবার পর আর চিঠির খোরাক খুঁজিয়া মেলে না; অথচ চিঠি নিতান্ত ছোট হইলেও বাবুর মন ওঠে না! অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া মালতী লিখিল:—

"এ জায়গাটা মন্দ নয়। চারিদিক ফাঁকা। এত ফাঁকা জায়গা আমার ভাল লাগে না কিন্তু। ও-পাশে শুধু একখানা একতলা বাড়ী। আমাদের দোতলার ঘর থেকে তার ভেতরের অনেকটা দেখা যায়। শুনলুম, ও-বাড়ীর বৌটি গেছে বাপের বাড়ী, শীগ্গির আসবে। সে এলে কিন্তু আমি খুব খুশী হবো। গল্প করবার লোকের তখন আর অভাব হবে না।

বাক্সের ভিতর হইতে সে ঠিকানা-লেখা খামখানি বাহির করিল; তাহাতে চিঠিটা পুরিয়া মোড়ক আঁটিয়া চাইকে তাহা ডাক-বাক্সে ফেলিতে পাঠাইল। তার পর বারদালানের এক পাশে যেখানে বৃদ্ধা ঠাকুরমা (তাহার বাপের পিসীমা) একরাশ তেঁতুল ঢালিয়া বীজ কাটিতেছিলেন, সেইখানে সে আসিয়া বসিল।

—আমি তেঁতুল কাটবো, ঠাকুমা!

—বরকে চিঠি লেখা শেষ হ'লো রে?

—ধ্যেৎ! কে বললে আমি চিঠি লিখছিলুম?

—চিঠি লিখে আবার মিছে কথা বলছিস্ কেন ভাই? আজকালকার মেয়েদের চিঠি নইলে কি প্রেম করা হয় রে?

মালতী একখানা বঁটি টানিয়া-লইয়া হাসিয়া বলিল,—তা, তোমাদের বয়স-কালে ও-বিদ্যে ত কেউ জানতো না ঠাকুমা!

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন—সেদিন ও-বাড়ীর বাবুটির একখানা চিঠি ভুল ক'রে পিওন আমাদের বাড়ীতে দিয়ে গিয়েছিল। আমি চিঠি দেখেই বুঝতে পারলুম—গিন্নী ও-চিঠি লিখেছেন বাবুকে বাপের-বাড়ী থেকে।

মালতী হাসিমুখেই বলিল,—তোমার বুঝি খুব ইচ্ছে হচ্ছিল—সেটা খুলে পড়বার?

—তা ভাই, পড়তে জানলে কি আর না পড়তুম?

মালতী বলিল,—বৌটা এলে কিন্তু আমি বাঁচি! বাবা বেছে বেছে এমন জায়গায় বাড়ী করলেন যে, কারো সঙ্গে একটা কথা কইবার যো নেই! আচ্ছা, ও-বাড়ীটা ওরা দোতলা করলে না কেন ঠাকুমা?

—ও-বাড়ী ওদের নিজেদের না কি যে, দোতলা করবে? দোতলা করা অমনি মুখের কথা কি না?

—বৌটা তোমাদের সঙ্গে কথা কয়?

—ও মাগো! ও-সব হচ্ছে ফেসিয়ান্ সুন্দরী মেয়ে যে গো, আমাদের সঙ্গে কথা কইবে কি?

—ও খুব সুন্দরী বুঝি?

—তা, রঙটা কটা বৈ কি! হ্যাঁ, খুবই কটা। যাকে তোমরা বল ফর্সা। মুখ-চোখও মন্দ নয়। তার ওপর শুনলুম আবার হারমণি বাজিয়ে গান গায়; যেন চুড়োর ওপর ময়ূরপাখা! আমরা হলুম বুড়ো-হাবড়া সেকেলে মনিষ্যি। তুই এসেছিস্ তোর সঙ্গে যদি কথা টথা কয়।

মালতী একমনে তেঁতুলের বীজ কাটিয়া তেঁতুলগুলা ঝুঁড়িতে রাখিতে লাগিল। ঠাকুরমার মন্তব্য শুনিয়া কোন কথা বলিল না।

উত্তরে মালতীর স্বামী লিখিয়াছে—"সেখানে তোমার একটি সঙ্গী খুঁজে পেয়েছ জেনে খুব খুশী হলুম। এতদিনে বোধ হয় তার সঙ্গে তোমার রীতিমত আলাপ জমে গেছে। গল্প পেলে তোমার খাবার কথাই মনে থাকে না। তার

সঙ্গে আলাপে মস্‌গুল হ'লে, ভয় হয়, পাছে আমাকেও একেবারে ভুলে যাও।"

মুখের একটা ভঙ্গি করিয়া নিজের মনে মালতী বলিল, —ঢঙ্‌।...

চিঠিতে লিখিল,—"আমার যেমন বরাত! বৌটার কথা যা শুন্‌লুম, তাতে ওর সঙ্গে ভাব করবার সখ আমার আর নেই। মাঁগো! যা দেমাক্‌ তার! বড়লোকই না হয় হ'লো, তা তার জন্যে এতো গুমোর মানুষের যে কি ক'রে হয়, তা তো আমি বুঝ্‌তে পারিনে!"

শেষের কয়টা ছত্র লিখিতে গিয়া মালতীকে আবার একখানা কাগজ খরচ করিতে হইল। প্রথমে লিখিয়াছিল বৌটি অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু ও-কথাটা লিখিবার পর মনের কোন্‌খানে কি যেন একটা খোঁচা খচ-খচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। নিজে যে সে কালো, এটা যতই স্বীকার করিবার ইচ্ছা থাক্‌, অস্বীকার করিবার যো নাই যে একেবারেই। কিন্তু নিজে হইতে স্বামীর কাছে ও-প্রসঙ্গটা তুলিবার দরকারই বা কি? যে ব্যাপারে নিজের গলদ, সেটাকে পাশ-কাটাইয়া যাওয়াই বরং সব দিক্‌ দিয়া ভালো; সুতরাং মালতী প্যাড হইতে লেখা কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অন্য একখানা কাগজে আগাগোড়া চিঠিখানা নূতন করিয়া লিখিয়া ফেলিল।

বউটি কয় দিন হইল বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছে। সে-দিন গাড়ীটা যখন ওদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, মালতী তখন কূয়াতলায় বসিয়া কাপড় কাচিতেছিল। ভিজা কাপড়েই ছুটিতে ছুটিতে সে একেবারে উপরের ঘরে গিয়া জানালা হইতে উঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বৌটি কখন যে গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর উঠান পার হইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছিল, তাহা জানিতে না পারায় মালতী অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

নীচে হইতে মা বিরক্তিভরে বলিলেন,—মেয়ে দিন দিন যে কি রকম ধিঙ্গিই হচ্ছে! তাহার পর ধমকের সুরে ডাকিলেন—বলি হ্যাঁ রে, ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছিস্‌, অসুখ করবে না?

আবার নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে মালতী বলিল,—বাবা রে বাবা, তোমরা একটুতেই এমনি কর! পান থেকে চুণটুকু খস্‌লে আর রক্ষে নেই!

ঠাকুরমা বলিলেন,—তা, আমাদেরই যে দোষ হবে ভাই! অসুখ-বিসুখ করলে নাত-জামাই ভাববে, আমরাই সব কুপথ্যি করিয়ে—

মালতী রাগ করিয়া বলিল,—হ্যাঁ গো, অসুখ অমনি করলেই হোলো আর কি!

কিন্তু বাকী যে কথাটা ঠাকুরমা বলিলেন, সেটা নিজের মনে মালতীরও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। যে রাগী এবং মুখফোড় মানুষ—তাহার পক্ষে সবই সম্ভব। তাহার রাগকে মালতীর বড় ভয়!

মাঝে মাঝে ও-বাড়ীর বৌটির গলার আওয়াজ শোনা যায়। তাহার কণ্ঠস্বর বেশ মিহি; কিন্তু মানুষটি একবারও চোখে পড়ে না! সময়ে সময়ে মালতী উপরের ঘরের জানালার ধারে তার উল্‌-বোনার সরঞ্জামগুলি লইয়া বসিয়া যায়, কিন্তু ও-বাড়ীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে গিয়া বোনার ঘর সব ওলট-পালট হইয়া যায়; আবার বোনার দিকে বেশী নজর দিতে গিয়া মনে হয়, বৌটা হয় তো এইমাত্র বাহিরে আসিয়া আবার ভিতরে চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ এই ভাবে বসিয়া-থাকিয়া তাহার মনে হয়, এমন করিয়া বসিয়া বসিয়া পাহারা দেওয়াটা হয় তো উচিত হইতেছে না। উহারা বুঝিতে পারিলে কি মনে করিবে? তার পর সে আস্তে আস্তে জানালার কবাট প্রায় বন্ধ করিয়া, সামান্য একটু ফাঁক রাখিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু আবার নিজের মনের কাছেই সে যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে; রাগও হয়! কি এমন গরজ তার, এ ভাবে লুকাইয়া এই প্রতিবেশিনী-টিকে দেখিবার? তার রূপ আছে, বেশ; সে রূপ লইয়া তার ঘরেরই শোভা বৃদ্ধি করুক, ইচ্ছা হয় রূপের গর্ব্ব করুক; তার জন্যে মালতীর মাথাব্যথা করিবার কি প্রয়োজন? কেন তার এই ব্যাকুলতা?

কিন্তু সংসারে সব 'কেন'র উত্তর খুঁজিয়া-পাওয়া দুষ্কর। মালতী আবার বৌটিকে দেখিবার জন্য উস্‌খুস্‌ করে, এবং দেখা না পাওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত নিজের উপর বিরক্ত হয় ও রাগ করে!

সাম্‌নেই তাদেরই বাড়ীর সামিল খানিকটা পতিত জমি। সেখানে দুই চারিটা অযত্ন-জাত বাজে গাছ। ঝাঁকড়া আমগাছটা এবার মুকুলে ছাইয়া গিয়াছে। তারই

সুমিষ্ট গন্ধ পড়ন্ত-বেলার ঠাণ্ডা বাতাসে মিশিয়া চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। গোটা শিমুল গাছটা ফুলে-ফুলে একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে। কাদের একটা চাকর ফুটফুটে একটি ছোট ছেলেকে কোলে লইয়া মাটী হইতে একটা শিমুল ফুল কুড়াইয়া খোকার মুখের কাছে ধরিয়া তাহাকে খেলা দিতেছিল। দিব্যি ফুটফুটে, গোলগাল ছেলেটি! কাদের ছেলে কে জানে!

মালতী চাকরটাকে ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ বাড়ীতে সে কাজ করে?

ও! মালতী যা ভাবিয়াছিল, তাই! পাশের বাড়ীর বৌটিরই ঐ ছেলে। সত্যিই ভারী সুন্দর! না হইবেই বা কেন? ওদের সবারই যখন এমন রূপ!

...এই খোকার মতই হয় তো ওর মায়ের মুখ আর গায়ের রঙ। সুতরাং অহঙ্কার একটু কেনই বা তার না হইবে?

ইচ্ছা হইলেও কিন্তু মালতী চাকরটাকে ডাকিয়া খোকাকে কোলে লইতে পারিল না। বৌটা যদি জানিতে পারে, হয় তো ভাবিবে...কত কি হয় তো ভাবিতে পারে। কি দরকার পরের ছেলে কোলে করিবার?

অকারণেই যেন মনের কোন্‌খানে খানিকটা ব্যথা জমিয়া ওঠে। তাহারও তো একটি খোকা হইতে পারিত, কিন্তু হইল না। আর—আর তাহার ছেলে হইলে সে নিশ্চয়ই তাহার মতই ত কালো হইত। সেই কালো ছেলেকে কেমন করিয়া সে পাঁচ জনের সম্মুখে বাহির করিত? বিশেষতঃ, ও-বাড়ীর বৌটার ছেলের কাছে তাহার কালো ছেলেকে সে কেমন করিয়া দাঁড় করাইত? নাঃ, ছেলে না হইয়াছে সে সব দিক্ দিয়া ভালোই হইয়াছে। যে কালো, সংসারের পথ তাহার পক্ষে বড়ই দুর্গম!

নানা রকমের এলোমেলো চিন্তা মালতীকে পীড়ন করিতে থাকে। এমনও মনে হয়, এ-রকম যদি কোন ওষুধ বা মন্ত্র থাকিত, যাহার সাহায্যে কালো মানুষ ফর্সা হইতে পারে, তাহা হইলে মালতী একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত। আর, এই সুসংবাদ পাইলে স্বামী তার নিশ্চিতই পরম আগ্রহে তাহার সমর্থন করিত। পুরুষ মানুষ যে যাহাই বলুক, ফর্সা রঙের বিশেষ পক্ষপাতী। না হইবেই বা কেন? নিতান্ত নিরুপায় না হইলে সে কখনো কালোকে সহ্য করিতে পারে না। সত্যই, মালতী সে জন্য স্বামীকে যেমন শ্রদ্ধা করে, তেম্‌নি স্বামীর প্রতি করুণাও তার কম নয়!

পরের দিন স্বামীকে চিঠি লিখিতে বসিয়া মালতী লিখিতে লাগিল,—

"কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি, যেন আমি মরে' গেছি। তুমি আমার জন্যে খুব কাঁদছো। তার পর কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে গেছ। ভুলে গিয়েই আবার বিয়ে ক'রে এনেছ একটি টুকটুকে সুন্দরী মেয়েকে। তার পর তোমার একটি খোকা হ'য়েছে—ফুটফুটে অতি সুশ্রী একটি ছেলে।..."

চিঠি পড়িয়া তার নিজেরই ভারী মজা লাগিল! স্বপ্ন না-হয় সে সত্যই দেখে নাই; কিন্তু কি আশ্চর্য্যভাবে তার মনের কথাগুলি সে চিঠিতে লিখিয়া ফেলিয়াছে! চিঠি পড়িয়া স্বামী হয় তো রাগ করিবে! করুক! তাহাকে রাগাইয়া মালতী খুব আমোদ পায়।

হঠাৎ সে দিন দেখা গেল ও-বাড়ীর সেই বৌটিকে। ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিয়া নয়, অত্যন্ত সহজ ভাবে অল্পক্ষণের জন্য দেখা। উপরের ঘরের বিছানা পাতিয়া জানালাগুলি বন্ধ করিতে গিয়া অন্যমনস্কভাবে ও-বাড়ীর উঠানে চোখ পড়িয়া গেল। বৌটি তখন একখানা শুকনো কাপড় কুচাইয়া তুলিতেছিল। মুখখানি তার অতি অল্পই নজরে পড়িল। রঙ ফর্সাই তো, বেশ ফর্সা! তার উপর আবার পরণে কি সুন্দর একখানি সাড়ী! সাড়ীর যেমন রঙ, তেমনি জল্‌জলে পাড়। এত সুন্দর সাড়ী মালতীর একখানিও আছে কি? বোধ হয় নাই।

মাকে সে বলিল, ও-বাড়ীর বৌটি এম্‌নি সুন্দর একখানি সাড়ী পরেছে আজ দেখলুম। তেমন ধারা সাড়ী কোন দিন আমাকে দাও তোমরা! এদিকে বলো—এতো দাম, ততো দাম; অথচ সেই সব দামী কাপড়ের ছিরি দেখে অঙ্গ হিম হয়ে যায় আর কি!

মা হাসিয়া বলিলেন,--কি জানি বাপু, আমরা কি ছাই অত-শত দেখতে পাই? এতো বলি, ভালো কাপড় আন্‌তে! এবার সুবোধ এলে তাকেই আমি টাকা দোব, তুই বাছা তোর পছন্দমত সাড়ী আনিয়ে নিস্।

—ছাই, সে-ই যেন এনে দেবে! যেমন বাবার পছন্দ, তেমনি ওর! বৌটার সঙ্গে ভাব হ'লে ওকে দিয়েই আনিয়ে নিতুম। তা বাবা, ওর যা গিদের! তা হবে না কেন বল মা? যে রকম ভাল ভাল কাপড়-জামা পরে, নিশ্চয় অনেক টাকা ওদের। ছেলের জন্যে একটা চাকরও রেখেছে।

মা বলেন,—তা হবে। ওরা সহরে মেয়ে। টাকা-কড়ি বেশ আছে বৈ কি! আমাদের মত তো আর ধান, আলু, আর গুড়—এই সব নেড়ে-চেড়ে ওদের খেতে হয় না?

বৌটির সম্বন্ধে মালতীর শ্রদ্ধা দিন দিন বেশ বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু সে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা দূরে থাক, ক্রমশঃই যেন তফাতে সরাইয়া লইয়া যায়! ঠাকুরমা বলিয়াছিলেন, 'আবার হারমণি বাজিয়ে গান গায়।' অনেক দিন পরে সে-দিন তাহাও শোনা গেল।

বাসন্তী পূর্ণিমার চাঁদ নবমীতে পৌঁছিয়াছে। ওদের বাড়ীর সদর দরজার পাশেই একটা হাস্‌না-হেনার ঝোপ, সেখান হইতে একটা ঘন সুগন্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নার সহিত এমন ভাবে মিশিয়া গেছে, যেন জ্যোৎস্না আর সুগন্ধকে তফাৎ করিবার একেবারেই যো নাই। সেই সুরভিত জ্যোৎস্নাকে ঝঙ্কারিত করিয়া শোনা গেল তার গান—

"ফাগুন্ যে-দিন আস্‌তো দখিণ বায়ে,
সে-দিন কিশলয়ের মেলায়,
কতই খেলা কিশোর-বেলায়
ছিল কোয়েল-ডাকা পিয়াল-বনছায়ে।"

মালতী একেবারে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। কি সুন্দর মিষ্ট গলা! গানের উপর মালতীর ভারী ঝোঁক। গুন্ গুন্ করিয়া সে দুই একটা গানের কলি গাহিতেও পারে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! বৌটা যেন সকল দিক্ দিয়াই—সত্যই যাহাকে বলে, 'রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী!' আর, তাহার না আছে রূপ, না আছে গুণ! পাড়াগাঁয়েই বিবাহ হইয়াছে। স্বামী লেখা-পড়া জানেন ভালই; কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শুনা করেন গ্রামে বসিয়াই। নিজে গান শুনিতে ভালবাসেন। কিন্তু বৌকে গান শিখাইবেন, এ ইচ্ছা বোধ হয় স্বপ্নেও কোন দিন তাঁর মনে স্থান পায় নাই।

মালতী মনে মনে ভাবিল, জীবনটা শুধু ওদের জন্যই, অর্থাৎ যাহারা দু-মুঠা ভরিয়া পাইয়াছে এ জীবনে যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষার বস্তু। কিন্তু মালতীর মত মেয়ের কি যে সার্থকতা বাঁচিয়া থাকিবার!

বৌটি গায়িতেছিল,—

"পলাশ লাজে হাস্‌তো পাশে,
কাঁপ্‌তো বেণু বঁধুর ত্রাসে,
হরষ ভরে ঝর্‌তো শিরীষ
ত্রস্ত দুটি পায়ে।"

তন্ময়তার মাঝখান দিয়া মালতীর চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে একটা চিত্র। তাদের গ্রামের বাড়ীর সংলগ্ন বাগানটিতে এমনি জ্যোৎস্নার বন্যা বহিত। এমন দিনে সাম্‌নের কৃষ্ণচূড়া গাছটা ফুলে-ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। তাহারই নীচে দিয়া একটি সরু পায়ে-চলা পথ ঘাসের বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেছে একবারে সেই বাঁধা-ঘাট পর্য্যন্ত। ঘাটের দুই পাশে দুটি কামিনী ফুলের গাছ। কখনো সেই কামিনীর, কখনো কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পিত পল্লব ছিঁড়িয়া তার স্বামী তার খোঁপায় গুঁজিয়া দিতে আসিত। মালতী বলিত, আমি নাকি সাঁওতালনি গো, যে মাথায় ঐ সব গুঁজ্‌তে যাবো?—সে ছুটিয়া পলাইত, এবং শেষ পর্য্যন্ত ধরা-পড়িয়া স্বামীর বাহুবন্ধনের মাঝখানে হাঁপাইয়া এলাইয়া পড়িত। বাড়ীর সকলে যখন ঘুমাইত, এমনি কত রাত্রি চলিয়াছে তাদের জীবনের বসন্ত-উৎসব। দু'জনে বাঁধা-ঘাটে বসিয়া নীলাভ আকাশব্যাপী শুভ্র জ্যোৎস্নার বিপুল রজত প্লাবনের পানে চাহিয়া থাকিত।

স্বামী বলিত,—এই রকম জ্যোৎস্নার মাঝখানে বসে' আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয়—এ ঠিক যেন কোন্ মায়াপুরীর রাজকন্যা—ঘুমিয়ে আছে কার রূপোর কাঠির মৃদুস্পর্শে।

মালতী হাসিয়া বলিত,—আর তুমি যেন সেই রাজ-পুত্তুর, যে তার ঘুম ভাঙাবে সোণার কাঠি ছুঁইয়ে।

.....গানের সুরটা যেন কেমন জড়াইয়া-জড়াইয়া কাণে আসিয়া লাগিতেছে। মালতীর দু'টি চোখের পাতা যেন তন্দ্রায় ভারী হইয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে, যে গান গায়িতেছে, সে সেই মায়াপুরীর রাজকন্যা ছাড়া আর কেউ নয়!

মালতীর পক্ষে কিন্তু ইহা একেবারে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। মনে-মনে সে তাই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে, নিজেই যাচিয়া-গিয়া এক দিন বৌটির সঙ্গে আলাপ করিবে, তাতে অপমান যা-ই কিছু তার হোক্ না কেন!

মাকে বলিল,—বৌটা তো কৈ এলো-না একবারও আমাদের বাড়ীতে?

মা বলিলেন,—ও মা গো! ওরা বড়লোকের মেয়ে আমাদের বাড়ীতে আস্‌বে কেন? তোর যে আর ঘুম হচ্ছে না ঐ ভেবে!

—সত্যিই ঘুম হচ্ছে না। তোমাদের যেমন, সারা-সহরে বাড়ী করবার আর জায়গা পেলে না! এমন এক-জন নেই যে, দু'দণ্ড বসে' গল্প করি। সহরে বাড়ী কর্‌লে, তা বাপু এমন জায়গায় কর়ো, যেখানে পাঁচ জন মানুষ বাস করে।

মা হাসিয়া বলিলেন, এখানটা যে একেবারে বন ছিল রে, এই সবে নতুন বাড়ী হচ্ছে। পাঁচ বছর বাদে দেখ্‌বি, চার ধারে লোক গিস্‌-গিস্‌ কর়বে!

—হ্যাঁ গো! এখন যে কি করে' দিন কাটে তার ঠিক নেই, তা আবার পাঁচ বচ্ছর পরে! তার চেয়ে যা মনে করে করুক্ গে, আমি চল্‌লুম ওদের বাড়ীতে। আলাপ কর্‌বো তার আবার কি? বাঘ তো নয়, যে খেয়ে ফেল্‌বে।

মালতী উপরে আসিয়া একখানা ভাল জরিপাড় সাড়ী ও একটা রঙীন সিল্কের ব্লাউজ পরিল। আয়নাতে মুখখানি ভাল করিয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিয়া খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বাক্স হইতে পাউডার ও স্নো বাহির করিল।

সত্যই, মুখের রঙটা অনেকখানি ফিকে দেখাইতেছে বৈ কি! মনে মনে খুশী হইয়া একটু হাসিল।

সিঁড়িতে নামিতে গিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা। মা বলিলেন,—ও-মা, যা ভেবেছি, ঠিক তাই! এম্‌নি ভূতের মতো ন্যাড়া হ'য়ে যায় বুঝি? গয়নাগাটীগুলো বুঝি বাক্সর ভরে' রাখ্‌বার জন্যেই তৈয়েরী হয়েছে? চল্, দেখি।—বলিয়া তিনি মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন আবার ঘরের ভিতর।...

মিনিট দশেক পরে মালতী ও-বাড়ীর সদর দরজায় আসিয়া শিকল নাড়িল। শিকল ঝন্‌-ঝন্ করিল; সঙ্গে সঙ্গে দুড়্‌-দুড়্ করিয়া উঠিল মালতীর বুকের ভিতরটায়। অথচ, কেন যে, তাহার কোন কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না।

বৌটি দরজা খুলিয়া-দিয়াই প্রথমটা একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তার পর রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল,—আসুন, আসুন! আপনি এসেছেন? আমি ভাবলুম বুঝি—

মালতী বলিল,—ঘুমুচ্ছিলেন বুঝি? আমি এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম—

বৌটি হাসিয়া বলিল,—ঘুমুবার জ্বালা! এই তো এতক্ষণে দস্যি ছেলেটা ঘুমুলো।

মালতী লক্ষ্য করিল, একখানি পেঁয়াজী-রঙের ফুল-তোলা ছাপা সাড়ী তার পরণে, গায়ে ঐ রঙেরই একটি ব্লাউজ আছে বটে, কিন্তু কাপড়খানা এমন করিয়া জড়াইয়া পরিয়াছে যে, ব্লাউজের খুব সামান্যই নজরে পড়ে মাত্র।

তক্তপোষের উপর একখানি সিঙ্গাপুরী মাদুর পাতা, তাহারই উপর দু'জনে বসিল। মালতী এক একবার তার মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, তার পর তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরাইয়া লইয়া যা-হোক্ একটা কথা পাড়ে। বৌটি সে প্রসঙ্গের খুব অল্পই জবাব দেয়, কোন রকমে দুই চারিটা কথা বলিয়া যেন কর্ত্তব্য শেষ করে। প্রাণ খুলিয়া সে যে মালতীর সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেছে না, এটুকু মালতী বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। থাকিয়া-থাকিয়া সে যেন একেবারে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। যেন এমনিভাবে দু'জনে বসিয়া গল্প করিবার অন্তরালে তাহার কোথায় রীতিমত একটা অসুবিধা রহিয়াছে, অথচ সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিবারও নহে।

মালতী একবার বলিয়া ফেলিল,—তোমায় কিন্তু ভারী অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আমি এসে হয় তো অসুবিধে কর্‌লুম তোমার—

—না না, ও কি বল্‌ছেন আপনি! আমার আবার অসুবিধে কি?

মালতী বলিল,—কিন্তু বেলাও তো শেষ হ'য়ে এলো! এখনো হয় তো অনেক কাজই বাকী পড়ে আছে।

—কাজ? তা, কাজ তো এখনো সবই বাকী ভাই! কাজের কি শেষ আছে?—বলিয়া সে একটুখানি ম্লান

হাসি হাসিল। পরক্ষণেই তাড়াতাড়ি বলিল,—তা, কাজ রোজই আছে, কিন্তু রোজই তো আপনাকে পাবো না!

—তা পাবে না, যত দিন না আমাদের বাড়ীতে তুমি এক দিন যাচ্ছো। কবে যাবে বল।

—কবে যাবো? যাবো বৈ কি! যে-কোনো দিন গেলেই তো হোল! এত কাছে যখন বাড়ী—

—হ্যাঁ, যেও কিন্তু। তুমি গেলে তবে কিন্তু আমি আবার আস্‌বো। এই বলে রাখ্‌ছি।

সেদিন মালতী বাড়ী ফিরিল মনের ভিতর অনেকখানি প্রফুল্লতা লইয়া। বৌটি শীঘ্রই আসিবে বলিয়াছে। মালতীর পক্ষে সে একটা শুভদিন!

মালতী কথায়-কথায় তার নামটিও জানিয়া লইয়াছে। চমৎকার নাম, চিত্রা! যে ভালো, তার সবই ভালো; আর তার নিজের নামটাও কি ভালো হইতে নাই? বাগ্দীদের যে বুড়ীটা তার শ্বশুরবাড়ীতে ধান ভানিতে আসে, তাহার নামও মালতী! কি বিশ্রী নাম!

হ্যাঁ, চিত্রা সত্যই সুন্দরী। কিন্তু নিতান্ত যেন গো-বেচারা-গোছের। কলিকাতার মেয়ে বলিয়া যেন মনেই হয় না। তাহার এমনি ভয় হইয়াছিল, না-জানি কত-না লম্বা-লম্বা কথা বলিবে; মালতীকে হয় তো থ হইয়া থাকিতে হইবে! কিন্তু কথা বরং মালতীই বেশী বলিয়াছে। সে যেন বড় বেশী জড়সড়; গায়ের কাপড়টুকু কেমন যেন একটু বিশেষ সাবধানে দেহের চারিদিকে টানিয়া দিয়া বসিয়া ছিল। কেন, কে জানে! একটা কথা মালতীর মনে হইল। —হয় তো তাহাই।

মালতী নিজের মনে না হাসিয়া পারে না। চিত্রার খোকা এই সবে মাস-ছয়ের হইয়াছে। তা, এমন তো কত জনেরই হয়। তার মেজ-জায়েরও তো ঠিক এম্‌নিই। এতে আর অত লজ্জা করিবার কি আছে? পাগল আর কাহাকে বলে! দাঁড়াও না, এবার দেখা হইলে মালতী এম্‌নি মজা করিবে!

রোজই মালতী মনে করে, আজ সে আসিবে, এবং তার উপরের ঘরখানিতে তার জন্য বেশ একটু গোছগাছ করে। একখানা ভাল সাড়ী পরিয়া সারা দুপুরটা প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। কিন্তু বেলা পড়িয়া যায়, সে আর আসে না। এক-একবার উপরের ঘরের জানালায় গিয়া দাঁড়ায়, ও-বাড়ীর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে কিন্তু কাহারও দেখা মেলে না। মালতী বিরক্ত হইয়া সরিয়া যায়।

নাঃ, বৌটা রীতিমত গর্ব্বিতা। অহঙ্কার ছাড়া এ আর কিছুই নয়। একটা সাধারণ ভদ্রতাও কি নাই? অথচ মুখে বলে সহরের মেয়ে! এর চেয়ে পাড়াগাঁই তো হাজার গুণে ভালো!

কয় দিন হইল, মালতী ও-বাড়ীর দিকের জানালাগুলো পর্য্যন্ত একবারও খোলে নাই, পাছে ও-বাড়ীর দিকে তাকাইতে-গিয়া বৌটার সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া যায়। ও-দিকে যে একটা বাড়ী আছে, এবং সেখানে কোন লোক বাস করে, সেটুকু পর্য্যন্ত ভুলিবার চেষ্টায় সে একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

কয় দিন হইয়া গেল, স্বামীর চিঠির কোন জবাব দেওয়া হয় নাই। রাত্রে সে লিখিতে বসিল। অন্যান্য কথার পর লিখিল,—

"এখানে আমার একদম্ ভাল লাগে না। বাবা যে কেন সখ্ ক'রে গ্রামের বাড়ী ছেড়ে এখানে বাড়ী কর্‌তে এলেন, আমি তা একেবারেই বুঝ্‌তে পারিনে। তোমাকে মাঝে মাঝে সহরে যাবার কথা বলি, কিন্তু সে সখ মিটেছে আমার। সহরে কোনো সুখ নেই। তার চেয়ে ওখানে আমাদের ঢের ভালো। হালদার-বাড়ীর গঙ্গাজল বোধ হয় এত দিনে ফিরে এসেছে? বৈঠকখানা-বাড়ীর বাতাবী-লেবুর গাছটাতে খুব ফুল ধরেছে তো? লিচু গাছটাতে এবার কি রকম লিচু ধরেছে লিখ্‌তে ভুলো না; সত্যি লিখো। তুমি হয় তো হাস্‌বে, কিন্তু সত্যিই আমার সেখানকার জন্যে মন কেমন করছে।"

স্ত্রীর এ-চিঠির সুবোধ আর কোন উত্তর দিল না। ঠিক করিল, সশরীরে সেখানে আবির্ভূত হইয়া একেবারে সোর-গোল তুলিয়া দিবে।

তাহার শ্বশুরের গ্রামের বাড়ীতে সে কয়েকবার গিয়াছে, কিন্তু সহরের এই নূতন বাড়ীতে আজ পর্য্যন্ত যায় নাই। বাড়ীটা না কি সহরের এক প্রান্তে, সম্পূর্ণ অচেনা বায়গা। আগে হইতে একটা খবর দিলে অবশ্য মন্দ হইত না, কিন্তু তাহাতে মালতীর স্ফূর্ত্তি অনেকখানি কম হইয়া পড়ি-

যেন। এ-সব ব্যাপারে আকস্মিকতার অনেকখানি মূল্য আছে বৈ কি!

পথে আসিতে আসিতে মালতীর শেষ চিঠিখানির কথাই সুবোধ ভাবিতেছিল। মালতীর বহু দিনের সাধ শহরে আসিয়া বাস করিবার। সুবোধ ভাবিতেছিল, শহরে বাপের বাড়ীতে গিয়া সে সাধ আরও বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু হঠাৎ এমন আশ্চর্য্যভাবে সে-সখ মিটিয়া গেল কি করিয়া, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না!

অধুনা-অভ্যস্ত তাহাদের গ্রাম্য নীড়খানির বাহিরে কর্ম্মচঞ্চল পৃথিবীর পানে চাহিয়া সুবোধের আজ মনে হইতেছে, নিজেও সে যেন অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছে। সে-ই যে একদিন কলিকাতার হোটেলে থাকিয়া দেশ-বিদেশের ছাত্রদের সঙ্গে হুল্লোড় করিয়া দিন কাটাইয়াছিল, সে কথা যেন সে আজ নিজেকেই বিশ্বাস করাইতে পারে না। আজ যখন তার সেই সব অন্তরঙ্গ সহ-পাঠিদের কথাই একে একে মনে পড়িতেছিল, সেই সময় সহসা তাহাদেরই এক জনের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ অণ্ডাল্ ষ্টেশনের চায়ের ষ্টলে।

—আরে কে, সুবোধ না?

পাশের আগন্তুকটির দিকে চাহিয়াই সুবোধ অবাক। একমুখ হাসিয়া বলিল,—কে হে অশেষ যে? আশ্চর্য্য! এই মাত্র আমি ঠিক তোমাদের কথাই ভাবছিলুম। সেই অশেষ গুপ্ত, প্রবীর চাটুয্যে, কিরণ সরকার ইত্যাদি হোষ্টেলের নামজাদা সহচরবৃন্দ।

চেয়ার টানিয়া বসিয়া-পড়িয়া অশেষ বলিল,—তার পর খবর কি? কোথায় আছ?

সুবোধ বলিল,—একবার বর্দ্ধমান যাবো। তুমি—

—বর্দ্ধমান যাচ্ছো? আর আমি বর্দ্ধমান থেকেই আস্‌ছি, যাবো আসানসোল। ঐ যে ট্রেণটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ১০ মিনিট এখানে ষ্টপেজ! বড্ড চায়ের তেষ্টা পেলো, তাই এক কাপ—দাও হে এক কাপ তাড়াতাড়ি! চায়ের জন্যে ট্রেণ ফেল করতে পারবো না কিন্তু! তার-পর? তোমার ডাউন ট্রেণের তো এখনো প্রায় তিন কোয়ার্টার দেরী।

—হ্যাঁ, ঐ রকমই হবে। উঃ, তোমার সঙ্গে কত দিন যে দেখা! তাই ভাবি, দেখা না হওয়াটাও যেমন আশ্চর্য্য, হওয়াটাও তো তেম্‌নি। প্রবীর কি কচ্ছে হে? সে না কি একটা কি বড় গোছের—

—হ্যাঁ, মুন্সেফী পেয়েছে। কিরণ শুনলুম লোহার কারবারে মোটা লাভ করেছে। আর আমি কি করছি শুধোলে না যে?

—সত্যিই তো, কি কর্‌চো বল না?

—আমি? দস্তুর মতো বাঙ্গালীর ট্রাডিশনটা বজায় রেখেছি হে, বুঝলে? অর্থাৎ, কেরাণীগিরি করছি, রাজ-ভাষায় যাকে বলে গবর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট।

—তা, মন্দ কি? যে বাজার! কত লোক যে ঐ চাকরীর জন্যেই ত্রিভুবন চষে' বেড়াচ্ছে!...কোথায় আছ? আসানসোলে বুঝি?

—না হে, বর্দ্ধমানে। হ্যাঁ, তুমিও তো বর্দ্ধমানে যাচ্ছো বল্‌লে না? যে রকম রাজবেশ, শ্বশুরবাড়ী নয় তো?

সুবোধ হাসিল।

—আরে, বল কি? সত্যিই শ্বশুরবাড়ী? বর্দ্ধমানে? কি আশ্চর্য্য!

হঠাৎ ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্ শোনা গেল। অশেষ বলিল,—আচ্ছা গুড্‌বাই। বর্দ্ধমানে পারি তো খুঁজে বার কর্‌বো তোমায়।

ছুটিতে-ছুটিতে গিয়া সে ট্রেণে উঠিল। ট্রেণ তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কাহিনী শুনিয়া সুবোধ স্ত্রীকে বলিল,—ওঃ! এরই জন্যে বলা হচ্ছিল, বৌটার ভারী দেমাক্! আসলে বল, সুন্দরীর কাছে তোমার এগোবার সাহস নেই!

মালতী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল,—ঈস্! তা আর বল্‌তে হয় না! জানো, আমি নিজে গিয়েছিলুম দেখা কর্‌তে! তা এম্‌নি অসভ্য, আস্‌বো বলে' এক দিনও এলো না। ছি ছি, এমন পড়্‌শি নিয়ে আবার মানুষে বাস কর্‌তে পারে? আমার এম্‌নি মন খারাপ হ'য়েছিল, কি বল্‌বো! ভাগ্যে তুমি আজ এলে!

—কি আশ্চর্য্য! আমি আসাতে অসভ্য বৌটার ওপর রাগ পড়ে' গেল বুঝি?

—তা কেন যাবে, বা-রে! দিন দিন কি রকম হ'য়ে

কঠোপনিষদ্

কঠোপনিষদের আখ্যানভাগ এইরূপ :—উদ্দালকি নামক ব্রাহ্মণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নচিকেতা দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা জরাজীর্ণ গাভীগুলিও দান করিতেছেন। নচিকেতা চিন্তা করিলেন যে, এই প্রকার গাভী যিনি দান করেন, তাঁহাকে মৃত্যুর পর নিরানন্দস্থানে যাইতে হয়। তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আপনি কাহার হস্তে আমাকে প্রদান করিবেন ?" পিতা বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন না। নচিকেতা পুনর্ব্বার এই প্রশ্ন করিলেন। তথাপি পিতা উত্তর দিলেন না। নচিকেতা তৃতীয়বার প্রশ্ন করিলেন। পিতা ক্রোধভরে বলিলেন, "তোমাকে মৃত্যুর হাতে প্রদান করিব।" পিতৃবাক্য সত্য করিবার জন্য নচিকেতা পরলোক-গমনে উদ্যত হইলেন। তখন পিতা অনুশোচনায় অধীর হইলেন। পিতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া নচিকেতা বলিলেন, "মানবমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। জীবনের মায়া করিয়া সত্যপথ হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সত্য পরিত্যাগ করেন নাই, আমাদেরও সত্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।" পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া নচিকেতা যমরাজের পুরীতে উপনীত হইলেন। তখন যম গৃহে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার কর্ম্মচারিগণ নচিকেতাকে আহার করিতে বলিলেন। কিন্তু যম ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত নচিকেতা আহার করিলেন না। তিন দিন পরে যম ফিরিয়া আসিলেন। নচিকেতা ব্রাহ্মণতনয় বলিয়া যম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং আহার ও পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে যম বলিলেন, "তুমি তিন রাত্রি অনাহারে ছিলে, তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি তোমাকে তিনটি বর প্রদান করিব। তুমি বর গ্রহণ কর।" নচিকেতা প্রথম বর চাহিলেন,—নচিকেতা যখন পিতার নিকট ফিরিয়া যাইবেন, তখন যেন পিতা তাঁহাকে চিনিতে পারেন, তাঁহার পিতার যেন মন শান্ত হয়, এবং তিনি আর কখনও ক্রোধপরবশ না হন। যম এই বর প্রদান করিয়া দ্বিতীয় বর চাহিতে বলিলেন। নচিকেতা বলিলেন, "স্বর্গলোকে দুঃখ নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই, অগ্নির কি ভাবে উপাসনা করিলে স্বর্গলাভ করিতে পারা যায়, আপনি তাহা শিখাইয়া দিউন।" তখন যমরাজা কি ভাবে বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয়, কি ভাবে অগ্নি প্রজ্বলন করিতে হয়,—এই সকল যজ্ঞ করিবার বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষা দিলেন। নচিকেতা তাহা শিক্ষা করিবার পর যম তাঁহাকে তৃতীয় বর চাহিতে বলিলেন। নচিকেতা বলিলেন,—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।

'প্রেত' হইলে কি হয়, এ বিষয়ে মনুষ্যের জানিবার ইচ্ছা হয়; কেহ বলেন—আছে,—কেহ বলেন নাই, এ বিষয়ে আপনার নিকট শিক্ষালাভ করিব, ইহাই তৃতীয় বর।"

'প্রেত' শব্দের সহজ অর্থ মৃত্যুগ্রস্ত। শঙ্কর এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না। কিন্তু রামানুজের মতে নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এরূপ হইতে পারে না। কারণ, দ্বিতীয় প্রশ্নে নচিকেতা স্বর্গলাভের উপায় কি, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন; মৃত্যুর পর যদি আত্মা না থাকে, তাহা হইলে স্বর্গলাভ কিরূপে হইতে পারে ? রামানুজের মতে নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে, মোক্ষলাভ করিবার পর জীবাত্মা থাকে, অথবা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। অদ্বৈত-মতে মোক্ষের পর জীবাত্মা থাকে না, পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে মোক্ষের পরও জীবাত্মা পরমাত্মার অংশরূপে থাকে। নচিকেতার প্রশ্ন এই—অদ্বৈতবাদ সত্য, অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ সত্য। 'প্রেত' অর্থাৎ যে জীব প্রকৃষ্ট গতিলাভ করিয়াছে। প্রকৃষ্ট গতি অর্থাৎ চরম গতি। যে গতির পর আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। অর্থাৎ মোক্ষ।

প্রশ্নটির তাৎপর্য্য যাহাই হউক, তাহার উত্তরে যম নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু যম সহজে এই উপদেশ দিতে চাহেন নাই। তিনি প্রথমে নচিকেতাকে বলিলেন যে, এই তত্ত্ব অতিশয় দুরূহ, এবং নচিকেতাকে অন্য বর চাহিতে বলিয়াছিলেন। যম বলিলেন যে, নচিকেতা প্রার্থনা করিলেই যম তাহাকে ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব, বিস্তৃত ভূখণ্ড, পুত্র, পশু, ধন, ধান্য, বহুসংখ্যক সুন্দরী রমণী, গীতবাদ্য,—উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ভোগ্য সকল বস্তু প্রচুর পরিমাণে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু নচিকেতা এ সকল চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, সংসারে সুখ ঐশ্বর্য্য সকলই ক্ষণস্থায়ী, জরাগ্রস্ত হইলে মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য থাকিলেও ভোগ করিবার ক্ষমতা থাকে না, ধন দ্বারা কেহ তৃপ্তিলাভ করিতে

পারে না। অতএব নচিকেতা এ সকল কিছু চাহেন না। তিনি তত্ত্ববিদ্যাই চাহেন। তখন যম নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন।

এই উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার পূর্ব্বে এই বিদ্যার অধিকার অর্জ্জন করা প্রয়োজন। যিনি অধিকারী নহেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া মিথ্যা;—তাহাতে কোনও সুফল হইবে না, বরং কুফল হইতে পারে। অধিকার সম্বন্ধে কঠোপনিষদে দুইটি প্রধান কথা বলা হইল, পিতার প্রতি কর্ত্তব্যসাধন, দেবতার প্রতি কর্ত্তব্যসাধন। বালক পুত্রকে হারাইয়া নচিকেতার পিতা শোকে মুহ্যমান; নচিকেতার প্রথম কর্ত্তব্য পিতার মনে শান্তি স্থাপন করা—সে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালাভের চেষ্টা করিলে তাহা কখনও ফলবতী হইবে না। অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতির মধ্যে আমরা ঈশ্বরের শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, সেই সকল দেবতার উপাসনা না করিয়া ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করা উচিত নহে,—ইহা বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ব্বে যজ্ঞের প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন যে, উপনিষদের ঋষিগণ যজ্ঞের বিরোধী এবং দেবতত্ত্বে অবিশ্বাসী, তাঁহাদের উক্তি যে সম্পূর্ণ ভুল, তাহার একটি প্রমাণ কঠোপনিষদের এই আখ্যায়িকা। কঠোপনিষদে যদিও পিতৃসেবা এবং দেবতার উপাসনার কথাই বলা হইল, তথাপি এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য এই যে, সকল প্রকার কর্ত্তব্যকর্ম্ম যথারীতি সম্পাদন করিলে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার লাভ করা যায়। এই বিষয়ে তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে দেখা যায় যে, আচার্য্য শিষ্যকে বেদ অভ্যাস করাইয়া আদেশ দিতেছেন,—"সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর, স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদ," ইত্যাদি। অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে, ধর্ম্ম আচরণ করিবে, নিত্য বেদ-পাঠে অবহেলা করিবে না। এই সকল অনুশাসনের মধ্যে উক্ত হইয়াছে—"দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।" অর্থাৎ দেব-কার্য্য এবং পিতৃকার্য্যে অবহেলা করিবে না। দেবকার্য্য হইতেছে—হোম ও যজ্ঞ, পিতৃকার্য্য হইতেছে—তর্পণ। উপনিষদের এই সকল বাক্য আলোচনা করিলে ইহা প্রতীতি হইবে যে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন করাই উপনিষদের অভিপ্রায়। সন্ন্যাসের কথা অবশ্য উপনিষদে আছে। যাঁহার পূর্ণ-বৈরাগ্য হইয়াছে, তিনি বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন,—"যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ"। কিন্তু পূর্ণ বৈরাগ্য উদয় হইবার পূর্ব্বে কর্ম্ম করা প্রয়োজন। বৈরাগ্যের উদয় অল্প লোকেরই হইয়া থাকে।

কর্ম্ম অবহেলা করিয়া কেবল ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা যে অনিষ্টকর, তাহা ঈশোপনিষদেও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। ঐ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি বিদ্যাকে অবহেলা করিয়া অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে গমন করেন, এবং যিনি অবিদ্যাকে অবহেলা করিয়া কেবল বিদ্যার সেবা করেন, তিনি অধিকতর অন্ধকারময় স্থানে গমন করেন। —

> অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
> ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

রামানুজ এই বাক্যের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন, বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলন অথবা ব্রহ্ম উপাসনা, এবং অবিদ্যা শব্দের অর্থ কর্ত্তব্যকর্ম্ম। ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন না করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে স্বর্গলাভ হয় এবং চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা থাকে (চিত্তশুদ্ধি হইলে মোক্ষলাভ বিশেষ দুরূহ নহে); কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিলে স্বর্গও হয় না, মোক্ষও হয় না,—অনধিকারীর বিদ্যাচর্চ্চা হেতু অনিষ্ট হওয়াই সম্ভব। এজন্য কেবল কর্ম্ম অপেক্ষা কেবল জ্ঞানচর্চ্চা নিকৃষ্ট।

ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবার পূর্ব্বে যম যে নচিকেতাকে নানাবিধ সুখ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, নচিকেতার প্রকৃত বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করা। বৈরাগ্য উদয় হইলেই ব্রহ্মবিদ্যা ফলপ্রদ হয়। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, মনের মধ্যে বিষয়-বাসনা যদি অণুমাত্রও থাকে, তাহা হইলে সেরূপ মনের দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে সম্পাদন করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় অর্থাৎ বৈরাগ্যের উদয় হয়। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে নচিকেতার চিত্তে স্বতঃই বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল; এজন্য তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উৎকৃষ্ট পাত্র ছিলেন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)

বৈষ্ণবমত-বিবেক

তৃতীয়-অধ্যায়

কাশীধামে শ্রীজীব

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় দেখা যায় যে, শ্রীজীব গোস্বামী গৌড় হইতে মথুরায় যাইবার পথে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করেন। তবে যে তিনি ৺কাশীধামে অবস্থান করিয়া বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এ কথা কোথা হইতে আসিল? আমাদের মনে হয়, এ স্থলে শ্রীচরিতামৃতের অতিসংক্ষিপ্ত প্রামাণিক উক্তির পরিপূরকরূপে ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাই গ্রহণ করিতে হইবে। ভক্তিরত্নাকরে আছে,—

নবদ্বীপ হইতে পরমানন্দ মনে।
শ্রীজীব গোস্বামী কাশী গেলা কতো দিনে।

—প্রথম তরঙ্গ ৫৪ পৃঃ।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা-আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার পথে শ্রীকাশীধামে আগমন করিয়া তথায় অবস্থান করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ৺কাশীধামে আগমন করিয়া মধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্রপাঠে নিযুক্ত হন। যত দূর জানা যায়, তাহাতে এইরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, তিনি চারি পাঁচ বৎসর ৺বারাণসীতে অবস্থান করিয়া দিবানিশি শাস্ত্রচর্চ্চায় মগ্ন থাকিতেন। শ্রীজীবের ন্যায় শক্তিশালী ও প্রতিভাবান শিক্ষিত যুবক তন্ময়ভাবে চারি পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া—তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার দর্শন ও শাস্ত্রাদি আয়ত্ত করিয়াছিলেন—ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

কার্য্য দেখিয়াই ফলের অনুমান করিতে হয়। শ্রীজীবের শ্রীভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ টীকায়, ষট্‌সন্দর্ভে ও সর্ব্বসম্বাদিনীতেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও দার্শনিক প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যে ভামতী টীকাসমেত শঙ্করভাষ্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তত্ত্বসন্দর্ভের "সর্ব্বসম্বাদিনী"তে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।* শাবর ভাষ্য, তন্ত্রবার্ত্তিক ও পূর্ব্বমীমাংসাসূত্র হইতে তিনি যে যে স্থান সর্ব্বসম্বাদিনীতে উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিয়াছেন, তাহাতে মীমাংসাদর্শনে যে তাঁহার প্রভূত জ্ঞান ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।† ভট্টমত ও প্রভাকর-মতের সহিতও তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। তিনি বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ প্রভৃতিতে বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে এই সকল হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণে ও পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও তিনি বিশেষরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণেও তাঁহার পাণিনি ব্যাকরণের নিরতিশয় ব্যুৎপত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি পাণিনিকলাপ, সারস্বত-বিস্তর ও চান্দ্রব্যাকরণ—এই সকল ব্যাকরণে তুলনামূলক জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার সার সংগ্রহ করিয়া লৌকিক সংস্কৃতের উৎকৃষ্ট ব্যাকরণরূপে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্বাদিনীতে স্ফোটবাদ নিরসনে তিনি পাণিনীর মহাভাষ্যের জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শব্দশক্তি ও শব্দবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি শব্দশক্তি-প্রকাশিকা প্রমুখ গ্রন্থ, এবং সাহিত্য-দর্পণ কাব্য-প্রকাশাদি অলঙ্কার-গ্রন্থও তাঁহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার নিদর্শন। ফলতঃ, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, শব্দশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় পরিপক্কতা লাভ করিয়াই তিনি ৺কাশীধামে বেদ ও দর্শনাদির আলোচনার জন্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে সে অনুমান কোনওরূপে অসঙ্গত হয় না।

শ্রীজীবের দার্শনিক জ্ঞানের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধ, মাইত ও চার্ব্বাকদর্শন, প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, অদ্বৈত বেদান্ত, দ্বৈত-বেদান্ত ও বিশিষ্টাদ্বৈত্যবাদে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রদর্শিত পন্থায় শ্রীরূপসনাতনের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহার অপূর্ব্ব দার্শনিক মত—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বিবৃত করেন।*

অদ্বৈত্য বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য, ভামতী, রত্নপ্রভাদি গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের শ্রীভাষ্য, তাহার টীকা শ্রুত-প্রকাশিকা, বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিকের শতদূষণাদি গ্রন্থ এবং মাধ্বমতের দ্বৈত-বেদান্তের মাধ্বভাষ্য, বিষ্ণুতত্ত্বপ্রকাশিকা, ব্যাসরাজ স্বামীর ন্যায়ামৃত গ্রন্থের নাম তিনি তাঁহার লঘুতোষণীতে উল্লেখ করিয়াছেন।† এই উক্তির দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে,

---

* 'অত্র বাচস্পতিচৈবমাহ' ইত্যাদয়ঃ।—সর্ব্বসম্বাদিনী পৃঃ ৯ (সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ)

† "তথাচ পারমর্ষং সূত্রং—"পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ ইতি—(পূঃ মীঃ সূঃ ৬।৫।৫৪) তথা—"পৌর্ব্বাপর্য্যবলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তে। আন্তাঞ্চ নিরপেক্ষাণাং জন্মধিয়াং ভবেৎ।"

—তন্ত্রবার্ত্তিকং

অন্য বহু স্থলেও মীমাংসাদর্শন হইতে বহু প্রমাণ উদাহৃত হইয়াছে।

* এই জীবনী গ্রন্থে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে শ্রীজীবের দার্শনিক অভিমত "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ" বিবৃত হইবে।

† "শ্রীবৈষ্ণবানাং শ্রীভাষ্যতদীয় টীকায়াঃ শতদূষণ্যাদিষু চ তত্ত্ববাদিনাঃ বিষ্ণুতত্ত্বপ্রকাশিকাদৌ ন্যায়ামৃতাদৌ চ তথাস্মাকং তদদৃষ্টিলেপাবষ্টম্ভি শ্রীভাগবতসন্দর্ভতট্টিকাদৌ চ বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ।"
—লঘুতোষণী—১০।৮৭।২

এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত তত্তৎসম্প্রদায়ের অন্যান্য গ্রন্থও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীজীবের শ্রীভাগবতের টীকা ক্রমসন্দর্ভে শ্রীভাগবতের প্রথম শ্লোকের ("জন্মাদ্যস্যযতঃ" ইত্যাদির) ব্যাখ্যায় অতি সংক্ষেপে এবং সুকৌশলে তিনি ব্রহ্মসূত্রে পাঁচটি সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যায় তিনি প্রধানতঃ শ্রীভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন। মাধ্ব সম্প্রদায়ের ব্যাসরাজতীর্থের "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থ তাঁহার অধিক পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলেও এই গ্রন্থের প্রাচরাধিক্য ঘটিয়াছিল। ন্যায়-গর্ভিত দ্বৈতবেদান্তের ইহা একখানি সুন্দর গ্রন্থ। অদ্বৈতবাদ নিরসনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের ও তাহার অভিমতের উল্লেখ করিয়া এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, শ্রীজীব তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীজীব কাশীধামে আসিয়া শ্রীল মধুসূদন বাচস্পতির নিকট অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন, ভক্তিরত্নাকরের প্রমাণ হইতেই ইহা জানিতে পারা যায়। এই মধুসূদন বাচস্পতি কে? কেহ কেহ ইঁহাকে মধুসূদন সরস্বতীর সহিত অভিন্ন ব্যক্তি কল্পনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা একেবারে প্রমাণসহ নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, শ্রীজীবের আবির্ভাব ১৪৩২ শকের পর হওয়া সম্ভবপর নহে। ১৪৩২ শকাব্দে শ্রীজীবের আবির্ভাব কাল ধরিয়া লইলে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বা ১৫১১ খৃষ্টাব্দের প্রথমে শ্রীজীবের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় মধুসূদন সরস্বতীর আবির্ভাবকাল ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থির করিয়াছেন।* যদি ১৫২৫ খৃষ্টাব্দেও মধুসূদনের জন্মকাল ধরিয়া লওয়া যায়, তবে শ্রীজীব গোস্বামীর অপেক্ষা অন্ততঃ তিনি ১৪ বৎসরের কনিষ্ঠ। সুতরাং ঊনবিংশ বা বিংশ বর্ষ বয়সে যখন শ্রীজীব বারাণসীধামে আগমন করিয়াছিলেন, তখন মধুসূদন পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষ বয়সের বালক। সুতরাং এই মধুসূদনের নিকট শ্রীজীব গোস্বামীর অধ্যয়ন—অন্ততঃ শ্রীজীব কাশীধামে অবস্থান করিবার সময়ে—কিছুতেই সম্ভবপর নহে। উত্তর কালেও তাঁহার সহিত কাশীধামে বা বৃন্দাবনে শ্রীজীবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। মধুসূদন সরস্বতীও যে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীরূপ-সনাতনাদির প্রিয়শিষ্য অত্যন্ত বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীজীবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, ইহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে মধুসূদনের নাম মধুসূদন "বাচস্পতি" প্রদত্ত হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে মধুসূদন সরস্বতী বলা হয় নাই। শ্রীজীবের গ্রন্থাবলীতে কোথাও মধুসূদন সরস্বতীর কোনও উল্লেখ নাই এবং মধুসূদন সরস্বতীর গ্রন্থাবলীতেও শ্রীজীবের কোনও উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরলোকগত অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার "সপ্তগোস্বামী" নামক সুলিখিত গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীর যে জীবনী লিখিয়াছেন তাহাতে আছে—"এই মধুসূদন বাচস্পতি নীলাচলপ্রবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য। অদ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক বাসুদেব শ্রীচৈতন্যের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া ভক্তিদীক্ষা লইবার পর বেদান্তাদি শাস্ত্র ভক্তিসিদ্ধান্তানুসারে নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত করিয়াছিলেন, বাচস্পতি তাঁহার নিকট সেই মতে বেদান্ত-চর্চ্চা করিয়া কাশীতে বিখ্যাত পণ্ডিত হন। ঐ ভাবে বেদান্ত অধ্যাপনা করিবার মত অন্য কোন পণ্ডিত তখন কাশীতে ছিলেন না।"* ইহা অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু কোনও প্রাচীন প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে আমরা সতীশবাবুর সমর্থক কোনও প্রমাণ পাই নাই। সতীশবাবুও তাঁহার গ্রন্থে মধুসূদন বাচস্পতি যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন, তাহার কোনও সমর্থক প্রমাণ দেন নাই। তবে মধুসূদন এই নাম হইতে অনুমান হয়—মধুসূদন কোনও বাঙ্গালী পণ্ডিত; কিন্তু তখন জীব গোস্বামীর হৃদয়ে ভক্তি-ভাব যেরূপ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে অবস্থায় ভক্তিভাব-বিরোধী কোনও অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের নিকট তিনি যে দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা মনে হয় না। অতএব তাঁহার অধ্যাপক মধুসূদন বাচস্পতি নিশ্চয়ই সুপণ্ডিত ভক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির সহিত ইঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁহার সুবিখ্যাত "বৃহত্তোষণী" টীকায় তাঁহার অধ্যাপকবর্গের নামের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার লিখিত মূল গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীরূপ-সনাতন, গোপাল ভট্ট ভিন্ন অন্য কাহারও নাম করেন নাই। তিনি যেরূপ-ভাবে ইঁহাদের নাম করিয়াছেন, তাহাতে গুরুবন্দনা হিসাবেই ইঁহাদের বন্দনা করিয়াছেন। তিনি কাশীধামে অবস্থান কালে মধুসূদন বাচস্পতি ভিন্ন অন্য কোনও অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। "ভক্তিরত্নাকর" এই মধুসূদন বাচস্পতির সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি।"

—(১ম তরঙ্গ ৫৪, পৃঃ)

অতএব মনে হয়, শ্রীজীব পঠিতব্য সর্ব্বশাস্ত্রই ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন করিয়া তিনি বারাণসীর মত পণ্ডিতবহুল স্থানেও অসামান্য প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যথা—

শ্রীজীবের বিদ্যাবল দেখি বাচস্পতি।
যে আনন্দ হইল তাহা কহি কি শকতি।।
কাশীতে শ্রীজীবেরে প্রশংসে সর্ব্ব ঠাঁই।
ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই।

—(ঐ প্রথম তরঙ্গ ৫৪ পৃঃ)

এই সময় ভারতবর্ষে বিদ্যাচর্চ্চার প্রসার বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং বারাণসীধামেই তখন যতীধর্ম্মাবলম্বী বিদ্বানগণের প্রধান সমাগম-কেন্দ্র। অদ্বৈত-বেদান্তে তখন বারাণসীস্থিত উপেন্দ্র সরস্বতী, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, রামতীর্থ, মাধব সরস্বতী, উপেন্দ্র তীর্থ, নৃসিংহাশ্রম, নারায়ণাশ্রম, জগন্নাথ আশ্রম, কৃষ্ণ তীর্থ, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত গৃহস্থ পণ্ডিতগণের মধ্যেও অদ্বৈত মতাবলম্বী রঙ্গরাজাধ্বরি, আচার্য্য মল্লনারাধ্য, মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ বিদ্যমান

---

* শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদিত অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা—পৃঃ ১৬৯; কিন্তু এই রাজেন্দ্রবাবুই অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন যে, "ভক্তিরত্নাকরের মতে মহাপ্রভুর রামকেলি গমনের সময় অর্থাৎ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম হয়।"—ঐ ভূমিকা —৫২ পৃঃ।

* শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ৺সতীশচন্দ্র মিত্রের—"সপ্তগোস্বামী" —পৃঃ ২০৯—১০।

ছিলেন। রঙ্গরাজ অধ্বরীর পরম প্রতিভাবান পুত্র অদ্বৈতমতাবলম্বী সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র অপ্পয় দীক্ষিতও ঐ সময়ে কাশীধামে বর্ত্তমান ছিলেন। দ্বৈতবৈদান্তিক মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়েও তখন ব্যাসরাজতীর্থপ্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যমান। শ্রীসম্প্রদায়েও ঐ সময়ে বেদান্তাচার্য্য বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের প্রতিভাশালী শিষ্যগণ বর্ত্তমান ছিলেন। ঐ সময়েই শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য প্রাচীন বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের নাম গ্রহণ করিয়া মর্য্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ নামে স্বীয় সিদ্ধান্তাবলীর প্রচার করিতেছিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই তৎপুত্র বিঠ্ঠলেশ বল্লভ-সম্প্রদায়ের গুরুপদে বৃত হন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ী কেশবকাশ্মীরি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ তখন দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচার করিতেছিলেন। ঐ সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ভট্টোজী দীক্ষিত ও বাঙ্গালী পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও জীবিত ছিলেন। নবদ্বীপে তখন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কবাগীশ বিদ্যমান ছিলেন।

যাহা হউক, কাশীধাম ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্তের আলোচনাতেই পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীজীব কাশীতে অবস্থান করিয়া তন্ময়চিত্তে অধ্যয়নপুরঃসর মীমাংসা ও বেদান্তশাস্ত্রে সমধিক কৃতিত্ব লাভ করিলেন। প্রায় পাঁচ বৎসরকাল তিনি এস্থানে অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সমস্ত পণ্ডিত তখন কাশীধামে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও সহিত শ্রীজীবের সাক্ষাৎকারের কথা স্পষ্টতঃ কোথাও পাওয়া যায় না। তাৎকালিক বৈষ্ণব ইতিহাস এ বিষয়ে নীরব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সমসাময়িক প্রামাণিক গ্রন্থ হইলেও এই গ্রন্থে শ্রীজীবের কাশীধামে অধ্যয়ন বা তাহার বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। সম্ভবতঃ শ্রীচরিতামৃত রচনার মূল উদ্দেশ্য শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলা বর্ণন বলিয়া চরিতামৃতকার এ বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। শ্রীচরিতামৃত রচিত হইবার সময় শ্রীজীব জীবিত ছিলেন—পরম বিনয়ী গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীকে তাঁহার চরিতামৃত গ্রন্থে ভট্ট গোস্বামীর কোনও বিবরণ প্রদান-করিতে নিষেধ করেন;—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীজীবেরও জীবন-কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে ভক্তিরত্নাকরের গ্রন্থকার প্রাচীন বৈষ্ণবগণের নিকট শুনিয়া শ্রীজীবের কাশীধামে মধুসূদন বাচস্পতির নিকট অধ্যয়নের বৃত্তান্তাদি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও প্রধানতঃ ঐতিহ্য অবলম্বনে তাঁহাকে লিখিতে হইয়াছে বলিয়া তিনি গোস্বামিগণের জীবনেতিহাস সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই প্রদান করিতে পারেন নাই। এস্থানে আমাদের আর শ্রীজীবের জীবনকথা জানিবার অন্য উপায় নাই।

বারাণসীধামে বিদ্যা-বিলাসের প্রবল তরঙ্গ সর্ব্বত্র যখন উচ্ছ্বলিত, তখন শ্রীজীবও যে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন এমন মনে হয় না। তবে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় তাঁহার লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়া তিনি এই তরঙ্গাভিঘাতে ভাসিয়া যান নাই। শুনা যায়, উত্তরকালে মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈত বেদান্তের আবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহার পূর্ব্বসংকল্প—অদ্বৈতবাদ নিরসন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন—হইতে বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীজীব তাঁহার সংকল্প অটুট রাখিয়া—লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া যে ভাবে কাশীধাম হইতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের বলের ও চরিত্রের দৃঢ়তারই পরিচয় পাওয়া যায়। অতুলনীয় প্রতিভাশালী শ্রীজীব প্রায় পাঁচ বৎসর কাশীধামে অবস্থান করিয়া তন্ময় ভাবে অধ্যয়ন করিয়া যখন অধীতব্য বিষয় প্রায় শেষ করিয়াছেন, তখন কাশীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের সংবাদ উপস্থিত হইল। এই হৃদয়বিদারক সংবাদে তিনি চিরপোষিত মনোরথ ভঙ্গের মর্ম্মান্তিক দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শিশুকালে একবার মাত্র দর্শন করিয়া যাঁহার সুবলিত প্রকাণ্ড তনুর মাধুর্য্য তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—যাঁহার মর্য্যাদা-বিলসিত, মূর্ত্তির স্মৃতি শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে বিরাজিত সেই সাধনার ধন সেই সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীমচ্চৈতন্যদেবকে যে তিনি আর নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবেন না—এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। ৺কাশীধামেও তখন শ্রীচৈতন্যদেবের অনুরাগী ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহারাও শ্রীচৈতন্যদেবের বিয়োগ-বার্ত্তা শুনিয়া প্রিয়জন-বিয়োগের ন্যায় দুঃখার্ত্ত হইয়াছিলেন। যিনি কাশীধামের মত জ্ঞানপ্রধান স্থানেও ভক্তিমন্দাকিনীর অমৃত-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, ভক্তগণ কিছুতেই তাঁহার কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। মধুসূদন বাচস্পতিও বোধ হয় এই শ্রেণীর ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ৺কাশীধামে প্রকাশানন্দের সহিত বিচারে যে ভাবে ব্রহ্মসূত্রের ভগবত-মতানুসারিণী ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—মধুসূদন বাচস্পতিও নিশ্চয়ই সেই ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হয় ত, তিনি পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুরাগী না হইলে এই সময় হইতে তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীজীব তাঁহার নিকট ভক্তিসম্মত যে বেদান্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন—উত্তরকালে তাহা ও শ্রীরূপ-সনাতন ও গোপাল ভট্টের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াই তিনি ষট্সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ ও সর্ব্বসম্বাদিনী রচনা করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই গৌরভক্ত সুপণ্ডিত অধ্যাপকের ও অন্যান্য গৌরগত-প্রাণ ভক্তবৃন্দের সান্ত্বনায় ধৈর্য্য-ধারণ করিয়া তিনি অবিলম্বে অধ্যয়ন শেষ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার পিতৃব্যগণের সকাশে গমন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৫৫ শকে লীলাসম্বরণ করেন। শ্রীল লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, আষাঢ় মাসেই তাঁহার তিরোভাব ঘটে। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই শ্রীজীব ৺কাশীধাম হইতে পাঠ শেষ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। শ্রীজীব শোকাকুলিত হৃদয়ে বিদ্যাদাতা আচার্য্যের ও ৺কাশীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের শ্রীচরণে বিদায় লইয়া ১৪৫৫ শকের শেষভাগে (সম্ভবতঃ প্রয়াগের পথে)—যে স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার পিতৃদেবের ও পিতৃব্য শ্রীরূপের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং যে স্থানে দশ দিন অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার পিতৃদেবসহ তাঁহার পিতৃব্য শ্রীরূপকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন—সেই পুণ্যক্ষেত্র দর্শন করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের অভয় আশ্রয়ে উপনীত হইলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ বি-এল)।

সুবর্ণ-দেউটি যেন তুলসীর মূলে

১

অনূ্যন ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। কলিকাতা গোয়াবাগানের ডাক্তার ডি, পি, মুখার্জ্জির কন্যা লতিকা এবং ডাক্তারের প্রতিবেশী-বন্ধু রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা উমা উভয়েরই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। অথচ এই উভয় পরিবারের আচার-ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য ছিল না। ডাক্তার মুখার্জ্জি ষোল আনা মেকি-সাহেব, আর রমেশ বাবু আঠারো আনা গোঁড়া-হিন্দু। ডাক্তার মুখার্জ্জি ধর্ম্মে ব্রাহ্ম ছিলেন না, কিন্তু সর্ব্বজাতির অন্নগ্রহণে ব্রাহ্মের ন্যায় তাঁহার উদারতা ছিল। জাতিভেদেও আস্থা ছিল না, এবং 'না জাগিলে যত ভারত ললনা'- ইহাই তাঁহার স্ত্রী-স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ছিল। সেকালে বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের পুরমহিলারা পাদুকা ব্যবহার না করিলেও ডাক্তার মুখার্জ্জির পত্নী ও কন্যা সর্ব্বদা পাদুকা ব্যবহার করিতেন। রমেশ বাবুর বাড়ীতে আধুনিকতার কোন চিহ্নই ছিল না। রমেশ বাবু বার মাস গঙ্গাস্নান করিতেন, সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া লগ্রহণ করিতেন না, হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য দ্রব্য তাঁহার হে প্রবেশ করিত না। তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ইলেও স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ডাক্তার মুখার্জ্জির া হেমাঙ্গিনীর বিদ্যাশিক্ষা বেথুন স্কুলের প্রথম শ্রেণী র্য্যন্ত; প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বেই বিবাহ হওয়াতে াহাকে স্কুল ছাড়িতে হইয়াছিল। তখন তাহার বয়স পনের ৎসর। ডাক্তার মুখার্জ্জি সেই বৎসরেই ডাক্তারি পাশ রিয়া বাহির হইয়াছিলেন; তখনও পশার-প্রতিপত্তি না ওয়ায় সকল বিষয়ে তাঁহাকে পিতার উপর নির্ভর করিতে ইত। সুতরাং পত্নী হেমাঙ্গিনাকে উচ্চশিক্ষা দানের ইচ্ছা থাকিলেও, তাঁহার পিতা এবং সংসারের কর্ত্রী পিসিমার আপত্তিতে তাঁহার এই কামনা পূর্ণ হয় নাই। হেমাঙ্গিনীর সহিত ডাক্তারের বিবাহের তিন বৎসর পূর্ব্বে রমেশ বাবুর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী শারদার বয়স তখন বার বৎসর। রমেশ বাবুর পিতা কোম্পানির কাগজের ও শেয়ারের বাজারে দালালী করিতেন। পুত্র রমেশচন্দ্র বি-এ পাশ করিয়া পিতার ইচ্ছানুসারে দালালীতে যোগদান করিলেন। যখন রমেশ বাবুর বিবাহ হয়, তখন শারদার বিদ্যা "কথামালা" ও "ফার্ষ্ট-বুকের" ঘোড়ার ছবির পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। রমেশ বাবু পত্নীকে "কথামালার" পরই কৃত্তিবাসের "রামায়ণ" পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, এবং "রামায়ণ" শেষ হইলে কাশীরাম দাসের "মহাভারত" পড়াইলেন; সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী অধ্যাপনাও চলিতে লাগিল। বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই শারদার "রামায়ণ" ও "মহাভারত" পাঠ শেষ হইয়াছিল।

রমেশ বাবুও বাল্য ও কৈশোরে পিতার নিকট "রামায়ণ" ও "মহাভারত" পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। হিন্দু-জীবনের আদর্শস্বরূপ এই মহাকাব্যদ্বয়ের প্রতি তাঁহার পিতার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল।

ডাক্তার ডি, পি, মুখার্জ্জির শ্বশুর ব্যারিষ্টার, এবং পিতা ছোট লাটের খাস-দপ্তরের পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এক জন ইংলণ্ডে শিক্ষিত, আর এক জন বাঙ্গালা সরকারের শ্বেতাঙ্গ রাজ-পুরুষগণের অনুগৃহীত। সেকালের বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারদিগের প্রায় সকলেই ঘরে-বাহিরে সকল বিষয়েই ইংরেজের অনুকরণ করা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা

বলিয়াই মনে করিতেন। হেমাঙ্গিনীর পিতার ইচ্ছা ছিল, হেমাঙ্গিনী বি এ পাশ করিলে তাহার বিবাহ দিবেন। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর তের বৎসর বয়সে তাহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার শ্যালক অর্থাৎ হেমাঙ্গিনীর মাতুল রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ভগিনীর সংসারের অভিভাবক হইতে হইল। রামচন্দ্র ধর্ম্মভীরু ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন; তিনি ভগিনীপতির ফিরিঙ্গীয়ানার বিরোধী ছিলেন। তিনি ভগিনীপতিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ ও য়ুরোপীয় খৃষ্টানসমাজ এক নহে, এক হইতে পারে না। এক সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্য সমাজের রীতি-নীতি, ও আচার-ব্যবহারের অনুকরণে আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, উহা অমানুষের কার্য্য। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর পিতা শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দের সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া একটা য়ুরোপীয় বালিকা-বিদ্যালয়ে কন্যাকে ভর্ত্তি করিয়া, তাহার মস্তক-ভক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ভগিনীর সংসারের কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াই ভাগিনেয়ীকে ফিরিঙ্গীদের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিলেন। ইহার এক বৎসর পরেই হেমাঙ্গিনীর মাতারও মৃত্যু হইল। তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় পিতৃমাতৃহীনা অনাথা ভাগিনেয়ীকে শ্যামবাজারের স্বগৃহে স্থানান্তরিত করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় হেমাঙ্গিনীকে নিজের সংসারে লইয়া-গিয়া দারুণ সমস্যায় পড়িলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় খাঁটি হিন্দু ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে চেয়ার-টেবিলে ভোজনের ব্যবস্থা ছিল না, কাঁটা-চামচে ব্যবহারেরও প্রথা ছিল না; কোন স্ত্রীলোক জুতা পায়ে দিতেন না, রাত্রিবাসের কাপড়ে বা অস্নাত অবস্থায় তাঁহারা রন্ধনশালায়, ভাঁড়ারেও প্রবেশ করিতেন না। বার-তের বৎসর বয়স্কা কিশোরী কন্যারাও নিতান্ত আত্মীয় ব্যতীত কোন পুরুষের সহিত মিশামিশি করিত না; হেমাঙ্গিনীর ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ ও অদ্ভুত মনে হইত। মাতুলালয়ে গিয়া প্রথম দিনই হেমাঙ্গিনী সকলকে কাঁটা-চামচের পরিবর্ত্তে হাতে করিয়া ভাত-তরকারী খাইতে দেখিয়া মাতুলকে বলিয়াছিল, "বাবা বলতেন, খাবার জিনিস হাত দিয়ে খেলে নানা রকম রোগ হয়, কারণ, নখের কোণে ও আঙ্গুলে কত রোগের বীজাণু থাকে।" সে কথা শুনিয়া চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার বাবার ও-কথা যথার্থ বটে। সেইজন্যই ত খাবার আগে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়, আর ঐ জন্যই আমাদের রান্নাঘরে অত বেশী জলের খরচ; যাঁরা রাঁধেন, তাঁরা যখন-তখন হাত ধুয়ে খাবার নাড়েন। ইংরেজের বাবুর্চ্চি খানসামাদের সদরে পরিচ্ছদের আড়ম্বর আছে বটে, কিন্তু তাদের বাবুর্চ্চিখানার পরিচ্ছন্নতার কথা না বলাই ভাল। লোক-দেখানো বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতায় কোন লাভ নেই মা!"

মাতুল, মাতুলানী ও তাঁহাদের পরিবারস্থ গুরুজনদের উপদেশে, তিরস্কারে ও শাসনে হেমাঙ্গিনীর আচার-ব্যবহার ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, এমন সময় মাতুল রামচন্দ্র অনেক অনুসন্ধানের পর মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় সদ্য উত্তীর্ণ দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। হেমাঙ্গিনী শিক্ষিতা, সুন্দরী, পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী, সুতরাং দেবীপ্রসন্নের পিতা প্রসন্নচিত্তেই হেমাঙ্গিনীর সহিত পুত্রের বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন। বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইল।

২

দেবীপ্রসন্নের পিতাও সাহেবী-ভাবাপন্ন ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেবীপ্রসন্নের অতি অল্প বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা আর বিবাহ করেন নাই, বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বাড়ীতে আনিয়া তাঁহাকেই সংসারের কর্ত্রী করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী বিবাহের পর পতিগৃহে গিয়া দেখিল, মাতুলালয়ে যেরূপ হিন্দুয়ানি লইয়া গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ি, শ্বশুরবাড়ীতে সেরূপ কিছুই নাই। শ্বশুর পিতার মত পুরা-দস্তর সাহেব না হইলেও সাহেবি-ভাবাপন্ন। বাড়ীতে একজন পাচক ব্রাহ্মণ আছে, সে কর্ত্তার এবং দেবীপ্রসন্নের জন্য দুই বেলা রন্ধন করে। পিসিমা বিধবা, তাঁহার পাকের জন্য পৃথক্ রান্নাঘর। দেবীপ্রসন্ন ও তাঁহার পিতা রাত্রিতে সাহেবিখানায় অভ্যস্ত। হেমাঙ্গিনীর কাঁটা-চামচে ব্যবহারের অভ্যাস আছে, এবং কোন প্রকার মাংসই সে নিষিদ্ধ মনে করে না জানিয়া এক দিন শ্বশুর বলিলেন, "বেশ ত, বৌমার ডিনারের ব্যবস্থা আমাদের সঙ্গেই হবে।"—শুনিয়া বৌমা যেন হাতে স্বর্গ পাইল! সেই দিন হইতে হেমাঙ্গিনী প্রত্যহ রাত্রিতে শ্বশুর ও স্বামীর সহিত এক টেবিলে বসিয়া কাঁটা-চামচে চালাইতে লাগিল।

দুই বৎসর পরে হেমাঙ্গিনীর প্রথমা কন্যা লতিকার জন্ম ল। কন্যার লালন-পালনের জন্য মান্দ্রাজী আয়া নিযুক্ত ল। কত আদরের খুকী, তাহার পালনের ভার পিসিমার র না দিয়া একটা "খৃষ্টান মাগীর" উপর দেওয়াতে সিমার দুঃখের অপেক্ষা অভিমানই অধিক হইল। তাঁহার আশা ছিল, দেবুর বিবাহ দিয়া একটি মনের মত বউ নিয়া শেষ-জীবনটা আনন্দে ও শান্তিতে কাটাইয়া দিবেন, স্তু বিধাতা তাঁহাকে নিরাশ করিলেন। এ কষ্টও তাঁহার হইয়াছিল; তথনও এ ক্ষীণ আশাটুকু ছিল যে, বৌমার টি খোকা কি খুকী হইলে তিনি তাহাকে তেল মাখাইয়া জল চোখে দিয়া, টিপ পরাইয়া বুকে করিয়া মানুষ করি-ন। কিন্তু ঐ "কেলে খৃষ্টান মাগীটা" আসিয়া তাঁহার শার সেই শেষ ক্ষীণ রশ্মিটুকুও নিবাইয়া দিল। তাঁহার ক ভ্রাতার ঘরে বাস করা আর সম্ভবপর হইল না। তিনি জীবনটা কোন তীর্থক্ষেত্রে কাটাইবার সঙ্কল্প করিয়া এক ভ্রাতার নিকট সে কথা প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধা আশা য়াছিলেন, হয় ত ভ্রাতা তাঁহাকে সংসার হইতে বিদায় ত আপত্তি করিয়া তাঁহার অভিমানের কারণ জানিতে হবেন; কিন্তু তাঁহার সে আশাও পূর্ণ হইল না। ার ভ্রাতা তাঁহার এই প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়াই মনে য়া বলিলেন, "শেষ বয়সে কাশীবাস করতে চাও, সে ত কথাই। আমাদের আফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নরেন ত পেন্সন নিয়ে কাশীবাস করছেন; তাঁকে চিঠি দিয়ে মার থাকবার ব্যবস্থা করিয়ে দেব। তোমার খরচের আমি প্রতিমাসে কুড়ি টাকা ক'রে পাঠিয়ে দেব, উপরেও যখন যা দরকার হবে, আমাকে জানিয়ো, চর জন্যে যেন কষ্ট না হয়।"

দিদি বলিলেন, "কুড়ি টাকা নিয়ে কি করব? এক চাট্টি আলোচাল ফুটিয়ে খাই; মাসে মাসে গোটা-ক ক'রে টাকা দিলেই ঢের হবে, কুড়ি টাকা কি ?"

দিদির কথায় যে অভিমানের সুর ছিল, ভ্রাতা তাহা ত পারিলেন না; তিনি বলিলেন, "কুড়ি টাকার কমে কি ক'রে? তোমাকে দেখা-শোনা করবার জন্যেও ক জন লোকের দরকার। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, নে বাজারে যাওয়া—এ সব কে করবে? তার পর ঠাকুর-দেবতার পূজা, দান-ধ্যান, বার-ব্রত এ সব ত আছে। আমি কুড়ি টাকা ক'রেই পাঠাব। আমি নরেন বাবুর নামে মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাব, তিনি ফি মাসের গোড়াতেই তোমাকে টাকা দেবেন।"

ইহার দশ-বার দিন পরে নরেন বাবুর পত্র আসিল, তিনি লিখিয়াছেন, মাসিক তিন টাকা ভাড়াতে একটি বাসা ঠিক করিয়াছেন, তাঁহার বাসার কাছেই; বিশ্বেশ্বরের মন্দির দশ মিনিটের পথ। সেই বাড়ীতে আরও চারি-পাঁচ জন বাঙ্গালী প্রৌঢ়া ও বিধবা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই ভদ্রবংশীয়া।

এই পত্র পাইবার প্রায় পনর দিন পরে, একদিন সন্ধ্যার সময় দেবীপ্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনীর নিকট বিদায় লইয়া খুকীকে কোলে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া দেবীপ্রসন্নের মাতৃ-স্থানীয়া পিসিমা, কাশীবাসের আশায় চিরদিনের জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন। দেবীপ্রসন্নের কম্পাউণ্ডার হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিল।

৩

পিসিমা কাশী যাত্রা করিলে হেমাঙ্গিনী সংসারের কর্ত্রী হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই সংসারের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে পিসিমার জন্য বাড়ীতে যেটুকু হিন্দুয়ানীর গন্ধ ছিল, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহা বিলুপ্ত হইল।

মাতুল চক্রবর্ত্তী মহাশয় মধ্যে মধ্যে ভাগিনেয়ীকে দেখিতে আসিতেন। পিসিমার স্বেচ্ছালব্ধ নির্ব্বাসনের পর, হেমাঙ্গিনীর সংসার কিরূপ চলিতেছে দেখিতে আসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সবিস্ময়ে দেখিলেন, সংসারের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এখন আর সে সংসারকে হিন্দুর সংসার—ব্রাহ্মণের সংসার বলিয়া চিনিবার উপায় নাই! প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে যেখানে পূর্ব্বে তুলসী-মঞ্চ ছিল, এখন সেইখানে লোহার জালবেষ্টিত একটা অনতিবৃহৎ কাঠের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কয়েকটা মোরগ-মুরগী রাখা হইয়াছে। কারণ, গৃহজাত সযত্নপালিত কুক্কুটের মাংস অধিকতর রুচিকর, তাহাতে ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প। পুরাতন পাচক-ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া আর এক জন নূতন পাচক নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহার লম্বা দাড়ি ও পরিধানে চাটগেঁয়ে লুঙ্গী দেখিয়া সে কি জাতি, তাহা জিজ্ঞাসা করা

তিনি অনাবশ্যক মনে করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, শৈশবে ও বাল্যে হেমাঙ্গিনী যে আবহাওয়ার মধ্যে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এখন সে সে-ই আবহাওয়ারই সৃষ্টি করিয়া সংসারে গৃহিণীপণা করিতেছে। হেমাঙ্গিনী বলিল, তাহার শ্বশুর ও স্বামীর এই সকল ব্যবস্থায় সম্মতি আছে; তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তাঁরা যা ভালবাসেন, তাই করাই তোমার কর্ত্তব্য, তাঁরা সুখী হ'লেই হ'ল।" কিন্তু তিনি মনে মনে বলিলেন, "জড়সে বিগড় গিয়া!"

সে-কালে মেডিকেল কলেজের পাশ করা ডাক্তাররা যদি প্রথমেই কিছু অর্থব্যয় করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পশার জমাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না। দেবীপ্রসন্নের অর্থাভাব ছিল না, তিনি ডাক্তার হইয়া প্রথমেই একখানা ব্রুহাম গাড়ী কিনিলেন। তাঁহাদের সদরে যে দুইখানা ঘর ছিল, তাহার একখানা তাঁহার রোগী দেখিবার কক্ষ, এবং অপরখানা ডিসপেন্সারী হইল। তাঁহাদের খোট্টা ভৃত্যটি আজানুলম্বিত চাপকান ও মাথার পাগড়ীতে সজ্জিত হইয়া দ্বারবানের অভাব পূরণ করিল। পাড়ার দুই-চারি জন বয়োবৃদ্ধ স্বয়ংসিদ্ধ মোড়ল সুযোগ বুঝিয়া প্রত্যহ চা-পান করিবার জন্য ডাক্তারের বাড়ীতে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সমবেত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা পল্লী-মধ্যে "দেবী ডাক্তারের" অপূর্ব্ব হাতযশের স্বকপোল-কল্পিত কাহিনী প্রচার করিতেন, এবং তাহার বিনিময়ে ডাক্তার তাঁহাদের বাড়ীতে বিনা-দর্শনীতে রোগের চিকিৎসা করিতেন, ঔষধেরও মূল্য লইতেন না; তাহার উপর ঐ সকল হিতৈষী প্রতিবেশীদের দুই-এক সপ্তাহ অন্তর নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করিতেন। এই প্রকার বিজ্ঞাপনের কৌশলে দুই-তিন বৎসরের মধ্যে দেবীপ্রসন্নের পশার হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিল।

সদরের ঘর দুইখানা ডাক্তারের কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ায় কর্ত্তাকে অন্দরে আশ্রয় লইতে হইল। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবরা অন্দরেই কর্ত্তার কাছে বসিতেন। পিসিমা কাশীবাসিনী হইলে হেমাঙ্গিনীর ব্যবস্থায় সদর ও অন্দরের ব্যবধান বিলুপ্ত হইল। রোগী ব্যতীত অন্য যে কোন পুরুষ আসিলে দ্বারবান তাহাকে অন্দরে পাঠাইয়া দিত। অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিতলের একটা বড় কক্ষ হেমাঙ্গিনীর সুসজ্জিত ড্রইং-রুমে পরিণত হইল। দেবীপ্রসন্নের বন্ধু-বান্ধবরা উপরের বৈঠকখানাতে, ও নীচের বৈঠকখানায় তাঁহার পিতার সুহৃদগণ মজলিস্ করিতেন। নীচে প্রৌঢ়দের মধ্যে যখন তাস-পাসা বা দাবা চলিত, উপরে তখন হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে, হেমাঙ্গিনীর অথবা কোন সুকণ্ঠ যুবকের স্বরলহরী অট্টালিকার প্রতি-কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইত। সে সকল সঙ্গীত ঠিক শ্যামাবিষয়ক বা ভক্ত বৈষ্ণবের পদাবলী নহে; সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া নীচেকার বৈঠকখানায় প্রৌঢ়, এমন কি, বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত অনেক সময় খেলার চাল ভুলিয়া যাইতেন, এবং গড়গড়ার মুখ-নলটা মুখবিবরের পরিবর্ত্তে নাসারন্ধ্রে গুঁজিয়া দিয়া হাঁচিয়া মরিতেন!

হেমাঙ্গিনীর কন্যা লতিকা এই আবহাওয়ার মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করিয়া আয়ার কোলে মানুষ হইতে লাগিল—এ তথ্য পাঠকগণের স্মরণ থাকাই সম্ভব।

৪

রমেশ বাবুর কন্যা উমা ডাক্তারের কন্যা লতিকা অপেক্ষা তিন মাসের বড় ছিল। লতিকা খৃষ্টান আয়ার ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছিল; উমা তাহার পিতামহ-পিতামহীর ক্রোড়ে মানুষ হইতে লাগিল। পিতা-মাতার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি যেরূপই হউক না কেন, শিশু-প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র সমান। শিশু-হৃদয়ে ঘৃণা-লজ্জা-দ্বেষ-হিংসা থাকে না; নির্ম্মল হৃদয় বলিয়াই তাহারা অতি সহজে পরস্পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে। এই জন্য উমা ও লতিকা ভিন্নভাবে প্রতি-পালিত হইলেও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

লতিকা ও উমা উভয়েই সাত বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল; লতিকাকে ভর্ত্তি করা হইল লরেটো গার্ল্‌স্ স্কুলে, উমাকে ভর্ত্তি করা হইল মহাকালী পাঠশালায়। ফলে তাহাদের শিক্ষাপ্রবাহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইল।

লতিকার বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাহার পিতামহের মৃত্যু হইল। বৃদ্ধ তিন বৎসর পূর্ব্বে পেন্সন লইয়াছিলেন; সে সময় দেবীপ্রসন্নের বেশ পসার-প্রতিপত্তি হইয়াছিল, সুতরাং পিতা পেন্সন লওয়াতে দেবীপ্রসন্নের আর্থিক কষ্ট হয় নাই। এক্ষণে পিতার মৃত্যুতেও তাঁহার

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে কোন অসুবিধা হইল না। তালতলা, জানবাজার, শাঁখারিটোলা প্রভৃতি অঞ্চলেই তাঁহার 'ডাক্' অধিক হইত, সেইজন্য তিনি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে একটি 'চেম্বার' খুলিয়াছিলেন। গোয়াবাগানে, বাড়ীতে প্রাতে সাতটা হইতে নয়টা ও অপরাহ্নে বেলা চারিটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত বসিতেন, এবং ধর্ম্মতলায় প্রাতে সাড়ে নয়টা হইতে বারটা, ও সন্ধ্যার পর সাতটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বসিতেন; ইহার উপর রোগীর বাড়ীতেও যাইতে হইত। সন্ধ্যার পর কোন দিনই তিনি বাড়ীতে থাকিতেন না, কিন্তু সেজন্য হেমাঙ্গিনীর একাকিনী থাকিবার অসুবিধা হইত না। সন্ধ্যার পর প্রত্যহই তাহার ড্রয়িং-রুমে চায়ের মজলিস বসিত; সেই মজলিসে প্রায়ই সাত-আট জন বন্ধু—কখনও বা দুই-এক জন বান্ধবীও উপস্থিত থাকিত। লরেটো স্কুলে বালিকাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়,—অবশ্য ইংরেজী সঙ্গীত। লতিকার কণ্ঠস্বর খুব মধুর ছিল। তাহার মুখে ইংরেজী গান শুনিয়া হেমাঙ্গিনীর বন্ধুরা তাহাকে বাঙ্গালা গান শিখাইবার জন্য হেমাঙ্গিনীকে অনুরোধ করিত। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর তখন আরও দুইটি পুত্র হইয়া সংসার বাড়িয়াছিল; তাহার সঙ্গীত শিখাইবার অবকাশ ছিল না। অবশেষে অনেক বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্কের পর এক জন সঙ্গীতজ্ঞ যুবককে লতিকার সঙ্গীত-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হেমাঙ্গিনী নিজেও সেই শিক্ষকের ছাত্রী হইল। মাতা-পুত্রী উভয়েরই সঙ্গীত সাধনা মহা উৎসাহে চলিতে লাগিল।

লতিকা মধ্যে মধ্যে উমাদের বাড়ীতে যাইত, কিন্তু ইদানীং উমা লতিকাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসিত না। লতিকা তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে উমা বলিত—"না ভাই, তোমাদের বাড়ীতে যেতে আমার ভয় করে। কত সব অচেনা পুরুষ মানুষ থাকে! অত লোকের মধ্যে যাওয়া যায় বুঝি? আমার ভারী লজ্জা করে।" উমার কথা শুনিয়া লতিকা হাসিয়া আকুল হইত, বলিত, "তোর ত খুব সাহস!"

একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় উমা কি একটা প্রয়োজনে লতিকার কাছে গিয়াছিল। ড্রয়িং-রুমে সঙ্গীতের শব্দ শুনিয়া উমা মনে করিল, লতিকা হয় ত সেইখানেই আছে, তাই সে একেবারে ড্রয়িং-রুমের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে দেখিল—টেবিল-হার্ম্মোনিয়মের সম্মুখে, দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া চেয়ারে বসিয়া হেমাঙ্গিনী গান করিতেছে, আর গানের মাষ্টারটি তাহার পশ্চাতে তাহার কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া গানের ও বাজনার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিতেছে। হেমাঙ্গিনীর কপোলের কাছে মাষ্টারের মুখ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে! লতিকা সেখানে নাই। হেমাঙ্গিনী তখন গায়িতেছিল—

"বসন্তে না আসি, হে মোর প্রাণেশ
নিদাঘে আসিলে কেন?..."

লতিকাকে দেখিতে না পাইয়া উমা ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া গেল।

বার বৎসর বয়সেই উমার বিবাহ হইল। উমা দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পর হইতেই রমেশ বাবু কন্যার জন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে থাকেন। অবশেষে নদীয়া জেলার হরিহরপুরের প্রাচীন জমিদার হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ব্যোমকেশকে রমেশ বাবুর পছন্দ হইল। ছেলেটি সেই বৎসর এফ-এ পরীক্ষা দিয়াছিল, বয়স আঠার বৎসর, সুশ্রী, বিনয়ী ও বুদ্ধিমান। তবে হৃষীকেশ বাবু প্রাচীন জমিদারের বংশধর হইলেও মামলা-মোকদ্দমায় এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মাসিক দেড়শত টাকা বেতনের একটা চাকরি লইয়া হাওড়া-শিবপুরে সপরিবারে বাস করিতেন। জমিদারী লইয়া জ্ঞাতিদের সহিত যে মামলা চলিতেছিল, হাইকোর্টে তাহাতে তাঁহার পরাজয় হইলে তাহার শেষনিষ্পত্তির জন্য তিনি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া বিলাতে আপিল করিয়াছিলেন; বিলাত-আপিলের রায় তাঁহার অনুকূল হইলে তিনি বার্ষিক প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক হইবেন, আর পরাজয়ে অক্ষম-ঋণীর ভাগ্য যেরূপ হয়, তাহাই হইবে। তাঁহার আশা ছিল যে, ব্যোমকেশ যদি আইন-পরীক্ষায় পাশ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সে উকীল হইয়া সংসার চালাইতে পারিবে।

উমার রূপলাবণ্য দর্শনে হৃষীকেশ বাবু আনন্দিত হইলেন, তিনি সম্মতিদান করায় উমার সহিত ব্যোমকেশের বিবাহ হইয়া গেল।

উমার বিবাহের সময় হেমাঙ্গিনী কলিকাতায় ছিল

না, বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাক্তার মুখার্জ্জি সপরিবারে দার্জ্জিলিঙে গিয়াছিলেন।

৫

হরিহরপুরের জমিদারবাবুর বাটীতে আজ মহাসমারোহ। জমিদারবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সংপ্রতি উপনয়ন হইয়াছে, তদুপলক্ষে আজ রাত্রিতে থিয়েটার হইবে। কলিকাতা হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত "শান্তি" থিয়েটার-কোম্পানী অভিনয় করিতে আসিয়াছে; বঙ্কিমবাবুর "বিষবৃক্ষ" নাটকাকারে অভিনীত হইবে। জমিদারবাবুদের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে ঠাকুরদালানের বিপরীত দিকে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছে। ষ্টেজের সম্মুখে ঠাকুরদালান পর্য্যন্ত সারি সারি চেয়ার ও বেঞ্চ পাতা, ঠাকুরদালানের পাঁচটা ফুকর ও দ্বিতলে দুই পার্শ্বের বারান্দার জানালায় চিক দিয়া মহিলাদের বসিবার স্থান করা হইয়াছে। পল্লীগ্রামে ইলেকট্রিক লাইট নাই, কলিকাতা হইতে "ডায়নামো" আনাইয়া সমস্ত অট্টালিকা বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত করা হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চের যবনিকা প্রলম্বিত রহিয়াছে, যবনিকার অন্তরালে কি হইতেছে, জানিবার জন্য উৎসুক বালক ও যুবকগণ অধীর হইয়া উঠিয়াছে। উপরে ও নীচে সমবেত নরনারীর অস্ফুট কলধ্বনিতে সহসা বাধা পড়িল; রাত্রি ঠিক সাড়ে আটটার সময় যবনিকার অন্তরালে ঘণ্টা-ধ্বনি হইবামাত্র ঐক্যতান বাদ্য আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে সকলের কলরব স্তব্ধ হইল।

প্রায় দশ মিনিটকাল ঐক্যতান বাদনের পর যেমন ঘণ্টাধ্বনি হইল, অমনি বাদ্যধ্বনি নীরব হইল, প্রাঙ্গণে আলোকমালা নির্ব্বাপিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা উত্তোলিত হইল। দর্শকগণ সবিস্ময়ে দেখিল, রঙ্গমঞ্চে তরঙ্গসঙ্কুল নদীবক্ষে বজরায় উপর দাঁড়াইয়া নগেন্দ্রনাথ মাঝিদিগের সহিত আলাপ করিতেছেন। পল্লীগ্রামের যে সকল লোক পূর্ব্বে কখনও থিয়েটার দেখে নাই, তাহারা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না যে, বাবুদের উঠানে, কাঠের তক্তার শুক্‌নো মাচার উপরে নদী কোথা হইতে আসিল, আর নদীজলে তরঙ্গই বা কিরূপে বহিয়া যাইতেছে, এবং কিরূপেই বা সেই তরঙ্গের আঘাতে বজরা দুলিতেছে! পল্লীর সরল, অনভিজ্ঞ নরনারীর দল যেন মন্ত্রমুগ্ধ!

হরিদাসী বৈষ্ণবীরূপে দেবেন্দ্রনাথের এবং হীরার গান শুনিয়া শ্রোতারা মুগ্ধ হইল; সেরূপ সুমিষ্ট কণ্ঠে উচ্চ গ্রামে সঙ্গীত তাহারা কখনও শোনে নাই। যাহা হউক, এইরূপে নয়নমুগ্ধকর দৃশ্যপটে ও সুধামাখা সঙ্গীতে এক অলৌকিক মায়াপুরী সৃষ্টি করিয়া রাত্রি সাড়ে বারটার পর অভিনয় শেষ হইল।

অদূরবর্ত্তী বাগান বাড়ীতে থিয়েটারের অভিনেতা, অভিনেত্রী ও দলের অন্যান্য লোকের বাসা। অভিনয়ের পরদিন প্রভাতে জমিদার-পত্নীর বৃদ্ধা পরিচারিকা ফকিরের মা ধীরে ধীরে সেই বাগান-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা বাবু, তোমরাই কি কাল রাত্তিরে—কি বলে—'সিয়েটা' ক'রেছিলে।"

লোকটি বলিল, "হাঁ, কেন?"

"যে মেয়েমানুষটা আজার আণী (রাজার রাণী) সেজে-ছ্যালো, আমাদের গিন্নীমা তেনারে ডাকতে বুল্লে।"

লোকটি বলিল, "ওঃ, গিন্নীমা তাকে ডেকেছেন? তা আমার সঙ্গে এস বাছা!" অভিনেত্রীরা সিগারেটের ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া যেখানে চা পান করিতেছিল, ফকিরের মাকে সেইখানে লইয়া গিয়া সে বলিল, "কাল রাণী সেজেছিলে কে? তাকে গিন্নীমা ডেকে পাঠিয়েছেন।" তাহার কথা শুনিয়া প্রধানা অভিনেত্রী চামেলী বলিল, "কাল রাণী সাজবার ত কোন পালা ছিল না।"

ফকিরের মা বলিল, "হিঁ, গিন্নীমা যে বল্লে গো, কি তার নামটা ধানী-নঙ্কা না কি, আমার কি অতো কথা মনে থাকে?"

তাহার কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। চামেলী বলিল "ধানী-নঙ্কা না সূর্য্যমুখী লঙ্কা?"

"হ্যাঁ মা হ্যাঁ, তাই বটে; আমার কি ও-সব নাম মনে থাকে?"

চামেলী বলিল, "আমিই তোমার সেই ধানী-লঙ্কা; তুমি একটু ব'স বাছা, আমি মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।" সে কক্ষান্তরে গমন করিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চামেলী বাইজীর মত সাজিয়া-গুজিয়া চক্ষুতে সুর্ম্মা ও ঠোঁটে লিপষ্টিক দিয়া ফকিরের মার সঙ্গে বাবুদের অন্দর-মহলে প্রবেশ করিল।

ফকিরের মা তাহাকে দ্বিতলে একটা কক্ষের দ্বার দেখাইয়া বলিল, "গিন্নীমা ঐ ঘরে আছে, আজ্ঞে, আপুনি যাও।"

চামেলী মনে করিয়াছিল, "গিন্নীমা" বৃদ্ধা না হইলেও অন্ততঃ প্রৌঢ়া হইবেন। কিন্তু সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, কক্ষমধ্যে একখানা কৌচে জমিদারবাবু এবং সেই কৌচেরই এক-পার্শ্বে জমিদার-গৃহিণী বসিয়া আছেন। জমিদারবাবুর বয়স বোধ হয় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। তিনি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, উন্নত নাসিকা, বুদ্ধিমত্তাব্যঞ্জক তীক্ষ্ণ আয়ত নেত্র, একটা সূক্ষ্ম আদ্দির পাঞ্জাবীর ভিতর দিয়া শুভ্র উপবীতগুচ্ছ বক্ষে প্রলম্বিত দেখা যাইতেছিল। জমিদার-পত্নীর বর্ণ স্বামীর বর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল, তাঁহার শরীর ঈষৎ স্থূল, সীমন্তের সিন্দুরবিন্দু নবারুণের মত শোভা পাইতেছে। প্রকোষ্ঠে তিনগাছা করিয়া সোণার চুড়ি, গলায় একগাছি সূক্ষ্ম হার, এবং কর্ণে দুইটি হীরার দুল ব্যতীত তাঁহার অঙ্গে আর কোন অলঙ্কার ছিল না। পরিধানে একটি চওড়া লাল-পাড় সাদা গরদের শাড়ী।

চামেলী এই যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া সহসা স্তব্ধ হইয়া মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বারের নিকট স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া উভয়ের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। জমিদারবাবু তাহাকে একখানা চেয়ার দেখাইয়া বসিবার ইঙ্গিত করিলেন; কিন্তু চামেলী চেয়ারে না বসিয়া জমিদার-পত্নীর পায়ের কাছে, গালিচার উপর উপবেশন করিল। জমিদারবাবু আর কিছু না বলিয়া কোমল মধুর স্বরে বলিলেন—"তোমার নাম চামেলী?"

চামেলী অবনত মস্তকে ও-কথা স্বীকার করিলে জমিদারবাবু বলিলেন, "কাল তোমার অভিনয় দেখে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য ইনি তোমাকে এই সামান্য উপহার দিতে ইচ্ছা করেছেন।" তিনি মখমলে-বাঁধা একটি ক্ষুদ্র বাক্স তাহাকে দিতে উদ্যত হইলে চামেলী নতজানু হইয়া যুক্তকরে সেই বাক্সটি লইয়া নিজের মাথায় ধরিয়া সবিনয়ে কহিল, "আপনার এই অনুগ্রহের দান আমার শিরোধার্য্য।"—সে পুনর্ব্বার প্রণাম করিল। জমিদার বলিলেন, "দান আমার নয়, উঁহার। তার অনুগ্রহ কি নিগ্রহ, তাহার বিচার আমি করবো না।" তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

জমিদার-গৃহিণী এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই, স্বামী দৃষ্টির অন্তরালে প্রস্থান করিলে তিনি চামেলীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "এইখানে আমার পাশে ব'স।"—চামেলী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আ-আমি কি আপনার সঙ্গে এক আসনে—"

জমিদার-পত্নী চামেলীকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "নাম বদলে চামেলীই হও, আর গোলাপ মল্লিকেই হও, আমাকে ফাঁকি দিতে পার এমন ক্ষমতা তোমার নেই লতি!"

চামেলী সবিস্ময়ে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনি! আপনি!"

"আমি উমা। মুখে রং মেখে উমার চক্ষুকে ফাঁকি দিবার সাধ্য লতিকার নেই।"

উমার কথা শুনিয়া লতিকা থর-থর করিয়া দুই তিন বার কাঁপিয়া অচেতন হইয়া উমার বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল। লতিকাকে অজ্ঞান দেখিয়া উমা বিচলিত হইল না, সাহায্যের জন্য কাহাকেও ডাকিলও না, স্থিরভাবে লতিকার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। প্রায় দশ মিনিট পরে লতিকার নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ হইল। আরও দশ মিনিট পরে লতিকা পূর্ণ জ্ঞান পাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "উমা, তোমার না শিবপুরে বিয়ে হ'য়েছিল? তুমি এখানে কি ক'রে এলে?"

"শিবপুরের বাসাবাড়ীতে তখন আমরা থাকতেম। জমিদারী নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে তখন মামলা চ'লছিল। বিলেত-আপিলে সেই মামলায় জিত হওয়ায় আমরা আবার আমাদের জমিদারীর মালিক হ'য়েছি। কিন্তু তোমার এ দশা কেন?"

এই প্রশ্নের উত্তরে লতিকা যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম এই - ডাক্তার মুখার্জ্জির মাসিক সাত-আট শত টাকা আয় ছিল বটে, কিন্তু ঘোড়-দৌড়ের জুয়ার নেশায় ভিতরে ভিতরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, শেষে এক মাড়োয়ারীর কাছে তাঁহার বাড়ী বাঁধা পড়িয়াছিল। লতিকার বয়স যখন পনের বৎসর, তখন ঋণের জ্বালায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া ডাক্তার আত্মহত্যা করেন। এই দুর্ঘটনায় লতিকার ও তাহার ভ্রাতা শিব-প্রসন্নের লেখা-পড়া বন্ধ হয়; তাহার অন্যান্য ভ্রাতা-ভগিনী-গুলির অল্প বয়সেই মৃত্যু হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর

হেমাঙ্গিনী কন্যা ও পুত্রকে লইয়া সেই বাড়ীতেই বাস করিতেছিল, এবং অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল। এইরূপে আরও তিন বৎসর অতীত হইলে একদিন লতিকা শুনিতে পাইল যে, তাহার মাতা সেই মাড়োয়ারী মহাজনের প্ররোচনায় ও প্রলোভনে পড়িয়া তাহার দমদমার বাগান-বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তখন হেমাঙ্গিনীর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর, এবং তাহার পুত্র শিবপ্রসন্নের বয়স ষোল বৎসর। মাতার কলঙ্কে মর্ম্মাহত শিবপ্রসন্ন সমাজে মুখ দেখাইতে না পারায় বিবাগী হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। সেই দুশ্চরিত্র নরপশুটা হেমাঙ্গিনীকে প্রমোদসঙ্গিনী করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; তাহার যুবতী কন্যা লতিকার উপরও তাহার লালসা-বিহ্বল দৃষ্টি পতিত হওয়ায় লতিকা নিরুপায় হইয়া নিজের পরিচয় গোপন করিয়া, "চামেলী" নাম লইয়া কলিকাতার উক্ত থিয়েটারের দলে প্রবেশ করিল। ইহাতেই তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়নির্ব্বাহ হইতেছে। নানা প্রলোভনেও সে চরিত্রের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছে।—ইহাই চামেলীর অভিনেত্রী-জীবনের ইতিহাস।

উমা নীরবে সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, "বিধাতার যা মনে ছিল, তা হ'য়েছে। এখন আমার একটা কথা রাখবে, ভাই?"

"কি কথা?"

"তুমি থিয়েটার ছেড়ে দাও। আমরা এই গ্রামে মহাকালী পাঠশালার আদর্শে মেয়েদের জন্য একটা স্কুল করেছি। তুমি তোমার নিজ নামে সেই স্কুলে ইংরেজী আর গান-শিখানোর ভার নাও। তুমি যে একদিন এই গ্রামে এসে থিয়েটার ক'রে গিয়েছ, আমরা ছাড়া আর কেউ তা' জানবে না। তুমি কুমারী লতিকা দেবী হ'য়ে ভদ্র হিন্দুমহিলার মতই থাকবে। স্বতন্ত্র বাসা পাবে, অর্থাভাবে কষ্ট পেতে হবে না। আমি জানি, তুমি পুরুষ মানুষকে ভয় কর না, কিন্তু অনেক সময় ভয়ও করতে হয়; তুমি সেই মাড়োয়ারী মহাজনের ভয়েই ত বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছ। আজ কলকাতায় ফিরে যাও। যদি আমাদের প্রস্তাব সঙ্গত ব'লে মনে কর, সেখানে গিয়েই আমাকে পত্র দিয়ো; আমি তোমার এখানে আস্‌বার ব্যবস্থা ক'রব। এখন এটা বাল্যসখীর উপহার ব'লে নিয়ে গলায় দাও।"

এই বলিয়া সেই মখমলমণ্ডিত বাক্স হইতে একটি রত্ন-হার বাহির করিয়া সে লতিকার গলায় পরাইবার উদ্যোগ করিলে, লতিকা বাধা দিয়া বলিল, "তুমি আমার চেয়ে তিন মাসের বড়, আমি তোমার ছোট। এই হার তুমি নিজে পর, তোমার গলায় ঐ যে সরু হার রয়েছে, তোমার প্রসাদ ব'লে ঐ হারছড়াটা আমায় দাও।"

উমা তখন নিজের কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিয়া দুই ছড়া হারই লতিকার গলায় পরাইয়া দিল। নানা অলঙ্কারধারিণী লতিকা প্রায় নিরাভরণা উমার পদতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল; তাহা দেখিয়া মনে হইল, "স্বর্ণ-দেউটি যেন তুলসীর মূলে!"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নিবেদন

অন্ধের মত তোমাতেই ডুবে থাকি
কত কাল আর রহিব তোমারে ভুলে?
কল্পিত মম অকূল পাথারে মজি
বুঝিতে পারি না আছি তব পাদমূলে।

প্রতি পলে নব বন্ধন-দুখ সহি
যুগ-যুগান্ত পিছে কত হলো জমা,
মিলাইয়া লহ এবার তোমার সাথে
সব অপরাধ নিজগুণে করি ক্ষমা॥

শ্রীমতী মাধুরী ঘোষ

রাষ্ট্রের রূপ

মুষ কেবল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে থাকতে পারে না ;
মাজিক স্বার্থের আকর্ষণও সে অনুভব করে। নিজের স্বার্থের
ং সামাজিক স্বার্থের কথা ভাবা তার পক্ষে স্বাভাবিক।
র্থপরতা আর পরার্থপরতা—দুটি জিনিষই মানুষের প্রকৃতিগত।
র এই জিনিষকে ভিত্তি ক'রেই তার সমাজ-জীবন গঠিত
য়েছে, তার নীতি-বাদ রচিত হয়েছে।

তবে এ-কথা সত্য যে, কোন-কোন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ
আকারে, কারো মধ্যে বা সামাজিক স্বার্থ বড় আকারে দেখা দেয়!
দের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের মূল্য বেশী, তারা ধনী হয়; বিষয়-
পত্তি করে; নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যাদের
ছে সামাজিক স্বার্থের মূল্য বেশী, তারা দেশপ্রেমিক হয়; দশের
লের জন্য সাধনা করে; বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সেবায়
ভিন্ন সামাজিক আদর্শের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে।

বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষের উপরেই সমাজের
ল এবং উন্নতি নির্ভর করে। তাদের উৎসাহ এবং কর্ম্মতৎপরতাই
জকে জীবনের উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়, আর তাদের অবসাদ
: নিরুৎসাহ সমাজের পতন এবং মৃত্যুর কারণ হয়।

মানুষে আর পশুতে তফাৎ এই যে, মানুষের জীবন চিন্তার দ্বারা
: পশুর জীবন দৈহিক প্রয়োজনের তাড়নায় পরিচালিত হয়।
ষ যত উচ্চে উঠতে থাকে, চিন্তার, Ideaর প্রভাব তার
বনে তত বাড়তে থাকে। সভ্যতার বিকাশ এবং বিস্তারের
রই হচ্ছে চিত্তের বিকাশ, আইডিয়ার (Idea) সম্প্রসারণ।

প্রত্যেক যুগেই মানুষ সামাজিক জীবনের একটা না একটা
র্শ, একটা না একটা পরিকল্পনা নিয়ে তার বেষ্টনীর সম্মুখীন
ছে। মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হলো তার মনের ইতিহাস; তার
ভন্ন আদর্শের, তার বিভিন্ন পরিকল্পনার উৎপত্তি, বিকাশ এবং
র ইতিহাস; এবং তার বিভিন্ন আদর্শ এবং পরিকল্পনার,
দ্ব, মিলনের ও সংমিশ্রণের ইতিহাস। এই যে দ্বন্দ্ব,
মিশ্রণ, আর মিলন—এ অবিরাম-ভাবে চলেছে আর চিরকালই
ব। এই দ্বন্দ্বে, এই সংগ্রামে সেই Idea, সেই পরিকল্পনাই
হয়—যা দেশ, কাল এবং পাত্রের উপযোগী। যে Idea বা
কল্পনায় এ উপযোগিতার অভাব ঘটে, সেটি শেষে পরাভূত হয়;
' সমাজ দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয়; না
সমাজ-দেহে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থান অধিকার ক'রে পড়ে'
ক। মানব ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এই ভাবে বিভিন্ন যুগে
ন্ন Idea, বিভিন্ন পরিকল্পনা এসেছে, দু'দিনের জন্য নায়কের
কায় অভিনয় করেছে, তার পর হয় মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়েছে,
য় নায়কের ভূমিকা ছেড়ে কোন ক্ষুদ্রতর ভূমিকা নিয়ে তাকে
ই থাকতে হয়েছে!

এমন এক যুগ ছিল, গোষ্ঠীর আদর্শকেই (clanship) মানুষ
। সব চেয়ে স্বাভাবিক, সব চেয়ে জীবন্ত প্রাণবন্ত
সামাজিক আদর্শ ব'লে মনে করতো। তখন গোষ্ঠীর ভিত্তির উপর
রাজ্য স্থাপিত হতো, সাম্রাজ্য স্থাপিত হতো, ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত
হতো, সব কিছু স্থাপিত হতো। এই গোষ্ঠীর আদর্শেই সাইরাসের
(Cyrus) সাম্রাজ্য স্থাপিত হলো, চেঙ্গিজ খাঁর সাম্রাজ্য স্থাপিত
হলো। এই গোষ্ঠীর আদর্শেই রাজপুত, পাঠান প্রভৃতি জাতির রাষ্ট্রীয়
জীবন স্থাপিত হলো। এই গোষ্ঠীর আদর্শেই ভারতীয় আর্য্যদের
এবং ইহুদিদের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো। এখনও ভারতবর্ষের
সামাজিক জীবন এই গোষ্ঠীর ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে।
কিন্তু কার্য্যকরী জীবন্ত প্রাণবন্ত আদর্শ হিসাবে clan idea বা গোষ্ঠী-
মূলক পরিকল্পনা এখন সভ্য জগৎ থেকে এক রকম লোপ পেয়েছে।
গোষ্ঠী অতীতের জিনিষ; বর্ত্তমানে তার জীবন মরণাপন্ন, ভবিষ্যৎ
তার নাই বললেও চলে।

গোষ্ঠীর পর (অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে) নাগরিক
রাষ্ট্রের আইডিয়ার প্রভাব দেখতে পাই। বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক
মিলে নগর রচনা করলো; তারপর নাগরিক রাষ্ট্রের জীবন
আরম্ভ হলো। নাগরিক জীবন থেকেই এক রকম উচ্চতর সভ্যতার
সূচনা হলো। ইউরোপীয় ভাষায় সভ্যতার সংজ্ঞামূলক শব্দই
হচ্ছে নাগরিক জীবন—civilisation। এই নাগরিক পরি-
কল্পনার ভিত্তির উপর বড় বড় সাম্রাজ্য, বড় বড় সভ্যতা গঠিত
হয়েছে। রোম, এথেন্স, কার্থেজ প্রভৃতির নাম কে না জানে?
কিন্তু কালের দুর্ব্বার প্রবাহ সবই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নাগরিক
রাষ্ট্রের পরিকল্পনা এখন আর জীবন্ত কার্য্যকরী Idea নয়; অতীতের
সেই জীবন্ত আদর্শের স্মারকরূপে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রয়ে গেছে
বড় বড় সহরের Corporation, City Council প্রভৃতি—এই
পর্য্যন্ত!

নাগরিক সভ্যতার লয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মীয় রাষ্ট্রের
আবির্ভাব দেখতে পাই! ইউরোপে পোপ আর সম্রাট এসে দেখা
দিলেন। প্রাচ্যে দেখা দিলেন খলিফা। ধর্ম্মীয় রাষ্ট্রের গৌরবের যুগও
বিশ্বসভ্যতায় এক স্মরণীয় যুগ। খলিফা হারুণার রশিদ আর
সম্রাট সারলমেনের (Charlemagne) কথা কে না শুনেছেন?

মধ্য-যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা অভিনব
ভাবে ইউরোপে এসে দেখা দিল, যার ফলে এলো Renaissance.
বিজ্ঞানের নব-জীবন লাভ, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি শিথিল
হ'তে লাগলো! আর তার স্থানে এসে দেখা দিল রাষ্ট্রীয় জীবনের নূতন
এক আদর্শ Nationalism—জাতীয়তা-বাদ। এই আদর্শই এখন
পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ দখল ক'রে আছে। এরই অভিনয় বিশ্ববাসী
কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে। ভবিষ্যতে হয় তো অপর কোন
রাষ্ট্রীয় আদর্শ এসে বর্ত্তমানের এই জীবন্ত প্রাণবন্ত আদর্শকে জীবনের
রঙ্গমঞ্চ থেকে বিতাড়িত করবে। যাক, সে সুদূর ভবিষ্যতের
কথা! আমাদের সে কথা ভাববার দরকার নাই। আপাততঃ
আমাদের এই জীবন্ত জাতীয়তা-বাদের কথাই ভাবা যাক, আর

আমাদের ভারতীয় জীবনে এ আদর্শের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা করা যাক।

দু'কথায় বলতে গেলে Nationalism বা জাতীয়তা-বাদের আদর্শ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুবিধাজনক এক ভৌগোলিক পরিবেশ বা এলাকার মধ্যে মূর্ত্ত ক'রে তোলা; সেই ভৌগোলিক পরিবেশের প্রতি মানুষের ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা জাগিয়ে তোলা; তার সেবায়, তার মুক্তি এবং মঙ্গলের সাধনায় মানুষের সর্ব্ববিধ শক্তি এবং প্রয়াসকে পরিচালিত করা; এবং সেই ভৌগোলিক পরিবেশকে সর্ব্বপ্রকার সামবায়িক জীবনের স্নায়বিক কেন্দ্রে পরিণত করা। এই ভাবেই বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন জাতীয়তা-মূলক রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে' উঠেছে, আর তারাই এখন মানবজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইউনাইটেড ষ্টেটস, জাপান প্রভৃতির কথা কে না জানেন?

জাতীয়তার আদর্শ যে বর্ত্তমান যুগে এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তার কারণ কি?

প্রথম কারণ, এ আদর্শের নির্দ্দিষ্ট একটা ভৌগোলিক রূপ আছে। দেশ-প্রেম বললে দেশের প্রতি প্রেম, কোন্‌খানে তার সীমানা, কোন্‌টা বিদেশ, দেশের মানুষ কারা, দেশের মানুষ কারা নয়, কারা প্রতিবেশী, কারা প্রতিবেশী নয়, এই সব প্রয়োজনীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা মানুষের মনে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে; আর তার ভাব এবং অনুভূতিকে বিশেষ একটা রূপ দিতে, তার প্রয়াসকে সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় কারণ, সাধনার এবং কর্ম্মের বৈধতা এবং অবৈধতার সহজবোধ্য এবং প্রমাণ-সাপেক্ষ একটা মাপকাঠির (Standard) আদর্শ আমাদের হাতে তুলে দেয়। দেশের মঙ্গলের দিক থেকে বিচার করলে কোন্ কাজটা দেশের পক্ষে কল্যাণকর, আর কোন কাজটা কল্যাণকর নয়; কোন্ আন্দোলন থেকে দেশের মঙ্গল হবে, কোন্ আন্দোলন থেকে দেশের অনিষ্ট হবে; কারা দেশের উপকার করছে, কারা দেশের অনিষ্ট করছে,—এ সব সহজে বোঝা যায়।

তৃতীয় কারণ, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের অতি-প্রয়োজনীয় শাস্ত্রসমূহের আলোচনায় এ আদর্শ কোনো বিঘ্নের সৃষ্টি তো করেই না, পক্ষান্তরে এ সকলের আলোচনা এবং সাধনা যাতে ব্যাপকভাবে হয়, তার জন্য এ আদর্শের সমর্থকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কেন না, তাঁরা জানেন, দর্শন এবং বিজ্ঞানের উন্নতির উপর এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসারের উপর জাতীয় মঙ্গল একান্তভাবে নির্ভর করে। মানুষ ধর্ম্মে বিশ্বাস করে কি করে না, দেবতাদের বিষয়ে কে কি ধারণা মনে পোষণ করে, পরকালে বিশ্বাস করে কিনা—জাতীয়তাবাদ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই বিভিন্ন দার্শনিক-মতবাদীরা এ-আদর্শের সেবায় এবং সাধনায় সহজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনের রাষ্ট্রনেতা Chiang Kei Sheikএর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি আর তাঁর সহধর্ম্মিণী হলেন Methodist-মতবাদী খৃষ্টান, অথচ এই বিষম জাতীয়-সঙ্কটের সময় তাঁরা এমন এক দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে পরিচালিত করছেন, যার অধিকাংশ অধিবাসীই ধর্ম্ম-বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। একমাত্র জাতীয়তা-মূলক রাষ্ট্রেই এ ঘটনা সম্ভব।

চতুর্থ কারণ, এ আদর্শের স্বাভাবিক প্রকৃতি (Natural tendency) হচ্ছে, নির্দ্দিষ্ট এক জনসমিতিকে বিভেদের পথে নিয়ে না গিয়ে ঐক্যের এবং সম্প্রীতির পথে নিয়ে যায়। এ আদর্শ এমন সব বিষয়ে মতের ঐক্য দাবী করে, যে সব বিষয়ে মত-ভেদের সম্ভাবনা অল্প; এবং যে সব বিষয়ে মতদ্বৈধের সম্ভাবনা আছে, অথচ সে মতভেদ দূরীকরণের কোন tangible test বা পরীক্ষা-মূলক মাপ নাই, সে সব বিষয়ে এ আদর্শ ঐক্যের প্রত্যাশা রাখে না, কিম্বা ঐক্য-সৃষ্টি করবার কোন রকম কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে না। সেজন্য এ আদর্শ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির এবং আলোচনার যুগে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী কালোপযোগী।

পঞ্চম কারণ, এই জাতীয়তার আদর্শ মানুষকে সর্ব্ববিধ সামবায়িক সাধনার প্রশস্ততম ক্ষেত্রের সন্ধান দেয়। ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কিছু করতে গেলেই প্রশ্ন ওঠে, কে আমার স্বধর্ম্মী আর কে স্বধর্ম্মী নয়! তার পর প্রশ্ন ওঠে, ধর্ম্মের বিষয়ে কে আচার-সম্মত মত পোষণ করে আর কে তা করে না! তার পর প্রশ্ন ওঠে, ধর্ম্মের ধুরন্ধরেরা এ বিষয় কি ভাবেন? যাঁরা ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কিছু করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরাই জানেন, সে কি দুরূহ ব্যাপার। প্রগতিপন্থী ব্যক্তিমাত্রকেই ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে ফিরতে হয়েছে। জাতীয়তার আদর্শে এ সব বাধা আসে না। এ-পথে মানুষ সহজেই দেশ-প্রেমিকের সহযোগিতা লাভ করতে পারে, এবং সাধনাকে সার্থক করে তুলতে পারে।

ষষ্ঠ কারণ, জাতীয়তা-বাদের আদর্শ মানুষের দৃষ্টিকে স্বভাবতঃ ভবিষ্যতের দিকে ফিরিয়ে অতীতের আনুগত্যের দৃষ্টিকে অন্ধ, এবং তার সাধনাকে পঙ্গু করে না। সে জাতীয় মঙ্গলের কথা আর তার ভবিষ্যতের কথাই ভাবে! এবং সেই দৃষ্টি নিয়েই সমস্যার আলোচনা আর বিচার করে; অতীতের অকাট্য শাস্ত্র-বাক্যের মাপকাঠি নিয়ে বর্ত্তমান সমস্যার আলোচনা কিম্বা সিদ্ধান্ত করে না।

সপ্তম কারণ, এ আদর্শ মানুষের সর্ব্ববিধ মঙ্গল-সাধনাকে ব্যাপক এবং বৃহত্তর মঙ্গলের সাধনায় নিয়োজিত, সংযোজিত এবং নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। মানুষ যে-ক্ষেত্রেই কাজ করুক না কেন, তার কাজের একটা সামাজিক মূল্য আছে। তার কাজ থেকে সমাজের উপকার হবে কি না, কতটা উপকার হবে, তার কাজে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে কি না, তার কাজে ইষ্টের সম্ভাবনা বেশী কি অনিষ্টের আশঙ্কা বেশী, এ সব বিষয় জাতীয়তার আদর্শ থেকে বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং মতের ঐক্য-স্থাপন করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। ধর্ম্মীয় আদর্শের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না।

অষ্টম কারণ, এ আদর্শে প্রত্যেক নাগরিককে সহজবোধ্য এক অধিকার দেয়; আর তার স্কন্ধে সহজবোধ্য দায়িত্ব স্থাপন করে। প্রত্যেক নাগরিকই তার অধিকার এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সহজে অবহিত হতে পারে। তা ছাড়া, তার অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে সে যদি অসন্তুষ্ট হয়, তা হ'লে তার প্রতিবিধানের সহজ উপায়ও তার করায়ত্ত। আলোচনা এবং আন্দোলনের সাহায্যে সে দায়িত্ব এবং অধিকারের অনুপাত এবং তার সীমানা তার মর্জ্জি মাফিক সে ক'রে নিতে পারে। সেজন্য জাতীয়তা-বাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহের ভাব সহজে তার মনে জাগে না

নবম কারণ, এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে এ আদর্শ [illegible]বার এবং সাধনার নিত্য নূতন পথে যেতে মানুষকে উৎসাহিত [এ]বং অনুপ্রাণিত করে। দেশের মঙ্গল যখন আদর্শ, তখন কিসে [সে] মঙ্গল সাধন করা যেতে পারে, সেই দিকেই মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ [হ]য়, অন্য কোন অবান্তর কথা ভাববার তার সময় থাকে না। এবং [এ]ই মঙ্গল সাধনের জন্য মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই নিত্য নূতন পথে [অ]গ্রসর হয়। কেন না, সে বোঝে যে, অতীতের অভিজ্ঞতার উপর [প্র]তিষ্ঠিত নূতন পন্থা প্রাচীন পন্থার চেয়ে ভাল। দেবতাদের [অনু]মত, সমর্থন বা অসমর্থন তার সহজ-বুদ্ধিকে বিকৃত কিম্বা [লক্ষ্য]ভ্রষ্ট করে না।

মধ্যযুগে রাষ্ট্রই ছিল ধর্ম্মের ভিত্তি। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের [ভি]ত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্র য়ুরোপে নাই। ধর্ম্ম সেখানে [আজ]ন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না; মানুষের আধ্যাত্মিক [জী]বন এবং তার পারলৌকিক মঙ্গল নিয়েই থাকে। প্রাচ্যের [স্বা]ধীন রাষ্ট্রসমূহেও ধর্ম্ম এখন রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে দ্রুত বাঞ্চত [হচ্ছে]। তুরস্ক, ইরাণ, চীন, জাপান প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা [যে]তে পারে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ নয়। এখানকার রাষ্ট্রীয় জীবন [অ]নেকাংশে বৈদেশিক শক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। [জনস]াধারণের মধ্যে কিন্তু দুটি আদর্শের প্রভাব কার্য্যকরী ভাবে [দেখ]তে পাওয়া যায়। একটি প্রাচীন ধর্ম্মীয় আদর্শের; দ্বিতীয়টি [আ]ধুনিক জাতীয়তার আদর্শের।

ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব কি? এ [আ]দর্শ কি বর্ত্তমান যুগে চলতে পারে? রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের [অ]াঙ্গি সম্পর্ক রাখা কি বর্ত্তমান যুগে বাঞ্ছনীয়?

এখন এই সব সমস্যার আলোচনা করা যাক। তবে [এ]স্থানে ব্যক্তিগত একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার মনে [করি]। ধর্ম্মে আমি একান্ত ভাবে আস্থা রাখি, আর ধর্ম্মকে [আ]মি জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলেই মনে করি। তবে [রাষ্ট্রে]র সঙ্গে ধর্ম্মের কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলে' আমি [বিশ্ব]াস করি না।

রাষ্ট্রের কারবার হলো ইহজীবনের স্বার্থ এবং সুবিধা নিয়ে; [ব্যক্তি]গত স্বার্থ-সুবিধা, বংশগত স্বার্থ-সুবিধা, শ্রেণীগত স্বার্থ-সুবিধা, [জাতি]গত স্বার্থ-সুবিধা, এই সব স্বার্থ-সুবিধা নিয়েই রাষ্ট্রের [প্রাত্য]হিক কারবার। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে (ইলেকসন্ [প্র]তিতে) যে-দল জয়ী হয়, সে দল স্বার্থের দিক্ থেকে যথেষ্ট [লা]ভবান হয়; পক্ষান্তরে, যে দল পরাজিত হয়, সে দল স্বার্থের [দিক্] দিয়ে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে [যৎ]মাত্র যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন, রাষ্ট্রের কারবারই [হলো] এযুগে সব চেয়ে বড় কারবার। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মকে রাষ্ট্র[থে]কে পৃথক্ না করলে ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম থাকে না, বড় একটা ব্যবসায়ে [পরিণ]ত হয়। আর ধর্ম্মের ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ার মানেই হলো তার [মৃত্যু]! কেন না, সে অবস্থায় ধর্ম্মের নামে যে সব জাগীর ছাড়া হয়, [সে]গুলো প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের জাগীর নয়, স্বার্থের জাগীর। তা' ছাড়া [এ] অবস্থায় ধর্ম্মের গুরুত্বপূর্ণ পদে নানা রকম চালাকি এবং [ফন্দি]র সাহায্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁদের কাছে ধর্ম্মের চেয়ে [ব্যক্তি]গত স্বার্থের মূল্যই বেশী। প্রকৃত ধর্ম্মের ভিত্তি হলো ত্যাগ আর সংযম। এ দুই আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অর্থ-সম্পদের নিবিড় সংযোগ কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। সে সংযোগ যেখানে হয়েছে, সেইখানেই স্বার্থ প্রকৃত ধর্ম্মের আসন দখল করেছে! অর্থ নিজেকে পরমার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে!

তার পর ধর্ম্মে যেমন শাশ্বত সত্য আছে, তেমনি এমন অনেক জিনিষ আছে, যাকে সত্যের আপেক্ষিক সত্য (Relative Truth) বলা যেতে পারে;—যাদের যৌক্তিকতা এবং বৈধতা বিশেষ এক যুগ কিম্বা বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ—যা বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা এবং ভাব-ধারার সঙ্গে খাপ খায় না। ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁরা ধর্ম্মের শাশ্বত অংশের উপরেই ধর্ম্ম-সাধনার ভিত্তি স্থাপন করেন; আর ধর্ম্মের আপেক্ষিক অংশগুলিকে যুগ এবং স্থানোপযোগী ক'রে নেবার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে, যাঁরা ধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শের সঙ্গে সংস্রব রাখেন না, অথচ ধর্ম্মকে উপলক্ষ ক'রে ধর্ম্মেতর আদর্শের অনুসরণ ক'রতে চান, তাঁরা ধর্ম্মের শাশ্বত এবং চিরন্তন আদর্শগুলিকে বর্জ্জন ক'রে, তার আপেক্ষিক অংশগুলিকে অবলম্বন ক'রে প্রকৃত ধার্ম্মিক এবং সত্য-সাধকদের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করেন। এই সহজ উপায়ে ধর্ম্মের ধ্বজধররূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রবার চেষ্টা করেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক Jesus Christকে তাই তথাকথিত ধর্ম্মের রক্ষক Phariseeদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে, শেষে মামুলি এক জন অপরাধীর মত ক্রস কাষ্ঠে দেহত্যাগ করতে হ'য়েছিল। এইখানেই হলো ধর্ম্মীয় সভ্যতার এবং ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্বাভাবিক এবং মৌলিক দুর্ব্বলতা।

ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্যকে জনসাধারণ সহজে বুঝতে পারে না। সে বিষয়ে সাধারণতঃ তারা মনে ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ ক'রে থাকে। যে সব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ধর্ম্মের শাশ্বত সত্যের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন, তারা তাঁদের ধর্ম্মের শত্রু মনে ক'রে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত করে। আর যে সব সংকীর্ণমনা স্বার্থসেবী তাদের কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেয়, তাদের তারা ধর্ম্মের এক-এক ধুরন্ধর মনে করে, প্রকৃত ধর্ম্মাত্মাদের লাঞ্ছনায় তাদেরই নির্দ্দেশ এবং ইঙ্গিতের অনুসরণ করে। ধর্ম্ম যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেছে, সেইখানেই শাশ্বত সত্যের বিরুদ্ধে, প্রকৃত ধর্ম্মাত্মাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নের অভিযান চালিয়েছে, আর তার ফলে উন্নতির পথ ছেড়ে সমাজের অধোগতি হ'য়েছে; ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অন্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে দুর্ব্বার রাষ্ট্র-শক্তি যোগ দিয়েছে আর উভয়ে মিলে সত্যকে পদদলিত করেছে। ধর্ম্মকে রাষ্ট্র-শক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মানেই হচ্ছে, সেই অতীত যুগের বর্ব্বরতার পুনরভিনয়। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি সে পথের সমর্থন করতে পারেন না।

তার পর যে সব তথ্যের আলোচনা, যে সব বিষয় সম্বন্ধে detailed ধারণা এবং মতবাদ ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেই সব তথ্য এবং বিষয় নিয়ে দর্শন এবং বিজ্ঞান আলোচনা করেছে এবং নিত্যই ক'রছে। তবে উভয়ের দৃষ্টি-ভঙ্গি ভিন্ন, আর উভয়ে বিচারের ভিন্ন-ভিন্ন ধরণের মানদণ্ড ব্যবহার করে। ধর্ম্মের মানদণ্ড হচ্ছে Authority শাস্ত্রকারের বাণী; আর বিজ্ঞানের মানদণ্ড হচ্ছে Verification বাস্তবতার অপক্ষপাত সমর্থন। ধর্ম্ম দেখে,

বিশেষ কোন মতবাদের সমর্থন ধর্ম্মের মূল গ্রন্থে কিম্বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের প্রামাণ্য উক্তি ও চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যায় কি না। দর্শন এবং বিজ্ঞান দেখে, মতবাদটি বাস্তব জগতের সঙ্গে, Objective realityর সঙ্গে খাপ খায় কি না। এরূপ অবস্থায় প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে দর্শন এবং বিজ্ঞানের সংঘর্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিবার্য্য। এ সংঘর্ষের অসংখ্য দৃষ্টান্ত মধ্যযুগীয় য়ুরোপের ইতিহাসে পাওয়া যায়। সেই সংঘর্ষের ফলেই জাতীয়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আবির্ভাব হ'য়েছে। ধর্ম্ম না হ'লে সমাজ চলে না—এ কথা যেমন সত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান না হ'লেও তেমনি সমাজ চলতে পারে না,—সে-কথাও তেমনি সত্য। এরূপ অবস্থায় বিশেষ এক পক্ষকে অর্থাৎ ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করার মানে হচ্ছে,—দর্শন এবং বিজ্ঞানের মূলোৎপাটন করা।

আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের দৃষ্টি স্বভাবতঃই অতীতের দিকে ; পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান যুগের বিশ্ব-মানবের দৃষ্টি হলো ভবিষ্যতের দিকে। মানুষ সব দেশেই এখন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে জীবন এবং রাষ্ট্র সাধনা করে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম কিন্তু মানুষকে অহরহ অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আর অতীতের জগতে ফিরে যাবার জন্ম তাকে আহ্বান করে। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান যুগের মানসিকতার সঙ্গে অতীতের আচার-অনুষ্ঠান এবং মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ধর্ম্মের সংঘর্ষ অনিবার্য্য, আর সে-সংঘর্ষ প্রকৃতপক্ষে অবিরামভাবেই চলেছে। এরূপ অবস্থায় অনুষ্ঠানমূলক সামাজিক ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভূষিত করার অর্থ হচ্ছে, প্রগতির সর্ব্ববিধ পথকে অর্গলবদ্ধ করা।

এ-কথাও অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধাদি অতীতের প্রয়োজন, অতীতের জীবনাদর্শ এবং অতীতের বেষ্টনীর তাগিদেই সৃষ্ট এবং তাদেরই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সুদূর অতীতের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী হ'লেও এ সব বিধি-নিষেধ আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান মানবের উন্নতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে ; ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে এই সব বাধা-বিঘ্ন চিরন্তন রূপ ধারণ করবে, আর মানুষের উন্নতির সর্ব্ববিধ প্রয়াসকে ব্যর্থ ক'রে দেবে।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের সব-চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা হচ্ছে এই যে, তার প্রকৃতি হলো, মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা, মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিভক্ত করা, এবং সেই গণ্ডীগুলিকে ধর্ম্মের আকার দিয়ে চিরস্থায়ী ক'রে তোলা। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মই এই পথে গিয়েছে। ফলে সর্ব্বত্র এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষের পক্ষে ব্যাপকভাবে একত্র কোন কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে ; মিলনের কিম্বা ঐক্যের সর্ব্বজনমান্য কোন আদর্শ কায়েম করতে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম কোথাও সক্ষম হয়নি।

এ কথাও আমাদের ভুললে চলবে না যে, বর্ত্তমান যুগে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা এতদূর প্রসার লাভ করেছে, তাদের মনে জিজ্ঞাসার ভাব এতখানি প্রবল হ'য়ে উঠেছে, প্রমাণের প্রয়োজন এত গভীর এবং ব্যাপকভাবে তারা অনুভব করতে শিখেছে, দর্শন এবং বিজ্ঞান এত দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে, নিত্য নূতন তথ্য এসে আমাদের মনকে এমন গভীর ভাবে আলোড়িত করছে, বিভিন্ন দেশ, সমাজ এবং কৃষ্টির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান নিত্য এমন ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠছে যে, এযুগে দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অতীতের ধারণাকে সমাজে কায়েম-বন্দী ক'রে রাখা সত্যই অসম্ভব। তাই এ যুগে সেই অতীত যুগের ভাব এবং চিন্তাধারার উপর কোন রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টাকে বাতুলতা ছাড়া আর কোন নামে অভিহিত করা সঙ্গত মনে হয় না।

এই সব বিভিন্ন কারণের সমবায়িক ফল এই হয়েছে যে, য়ুরোপ ভূখণ্ডে ধর্ম্মীয় রাষ্ট্রের অবসান ঘটেছে, আর প্রাচ্যের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিও দ্রুত সেই একই পথে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতবাসীর পক্ষেও এ বিষয়ে যুগ-ধর্ম্মের অনুসরণ করা ছাড়া উন্নতির এবং সার্থকতার অন্য কোন পথ নাই। তাকেও এখন জাতীয়তার ভিত্তির উপরেই রাষ্ট্রীয় জীবন গড়তে হবে। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মীয় ভিত্তির উপর সে প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে বিড়ম্বনা হবে।

এস, ওয়াজেদ আলি (বি-এ 'কাণ্টাব' বার-এ্যাট্-ল)

বৈশাখ

হেথায় বিশুষ্ক তৃণদল তপনের রোষাগ্নির তাপে ;
হোথায় আকাশ-পাতে নক্ষত্রের রাজি
মহাতঙ্কে থর থর কাঁপে।
অনির্দ্দিষ্ট কি আতঙ্ক জপিতেছে নির্ম্মেঘ আকাশ,
হেথা বায়ু অজগর সম ফেলিতেছে ক্রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ;
অন্তরালে লুকায়ে চাতক—শুষ্ককণ্ঠে করে জল জল,
জীর্ণ পত্রে শুষ্ক পুষ্পে পূর্ণ হোল ধরার অঞ্চল।

ধূলিরাশি নীড়-হারা মহাশূন্যে খুঁজিছে আশ্রয়,
পক্ষিগণ চঞ্চু খুলি শাখে বসি গণিছে বিস্ময় ;
খাদ্য লোভে কভু নামি—
রুক্ষ ভূমি বৃথা খুঁজে ফেরে,
বিফল আশায় হায়—কেঁদে ওঠে করুণ চিৎকারে।
কোন্ ঋষি-শাপে আজি সৃষ্টি পুড়ে করিছে শ্মশান,
অশ্রুবারি অন্তরে শুকায়—অসহায় ধরার সন্তান?

শ্রীমতী নিভা দেবী

সঙ্গীতের কীর্ত্তনাঙ্গ

(আলোচনা)

কীর্ত্তনের মৌলিকতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, নববিধ ভক্তির অন্যতম বলিয়া কীর্ত্তনের উল্লেখ আছে, যথা—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃস্মরণং পাদ-সেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্" ॥—(বিষ্ণুপুরাণ)। শ্রীমদ্ভাগবতেও কলিযুগের উপাস্য দেবতার আরাধনা-পদ্ধতির নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনের উল্লেখ আছে। যথা—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ"—(ভাগবত ১১ স্কন্ধ)। এতদ্ভিন্ন, শাস্ত্রের অন্যান্য বহু স্থলে কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তন শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হয়। প্রাগুক্ত কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তন শব্দের প্রয়োগরীতি আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, কীর্ত্তন শব্দে সাধারণতঃ কথন পঠন প্রভৃতি বুঝায়, এবং সঙ্কীর্ত্তন অর্থে তালরাগাদি ও বাদ্যাদিসহ গান। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতে, বিশেষতঃ, জয়দেবাদি বৈষ্ণব কবিগণের অভ্যুদয় কাল হইতে কীর্ত্তন শব্দ তাল-রাগাদি ও বাদ্যাদিসহ গান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাল ও বাদ্যাদির অনুগত কীর্ত্তনই সঙ্কীর্ত্তন পদবাচ্য। "সম্" উপসর্গ-যোগে গীত ও কীর্ত্তন শব্দের এই বৈশিষ্ট্য সঙ্গীতশাস্ত্র-সম্মত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ বহু কীর্ত্তন-পদাবলী রচনা করেন, এবং ঐ সকল পদাবলী যে কেবলমাত্র আবৃত্তি পাঠ ও কথনের দ্বারাই জনসমাজে বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছিল, ইহা সম্ভব নহে। বিশেষতঃ, বৈষ্ণব-পদাবলীর রচনাপ্রণালী দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, বাদ্যাদিসহ তাল-লয়ের অনুসরণে গান করিবার উপযোগী করিয়াই ঐ সকল পদ রচিত হইয়াছিল। সঙ্গীতজ্ঞগণের মতে—তাললয়াদি-সহযোগে গান করিবার জন্য রচিত পদ, এবং কেবল আবৃত্তি বা কথনের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা—এই উভয়ের মধ্যে রচনাগত বৈষম্য আছে; তবে আনাড়ীর নিকট 'সব গোয়ালই এক চেহারা!' কবিতা হইলেই তাহা গান

সঙ্গীতের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা যায়, পণ্ডিতগণ ধাতুমাতুসমযুক্তকে গীত আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ধাতু নাদাত্মক, এবং মাতু অক্ষরসঞ্চয়। এই গীত দুই ভাগে বিভক্ত। বেণু-বীণাদি যন্ত্র-নিঃসৃত, এবং নরনারী-কণ্ঠনিঃসৃত গীত তাল-বাদ্যাদি ও নৃত্যের অনুসরণে প্রকাশিত হইলেই সঙ্গীত পদবাচ্য হইয়া থাকে। কথিত আছে, সংসারতাপদগ্ধ নরনারীগণের হৃদয়ে শান্তি-দানের জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শুদ্ধ, শালগ ও সঙ্কীর্ণ গীতের এই তিন প্রকার বিভিন্নতা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শুদ্ধ, শালগ, সঙ্কীর্ণ আবার নানা ভাগে বিভক্ত। গীতের এই সকল বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। কীর্ত্তন ভারতীয় সঙ্গীতের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার সুবিধার জন্য সঙ্গীত সম্বন্ধীয় কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়ে। সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগ-রাগিণী ও তাল-লয়াদির নির্দ্দেশক এবং রূপ-নির্ব্বাচক বলিয়া চারি জন প্রধান আচার্য্যের নামের উল্লেখ আছে—যথা, ভরত, হনুমান, সোমেশ্বর ও কলানাথ। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী কালে এই চারি জন আচার্য্যের নির্দ্দেশানুসারেই ভারতীয় সঙ্গীত পরিচালিত হইয়াছিল। হিমালয় হইতে প্রবাহিত ভাগীরথী-ধারা পৃথিবীতে যেরূপ অমৃত-প্রবাহ-রূপে বর্ত্তমান, ভারতীয় সঙ্গীতের কীর্ত্তন-ধারাও সেইরূপ মানবগণকে অমৃতের আস্বাদ দান করিতেছে। সাধারণতঃ সঙ্গীতে যেরূপ তাল-লয় রাগ-রাগিণী আছে, কীর্ত্তনেও তদ্রূপ তাল, লয়, রাগ-রাগিণী বর্ত্তমান; কীর্ত্তনের এই তাল, লয়, সুর, রাগ, রাগিণী প্রভৃতি সাধারণতঃ সঙ্গীতশাস্ত্রের নিয়মানুগত রাগাদির অনুরূপ হইলেও ঐ সকলের এমনি একটা মাধুর্য্যময় বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়—যেজন্য কীর্ত্তন অন্যান্য সঙ্গীতের শ্রেণী হইতে পৃথক হইয়াও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতধারার সহিত একই পর্য্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছে।

করিবার উপযুক্ত হয় না; গানের উপযোগী কবিতাগুলিই কীর্ত্তন-পদাবলী নামে সুবিদিত।

কীর্ত্তন দুই অংশে বিভক্ত; প্রথমটি রসকীর্ত্তন, দ্বিতীয়টি নামকীর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বিবৃত শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসাবলম্বনে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন-কালের ভক্ত কবিগণ যে বৈষ্ণব-ভাবসম্পদপূর্ণ পদাবলী রচনা করিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী যুগে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক ঐ রসপঞ্চকোপজীব্য বৈষ্ণব-গ্রন্থবর্ণিত লীলা-বিষয়ক, বিশেষতঃ জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শশিশেখর প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত মধুররসাত্মক পদাবলী সুর ও রাগ-রাগিণী-সহযোগে সবাদ্য গীত হওয়ায় তাহা রস-কীর্ত্তন নামে অভিহিত হইয়াছে। এই রসকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের বহু-পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। তবে তাহা কোন্ সুর, তাল, লয়ে গীত হইত, তৎসম্বন্ধে কোথাও কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী কীর্ত্তন হইত। ভক্ত-সমাজে প্রচার, মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী কীর্ত্তন শ্রবণে ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইতেন। স্বরূপদামোদর জয়দেবের পদাবলী মধুর সুরে গান করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইতেন। বাসুদেব মুকুন্দ প্রভৃতি কীর্ত্তনীয়াগণের কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হইত। মুকুন্দদাসের কীর্ত্তন শুনিয়া ভাবোন্মত্ত প্রাচীন বৈষ্ণবগণ তাঁহার চরণ ধরিয়া ভাববিহ্বল চিত্তে অশ্রু-বর্ষণে প্রেম প্রকাশ করিতেন; বৈষ্ণবশাস্ত্রে বর্ণিত এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই রসকীর্ত্তন প্রচলিত ছিল, এবং তাহা যথেষ্ট উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল।

কীর্ত্তনের দ্বিতীয় ভাগের নাম নাম-কীর্ত্তন। শ্রীভগবানের প্রতি নমস্কার, স্তুতি-বিজ্ঞপ্তি ও আত্মনিবেদন, তাঁহার জয়-ঘোষণা, প্রার্থনা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশমূলক তাঁহার নামযুক্ত পদ সাধারণতঃ নাম-কীর্ত্তন পদবাচ্য। রসকীর্ত্তনের সহিত এই নামকীর্ত্তনের সুর ও তালগত প্রধান বৈষম্য এই যে, রসকীর্ত্তনের তাল-সুর-রাগাদি বিশেষ মধুর এবং চিত্তগ্রাহী হইলেও সহজ নহে; কঠোর পরিশ্রম সহকারে দীর্ঘ কালের সাধনায় ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। এই জন্যই গায়ক যখন রস-কীর্ত্তন গান করেন, তখন ঐ কীর্ত্তনশ্রবণে চিত্ত প্রসন্ন হইলেও সাধারণ শ্রোতাগণ ঐ রস-কীর্ত্তনের সুর-তাল-লয়াদির অনুকরণ করিতে পারেন না; এবং ঐ কীর্ত্তনে যোগদানও করিতে পারেন না, কেবল শ্রোতারূপেই অবস্থান করেন। নাম-কীর্ত্তনের তাল, লয়, সুরাদি অতীব সহজ ও মধুর, সুতরাং শ্রবণমাত্রেই পুলকিত-তনু শ্রোতা ঐ কীর্ত্তনে যোগদান করিতে পারেন। বস্তুতঃ, সকলে একত্রে মিলিয়া গান করিয়া পারমার্থিক আনন্দ পাইবার আশায় নাম কীর্ত্তন পদ্ধতি প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীচৈতন্য-দেব কীর্ত্তন শিক্ষা দিতেছেন,—

"শিষ্যগণ বলেন কেমন সঙ্কীর্ত্তন।
আপনি শিখান প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)।

বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুকে "সঙ্কীর্ত্তনের পিতা" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে পদাবলী ছিল, সঙ্কীর্ত্তনও ছিল; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতেই কীর্ত্তন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তিনি তাহাতে এরূপ অপার্থিব সুধা সিঞ্চন করিলেন যে, তাহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া 'শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়!' বস্তুতঃ, ইহার প্রভাবে সমগ্র দেশই প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া গেল।

রস ও প্রেম বৈষ্ণবপদাবলী-কীর্ত্তনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। প্রাচীন কবিগণ এবং গায়কগণ পদাবলীতে রস ও প্রেম পরিবেশনে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কোনও প্রকারে রসের হানিকর কিছু না হয় এবং রসাভাস না ঘটে, তদ্বিষয়ে বৈষ্ণব অলঙ্কার ও সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রমতে পদাবলী রচিত ও গীত হইয়া আসিতেছে। কীর্ত্তনের সহিত বৈষ্ণবের 'পারমার্থিক বস্তু'র খুব নিকট সম্বন্ধ। সুর-তালের উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিয়া কেবল তাহারই অনুশীলনে বিশুদ্ধ কলা-বিদ্যার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই কীর্ত্তন-পদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং সুর ও তাল প্রভৃতি ইহার গৌণ সত্ত্ব ও অঙ্গ। রস, প্রেম ও ভাব ইহার মুখ্য সত্ত্ব (প্রকৃতি) ও অঙ্গ। সুর ও তালকে অবলম্বন করিয়া ঐ রস, প্রেম ও ভাব পরমার্থের উদ্দেশ্যেই প্রধাবিত; সুতরাং বৈষ্ণবসমাজ ঐ রস, প্রেম ও ভাবের অমর্য্যাদা সহ্য করিতে পারেন না।

যে, যে স্থলে যত প্রকারে প্রিয়তমকে ভালবাসিতে পারে সেই ভালবাসার সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সার সংগ্রহ করিলে যে বস্তু পাওয়া যায়—তাহাই প্রেম; এই প্রেমের সার বস্তুর নাম মহাভাব, এবং বৈষ্ণবের শ্রীরাধা এই মহাভাবের স্বরূপ।

"প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ কেহ নাই, যিনি চিরমধুর, চির-কিশোর, আনন্দ লীলাময়-বিগ্রহধারী সেই নবজলধর-শ্যামরূপ বেণুধর মনপ্রাণনেত্রোৎসব শ্রীকৃষ্ণই বৈষ্ণবের প্রিয়তম পারমার্থিক বস্তু, এবং এই ব্রজ-নব যুবদ্বন্দ্ব শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে ঘিরিয়া বৈষ্ণবের গান, তাহাই বাঙ্গালার তথা ভারতের অমূল্য সম্পদ বৈষ্ণব-কীর্ত্তনপদাবলী সাহিত্য। কাব্যসম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইলেও ইহা কল্পনার চির-পরিসর সমুদ্রবক্ষে কবির ভাবরাশির রঙ্গিল ফেনিল উচ্ছ্বাস নহে। আপ্রাণ সাধনায় জীবনের প্রতি স্তরে উদাসী, আপন-ভোলা বৈষ্ণব যে সত্য ও আনন্দকে অনুভব করিয়াছেন যে মধুর উন্মাদনার স্পর্শে তাঁহার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত সার্থক হইয়াছে, ইহা সেই আনন্দ, মাধুর্য্য ও প্রেমের অমৃতময় প্রবাহ। সেই প্রবাহ সুর, তাল প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া কীর্ত্তনরূপে পরমার্থের উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছে।

সঙ্গীতবিলাসী কেহ কেহ কীর্ত্তনে "moro idoa than music" বলিয়া দোষ দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু সুর ও তালাদিকে গৌণরূপে চর্চ্চা করিয়াও প্রাচীন বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়াগণ কীর্ত্তনে সুর-তালের যে চমৎকারিত্ব ও উৎকর্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন, আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহা ভারতীয় ও বৈদেশিক যে কোনও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতধারার সুর ও তালাদি অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট তো নহেই, অধিকন্তু সমকক্ষ, এবং বহু স্থলে উৎকৃষ্টতর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং Wagner, Beethoron, Mozart. Schubert ইত্যাদি পাশ্চাত্য সঙ্গীত-মহাজনগণের সঙ্গীতের সহিত বাঙ্গালার কীর্ত্তনসমাজ স্থান পাইতে পারে বলিয়া য়ুরোপীয় সঙ্গীতবিশারদগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে কীর্ত্তনের সুর ও তালাদি এবং গান করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বহুদিন হইতেই কীর্ত্তন ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট ধারারূপে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কোন্ সুর-তালাদিতে এই কীর্ত্তন গান হইত, তাহার বিশেষ কোনও ইতিহাস ছিল কি না, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব-বিস্তারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় না। কীর্ত্তনে যে সকল সুর-তাল-মান প্রভৃতির নাম ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, ভারতীয় অন্যান্য ধারাতেও সেই সকল নামাদিরই ব্যবহার লক্ষিত হয়, কিন্তু উভয়ের ভঙ্গী ও চলন এক-প্রকার নহে। উত্তরকালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময় হইতে কীর্ত্তনের সুর-তাল প্রভৃতি একটি বিশিষ্ট রূপ ও প্রাণ প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে কীর্ত্তনীয়াগণ ও পদাবলী-কার মহাজনগণ কীর্ত্তন-গানের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। হিন্দুর সঙ্গীতশাস্ত্রানুসারে অতি যত্নের সহিত বিশুদ্ধ ভাবে কীর্ত্তন গানে সুর ও তালাদি সংযোজিত হইয়াছে।

স্থূলতঃ আমরা কীর্ত্তনের যুগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের যুগ পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, এবং তাহার পর হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর যুগ অর্থাৎ নরহরি ঠাকুর, বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ, দামোদর প্রভৃতি পদকর্ত্তামহাজনগণের যুগ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ ও পরিশেষে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্তর্ধানের প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পরে খেতুরী গ্রামে নরোত্তম দাস, শ্রীনিবাসাচার্য্য, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, নয়নানন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনীয়াগণের মিলনের যুগ পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ। এই তৃতীয় ভাগের যুগেই সঙ্গীত কলাবিস্তার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং কীর্ত্তনের সুর-তালাদির ইতিহাস ঐ সময় হইতেই সমধিক ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তবে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুই ভাগের যুগে কীর্ত্তন যে সকল সুর ও তালাদিযোগে গীত হইত, তাহা যে তৃতীয় ভাগের যুগে কীর্ত্তনে প্রচলিত সুর-তাল অপেক্ষা বিশেষ গুরুতর পার্থক্যযুক্ত, এরূপ মনে হয় না; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী পর পর দুই ভাগের যুগে প্রবাহিত কীর্ত্তনধারা

পরবর্ত্তী তৃতীয় ভাগের সময়ে রাগ-রাগিণী সুর-তালাদির দ্বারা বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে মাত্র। তাৎকালিক প্রচলিত কীর্ত্তন গানের উৎকর্ষ সম্বন্ধে পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণবগ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপ উক্তি পাওয়া যায়:—

রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বর-গ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা॥
সমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরমমাদক সুধা নাহি তার সম॥
(ভক্তিরত্নাকর)।

যাহা হউক, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তীকালে ঐ সময় হইতে প্রচলিত এই কীর্ত্তনধারায় চারি প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত হইল। প্রথম গরাণহাটী, দ্বিতীয় মনোহরসাহী, তৃতীয় রেণেটী, চতুর্থ মন্দারিণী। এই চার-ঘরের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসারে বর্ত্তমানে কীর্ত্তনের ধারা চলিয়া আসিতেছে। গঙ্গার সহিত যমুনা ও সরস্বতীর মিলনের ন্যায় ভগবৎ-প্রেমের সহিত গীতিকাব্য ও সঙ্গীত মিলিত হইয়া কীর্ত্তনরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ধারাবাহিক একটি মাত্র কবির রচিত কোনও কাব্য বিশেষ নহে। বিভিন্ন সময়ের বৈষ্ণব-কবির রচিত বিভিন্ন রসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতা বৈষ্ণবরসশাস্ত্র ও সিদ্ধান্তানুসারে সমজাতীয় রস পর্য্যায়ক্রমে সংযোজিত হইয়া পালা-রূপে কীর্ত্তনের গীত হইয়া থাকে।

অনুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, মান, দান, কলহান্তরিতা, রাসখণ্ডিতা, ইত্যাদি বিভিন্ন পদে প্রয়োজনানুরূপ আখর-সংযোগে গানের মাধুর্য্য ও রস বৰ্দ্ধিত করিয়া শ্রোতার হৃদয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি সঞ্চার করা হইয়া থাকে। এক রসের পদের ক্রমমধ্যে অন্য রসের পদ গান করা বা আখর দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ ও রসাপকর্ষক। আখর ও কাটান গানের মূল অর্থকে অবলম্বন করিয়া স্বকীয় রচিত অলঙ্কার-বাক্যবিশেষ, ইহা মূল পদকে অধিক হৃদয়গ্রাহী করে। কীর্ত্তনে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে মৃদঙ্গ, শ্রীখোল এবং করতালই প্রশস্তরূপে ব্যবহৃত হয়। এই শ্রীখোলের বাদ্য যেমন সুমধুর, বাদ্য হিসাবে তেমনি উচ্চাঙ্গের বস্তু। তাই বুঝি ভাবুক ভক্ত ভাবোচ্ছাসিত হৃদয়ে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া শ্রীখোল ও খুলী উভয়কে আলিঙ্গন করিতে চাহেন, কেহ বা ভাবাবেশে বিভোর হইয়া ধরাশায়ী হইয়া থাকেন। কোনও পালা কীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে একটি পদ কীর্ত্তন করিবার রীতি কীর্ত্তন গানের বিশিষ্ট অঙ্গ। পালা গানের সময়-ভেদ আছে; যথা, প্রভাতে খণ্ডিতা, রাত্রে রাস ইত্যাদি এবং গানশেষে মিলন গান করিতে হয়। পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ গানের শেষে মিলন গান না করিয়া ঝুমর গান করিয়া গান রক্ষা করা যাইতে পারে; পরে ইচ্ছামত একবার শেষে মিলন গান করিলেই চলে। কীর্ত্তন সম্বন্ধে এই সকল সাধারণ নিয়ম চার-ঘরেই সমান; কিন্তু তাল, লয়, গতি, সুর প্রভৃতিতে পার্থক্য আছে। গরাণহাটী পদ্ধতিতে সুর ও তালের উপর বিশেষ যত্ন ও নজর দেওয়া হইয়াছে। সেই হেতু ইহার সুর ও মাত্রা অতীব দীর্ঘ ও তাল বিলম্বিত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এই পদ্ধতির কীর্ত্তন প্রচার করেন।

তিনি প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। পরিশেষে স্বীয় গুরুর আদেশে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন, এবং রাজসাহী জিলার গরাণহাটা পরগণাস্থিত নিজ বাসস্থান খেতুরী গ্রামে শ্রীশ্রী গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-সেবা স্থাপন করিয়া সেখানে বসবাস করেন। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রচারিত পদ্ধতিই গরাণহাটা পরগণার নামানুসারে গরাণহাটীঘরের কীর্ত্তন গান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন স্থল হইতে বহু কীর্ত্তনীয়া আসিয়া ঐ ঘরের কীর্ত্তন আয়ত্ত করেন, এবং এইরূপে তাহা সমগ্র বঙ্গদেশে ও শ্রীবৃন্দাবনে বিস্তার লাভ করে; কিন্তু ঐ ঘরের গান ও তাহার চলন অত্যন্ত কঠিন বলিয়া পরে উহার চর্চ্চা যথেষ্ট হ্রাস হয়। পরবর্ত্তী সময়ের নবদ্বীপধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ ঐ ঘরের কীর্ত্তনে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীগিরিধারী বাবাজী মহারাজ ও শ্রীপণ্ডিত বাবাজী (যিনি শেষে শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন) প্রভৃতি ঐ গান রক্ষা করিতেছিলেন।

নবদ্বীপ চিরদিনই কীর্ত্তন গানের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া স্থাপিত ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দিরের মাঘী পূর্ণিমার ধূলোট উৎসব অর্থাৎ

২ দিন অহোরাত্র রাসলীলা কীর্ত্তনের পর আচণ্ডালের
ব্বলিত বাসরে শ্রীরজ-গ্রহণ-বিতরণোৎসব বহুদিন হইতে
ঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। ঐ সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল
ইতে আনীত সাত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন পূর্ব্বোক্ত চার-
রের প্রচলিত পদ্ধতিতে ৬৪ রসের পর্য্যায়ক্রমে দ্বাদশ
নব্যাপী সঙ্গীতালোচনা বহুকাল হইতে চলিয়া আসি-
তেছে। শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রাচীন কালে পরমভাগবত শ্রীল
দ্ধচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ গরাণহাটী পদ্ধতির;
নামধন্য কীর্ত্তনীয়া শ্রীরসিকদাস, শ্রীবেণীদাস প্রভৃতি
নোহরসাহী পদ্ধতির; নবীনদাস, বনওয়ারীদাস প্রভৃতি
খ্যাত গায়কগণ রেণেটী পদ্ধতির এবং উদ্ধবদাস,
খিলদাস প্রভৃতি মন্দারিণী পদ্ধতির কীর্ত্তন গান করিয়া
ক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। ঐ সকল মহাজনের
ভাব ঘটিলে পরবর্ত্তীকালে শ্রীপ্রাঙ্গণে শ্রীগিরিধারী
বাজী মহারাজ সর্ব্বজনবিদিত গণেশদাস, রাধিকা
কার, প্রেমদাস, প্রভৃতি কীর্ত্তনীয়াগণ ঐ চার-ঘরের
র্ত্তন গান করিতেন। তৎপরে শ্রীহরিদাস, বর্ত্তমানের
র্ত্তনীয়া চূড়ামণি শ্রীসুরেন্দ্র আচার্য্য, এবং ময়না ডালের
ধর মিত্র ঠাকুর শ্রীযামিনী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি
র্ত্তনীয়াগণ কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু বড়ই
খের কথা যে, কিছু দিন হইল, শ্রীহরিদাস ও শ্রীসুরেন্দ্র
চার্য্য এই দুই জন শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়াই নিত্যধাম প্রাপ্ত
য়াছেন। এই উৎসবের অনুকরণে নবদ্বীপের অন্যান্য
দেবালয়ে ও আখড়ায় ঐ প্রকারে কীর্ত্তন গান হইয়া
ক। অন্যতম প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক শ্রীঅবধূত
ন্দ্যাপাধ্যায়ও এই সময় একটি আখড়ায় কীর্ত্তন করিয়া
কন।

গরাণহাটী পদ্ধতিতে বহুপ্রকার তালের ব্যবহার আছে।
ই ১০৮ প্রকার তালের চলন তন্মধ্যে সমধিক। যথা—
কোষী, সমতাল, তিওট, ডাঁশপাহিড়া, আড় ইত্যাদি।
ই আবার বড়-মধ্যম ছোট এবং কাটা ভেদে ১০৮
ার তাল প্রধানতঃ পূর্ণ হইয়াছে।

হিন্দুসঙ্গীতশাস্ত্রানুসারে ঐ সকল তালের লক্ষণ ও গতি
র্দশ করা যাইতে পারে। পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির
সংক্ষেপতঃ কয়েকটিমাত্র বিশেষ বিখ্যাত তালের লক্ষণ
তি নির্দ্দেশ করা হইতেছে। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রানুসারে
তাল শব্দের মৌলিকতার অনুসন্ধান করিলে দেখা
যায় যে, মহাদেবের অর্থাৎ পুরুষের নৃত্যকে 'তাণ্ডব' এবং
গৌরীর অর্থাৎ স্ত্রীনৃত্যকে 'লাস্য' বলে। এক্ষণে তাণ্ডবের
আদ্যাক্ষর "তা" এবং লাস্যের আদ্যাক্ষর "ল" এই উভ-
য়ের সংযোগে "তাল" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। "হর-
নৃত্যস্য তাণ্ডবং গৌর্য্যানৃত্যস্য লাস্যম্ ইতি সংজ্ঞা"। "পুরুষ-
নৃত্যস্য তাণ্ডবং নার্য্যনৃত্যস্য লাস্যমিতি নাম"। "তাণ্ডব-
স্যাদ্যাক্ষরেণ লাস্যস্যাদ্যাক্ষরেণ চ মিলিত্বা তাল ইতি সংজ্ঞা
জাতা"। ক্রিয়ার নিরূপক প্রমাণই তাল। ১০১ প্রকার
তালের মধ্যে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে চর্চ্চৎপুট প্রভৃতি
৬০ প্রকার তালই প্রধান। কীর্ত্তনে প্রচলিত দশকোষী,
ডাঁশপাহিড়া, ছুটকা, কন্দর্প প্রভৃতি তাল রুদ্র তালের
অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার ভেদ মাত্র। দশকোষী তালই
কীর্ত্তনের মধ্যে বিশেষ কঠিন এবং বিলক্ষণ বিস্তৃত। এই
তালের যতি অত্যন্ত বিলম্বিত। তাল ও মাত্রা সঙ্কোচ
করিয়া ব্যবহার করিলে ইহাই মধ্যম কাটা বা ছোট দশ-
কোষী নামে গানে ব্যবহৃত হয়। বিলম্বিত তাল ও মাত্রা-
যুক্ত দশকোষীই বড় দশকোষী অথবা যোতি বা যোৎ নামে
প্রসিদ্ধ। দশকোষী স্থলে অনেক সময় দশকুশী এই
প্রকার বাণান চলন আছে; দশটি কোষযুক্ত যাহা—তাহা
দশকোষী, পক্ষান্তরে দশটি কুশ অর্থাৎ ফাল (বিদারণ-
যন্ত্র বিশেষ, ফল্যতে বিশীর্য্যতে ইতি) যুক্ত যাহা—তাহা
দশকুশী; ফলতঃ, উভয় শব্দের তাৎপর্য্য অভিন্ন অর্থে
প্রযোজ্য। অনেকে "দশকুসি" বাণান লিখিয়া থাকে,
তাহা ভুল।

সঙ্গীতশাস্ত্রে দশকোষীর লক্ষণ যথা :—

"একতালমেকশূন্যমিত্যেবঞ্চ ভবেৎ ক্রমাৎ
বিরাম একতালঞ্চ বাগ্‌ভেদে দশকোষিকা॥"

কীর্ত্তনে প্রচলিত দশকুশী সর্ব্বাংশে ঠিক ঐ লক্ষণের
অনুরূপ নহে। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের গৌর-চন্দ্রিকা
পদের মাত্র একচরণ প্রথম কাটান সহ বড় দশকুশী অর্থাৎ
যতি বা যোৎ তালে যাহা কামোদ সুরে গান হইবে, নিম্নে
তাহা তালসহ অঙ্কপাত করিয়া দেখান হইল। "নিরমল
গোরাতনু কষিত কাঞ্চন জনু।" অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের নির্ম্মল
তনু কষ্টি-পাথরে পরীক্ষিত যেন বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

তাললিপি

নিরমল গোরা-তনু কষিত কাঞ্চন জনু :—

তাল—বড় দশকুশী অর্থাৎ যতি (যোৎ ইতি তাহা)

সুর—কামোদ

চৌদ্দ মাত্রা। ছাপ্পান্ন মাত্রা।

নি ই র অ অ ম ল অ, অ অ, অ অ, অ অ, অ, অ অ, গো ও,

রা আ, তনু, উ উ, উ, উ উউ, উউ, তনুউকষিইতত, অ অ,

অ অ, কষিতকাআ, ঞ্চন, অ অ, অ অ, অ অ, জ, অ অ, নু উ,

উ উ, উ (নিইরঅঅমলঅ) ॥০॥

নি র ম ল অ অ অ গোরা তনু উ উ = মুখপাত।

প্রথম কাটান :—

নি র ম ল গোরা আ আ আ আ আআ ত অ অ

নু উ উ উ উ তঅঅনুউউকষিত অ অ ॥০॥

আদৌ মুখপাত গান করিয়া "*" চিহ্নিত স্থানের পর হইতে গান জুড়িতে হইবে এবং সম্পূর্ণ অংশ যথাক্রমে গায়িয়া আসিয়া "+" চিহ্ন পর্য্যন্ত গান আসিলে বক্র রেখার দ্বারা তলদেশ রেখাঙ্কিত + ৪ তালাঙ্কলিখিত অংশটি গায়িতে হইবে, এবং তাহার পর আর মুখপাত গান না করিয়া যথাক্রমে ১, ২, ৩—৪ এই তালাঙ্ক পর্য্যন্ত গান করিয়া ৮ নিশান চিহ্নিত স্থানের পর হইতে প্রথম কাটান জুড়িতে হইবে। এইরূপে এককেরা কিম্বা দুই তিন ফেরা গান গায়িয়া মাতান হইবে। মোট মূল দুই দফায় ৮টি বিলম্বিত তাল। +৪নং জোড়ায় ধরণ। ৩৬টি শূন্য; জোড়া তাল ১৪ মাত্র তদ্ভিন্ন ৫৬ মাত্রায় পড়িবে; এবং একটি মাত্র সোম। মুখপাত গানের প্রথমে একবার মাত্র আসিবে। যদিও কাগজে কলমে লিখিয়া ইহা বুঝান যায় না, তথাপি পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত যতদূর সম্ভব প্রকাশ করা হইল।

সঙ্গীতশাস্ত্রানুসারে ডাঁশপাহিড়া তালের লক্ষণ :—

পঞ্চতালপরং শূন্যং ডাঁশপাহিড়মুত্তমম্।

অত্যুর্দ্ধঞ্চ ভবেৎ দ্রুতং সংগ্রামস্ত যথা গতিঃ॥

মূল শাস্ত্রসম্মত লক্ষণাদির সহিত কীর্ত্তনে ব্যবহৃত তাল ও সুরের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। আড়, সমতাল, প্রভৃতি অষ্টতালের অন্তর্গত এবং সম্প মাত্রা তাল প্রভৃতি ব্রহ্ম তালের ও পঞ্চালী, মদনদোলা প্রভৃতি ইন্দ্রতালের অন্তর্গত। সঙ্গীতদামোদরের মতে শুদ্ধ শালগ ও সঙ্কীর্ণ ভেদে গান তিন প্রকার। কীর্ত্তনের একতালা, ঝুমরি, যতি প্রভৃতি শালগসূত্রসম্মত। দোহা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ সূত্রসম্মত। এই সকলের বিশেষ বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচ্য।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন-পদ্ধতি বর্দ্ধমান জেলার মনোহরসাহী পরগণা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল; সে কারণ উহা "মনোহরসাহী" নামে বিখ্যাত। এই ঘরের কীর্ত্তনের তালের গতি গরাণহাটী অপেক্ষা দ্রুত ও সহজ। সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে ৬০টি তালের ব্যবহার দেখা যায়। উপস্থিত বঙ্গদেশে ঐ ঘরের গানের প্রচলনই অধিক।

বর্দ্ধমান জেলার রাণীহাটী পরগণা হইতে উদ্ভূত কীর্ত্তন-পদ্ধতি "রেণেটি"-পদ্ধতি বলিয়া খ্যাত।

এই ঘরের গানের মাত্রা ও তাল সরল ও দ্রুত, জনসাধারণ সহজেই তাহা আয়ত্ত করিতে পারে। ইহাতে সাধারণতঃ ৩০টি তাল ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

"মন্দারিণী"-পদ্ধতির কীর্ত্তন কোথা হইতে উদ্ভূত, তাহা

বিশেষ কোনও ইতিহাস সংগৃহীত হয় নাই। অনেকের মতে ইহা এই তিন-ঘরের সংমিশ্রণে রাঢ়দেশীয় কীর্ত্তনীয়াগণের সৃষ্ট সহজ কীর্ত্তন-রীতি। পরবর্ত্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলেই কীর্ত্তনের সমধিক প্রচলন হয়; বর্ত্তমান কালের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ও পদকর্ত্তাগণ প্রায় সকলেই রাঢ়ো'। এই স্থানের কীর্ত্তনীয়াগণই শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থানে কীর্ত্তনের প্রচার করেন। 'মন্দারিণী'-ঘরের পৃথক্ চলন বর্ত্তমানে নাই। এই পদ্ধতিতে দ্রুত ও সরল গতিসম্পন্ন ২টি তালের ব্যবহার দেখা যায়। গায়কগণ গানের মধুরতা ও গতির স্বাচ্ছন্দ্য এবং টাকিসুরের নৈপুণ্যবিধানের জন্য মন্দারিণীর গতি, ঝঙ্কার ও চলন নিজ নিজ প্রচলিত পদ্ধতির সহিত সংমিশ্রিত করিয়া থাকেন।

এই চার ঘরের কীর্ত্তন-পদ্ধতি বর্ত্তমানে কোথাও ঠিক ভাবে, কোথাও বিকৃতভাবে, কোথাও বা মেঠো গ্রাম্য সুর সংযোগে অদ্ভুত আকারে প্রচলিত আছে। যথাযোগ্য শিক্ষা, প্রচার ও সংস্কারের অভাবে এই চার-ঘরের কীর্ত্তন-পদ্ধতি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

সাধারণতঃ গ্রামফোনের রেকর্ড প্রভৃতিতে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও অন্যান্য পদকর্ত্তার যে সকল কীর্ত্তন শুনিয়া সঙ্গীতানুরাগী শ্রোতারা তৃপ্তিলাভ করিতেছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে কীর্ত্তন নহে। কীর্ত্তনের একটু আধটু রেশ ইহাতে আছে মাত্র, ঐ সকল কীর্ত্তনকে "রংএর গান" বলা যাইতে পারে। শ্রোতার চিত্ত সহজে আকর্ষণ করিবার জন্য এই প্রকার রংএর গানের প্রচলন আধুনিক কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যেও বিরল নহে।

প্রকৃত কীর্ত্তন গানে হিন্দুসঙ্গীত-শাস্ত্রসম্মত রাগ-রাগিণী সুর-তালাদি সংযোজিত আছে; কিন্তু তাহা ভারতীয় অন্যান্য সঙ্গীতধারা হইতে এমনি একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত যে, শ্রবণ মাত্রই অন্যান্য যাবতীয় গান হইতে সাধারণ শ্রোতা কর্ত্তৃকও ইহার পার্থক্য অনুভূত হয়। কীর্ত্তন গান অপর সকল গান অপেক্ষা চিত্তোন্মাদক ও সুমোহন; একারণ দেখা যায় যে, কীর্ত্তনের পর সেই আসরে আর অন্য গান প্রায়ই জমে না। কীর্ত্তন বাঙ্গালীর নিজস্ব অমূল্য সম্পদ। আশা ও আনন্দের কথা এই যে, বর্ত্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায় কীর্ত্তনের বিশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহার প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীগৌরকিশোর গোস্বামী (বেদান্ততীর্থ)।

আগামী কাল

কাল প্রভাতে কি রঙীন আলোয়
উদিবে তপন পূর্ব্বাকাশে,
শিশিরের বুকে শত রামধনু
জাগিবে কি কচি দূর্ব্বাঘাসে ?
গাহিবে কি পাখী নতুন ছন্দে ?
ভরিবে বনানী মধুর গন্ধে,
চঞ্চল পায়ে বহি দূর পথ
চলিবে কি কেহ অজানা আশে ?

জাগিবে কি সেথা অপরূপ আভা
আকাশ যথায় ধরায় মেশে ?
কাল কি সেথায় বাজিবে কণ্ঠ
আজ যেথা সুর উঠিছে ভেসে ?
চলিবে কি নদী অজানার টানে
দুর্ব্বার বেগে সাগরের পানে,
উল্কার মত উল্লাসে মাতি
ছুটিবে সমীর দেশ-বিদেশে ?

আন্‌মনে বসি' কাল কোনো কবি
রচিবে কি কোনো কাব্য-গাথা,
প্রিয় আশা-পথ চাহিয়া কি রবে
কারো হৃদয়ের আসন পাতা ?
নিশীথের ফুল ফুটিয়া নীরবে
কাল প্রভাতে কি চাহিয়া সে রবে,
কাল প্রভাতে কি আসিবে ভ্রমর
শোনাতে তাহারে গোপন কথা ?

এই হৃদয়ের ক্ষীণ সাড়াটুকু
কে বলিবে কাল যাবে না থামি',
কে বলিবে কাল হবেই প্রভাত
আজিকার এই গভীর যামী ?
উচ্ছ্বাস-ভরা প্রাণের ছন্দ
কে বলিবে কাল হবে না বন্ধ,
কে বলিবে কাল নব-জাগরণ
ধরণীর দ্বারে আসিবে নামি ?

এস, এ, জাফর।

ইতিহাসের অনুসরণ

বঙ্গদেশ কি আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে?

বঙ্গদেশ কি আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে? অধুনা এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হইতেছে। অনেকগুলি য়ুরোপীয় পণ্ডিত বঙ্গদেশকে—অর্থাৎ আধুনিক বাঙ্গালা প্রদেশকে আর্য্যাবর্ত্তের সীমায় বহির্ভূত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই জন্ম অনেকে ভাবিতেছেন, হবেও বা। সাদা মুখের কথা কখন মিথ্যা হয়? এই প্রসঙ্গে স্মরণ হইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব্বে বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছিলেন, বেঞ্জামিন্ গল অর্থাৎ বেন্ গল নামক ইংরেজ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা আবিষ্কার করেন; তাঁহার নাম অনুসারেই বাঙ্গালার নাম হইয়াছে বেঙ্গল! আমরা বাল্যকালে পাঠ করিয়াছিলাম--বাঙ্গালা দেশটি সাগরগর্ভ হইতে অল্পদিন পূর্ব্বে উত্থিত হইয়াছে,—সুতরাং উহা নবীন দেশ। তাহার পর মানব জাতির মধ্যে অনার্য্য জাতিই প্রথমে আসিয়া এই দেশে বাস করিতে আরম্ভ করে। ইহা ছিল কিরাতের দেশ। কিন্তু গবেষণার ফলে বুঝিতে পারা গিয়াছে, এই ধারণা ভুল। বঙ্গদেশ অন্যান্য বহু দেশের পরে সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইলেও দুই-চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহা যে সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত ছিল এরূপ নহে। বৈজ্ঞানিকরাও সে কথা বলেন না। মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ হইতে জানিতে পারা গিয়াছে, বলি রাজার পাঁচ পুত্র অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পৌণ্ড্র; এই পাঁচ জন পূর্ব্বভারতে পাঁচটি রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম অনুসারে পূর্ব্বভারতের ঐ পাঁচটি রাজ্যের নাম হইয়াছিল—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পৌণ্ড্র। বলি রাজার পুত্র পাঁচ জন যে একেবারে অনার্য্য জাতির অধ্যুষিত রাজ্যে রাজত্ব করিতে আসিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। একাকী বা কয়েক জন লোক লইয়া অনার্য্য-জাতিপূর্ণ এক একটা বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করা কাহারও পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না; অবশ্য তখন ঐ রাজ্যগুলির বিস্তার এবং অবস্থান ঠিক কোথায় এবং কি ভাবে ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম এবং পৌণ্ড্র যে আধুনিক বাঙ্গালা প্রদেশেরই মধ্যে ছিল, এরূপ অনুমান প্রায় সকলেই করিয়া থাকেন। কর্ণ ছিলেন অঙ্গাধিপতি। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। খৃষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কতকগুলি য়ুরোপীয় পণ্ডিতও একথা স্বীকার করেন। কেহ কেহ উহা পরবর্ত্তীকালের ঘটনাও বলেন। য়ুরোপীয়গণ ভারতের কাল-গণনায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি করিয়া থাকেন,—এরূপ ধারণা অসঙ্গত নহে। তাঁহাদের ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইবার অনেক কারণ আছে। ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, পরশুরাম ব্রহ্মপুত্র নদকে ব্রহ্মপুত্র হ্রদ হইতে কাটিয়া বাহির করিয়া জনসাধারণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। এ গল্পটি বিশ্বাসের অযোগ্য; কারণ, ঐ ঘটনার পরও পরশুরামের মাতা রেণুকা যে জীবিতা ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় প্রকাশ যে, পরশুরামের প্রার্থনানুসারেই জমদগ্নি রেণুকাকে বাঁচাইয়াছিলেন। শাস্ত্রমতে গুরুকে দুর্ব্বাক্য বলিলেই গুরুহত্যার অপরাধ হয়, এবং সে জন্য গুরুহত্যার পাতক অশে... সম্ভবতঃ সেই পাতক ক্ষালনের জন্য পরশুরাম ব্রহ্মপুত্রকে হ্রদ হইতে নদরূপে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং পরশুরামের অভ্যুদয় কালে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এই পরশুরাম কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। পরশুরামকে যদি রামচন্দ্রের সমসাময়িকও বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্রের বংশধর বিশ্রুতবানের পুত্র বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। বিশ্রুতবান দশরথ হইতে ... পুরুষ পরবর্ত্তী; সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় ৫... বৎসর পূর্ব্বে পরশুরাম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে খৃষ্ট জন্মিবার আনুমানিক তিন হাজার বৎসর

পূর্ব্বে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পরশুরাম জীবিত ছিলেন। হিন্দুরা পরশুরামের কালকে অধিকতর পুরাতন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং বঙ্গদেশের অস্তিত্ব যে পাঁচ ছয় হাজার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, এবং এই প্রদেশে হিন্দুর বিভিন্ন তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে অবগাহন করিতে আসিয়াছিলেন। কালক্রমে উহার স্থানের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য—কিন্তু উহা তখনও বঙ্গদেশেই অবস্থিত ছিল। মহর্ষি কপিলদেবের আশ্রমও বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠিত ছিল; তথায় কপিলের তপঃশক্তিপ্রভাবে ষষ্টিসহস্র সগর-সন্তান, বা সগর রাজার ৬০ হাজার সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সগর-রাজার প্রপৌত্র মতান্তরে (প্রপৌত্র পুত্র) ভগীরথ গঙ্গা হইতে খাল খনন করিয়া কপিল তীর্থে লইয়া গিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ অনুসারে এই সগর রাজা হইতে রামচন্দ্র ২২ পুরুষ অধস্তন নৃপতি। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে উঁহাদের পুরুষপরম্পরার ব্যবধান আরও অনেক অধিক।* রামায়ণের সংক্ষিপ্ত তালিকা লইলেও সগর রাজার কাল রামচন্দ্রের সময় হইতে অন্ততঃ সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে। তাহা হইলেও সগর রাজা এবং কপিল মুনির যে কাল পাওয়া যায়, তাহা খৃষ্টের জন্মের সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে; সুতরাং বঙ্গদেশ নিতান্ত আধুনিক, এই মত আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। কপিল মুনির যে দেশে আশ্রম ছিল,—রাজর্ষি জহ্নু যে দেশে সর্ব্বমেধ নামক মহাযজ্ঞ করিতেছিলেন, সে দেশ যে অনার্য্যাধ্যুষিত ছিল, ইহা মনে করা অত্যন্ত সাহসের কার্য্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও এ বিষয়ে সকলে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বভারতে অর্থাৎ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যাগযজ্ঞকারী একদল আর্য্য আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এক দল প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং নৃতত্ত্ববিৎ বলেন, বেদ আলোচনা করিলেই প্রতীতি হয় যে, বেদের ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইবার পূর্ব্বে আর্য্য জাতির এক দল লোক ভারতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর আর এক দল বা আর্য্য জাতির অন্য একটি শাখা, খাইবার গিরি-সঙ্কটের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিযোগিতায় পূর্ব্ববর্ত্তী শাখার লোকগুলি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় অপসারিত হইয়া ঐ সকল স্থানে বাস করিতেছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, বৈদিক সাহিত্য মন্থন করিয়া তাঁহারা এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এক জন বিশিষ্ট য়ুরোপীয় লেখক এ সম্বন্ধে যাঁহা লিখিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ আধুনিক মত।* নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা এখন বলিতেছেন যে, মঙ্গল এবং দ্রাবিড় জাতির শোণিতসংমিশ্রণে বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে করা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অপসিদ্ধান্ত। বাঙ্গালী জাতির করোটি (Cephelic Ind x) এবং গুহ্য অঙ্গের গঠন তাহাদের আর্য্যত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য, সুতরাং প্রাচীন কালেই যে বঙ্গ ও বিহার প্রদেশে আর্য্যগণ বাস করিতেন, —তাহা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

কিন্তু আর একটি কথা এই যে, শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নির পরিক্রমণ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। ঐ উপাখ্যান

* প্রাচীনকালে ব্যাস বা কথক মহাশয়দিগের দ্বারা পুরাণ[illegible] সংরক্ষিত হইত, তাঁহারা পুঁথি দেখিয়া তাহার নকল করিতেন। [illegible]ন কেবল রাজগণের বংশ-তালিকায় জনসংখ্যা অধিক হইলে [illegible] স্মরণ রাখিয়া আবৃত্তি করা কথক মহাশয়দিগের কষ্টসাধ্য [illegible]ত, এবং শ্রোতৃবৃন্দেরও তাহা নীরস মনে হইত। যাঁহারা পুঁথি [illegible]খিয়া তাহার নকল করিতেন, তাঁহাদের পক্ষেও উহা বিশেষ [illegible]সাধ্য ও শ্রান্তিজনক ছিল। সেই জন্য ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের [illegible]নকে কতকগুলি অপ্রসিদ্ধ রাজার নাম বাদ দিতেন, এরূপ [illegible]মান অসঙ্গত নহে। আর কতকগুলি পুঁথি নকলের সময় [illegible]নে স্থানে ছাড় পড়িত, ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব। সেই জন্য যে যে [illegible]থির কথকতা অধিক হইত বা এখনও হয়, তাহাতে নাম কম [illegible]ওয়া যায়। উহা যে বর্ত্তমান সময়ে কালনির্ণয়ের একটা [illegible]য় বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা প্রাচীন ব্যাসগণ ধারণা করিতে [illegible]রিতেন না। উহা অবলম্বন করিয়া কালনির্ণয় করিলে তাহা অভ্রান্ত হইবে,—এরূপ আশা করা যায় না।

* এই মনস্বী লেখক বৈদিক সাহিত্য, সংহিতা প্রভৃতি আলোচনা করিয়া এবং নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত অবলম্বন করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এবং বহু য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞ এখন যে মত পোষণ করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য যাঁহাদের আগ্রহ হইবে, তাঁহারা মূল পুস্তক (The Indian Historical Q uarterly—vol. 4. No. 1.) পাঠে তাহা জানিতে পারিবেন। সুদীর্ঘ ইংরেজি 'কোটেসন' দ্বারা প্রবন্ধটিকে ভারাক্রান্ত করিলে অনেকের তাহাতে ধৈর্য্য নষ্ট হইতে পারে।

হইতে কয়েক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর্য্যগণ সদানীরা নদীর পশ্চিম-তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার পর তাঁহাদের গতিরোধ হইয়াছিল। উপাখ্যানটি এইরূপ—"বিদেঘ মাথব মুখ মধ্যে অগ্নি ধারণ করেন। তাঁহার পুরোহিত ছিলেন 'গোতম রাহুগণ' ঋষি। পুরোহিত মাথবকে আহ্বান করিলে মাথব কোন উত্তর দিলেন না। পুরোহিত রাহুগণ ঋষি ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ অগ্নিকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন; তথাপি মাথব কোন কথা বলিলেন না। তখন পুরোহিত রাহুগণ ঋষি—"হে ঘৃতপ্রেরক অগ্নি" ইত্যাদি বলিয়া ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ঘৃত শব্দ শুনিয়া অগ্নি বিদেঘ মাথবের মুখ বিবরে প্রজ্জ্বলিত হইলেন। মাথব অতঃপর অগ্নিকে মুখ বিবরে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্নি পৃথিবীতে নিপতিত হইলেন। মাথব এই সময়ে সরস্বতী নদীতীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অগ্নি পৃথিবী দগ্ধ করিতে করিতে পূর্ব্ব দিকে প্রধাবিত হইলেন। মাথব এবং রাহুগণ দ্রুতবেগে অগ্নির অনুসরণ করিতে থাকিলেন। অগ্নি সমস্তই দগ্ধ করিলেন, কিন্তু হিমালয় হইতে নিষ্ক্রান্তা সদানীরা নদী অতিক্রম করিলেন না। অগ্নি কর্তৃক সদানীরার পূর্ব্ব পার দগ্ধ না হওয়ায় প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ ঐ নদীর পূর্ব্বতীরস্থ ভূমিতে বাস করিতেন না। আধুনিক কালে অনেক ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে বাস করেন। এই অঞ্চল জনাকীর্ণ ছিল, এখন উহা ব্রহ্মণগণের সম্পাদিত যজ্ঞের দ্বারা বাসের যোগ্য হইয়াছে। মাথব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা এখন কোথায় বাস করিব?" অগ্নি কহিলেন, "সদানীরার পূর্ব্বপারে। "এই নদী কোশল এবং বিদেহ রাজ্যের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত ছিল।" (১) মাথব-সন্তানগণ অতঃপর এই স্থানে বাস করিতে থাকেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মাথব-সন্তান আর্য্যগণ অগ্নির আদেশে বৈদিক সময়েই সদানীরা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বভারতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই সদানীরা নদীটি কোন্ নদী? অমর কোষ বলেন, উহা করতোয়া নদী। কিন্তু শতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন, উহা কোশল এবং বিদেহ দেশের মধ্যবর্ত্তী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রবাহিত। এ অবস্থায় ঐ নদী বর্ত্তমান কালের করতোয়া হইতে পারে না। সেই জন্য অধ্যাপক ওয়েবার (Webar) অনুমান করেন, উহা গণ্ডকী নদী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কোন্ নদী, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। উহা করতোয়া হইলে ব্রহ্মপুত্রের একটি উপনদী বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়। ইহা বঙ্গের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। সুতরাং ইহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, অগ্নি বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু যদি সদানীরা গণ্ডকীই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অগ্নি বিহার প্রদেশ পর্য্যন্তই অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহা কোশল এবং বিদেহ প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী গণ্ডকী। ঠিক তাহাই নহে। বিদেহ মিথিলার প্রাচীন নাম। তখন কোশল এবং মিথিলা প্রদেশের সীমারেখা কোথায় ছিল, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে ঋগ্বেদে কীকট বা কীকটা প্রদেশের উল্লেখ আছে। (২) কীকট ও মগধ। কীকট দেশে অনার্য্যদিগের বাস ছিল। (৩) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে, এবং ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ দেশের কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) সুতরাং দেশগুলি ঐ সকল বৈদিক গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে বলি রাজের পাঁচ পুত্র দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের নামানুসারে ঐ প্রদেশগুলির নাম হইয়াছিল। এদিকে শতপথ-ব্রাহ্মণ-বর্ণিত আখ্যান হইতে উপলব্ধি হয় যে, অগ্নি মাথবকে বলিয়াছিলেন, 'সদানীরার পূর্ব্বপার তোমাদের বাসস্থান হইবে।' শতপথ-ব্রাহ্মণ-বর্ণিত আখ্যানটি উক্ত গ্রন্থরচনাকালের সমসাময়িক ঘটনা, কি তাহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ব্যাপার অবলম্বনে রচিত, তাহা বুঝিবার উপায় নাই; বরং উহা শতপথ-ব্রাহ্মণ রচনার বহু পূর্ব্বের ইতিহাস অথবা কিম্বদন্তী অবলম্বনে রচিত বলিয়াই মনে করিবার কারণ আছে। ইহা হইতে প্রতীতি হয় যে, বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালায় এবং বিহারে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বৈদিক সাহিত্য হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে,

(১) শতপথ-ব্রাহ্মণ ১-৪-১-১০

(২) ঋগ্‌বেদ ৩।৫৩।১৪

(৩) কীকটা নাম দেশোঽনার্য্যনিবাসঃ। নিরুক্ত ৬।৩২।

(৪) ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১।

ঁচম-দেশস্থ আর্য্যগণ তথনকার বাঙ্গালার অধিবাসী-গকে পক্ষীবৎ এবং তাহাদের ভাষাকে পক্ষীর ন্যায় কিচির ঁচর ভাষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পক্ষী শব্দ ও ং শব্দ একার্থবোধক। সুতরাং তথাকার বাঙ্গালীরা হ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতির অন্তর্ভূ'ত ছিল, ন্তু তাহাদের ভাষা যে পশ্চিমদেশীয় আর্য্যগণের ভাষা তে স্বতন্ত্র ছিল, এইরূপ বুঝিতে পারা যায় ; মহামহো-ধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একবার বলিয়া-লেন, "আর্য্যগণ আপনাদিগের বসতি বিস্তার করিয়া ন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার ্যতায় ঈর্ধ্যাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" ইত্যাদি। বস্তুতঃ ধুনিক ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, প্রাচীন র্য্যগণের একটি শাখা বহু পূর্ব্বে ভারতে প্রবেশ করিয়া ঁচম ভারতে বাস করিয়াছিলেন, এবং পরে আর্য্যগণের র কয়েকটি শাখা পশ্চিম-ভারতে প্রবেশ করিয়া থমোক্ত দলকে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে বিতাড়িত করিয়া-লেন। ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়াই ন হয়।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, অগ্নির এই যাত্রার কি ? অতি প্রাচীন কালে ভারতের অধিকাংশ স্থল বড় অরণ্যরাজি দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। সেই সকল ম অরণ্যে মনুষ্যের গমনাগমনের পথ ছিল না। সমাগমহীন ঐ সকল দুষ্প্রবেশ্য ভীষণ অরণ্য সময়ে য়ে পক্ষীর কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হইত। রাত্রিকালে ই সুবিস্তীর্ণ ভীষণ অরণ্যে গভীর গর্জ্জন উত্থিত হইত। ষণদর্শন নানা জাতীয় শ্বাপদ জন্তু তথায় বিচরণ রিত। কিন্তু সেই সকল অরণ্যে নানা প্রকার ফলবান ন্তে সুমিষ্ট ফল, ফুলের গাছে নানা প্রকার সুরভিত ুম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ঐ সকল ফল ভক্ষণ িয়া মানুষ অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারিত। রণ্য কুসুমের সৌরভে তাহারা তৃপ্তি লাভ করিত। হা জীবন ধারণের অনুকূল ছিল। (৫) আর্য্যগণ ঐ ল অরণ্য অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী ও কৃষিকর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন ইত্যাদি। অগ্নির সাহায্যে বনস্থলী বিধ্বস্ত করিতে করিতে আর্য্যগণ জয়যাত্রা করিতেন। অগ্নি পরিক্রমণের এই অর্থই সঙ্গত। অগ্নি সদানীরার পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত আসিয়া-ছিলেন, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম—আর্য্যগণ ঐ পর্য্যন্ত বনভূমি বিধ্বস্ত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সরস্বতীর তীর হইতে তাঁহারা সদানীরা পার হইয়া মিথিলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে পূর্ব্ব দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিলেন। নবাগত আর্য্যগণের সহিত পুরাতন আর্য্য-দলের এইরূপ বিবাদ স্বাভাবিক। এ বিবাদ প্রাদেশিকতা-জনিত। আধুনিক বিহারীদিগের বাঙ্গালীবিদ্বেষের ন্যায় সেকালে উহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' এই নীতি সেকালেও অনুসৃত হইয়াছিল।

এখন দেখা যাউক, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে কোন্ কোন্ দেশ আর্য্যগণের বাসোপযোগী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। মনুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্যগণের উপযুক্ত ক্ষেত্র চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ; যথা—ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি মধ্যদেশ, এবং আর্য্যাবর্ত্ত। তন্মধ্যে সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নাম্নী দেবনদীদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে অভিহিত (মনু ২।১৭)। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ এবং মথুরা এই কয়টি প্রদেশ ব্রহ্মর্ষি অন্তর্ভুক্ত। এই ব্রহ্মর্ষি 'দেশ' বা 'ভূভাগ' ব্রহ্মাবর্ত্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন। তৎপরে উত্তরে হিমাচল ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এই পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পশ্চিম বিনশন হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত অবস্থিত তাহা মধ্যদেশ নামে অভিহিত। যে স্থানে সরস্বতী নদী বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা বিনশন দেশ নামে অভিহিত। তৎপরে মনু আর্য্যাবর্ত্তের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিকে সমুদ্র, উত্তরে হিমাচল এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি,—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই আর্য্যাবর্ত্ত। অর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম দিকে আরব সাগর, পূর্ব্ব দিকেও সমুদ্র। পূর্ব্ব দিকের সমুদ্র কোন্ সমুদ্র ? প্রায় সকলেই ধারণা করেন, উহা বঙ্গোপসাগর। কিন্তু হিমবান এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে ধরিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইলে বঙ্গোপসাগর প্রায় পড়ে না,—প্রকৃত প্রস্তাবে দক্ষিণ দিকে অতি অল্পই পড়ে। তবে যদি ধরিয়া লওয়া

---

(৫) Muir's Original Sanskrit Text, vol v, p-215

যায় যে, বঙ্গোপসাগর মনুর আমলে বা তাহারও পূর্ব্বে আরও কিছু উত্তর দিকে বিস্তৃত ছিল—তাহা হইলে এ সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু তাহা হইলে মনুর কাল অত্যন্ত প্রাচীন হইয়া পড়ে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা তাহা মানিবেন না।

এরূপ অবস্থায় অন্য দিক্ দিয়া আর্য্যাবর্ত্তের এবং আর্য্যগণের প্রাচীন বাসভূমি কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার সন্ধান করা যাউক। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা মনুসংহিতার ন্যায়ই প্রামাণিক গ্রন্থ। উহাতে কথিত হইয়াছে যে, যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, তাহাতেই ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। (৬) তথাকার ধর্ম্মই প্রামাণিক। মনুও সে কথা বলিয়াছেন। (৭) ব্যাস লিখিয়াছেন যে, যে সকল দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বেচ্ছায় বিচরণ করে, সেই স্থলেই বেদোক্ত ধর্ম্ম ব্যবহার করা উচিত। (৮) বশিষ্ঠসংহিতায় বলা হইয়াছে যে, যে যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বাভাবিক ভাবে বিচরণ করে, সেই সমস্ত দেশেই ব্রহ্মবর্চ্চ (ব্রহ্মতেজ) বিদ্যমান। বাশিষ্ঠ এই বিষয়ে ভাল্লবী পণ্ডিতগণের এক প্রাচীন গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে গাথাটি এই :—

পশ্চাৎ সিন্ধুবিহরিণী সূর্য্যস্যোদয়নং পুরা,
যত্র কৃষ্ণোভিধাবতি তাবদ্বৈ ব্রহ্মবর্চ্চসম্।" ইত্যাদি।

পশ্চিম দিকে সিন্ধু (সিন্ধুনদ বা সমুদ্র) এবং পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যদেবের উদয়াচল পর্য্যন্ত যে ভূমিতে কৃষ্ণসার মৃগ স্বচ্ছন্দে প্রধাবিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত দেশই ব্রহ্মতেজ সন্ধুক্ষণের প্রশস্ত ক্ষেত্র। (৯) বৌধায়নও ভাল্লবীদিগের এই গাথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভাল্লবী ব্রাহ্মণ বেদের অন্যান্য ব্রাহ্মণগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা পণ্ডিতরা স্বীকার করেন। উহা সামবেদীয় ব্রাহ্মণ। উহা অধুনা লুপ্ত। অন্ততঃ উহার সম্পূর্ণ পুঁথি অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। তবে উহার বচন প্রমাণস্বরূপ অন্যান্য অনেক প্রাচীন গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। নিদান পুস্তকে উহার অংশবিশেষ পাওয়া যায়। যাহা হউক, ইহা অতি প্রাচীন। ভাল্লবী নিদানে দেখা যায় যে, সিন্ধুনদ হইতে উদয়াচল পর্য্যন্ত যে যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, সেই সমস্ত দেশই আর্য্যাবর্ত্ত। এ কথা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন—কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা। এ বিষয়ে বিস্তৃততর প্রমাণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। ব্লানফোর্ড বলেন যে, এই কৃষ্ণসার মৃগ কেবল ভারতেই জন্মে। সিন্ধু হইতে পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই উহা দলে দলে বিচরণ করিত। (১০) অধ্যাপক বুলহারও বলিয়াছেন যে, ভারতের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা নিম্ন ভূমিতেই ইহাদিগকে দেখা যায়। বাঙ্গালার ও আসামের বনরাজিশ্যামল পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মৃগ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত। এখন কোন কোন অঞ্চলে বনভূমিতে উহার অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সিন্ধু নদের তীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ আর্য্যাবর্ত্তেরই অন্তর্ভুক্ত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বাঙ্গালা প্রদেশ ইহার মধ্যেই পড়ে। সুতরাং বঙ্গদেশ প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তেরই অন্তর্ভুক্ত, এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

বশিষ্ঠ এবং বৌধায়ন উভয়েই ভাল্লবী ব্রাহ্মণ হইতে অতি প্রাচীন সংহিতাগুলিতে যখন আর্য্যাবর্ত্তের সীমা নির্দ্দেশক গাথা প্রামাণিক বলিয়া উদ্ধৃত বা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন উহার প্রামাণিকতা অস্বীকার করা যায় না। একটা প্রবাদ আছে যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র এবং মগধে গমন করিলে পুনরায় সংস্কার করিতে হয়। যথা—

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥

এই শ্লোকটির মূল কোথায়, তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু উহাকে মনুর

(৬) যস্মিন দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্ নিবোধত। যজ্ঞ ২।১

(৭) কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগাযত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যাজ্ঞয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥
—মনু ২।২৩।

(৮) যত্র যত্র স্বভাবেণ কৃষ্ণসারো মৃগঃ সদা,
চরতে তত্র বেদোক্তো ধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি। ব্যাস ১।৩।

(৯) বশিষ্ঠসংহিতা ১ম অধ্যায়।

(১০) This antilope is found in suitable localities, chiefly open plains with grass of moderate height from the Indus to Assam and from the base of the Himalayas to the neighbourhood of Trichinopoly. Formerly it was more abundant, * * * * but its numbers have been greatly reduced since rifles have become common.

—Blanford Imperial Gazetteer of India, vol. I.

ক বলিয়া বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু ঐ শ্লোক মনুসংহিতার কোন সংস্করণেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে কতকটা ঐ ভাবের আছে বটে—কিন্তু তাহা ঠিক ঐরূপ নহে।(১১) তে বুঝা যায় যে, তৎপূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে বেদপন্থীদিগের ছিল। তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সকল স্থানে,—যে সকল আর্য্য সাধকদিগের সাধনাপূত, অথবা তাঁহাদের কর্ত্তৃক জনহিতকর কার্য্যের জন্য জনসমাজে প্রখ্যাত। তৃ-ধাতু র্থক। যে স্থানের আকাশ বাতাস সাধকের সাধনায় ভাবে পবিত্র হইয়াছে যে, তথায় মানুষের পাপবুদ্ধি ত এবং ধর্ম্মবুদ্ধি প্রসারিত হয়,—তাহাকেই তীর্থ বলা ঐ সকল স্থানে আর্য্যদিগের নিবাস না থাকিলে তীর্থ হইবে কি করিয়া? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যখন ঐরূপ কয়েকটি বচন দ্বারা বাঙ্গালা দেশ অনার্য্যভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল, তখন এই সহজ বিষয়ের প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই! তবে ইদানীং অনেকে এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, এই দেশ আর্য্যগণের অধিকারে আসিবার পূর্ব্বে এ দেশের লোকরা সভ্যতার পথে এত দূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, আর্য্যগণ তাহাদের উপর ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরে যখন নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিলেন—মগধ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা অনার্য্য নহে—তাহাদের দৈহিক লক্ষণ হইতে মঙ্গলীয় বা দ্রাবিড়ী রক্ত অপেক্ষা আর্য্য-শোণিতেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়, তখন ঐতিহাসিকরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, আর্য্যজাতির বহু শাখা ভারতে প্রবেশ করে, এবং প্রথমে যাহারা প্রবেশ করিয়াছিল পরে তাহারা নবাগত আর্য্যের চাপে পূর্ব্ব-ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। বস্তুতঃ, আমাদের এই বঙ্গভূমি 'অনার্য্যভূমি' নহে, ইহা আর্য্যভূমি; ইহা প্রতিপন্ন করিতে এখন 'চিনা বামুনকে' পৈতে দেখাইতে হইতেছে!

(১১) বৌধায়ন স্মৃতি ১।১।২

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

কবির গান

আছে ত অভাব নানা করছি মানা কাঁদতে কবি
অভাবের নবাব তুমি থাকুক তোমার সেই গরবই।
দেখ না ভূমি নীরস—
টেনেও পায় নাক' রস,
তবুও নয়ক' বিরস, ফুটায় কুসুম ওই করবী।

তক নহ, চকোর তুমি চাঁদ যে চেনে
তোমার ক্ষুধা স্বরগ-সুধা আন্‌বে টেনে।
পাতালের দুয়ার টুটি'
ত্রিধারা আস্‌বে ছুটি'
জাতে ওষ্ঠ দুটি রসের পাথার রচ্‌বে 'গোবী'।

কোকিলের সাজ্‌বে কেন কুলায় বোনা?
বসন্ত ক'রছে তাহার উপাসনা।
ভ্রমরা গুঞ্জরিছে,
মাধবী মুঞ্জরিছে,
মুখরে মৌন দেখে মেঘের আড়ে হাস্‌ছে রবি।

দারিদ্র্য বল্মীকের ওই আবরণে
পাবে মন রামকে এবং রামায়ণে।
হলাহল তিক্ত অতি,
করে না তোমার ক্ষতি,
বাড়াবে কণ্ঠদ্যুতি হয় ত বা তুই অমর হবি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

দিয়াশলায়ের দেশীয় উপাদান

আধুনিক যুগে যে সকল নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দীপশলাকা বা দিয়াশলাই অন্যতম। ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে কি বিপুল পরিমাণে দিয়াশলায়ের প্রয়োজন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিছুকাল পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত এই সামান্য জিনিষটির জন্যও ভারতবাসীকে নিরুপায় ভাবে বিদেশী শিল্পীদের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইয়াছিল। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান কালে এদেশবাসীর সেই দুরবস্থার অবসান হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে ভারতেই প্রচুর পরিমাণে দিয়াশলাই নির্ম্মিত হইতেছে। তথাপি, ভারতীয় দিয়াশলাই-শিল্প সম্বন্ধে যে কোন অভাব অভিযোগ নাই, একথা বলিবার উপায় নাই। এখনও ইহার উন্নতি ও বিস্তৃতির পথে কয়েকটি প্রবল বাধা বর্ত্তমান। দিয়াশলাই-শুল্কসংক্রান্ত সরকারী বিধি-ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে দেশজ—বিশেষতঃ কুটীর-সমুৎপাদিত দিয়াশলাই-শিল্পের প্রসারবৃদ্ধির অনুকূল নহে। কিন্তু শুল্ক, লাইসেন্স প্রভৃতি সম্বন্ধে সরকারী নীতির আলোচনায় আপাততঃ প্রবৃত্ত না হইয়া দিয়াশলাই-প্রস্তুতের মূল উপাদানগুলির প্রসঙ্গেই আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। এই সকল উপাদান যাহাতে সম্পূর্ণরূপে দেশমধ্যেই সংগৃহীত হইতে পারে, অর্থাৎ এদেশের দিয়াশলাই-শিল্প পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাবলম্বী হয়, ইহা এদেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রার্থনীয় মনে করেন। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধের প্রভাবে ভারতের কোন কোন শিল্পের অবস্থা যেরূপ অচল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

শিল্পের প্রতিষ্ঠা

ভারতে দিয়াশলাই-শিল্পের অভ্যুদয় অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক নহে; এই সময়ের মধ্যে নানাবিধ প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া ইহাকে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। আজকাল এদেশে দিয়াশলায়ের যে সকল বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আহম্মদাবাদের 'গুজরাট ইস্‌লাম ম্যাচ ফ্যাক্টরী'ই এদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন প্রতিষ্ঠান; কিন্তু উহাও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম-দশকে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বঙ্গদেশের কলিকাতা, ঢাকা, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিয়াশলায়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু পরিচালকগণের যথাযোগ্য অভিজ্ঞতার ত্রুটিতেই হউক, আর উপযুক্ত পরিমাণ মূলধনের অভাব-নিবন্ধনই হউক, ঐ সকল কারখানা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ভারতকে নরওয়ে, সুইডেন ও জাপান হইতে প্রেরিত দিয়াশলায়ের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দেও অন্যূন ৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা মূল্যের দিয়াশলাই এদেশে আমদানি হইয়াছিল। উহার ১৬ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে আমদানির পরিমাণ হ্রাস হইয়া তাহার মূল্য কিঞ্চিদধিক ১ লক্ষ টাকায় নামিয়াছিল; ইহা যে এদেশে দিয়াশলাই-শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ও বিস্তৃতির নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, ১৯২২ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এদেশের দিয়াশলাই-শিল্পে একটা প্রবল প্রেরণা (boom) লক্ষিত হইয়াছিল। তাহার ফলে এদেশে দিয়াশলায়ের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা যে কেবল ভারতবাসীরই প্রচেষ্টার ফল, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই, বিদেশীয় প্রভাবও তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান।

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর হইতে সুইডেন ভারতের দিয়াশলাইর বাজারে কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। এস্থলে একথার উল্লেখ বাহুল্য নহে যে,

ন সুইডেনের যে কোম্পানি ভারতে দিয়াশলাই-শিল্পের সায় পরিচালিত করিতেছেন, সেই 'Sweedish atch Company' প্রকৃতপক্ষে সুইডেনের বিরাট রখানা সমূহের সংঘ মাত্র (match combine)। পৃথিবীর নক দেশেই ইহার কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য নানা ায়ে দিয়াশলাই-ব্যবসায় আপনাদের আয়ত্ত করিবার ়া করিয়া আসিয়াছে; এবং তাহার ফলে সমগ্র পৃথিবীর াশলাই-ব্যবসায়ের শতকরা ৬৫ হইতে ৭০ অংশ এই ম্পানি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। Tariff Board তীয় দিয়াশলাই-শিল্প সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনু- ন দ্বারা ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, াতে এই কোম্পানির কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ সন্নি- হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে মোট ১ কোটি লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই উৎপন্ন হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৪০ গ্রোসেরও অধিক পরিমাণ দিয়াশলাই উক্ত সুইডিস্ ম্পানির কলিকাতা, বোম্বাই, আসাম ও ব্রহ্মদেশে ষ্ঠিত কারখানা সমূহে উৎপাদিত হইয়াছিল। উঁহাদের ার কারখানা ব্যতীত কতকগুলি এদেশীয় কোম্পানির রও উঁহারা নানা উপায়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া- । যাহা হউক, তাহা সত্ত্বেও ভারতে দিয়াশলাই- যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা ত পারে। সমগ্র পৃথিবীর দিয়াশলাই-শিল্পের তুল- এই শিশু ভারতীয় শিল্প আজ নগণ্য নহে। পৃথিবীতে ের প্রায় ১৫ কোটি গ্রোস দিয়াশলাই কাটতি হয়; ধ্যে ভারতে কাটতির পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ । ইহার মধ্যে ভারত এখন ৫৪,০০০ গ্রোস মাত্র ানি করিয়াই স্বকীয় অভাব পরিপূরণ করিতে সমর্থ ছে। ভবিষ্যতে বিদেশীয় দিয়াশলাই ভারতে যে ানি করিতে হইবে না, ইহা বুঝিবার জন্য এই কথার ই যথেষ্ট যে, ভারতীয় কারখানা সমূহের উৎপাদন- (capacity) বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষ গ্রোস আরও অধিক।

দিয়াশলায়ের উপাদান

তিপয় খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যতীত কাঠই লাই উৎপাদনের মূল উপাদান। খনিজ মোম (paraffin wax), রক্তিম ফস্ফরাস, ম্যাঙ্গানিজ ডায়ক্সাইড, কাচ চূর্ণ প্রভৃতি এ দেশেই উৎপন্ন হয়। কয়েক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, ও আবরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ-প্রকার কাগজ এখনও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় বটে, কিন্তু এদেশীয় কাগজে এবং রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির সহিত ঐ সকল অভাবও যে এ দেশোৎপন্ন দ্রব্যের সাহায্যে নিরাকৃত হইবে, ইহা আর দুরাশা বলিয়া মনে হয় না।

দিয়াশলায়ের বাক্সের ও কাঠির উপযোগী কাঠ প্রথমে কতক পরিমাণে বিদেশ হইতেই আমদানি করা হইত। এদেশে দিয়াশলায়ের কাঠ সংগ্রহ হইতে পারে কি না, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে তাহার অনুসন্ধান চলিয়া আসিতেছে; এই অনুসন্ধানের ফলে ভারতীয় বন বিভাগ দিয়াশলাই নির্ম্মাণোপযোগী নানাবিধ কাঠের সন্ধান পাইয়াছেন। জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ দিয়াশলাই-শিল্পবিৎ A. Rotter নানা জাতীয় ভারতীয় কাঠ দিয়াশলাই প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করিয়া এই কার্য্যে তাহাদিগের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, প্রায় ৭৮ জাতীয় ভারত-জাত কাঠ দিয়াশলায়ের কাঠি-প্রস্তুতের উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও, শুনিতে পাওয়া যায়, দিয়াশলাই প্রস্তুতের পক্ষে দেশীয় কাঠের সরবরাহ না কি চাহিদার অনুরূপ নহে, এবং এই জন্যই ঐ কার্য্যের উপযোগী প্রায় এক হাজার টন কাঠ বিদেশ হইতে এখনও আমদানি করিতে হয়। দিয়াশলায়ের কাঠের যোগান দেওয়ার জন্য এ কাল পর্য্যন্ত এদেশে বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠান বা কারবার স্থাপিত নাই। নানা স্থানের কাঠব্যবসায়িগণ পরস্পরের সহিত সংশ্রব-হীন ভাবে এই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন; এবং রেলের শ্লীপার, ইমারৎ, আসবাব প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত কাঠের তুলনায় দিয়াশলায়ে ব্যবহারের যোগ্য বিভিন্ন জাতীয় কাঠের মূল্য অল্প বলিয়া ঐ সকল কাঠ-ব্যবসায়ী এ জন্য তেমন আগ্রহ বা উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কিন্তু দিয়াশলাই-কাঠ সরবরাহের ব্যবসায় যথারীতি সংগঠিত হইলে দিয়াশলাই প্রস্তুতের জন্য এদেশে কাঠের অভাব হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

বস্তুতঃ, দিয়াশলাই-প্রস্তুতের উপযোগী কাঠ-উৎপাদক

বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ কেবল যে ভারতের দুই একটি স্থানেই পাওয়া যায় এরূপ নহে। উহাদের অধিকাংশেরই সমাবেশ (distribution) এরূপ বহুল-বিস্তৃত যে, বিভিন্ন প্রদেশস্থিত দিয়াশলাই-কারখানা সমূহ সেই প্রদেশেই প্রয়োজনানুযায়ী কাঠ পাইতে পারে; এবং তাহার অভাব হইলেও সন্নিহিত অন্য প্রদেশ হইতে উহা সংগ্রহ করাও কঠিন নহে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নে বিশেষরূপে পরীক্ষিত কয়েক জাতীয় কাঠের পরিচয় প্রদান করিতেছি। উৎপত্তি হিসাবে উহাদিগকে পার্ব্বত্য ও সমতল-দেশীয় কাঠের পর্য্যায়ভুক্ত করা হইল।

পার্ব্বত্য অঞ্চলের কাষ্ঠ

Aesculus indica,—বা Indian Horse chestnut পাহাড়ী কাঠ-বাদাম;—উত্তর-পশ্চিম হিমালয়, নেপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

Alnus : ভূর্জ্জপত্রবর্গীয় তরু। হিমালয়ের নাতি-শীতোষ্ণ অংশে সুলভ A hepaleuses খাসিয়া পাহাড়ে পাওয়া যায়; আর একটি জাতি A diococa শ্রীহট্টের জঙ্গলের সাধারণ তরু।

Englehardia : এই গণীয় দুই এক জাতীয় বৃক্ষ কুমায়ুন ও গাড়বালে উৎপন্ন হয়; তদ্ভিন্ন আসামেও দেখিতে পাওয়া যায়।

Picea morinda : ভুটান হইতে পশ্চিম দিকে হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে রাউ নামে পরিচিত এই মহাতরু জন্মিয়া থাকে। ১৬০—১৮০ ফুট উচ্চ বৃক্ষও বিরল নহে। ইহার কাঠ দিয়াশলাইয়ের বাক্স ও কাঠি উভয়েরই পক্ষে বিশেষ-উপযোগী।

Pine : তিন জাতীয় পাইন বা সরল বৃক্ষ হিমালয় পর্ব্বত হইতে আসামে খাসিয়া পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছে। পশ্চিমাংশে চিড় (p. longifolia) এবং কাইল (P. excelsa) ও পূর্ব্বাংশে খাসিয়া চিড়ের (P. khasya) বসতি। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে সরল কাঠ দিয়াশলাই নির্ম্মাণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বাক্স ও কাঠি উভয়ের পক্ষেই ইহা উপযোগী; বিশেষতঃ, দেখা গিয়াছে, কাইলের কাঠি খুব মজবুৎ। এই তিন জাতীয় সরল বৃক্ষের মধ্যে বাজারে চিড়ের কাঠের আমদানি অধিক। সরলের নির্য্যাস হইতেই তার্পিন ও রজন উৎপন্ন হয়। কাষ্ঠ নির্য্যাসময় হওয়ায় ইহা জলেও ভাল।

Populus euppratica বা বাহান। সিন্ধু, পঞ্চনদ ও বেলুচিস্থানে বাহান বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষজ্ঞ রোলারের মতে ইহা দিয়াশলায়ের উৎকৃষ্ট কাঠ। নাতিশীতোষ্ণ হিমালয় প্রদেশে আরও দুই এক জাতীয় Populus জন্মায়। তাহাদিগের গুণাগুণও পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

Salix : সাধারণ ইংরেজি নাম Willow। নানাজাতীয় Willow বা বেদ পার্ব্বত্য এবং সমতল প্রদেশে জন্মে। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে নদীতীরে S. tetrasperma জন্মিতে দেখা যায়। গাছ খুব উচ্চ না হইলেও ইহার কাঠ দিয়াশলাই প্রস্তুতের উপযোগী। বেতের ন্যায় দৃঢ় ও সরু প্রশাখা সমূহ দ্বারা সাধারণতঃ ঝুড়ি, টুক্‌রী ও অন্যান্য আধার নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

Zanthoxylum a latum : তেজবল, তিমরু; হিমালয়ের পাদদেশের ক্ষুদ্র তরু। সদ্গন্ধযুক্ত কাঠ, কাঠি প্রস্তুতের উপযোগী; ইহার তম্বুল নামক ফল গন্ধের মশলারূপেও ব্যবহৃত হয়। আসামেও ইহা সুলভ।

সমতল প্রদেশের কাষ্ঠ

কদম্ব : হিমালয়ের পাদদেশ দিয়া নেপাল হইতে পূর্ব্বদিকে ইহা বিস্তারলাভ করিয়াছে; দাক্ষিণাত্যেও ইহা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন, নানা স্থানে রোপিত অবস্থাতেও কদম্ব তরু দেখিতে পাওয়া যায়।

ছাতিম : শৈত্য-বহুল স্থানে, যথা—পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম ও দাক্ষিণাত্যের অরণ্যসমূহে ছাতিম গাছ সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে। ইহার কাঠ হাল্‌কা; বাক্স প্রস্তুতের উপযোগী।

শিমুল : ভারতের সমগ্র গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ও হিমালয়ের পর্ব্বতমালায় ৩০০০ হাজার ফুট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত শিমূলের প্রসার। শুষ্ক স্থানে গাছও খুব বড় হইয়া থাকে। ১৫ ফুট বেড়বিশিষ্ট শিমূল কাণ্ড বিরল নহে। আপাততঃ দিয়াশলায়ের জন্য যে সকল কাঠ ব্যবহৃত হইতেছে, তন্মধ্যে শিমূল অন্যতম। রোলার সাহেব বলেন যে, দিয়াশলাই প্রস্তুতোপযোগী ভারতীয় কাষ্ঠসমূহের মধ্যে শিমূলের

|কক্ষ কাঠ কম দেখা যায়। শিমূল খুব দ্রুত বৃদ্ধিশীল হু বলিয়া কর্ত্তিত বৃক্ষের অভাব সহজেই পূরণ হইয়া কে। শিমূলের সমগণীয় Bomdox insigneকে হু অথবা ঝুটা-শিমূল বলা হয়। ইহার বাসস্থান পশ্চিম পকূল, চট্টগ্রাম ও আন্দামান দ্বীপ। ইহাও শিমূলের ন্যায় দাকার বৃক্ষ, এবং কাঠও দিয়াশলাই প্রস্তুতের ান উপযোগী।

সালাই ঃ—শুষ্ক অগভীর মৃত্তিকাময় স্থানে, যথা— জপুতানা, মধ্যভারত ও উড়িষ্যার কঙ্করবহুল অংশ সালাই ছের স্বাভাবিক জন্মস্থান। ইহার নির্য্যাস সালাই গঁদ কুন্দুরকুট নামে বাজারে পরিচিত। কাষ্ঠ নির্য্যাস- ক্ত বলিয়া ইহা সহজদাহ্য।

ধ্রাউল ঢাক ঃ—ইহা পালিতা-মাদার গাছের গণীয়। মধ্য-প্রদেশ, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, পঞ্চনদ ও যুক্ত- দেশের স্থানে স্থানে এই জাতীয় মধ্যমাকৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া কে। কাষ্ঠ নরম; বাক্স ও কাঠি উভয়েরই উপযোগী।

দেবদারু ঃ—ইহা দক্ষিণ-ভারতে স্বাভাবিক ভাবে ৎপন্ন হইলেও বঙ্গে ও অন্যান্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ন্মিয়া থাকে। দেবদারু কাঠ পল্‌কা ও কম মজবুৎ বলিয়া াকিং-বাক্স নির্ম্মাণ ব্যতীত অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, ন্তু ইহা দিয়াশলায়ের উপযোগী।

কুড়চি ঃ—ভেষজরূপে কুড়চির ছাল ও ফল (ইন্দ্র- ।) সুপরিচিত। সমতল প্রদেশ হইতে অল্পোচ্চ পার্ব্বত্য ঞ্চল পর্য্যন্ত ভারতের অনেক স্থলেই কুড়চী গাছ সাধারণ। াঠি প্রস্তুতের জন্য ইহার কাঠ প্রশস্ত।

Holoptelia integrifolia নামক বৃহৎ ক্ষ বঙ্গদেশে সুলভ নহে বটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর- ারতের নানা স্থানে ইহা বিচ্ছিন্ন ভাবে জন্মে। ইহার াঠ বাক্স ও কাঠি প্রস্তুত, উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইতে ারে।

পুলী ঃ—kydia calycina—পশ্চিম-ঘাট, পঞ্চনদ যুক্তপ্রদেশের দেরাদুন ও সাহারাণপুর জেলার জঙ্গলে ণীয় অনতিবৃহৎ বৃক্ষ সুলভ। দেশীয় প্রথায় শর্করা- াধনে ইহার ত্বক স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। য়াশলাই প্রস্তুতে ইহার কাঠ ব্যবহৃত হইতে পারে।

জিউলী ঃ—ইহার আঠা অনেকেই দেখিয়াছেন। গাছ মধ্যমাকৃতি। সমতল প্রদেশের অনেক স্থলে এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে ৫০০০ ফুট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত জিউলী গাছ দেখা যায়। ইহার কাঠ বাক্স অপেক্ষা কাঠি প্রস্তুতেরই অধিকতর উপযোগী।

কণক চাঁপা ঃ—ইহা মুচকুন্দ ফুলের সমগণীয় গাছ। রোপিত অবস্থায় কলিকাতায় ও সহরতলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের উচ্চতর প্রদেশে বিশেষতঃ আসামে ইহা সুলভ। কাঠ হালকা। মুচকুন্দ কাঠও পরীক্ষাযোগ্য।

আমড়া ঃ—সাধারণতঃ বাগানে যে আমড়া গাছ দেখা যায়, তাহা তত বড় হয় না। পার্ব্বত্য প্রদেশের আমড়ার ফল অখাদ্য হইলেও গাছ বৃহদাকার হয়। আমড়া-কাঠ এখন দেশলাইয়ের জন্য ক্রমশঃ অধিক পরি- মাণে ব্যবহৃত হইতেছে। সমতল দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়ের ৫০০০ হাজার ফুট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত আমড়া গাছ প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। অন্য কাজের জন্য বিশেষ চাহিদা না থাকায় ইহার কাঠও সুলভ।

পারুল ঃ—এই নামে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত দুই জাতীয় বৃক্ষ আছে। একটি সমতল প্রদেশে ও অন্যটি অপেক্ষা- কৃত উচ্চতর অঞ্চলে জন্মে। পাহাড়ী পারুলের কাঠই দিয়াশলাই প্রস্তুতের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। অযোধ্যা, চট্টগ্রাম ও ছোটনাগপুর, বোম্বাই এবং দক্ষিণ-ভারতের নানা স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পঞ্চনদেও ইহা বিরল নহে।

পিঠালী ঃ—ইহার গাছ গ্রামাঞ্চলে বহু স্থানে দেখা যায়। সাধারণতঃ গঙ্গার তটদেশে বড় বড় পিঠালী গাছ জন্মে; সুন্দরবনেও ইহা সুলভ। কাঠ হাল্‌কা, ঢাক নির্ম্মাণ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে ইহার বিশেষ ব্যবহার দেখা যায় না। দিয়াশালায়ের পক্ষে ইহা সুলভ ও উপযুক্ত কাঠ।

কাষ্ঠ নির্ব্বাচন

দিয়াশলায়ের উৎকর্ষতা ব্যবহৃত কাষ্ঠের উপযোগিতার উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। বাক্স ও কাঠির পালিশ ভাল হইবে, কাঠি পাতলা হইবে, অথচ বাক্সে ঘর্ষণের সময় ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইবে না; বাক্স ও কাঠি, উভয় যথাসম্ভব পাতলা হইবে—এই সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি

দিয়াশলাই-শিল্পীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অপকৃষ্ট কাঠি-নির্ম্মিত দিয়াশলায়ের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা হওয়াই স্বাভাবিক; সুতরাং তাহা ব্যবসায়ের অনুকূল নহে। এক সময় সুইডিস্-কোম্পানি তাঁহাদিগের স্বদেশজাত দিয়াশলায়ের কাটতি বাড়াইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই অতি অপকৃষ্ট দেশীয় কাষ্ঠ দ্বারা দীপশলাকা প্রস্তুত করাইয়া বাজারে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টার অল্প পরেই উৎকৃষ্ট দেশীয় কাষ্ঠে নির্ম্মিত দিয়াশলাই এ দেশের কারখানা সমূহ হইতে বাহির হওয়ায় তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া সেই অপচেষ্টায় নিরস্ত হইতে হইয়াছিল।

আজকাল ছোট-বড় সকল প্রকার দিয়াশলায়ের কারখানায় কলের সাহায্যে বাক্স ও কাঠি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। দিয়াশলায়ের কাঠ বাতির (log) আকারে কর্ত্তিত হইয়া কারখানায় প্রেরিত হয়। ত্বক্ অপসারিত করিয়া সেই বাতিগুলিকে পর্দ্দা-তুলিবার কল (Peeling machino) ব্যবহারের উপযোগী করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। উক্ত কলে কাষ্ঠখণ্ড হইতে বাক্স অথবা কাঠি নির্ম্মাণোপযোগী পুরু পর্দ্দা অবিচ্ছিন্নভাবে কর্ত্তিত হইয়া বাহির হইয়া আসে। পর্দ্দা হইতে কাঠি-কাটা ও পালিশ-করা, এবং বাক্সের তিন অংশ—বহির্ভাগ, অন্তর্ভাগ ও তলা—কাটা ও ভাঁজ করিবার কার্য্য অন্য কলে সম্পন্ন হয়। বড় বড় কারখানায় এই সকল কার্য্যের জন্য সুবৃহৎ ও জটিল কলকব্জা ব্যবহৃত হয়। ছোট কারখানায় ও কুটীরশিল্পে ব্যবহারোপযোগী ক্ষুদ্রতর যন্ত্রাদি এখন প্রচলিত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে ক্রমশঃ এগুলিরও অধিকতর উন্নতি সাধিত হইবে এরূপ আশা আছে; কিন্তু শুধু কল হইলেই চলে না, কাঠও এরূপ হওয়া চাই—যাহা লইয়া সহজে কাজ করা যায়, ও যাহার নিখুঁত পর্দ্দা বাহির করা সম্ভব।

ক্ষুদ্র কারখানা ও কুটীর-শিল্পে যতদূর সম্ভব স্থানীয় গাছের কাষ্ঠ ব্যবহার করাই সঙ্গত। কুটীর-শিল্পরূপে দিয়াশলাই প্রস্তুত যে সম্ভবপর, তাহা একাধিক ক্ষেত্রে সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহাতে ন্যূনপক্ষে অল্পসংখ্যক লোকেরও অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারে। আপাততঃ এদেশের দিয়াশলাই-কারখানা সমূহে প্রায় ১১ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। ইহা কুটীর-শিল্পরূপে পরিচালিত হইলে তাহাতে ইহার দশ গুণ লোক নিয়োজিত হইতে পারে। অবশ্য বৃহৎ কারখানাগুলি থাকিবেই; কিন্তু ভবিষ্যতে গ্রাম্যশিল্পরূপে দিয়াশলাই-শিল্পের প্রবর্ত্তন হইলে এক দিকে যেমন কতকগুলি গ্রামবাসীর জীবিকার্জ্জনের উপায় হইবে, অন্য দিকে তেমনই স্থানীয় বৃক্ষ সমূহের কাষ্ঠাদিরও অধিকতর সদ্ব্যবহার হইবে; এবং তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইলে গ্রামবাসীদের আর্থিক সচ্ছলতা হইবে। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে— কংগ্রেসের নির্দ্দেশক্রমে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য উদ্যোগ সমিতি কুটীরশিল্পরূপে দিয়াশলাই নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছেন। কাঠের পরিবর্ত্তে তাঁহারা বাঁশ ও পুরাতন অব্যবহার্য্য কাগজ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়, কিন্তু ঐ সকল উপাদানে নির্ম্মিত দীপশলাকা সাধারণ প্রণালীতে নির্ম্মিত দীপশলাকার সহিত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

মিলন-ব্যথা

কূজন-মুখর সে দিন নিশিতে প্রথম মিলন প্রিয়া—
তুমি এসেছিলে নীরব চরণে
কুতূহলে শুধু হেরিতে গোপনে—
চোখে চোখে যেই দেখিনু তোমারে নিবিড় দরশ দিয়া,—
ছুটে চলে গেলে চকিত চরণে প্রাণমন নিঙাড়িয়া!

নিবিড় সুখের পরম-পুলকে শিহরণে কাঁপি উঠে—
অনুরাগ-মাখা আগমন-ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণ-রণি
আবেগ—উল্লাস প্রকাশিতে চায় দেহের বন্ধ টুটে,—
উদ্ধত যত মিলনের কাঁটা নগ্ন জ্বালায় ফোটে।

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

রামায়ণ-বিচার

৫

এই বিচার সুনিপুণভাবে করিতে হইলে প্রবন্ধাবলি বহু বিস্তৃত হইবে, ইহা জানিতাম, ইহাও জানিতাম,—এই মুমূর্ষু বৃদ্ধ এ বিচার সমাপ্ত করিতে পারিবে না, তথাপি রামায়ণ-কথা কবির ভাষায় 'রামায়ণী গঙ্গা পুনাতি ভুবন-ত্রয়ম্'—ত্রিভুবনপাবনী রামায়ণী গঙ্গায় এ সময়ে অবগাহনের লোভ সংবরণ করিতে পারি না। বেগবতী স্রোতস্বিনীর স্রোতোবেগের আঘাতে উচ্চকূল খসিয়াছে, নির্ম্মল জল আবিল হইয়াছে—অশুদ্ধি-বাহুল্যে বিচার-কথা দুরবগাহ হইয়াছে, আর অবগাহন করিব না ভাবিয়াছিলাম, তবু অবগাহন-স্পৃহা ত্যাগ করিতে পারি নাই—আজও পারিলাম না।

যে একটি আকাঙ্ক্ষা পাঠকের মনে জাগাইয়া রাখিয়াছি—সে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি না করিলে—গঙ্গা-রক্ষকদলের কোপে পতিত হইতে হইবে—এই ভয় অবগাহন লোভে সোণায় সোহাগার কার্য্য করিল, লিখিতেই হইল,—তবে খুব সম্ভব ইহাই শেষ।

গত মাঘ মাসের বসুমতীতে লিখিয়াছিলাম, 'রাজা দশরথের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, পট্ট-মহিষীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হয় অথচ তাঁহার ভয় ছিল কৈকেয়ীর পিতৃকুলকে'। আরও লিখিয়াছিলাম, "কৌশল্যানন্দনের রাজ্যাধিকারে কৈকেয়ীনন্দন হইতে দশরথ যে বাধার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, প্রবন্ধান্তরে এতৎসম্বন্ধে তত্ত্বনির্ণয়ে ইচ্ছা থাকিল"—এই প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধেই আলোচনা বা বিচার।

রাজা দশরথের কৌশল্যা কৈকেয়ী ব্যতীত * পত্নীর সংখ্যা সাড়ে সাত শত। (অর্দ্ধসপ্তশতাস্তাস্তু প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ। কৌশল্যাং পরিবার্য্যাথ শনৈর্জগ্মুর্ব্বরস্ত্রিয়ঃ॥ অযোধ্যা ৩৪।১৩।) কিন্তু এক কন্যা শান্তা ব্যতীত তাঁহার আর কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই, পুত্র সন্তানের জন্যই হউক আর সৌন্দর্য্য লোভেই হউক, কিছু অধিক বয়সে কেকয়-রাজনন্দিনীকে তিনি বিবাহ করেন। তখন কেকয়রাজের নিকট তাঁহার প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল,—কৈকেয়ীর গর্ভে পুত্র জন্মিলে সে-ই রাজ্যাধিকারী হইবে, অপুত্রক রাজা দশরথ নিঃশঙ্কচিত্তে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পর অনেক বৎসর অতীত হইল, কৈকেয়ীরও কোন সন্তান জন্মিল না, তখন রাজদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা চাপা পড়িয়া গেল, কিন্তু প্রতিশ্রুতিদাতা রাজার মন হইতে তাহা যাইতে পারে না—যায়ও নাই। যখন দৈবানুগ্রহে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রলাভের অমোঘ উপায় লাভ হইল, তখন রাজার সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভিতরে ভিতরে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছিল, কৈকেয়ীর সারল্যে ও সৌজন্যে রাজার যথেষ্ট বিশ্বাস থাকিলেও কেকয়রাজ যে অবসরমত সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে পারেন, রক্ষা না করিলে অন্তর্ভেদের সুযোগ থাকিলে তাহা ঘটাইতে পারেন—পায়সের বিভাগ সময়ে রাজার মনে এই সব তর্ক নিশ্চয়ই উঠিয়াছিল, সেই কারণে কৈকেয়ী-গর্ভজাতকে কৌশল্যা-গর্ভজাত অপেক্ষা হীনবীর্য্য ও অন্তঃসহায় বলে হ্রস্ব রাখিবার চেষ্টার পরিচয় সেই সময়ে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কবিকুলগুরু বাল্মীকি—রাজা দশরথের এই কৌশল—একটি ছোট কথায় চাপিয়া দিয়াছেন—সে কথাটি 'অনুচিন্ত্য'। সংক্ষেপে ভাবার্থ বর্ণনা করিতেছি, রাজা দশরথ শ্রেষ্ঠতা হেতু তিন মহিষীকে পায়স ভাগ করিয়া দিলেন, ইঁহারা সকলেই এক এক দেশের রাজকন্যা। জ্যেষ্ঠা কৌশল্যাকে দিলেন অর্দ্ধাংশ, মধ্যমা সুমিত্রাকে * এক-চতুর্থাংশ, অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ তাহাও দুই ভাগ করিলেন, এক ভাগ কৈকেয়ীকে দিলেন 'মহামতিঃ' রাজা 'অনুচিন্ত্য' অনেক চিন্তা করিয়া সুমিত্রাকেই সে অর্দ্ধ প্রদান করিলেন। কৈকেয়ীনন্দন কৌশল্যানন্দন অপেক্ষা তেজোবীর্য্যে কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে না—ইহাই ছিল তাঁহার অভিসন্ধি। তিন ভ্রাতা একদিকে

* রামের বনবাস সময়ে রাজপত্নীগণ দশরথের আহ্বানে আসিয়াছিলেন, কৈকেয়ীকে যে তিনি তখন আহ্বান করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য এবং কৌশল্যাকে ঘিরিয়া সার্দ্ধ সপ্তশত পত্নী চলিয়াছেন। অতএব কৌশল্যাও এই সার্দ্ধ সপ্তশতের মধ্যে নহেন।

* সুমিত্রা যে মধ্যমা, তাহার প্রমাণ বাল্মীকি-রামায়ণে স্পষ্ট আছে। ভবভূতি কৈকেয়ীকে লক্ষ্মণের কথায় মধ্যমা বলিয়াছেন, তাহার কারণ—তিনি তাঁহাকে মধ্যমাই বলিতেন; কৌশল্যার পরেই তাঁহার সম্মান, ইহা লক্ষ্মণের মনোগত ভাব। অথবা মধ্যম-বয়স্কা অর্থাৎ যুবতী বলিয়াই তাঁহাকে মধ্যমা বলিয়াছেন।

হইলেও সমান সমান,—তাহাও যে হইতে পারিবে না সাহচর্য্যের সুব্যবস্থায়—তাহারও বিধান রাজা করিয়াছিলেন।

রাজা দশরথ যে কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময়ে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ সত্যসন্ধ শ্রীরামের বাক্য। পরমধার্ম্মিক ভরত শ্রীরামকে অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবার জন্য আনিতে চিত্রকূটে গিয়াছেন, মাতৃগণ, কুলগুরু বশিষ্ঠ ও অপর পুরোহিতগণ সকলে গিয়াছেন, বিশিষ্ট পুরবাসিগণও সঙ্গে গিয়াছেন—অনুনয়-বিনয়, অনুরোধ-উপরোধের সীমা থাকিল না, কিন্তু 'রামো দ্বির্নাতিভাষতে' তাঁহার পিতৃসত্য ও নিজসত্য হইতে তিনি বিচ্যুত হইবার নহেন, ভরতের প্রার্থনা ও তাহার পূরণ যে অনুচিত, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এক স্থানে শ্রীরাম ভরতকে বলিলেন—

পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্॥

(অযোধ্যা ১০৭।৩।)

কিন্তু ভাই! পূর্ব্বকালে আমাদিগের পিতা যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন তোমার মাতামহের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আপনার কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে, তাহাকেই আমি রাজ্য দান করিব।

রাজা দশরথের মনে বরাবরই এই কারণে দুশ্চিন্তা ছিল,—শ্রীরামের যৌবরাজ্যাভিষেকেও অন্য আকারে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বজনপ্রিয় পুত্র শ্রীরামের যৌবরাজ্যে অভিষেক ঐরূপ সঙ্গোপনে এবং ত্বরাসহকারে কেন? সঙ্গোপন বলিতেছি—তাহার কারণ, ভরত শত্রুঘ্ন সুদূর কেকয়-রাজ্যে, কেকয়রাজ ও বিদেহরাজ অনিমন্ত্রিত এবং অভিষেকের পূর্ব্বদিনে মাত্র নিমন্ত্রিত রাজগণ ও প্রজাসাধারণ অভিষেকের কথা জানিতে পারিল,—অতএব ত্বরাও অল্প নহে। রাজা দশরথের সুবিশাল রাজ্য, তিনি সার্ব্বভৌম রাজা।

প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য, আর্য্য, ম্লেচ্ছ, রাজগণ, রাজচক্রবর্ত্তী, দশরথের করদরাজ্য, সকলেই আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত, কিন্তু এই আমন্ত্রণ বিশেষ কার্য্যের পরামর্শার্থ—ইহাই মনে হয়; কারণ, অভিষেকের পূর্ব্বদিন মহাসভা, করদরাজগণ ও পৌরগণ সমক্ষে রাজা দশরথ শ্রীরামের যৌবরাজ্য অভিষেকে স্বীয় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীন মত প্রদান করিতে বলিলেন,—

যদ্যপ্যেষা মম প্রীতির্হিতমন্যদ্ বিচিন্ত্যতাম্।
অন্যা মধ্যস্থচিন্তা তু বিমর্দ্দাভ্যধিকোদয়া॥

২য় সর্গ ১৬।

যদিচ এইরূপ হইলেই আমার প্রীতি হয়, তথাপি অন্য হিতকর যদি কিছু থাকে, তাহা আপনারা চিন্তা করুন। একপক্ষ চাপিয়া যে চিন্তা অর্থাৎ পক্ষপাতীর যে চিন্তা, তাহা অপেক্ষা নিরপেক্ষের চিন্তায় অধিক হিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বদেশের রাজগণ, পৌর ও প্রজামণ্ডল একবাক্যে শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক অতিশয় আনন্দসহকারে অনুমোদন করিলেও রাজা দশরথ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এখনও জীবিত আছি, আমি থাকিতে আপনারা রামের যৌবরাজ্যে মত দিতেছেন কেন?

তখন সকলেই শ্রীরামের উচ্চ প্রশংসা করিলে, রাজা বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলেন। তখন বলিলেন,—

অহোঽস্মি পরমপ্রীতঃ প্রভাবশ্চাতুলো মম।
যন্মে জ্যেষ্ঠং প্রিয়ং পুত্রং যৌবরাজ্যস্থমিচ্ছথ॥

(অযোধ্যা ৩য় সর্গ ২।৬)

ইহা রাজনীতি। "রাজা দশরথ সমস্ত রাজা ও প্রজাগণের ইচ্ছাক্রমেই রামকে যুবরাজ করিয়াছেন, ইহা সুস্পষ্ট করাই পূর্ব্বোক্ত দশরথবাক্য হইতে প্রমাণিত। শ্রীরাম জ্যেষ্ঠপুত্র—ইক্ষ্বাকুবংশের নিয়মানুসারে তাঁহাকে রাজ্য দিবার ইচ্ছা আমি প্রকাশ করিলেও—সকলেরই স্বাধীন মত দিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীরামের যৌবরাজ্যের প্রতিবাদ এক ব্যক্তিও করেন নাই। সেই কারণেই শ্রীরামকে রাজ্য দিয়াছি।" কেকয়রাজ ও বিদেহরাজের আপত্তির উত্তর যেন এই মহাসভায় ঘোষণা দ্বারা নির্ণীত হইল।

রাজা দশরথের দুশ্চিন্তা—কৈকেয়ীর বিবাহ সময়ে স্বীয় প্রতিশ্রুতিদানজনিত শ্রীরাম-রাজ্যাভিষেকের যে ব্যাঘাত চিন্তা, তাহা এইরূপে অনেকটা উপশমিত হইলেও তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। এই সভা-ভঙ্গের পরেই শ্রীরামকে আহ্বান করিয়া যাহা বলিলেন, তাহাই আমার সিদ্ধান্তের অকাট্য প্রমাণ। যথা—আমি দেব, ঋষি, বিপ্র, পিতৃবর্গ ও আত্মার ঋণ হইতে

বিমুক্ত হইয়াছি। অতএব তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা ব্যতীত আমার আর অন্য কর্ত্তব্য নাই; এজন্য আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার করা উচিত। ১৪-১৫। পুত্র! এক্ষণে তুমি রাজা হও, ইহাই প্রজাবর্গের অভিলাষ; অতএব আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব; কিন্তু রাম! দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছেন, আমার জন্ম-নক্ষত্র—দারুণ গ্রহ—সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এবং আমিও অন্য নানাবিধ অশুভ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি। তাহাতে আবার মহাশব্দকারিণী উল্কা সকল পতিত হইতেছে এবং নির্ঘাত শব্দ হইতেছে; প্রায় এইরূপ দুর্লক্ষণ সকল প্রাদুর্ভূত হইলে, মহীপতি ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়া কাল-কবলিত হইয়া থাকেন, এ নিমিত্ত আমার জীবনের প্রতি সংশয় হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রাণীদিগের মনোবৃত্তি সর্ব্বদা একরূপ থাকে না; অতএব রাঘব! যে কোন প্রকারে হউক, আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হইতে না হইতেই তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। ১৬-২০। দৈবজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, চন্দ্র পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করেন, সুতরাং যখন অদ্য চন্দ্র পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে গমন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই কল্য পুষ্যা নক্ষত্রে যাইবেন, আমি সেই পুষ্যাযোগে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব—কল্যই তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও; কেন না, আমাকে আমার মন এ বিষয়ে অতীব ত্বরান্বিত করিতেছে। রাম! তোমার এক্ষণ হইতে উপবাস করিয়া সংযতচিত্তে রাত্রে পত্নীর সহিত কুশশয্যাতে শয়ন করা বিধেয়। অদ্য তোমার বন্ধুবর্গ অপ্রমত্তচিত্তে সর্ব্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করুন, যেহেতু, এইরূপ কার্য্যেই নানাবিধ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; এজন্য যদিও তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা ভরত সাধুদিগের মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছে এবং যদিও সে জিতেন্দ্রিয় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ ও দয়াবান্, তথাপি আমার মতে তাহার অবর্ত্তমানেই তোমার যৌবরাজ্যে অভিষেক হওয়া উচিত। কেন না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, মনুষ্যদিগের চিত্ত সর্ব্বদা সমভাবে থাকে না,—ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগেরও চিত্ত, রাগ ও দ্বেষে আক্রান্ত হইয়া থাকে।" ২১-২৭॥

দুর্নিমিত্ত দর্শনে নিজ মরণাশঙ্কা শ্রীরামের যৌবরাজ্যাভিষেকে ত্বরার প্রকাশ্য কারণ বা গৌণ কারণ হইলেও ভরতের ভয়ই প্রধান কারণ, ইহা এই উক্তিতে সুস্পষ্ট। ভরত হইতে ভয়ের মূলে যে তাঁহার বিবাহ কালীন প্রতিশ্রুতি, একথা রাজা একেবারেই গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। এই যৌবরাজ্যোৎসবে কেকয়রাজার ও বিদেহরাজ জনকের অনিমন্ত্রণের প্রকৃত কারণ সুস্পষ্ট—মৌখিক কারণ,—

"সমানিনায় মেদিন্যাঃ প্রধানান্ পৃথিবীপতিঃ।

* * * * *

নতু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ।

ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্॥"

রাজা দশরথ পৃথিবীর প্রধান ব্যক্তিগণকে (রাজা ও ঋষি) আনয়ন করাইলেন, কিন্তু কেকয়রাজা ও বিদেহাধিপতি জনককে ত্বরার জন্য আনাইতে পারিলেন না, পরে তাঁহারা

অনুভূতানি চেষ্টানি ময়া বীর সুখান্যপি।
দেবর্ষি পিতৃবিপ্রানামনৃণোঽস্মি তথাত্মনঃ॥ ১৪॥
ন কিঞ্চিন্মম কর্ত্তব্যং তবান্যত্রাভিষেচনাৎ।
অতো যত্ত্বামহং ব্রূয়াং তন্মে ত্বং কর্ত্তুমর্হসি॥ ১৫॥
অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাস্ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপম্।
অতস্ত্বাং যুবরাজানমভিষেক্ষ্যামি পুত্রক॥ ১৬॥
অপি চাদ্যাশুভান্ পুত্র স্বপ্নান্ পশ্যামি রাঘব।
সনির্ঘাতা দিবোল্কাশ্চ পতন্তি হি মহাস্বনাঃ॥ ১৭॥
অবষ্টব্ধঞ্চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণগ্রহৈঃ।
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্য্যাঙ্গারকরাহুভিঃ॥ ১৮॥
প্রায়েণৈব নিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা হি মৃত্যুমাপ্নোতি ঘোরাঞ্চাপদমৃচ্ছতি॥ ১৯॥
তদ্ যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব।
তাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ॥ ২০॥
অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগমৎ পুষ্যাৎ পূর্ব্বং পুনর্ব্বসুম্।
শ্বঃ পুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ॥ ২১॥
তত্র পুষ্যেঽভিষিঞ্চস্ব মনস্ত্বরয়তীব মাম্।
শ্বস্ত্বাহমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপ॥ ২২॥
তস্মাত্ত্বয়াদ্য প্রভৃতি নিশেয়ং নিয়তাত্মনা।
সহ বধ্বোপবস্তব্যা দর্ভপ্রস্তরশায়িনা॥ ২৩॥
সুহৃদশ্চাপ্রমত্তাস্ত্বাং রক্ষন্ত্বদ্য সমন্ততঃ।
ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্য্যাণ্যেবংবিধানি হি॥ ২৪॥
বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম॥ ২৫॥
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৬॥
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।
সতাঞ্চ ধর্ম্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব॥ ২৭॥

প্রিয়বার্ত্তা শ্রবণ করিবেন। জনকের অনিমন্ত্রণের কারণটা আপাত দর্শনে ঠিক বোধ হয় না, কবির উক্তিই স্বীকার করিতে হয়। কেকয়রাজ্য দূরবর্ত্তী—প্রকৃত কারণ দশরথের মনে 'তুকতুক' করিলেও ত্বরা বশতঃ তাঁহাকে আনয়ন করা হইল না, একথাটা একেবারে উপেক্ষণীয় না-ও হইতে পারে, কিন্তু জনকের অনিমন্ত্রণ কেন? এ প্রশ্ন স্বতঃ উত্থিত হয়।

অথ তত্র সমাসীনাস্তদা দশরথং নৃপম্।
প্রাচ্যোদীচ্যাঃপ্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ ॥
আর্য্যা ম্লেচ্ছাশ্চ যে চান্যে বনশৈলনিবাসিনঃ।
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্ব্বে তং দেবা ইব বাসবম্ ॥

অযোধ্যা ৩য়। ২৪।২৬।

এত দেশের রাজার নিমন্ত্রণ ও আগমনে ত্বরায় বাধা হইল না আর অযোধ্যার সন্নিহিত মিথিলারাজের নিমন্ত্রণে যত বাধা দিল—অভিষেকের ত্বরা। এখানে কবিকুলগুরুর লিপিকুশলতা অপূর্ব্ব।

ত্বরাই অনিমন্ত্রণের কারণ ঘটে, বিদেহরাজ জনক আসিলে, সে সময়ে অভিষেক ঘটিত না, কারণ—বৈবাহিক প্রতিশ্রুতি তখন গুপ্ত থাকিত না, বিশেষতঃ তৎকালে ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ যে কয়জন রাজা ছিলেন, তন্মধ্যে কেকয়রাজ, অশ্বপতি ও বিদেহরাজ জনক বিশেষ প্রসিদ্ধ —আশ্বতরাশ্বি বুড়িলের প্রতি (বৃহঃ ৫।১৪।৮) জনকের সানুগ্রহ দৃষ্টি এবং তাঁহাকে কেকয়রাজ অশ্বপতি কর্ত্তৃক বৈশ্বানর বিদ্যাদান (ছান্দোগ্য ৫।১০—১৬) অবগত হইলে জনক ও অশ্বপতির বন্ধুত্ব অসম্ভব কল্পনার মধ্যে গণ্য হয় না। জনক ধার্ম্মিক, এ কারণে দশরথের বিবাহকালীন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে বাধা উপস্থিত করিতে পারেন, কেকয়রাজের বন্ধুত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান স্মরণ করিয়া তাঁহার অনিমন্ত্রণে এরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়াতেও বাধা প্রদান অসম্ভব ছিল না—কবির ভাব যাহাই হউক, দশরথের বিবাহকালীন প্রতিশ্রুতি জনিত গুপ্ত দুশ্চিন্তা কেকয়রাজ ও বিদেহরাজের অনিমন্ত্রণের যে প্রকৃত কারণ, তাহা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত না হইলেও দশরথের মুখে অন্য আকারে ব্যক্ত হইয়াছে। রাজা দশরথের মানস ছিল, তিনি জীবদ্দশায় শ্রীরামকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করিবেন। তখন আর কেকয়রাজ বা ভরত হইতে কোন আশঙ্কাই থাকিবে না।

মানুষ এক ভাবে, বিধাতা করেন আর কিছু; কারণ, দশরথের শঙ্কাস্থান ভরত হইতেই ভবিষ্যতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছিল।

এখন একটা প্রশ্ন আছে, এই যে রাজা দশরথের বিবাহকালীন প্রতিশ্রুতি, ইহার বাষ্প বিন্দুও মন্থরার মুখেও তো প্রকাশ পায় নাই, কৈকেয়ীর মুখে তো নহেই, ইহার কারণ কি?

উত্তর—ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহু-রপাতকানি ॥ মহাভারত।

পরিহাস স্থান, স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জন, বিবাহকাল, প্রাণনাশ সম্ভাবনা এবং সর্ব্বনাশ এই পঞ্চস্থলে যে মিথ্যা, তাহা পাতক নহে।

এই যে অনুকল্প অশক্ত পক্ষের ব্যবস্থা, তাহার দ্বার দিয়া রাজা পলায়ন করিতে পারেন; বিশেষতঃ মহানুভাবা কৈকেয়ী এক দিনের জন্যও সে-কথা উত্থাপন করেন নাই, অতএব সেই প্রতিশ্রুতির বল তেমন হইবে না। দেবাসুর সংগ্রামে যে বরদ্বয় দান প্রতিশ্রুতি তাহা সেবা বর, প্রতিদান প্রতিশ্রুতি, ইহার বল অত্যধিক, ইহা কেবল বাক্য নহে,—অসীম সেবার পুরস্কার প্রদানে আকুল আগ্রহ —ইহা হইতে পশ্চাদপসরণ মনুষ্যোচিত নহে। এই বরদান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে 'ন স্মরেচ্চ কৃতং যস্তু' এই বচনানুসারে কৃতঘ্নতা দোষ হয়, 'কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ' কৃতঘ্নতা পাপের নিষ্কৃতি নাই। সে সময়ে কৈকেয়ী যে এ দোষের উল্লেখ করেন নাই, তাহা তাঁহার সৌজন্য। নিজকৃত সেবাকে তাহা হইলে খর্ব্ব করা হয়; সে কারণে বৈবাহিক প্রতিশ্রুতির আভাস না দিয়া ঐ দুইটি বরের উল্লেখ। বিশেষতঃ বিবাহকালের প্রতিশ্রুতি দ্বারা ভরতের রাজ্যলাভ মাত্র হইতে পারে—রক্ষার উপায় কি? রাম অযোধ্যায় থাকিলে প্রজারা কি ভরতকে রাজা বলিয়া মানিবে? অতএব চতুরা মন্থরা বিবাহকালে প্রতিশ্রুতির নামও করে নাই। ইহাই হইল পঞ্চম সংখ্যক প্রবন্ধের বিচার-রহস্য। বিচারের সংখ্যানির্দ্দেশ আর পরিকল্পনা হয় তো এই স্থানেই শেষ। ইতি—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

প্যাটার্ণ প্রিণ্টিং

এ পর্য্যন্ত ছুঁচ-সুতো দিয়ে কাপড়ের ওপর নক্সা তোলবার বহু নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সংখ্যায় প্যাটার্ণ প্রিণ্টিং (Pattern Printing) অর্থাৎ রঙ ও রঙ-ফলানো-কাঠির সাহায্যে কাপড়ের ওপর নক্সা কেমন ক'রে কাটা যায়, সেই কথা বলছি। প্যাটার্ণ-প্রিণ্টিংয়ের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ, এ কাজ করতে হলে স্চী-শিল্পীর মতো অত সূক্ষ্ম শিল্পবোধের আবশ্যকতা নেই। যে কেউ (সামান্য একটু সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সাবধানতা থাকলে) এ শিল্পটি সফলভাবে রচনা করতে পারবেন। এতে সময় কম লাগে, খাটুনিও বাঁচে।
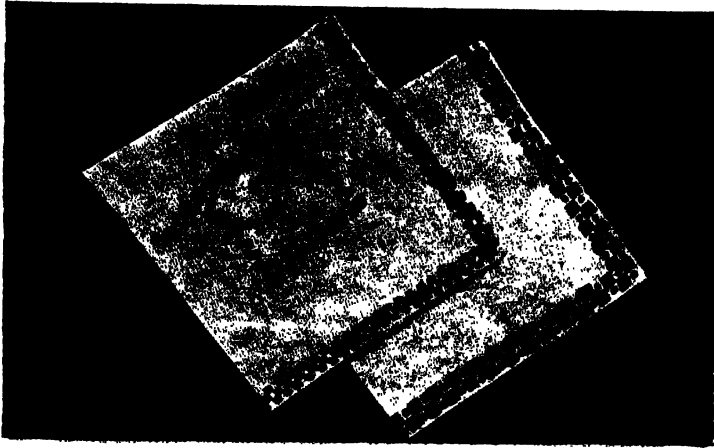
নক্সা-কাটা দু'খানি রুমাল

প্যাটার্ণ প্রিণ্টিং করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন এক সেট কাঠি—যা দিয়ে রঙ ফলাতে হবে। কাপড়ের ওপর তুলি দিয়ে রঙ-ফলানোর চাইতে কাঠি দিয়ে রঙ-ফলানোয় সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশী। এই এক ডজন কাঠির একটি সেট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কাঠিগুলোর মাথা সাধারণতঃ নানা রকম। কাঠির কোনটির মাথা ত্রিভুজাকৃতি, কোনটির চতুর্ভুজ, কোনটির বা অর্দ্ধবৃত্তাকার ইত্যাদি। কাজেই এ সব কাঠির সাহায্যে যে-নক্সা তোলা হবে, তা লতাপাতা-কাটা বা ঢেউ-খেলানো হ'তে পারে না। সে-নক্সাগুলি হবে জ্যামিতির রেখার ধরণে (ছবিতে যে-ধরণের নক্সা আছে)। এই তো গেল কাঠির কথা। এ-ছাড়া চাই তেলের রঙ (liquid oil colours)। এ রঙের নানা শেড আছে। পছন্দমতো নিজে দেখে কিনবেন। যেমন ছবির রুমাল দুটির একটিতে নক্সা করা হয়েছে কমলালেবু ও কালো রঙে; অপরটি গাঢ় লাল আর কালো রঙে।

প্রথমেই কেউটে ধরতে যাওয়া ঠিক হবে না। কাজেই রুমাল নিয়ে কাজ আরম্ভ করা ভালো। ছাপ ভালো ধরে সাধারণতঃ জর্জ্জেট, ক্রেপ-ডি-সিন, ম্যাটী, খদ্দর বা ঐ ধরণের কোনো মোটা এবং খসখসে কাপড়ের ওপরে। ছবির রুমাল দুটি জর্জ্জেটের। যে-জিনিষের ওপরেই ছাপ তোলা হোক, (রুমাল কিম্বা টেবল-ক্লথ কিম্বা ব্লাউস কিম্বা শাড়ী) প্রথমেই কাপড়টাকে ব্লটিং-পেপারের ওপর এঁটে নিতে হবে,—আলপিন দিয়ে। এই জন্যে যেখানে ছাপটি তুলবেন, তার কোলে কোন সোজা লাইন টেনে নেওয়া ভালো—তা'হলে আর নক্সাটির বেঁকে যাবার ভয় থাকবে না। কাপড়টি ব্লটিং-পেপারের ওপর আটকে, কাঠি ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে আঁকতে ব'সে যান;
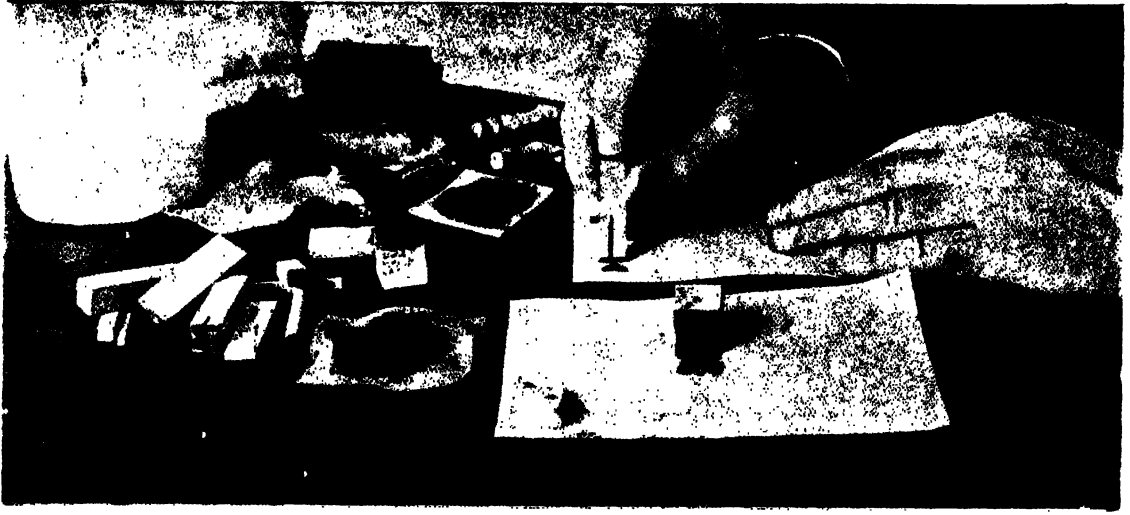
ফেল্ট-কাপড়ে ঢালা রঙ্‌ এমনি ভাবে কাঠি ধরিয়া নক্সা ছাপিবেন

কিন্তু রঙ ব্যবহার করতে হবে খুব সতর্কভাবে। পাতলা রঙ, কাজেই রঙ-গোলা বাটিতে ঢাললে সে-রঙ্‌ কাঠিতে উঠবে, সে-সম্ভাবনা অল্প। কাজেই রঙ ব্যবহার করবার জন্যে এক-টুকরো ফেল্‌ট্‌-কাপড় বা বনাত রাখা দরকার। রঙ ভালো করে গুলে নিয়ে এই ফেল্ট-কাপড়ের ওপর সমান ভাবে ঢেলে নেবেন। তার পর সেই ফেল্টের টুকরোয় কাঠিগুলো বেশ করে চেপে ধরলেই তাদের মাথায় রঙ লেগে যাবে। এখন ইচ্ছানুযায়ী রঙ মিলিয়ে কাপড়ের ওপর নক্সা আঁকুন।

এক-রকম নক্সা

আর এক-রকম নক্সা

তিন-নম্বরের নক্সা

অনেক সময় বেশী রঙ পড়ে গিয়ে নক্সা ধেব্‌ড়ে যায়, তাতে শঙ্কিত হবার কারণ নেই — কেন না, এ-রঙ কাচলেই উঠে যাবে। রঙ ধেব্‌ড়ে গেলে কাপড় কাচিয়ে নিয়ে ভালো ক'রে ইস্ত্রি ক'রে আবার কাজ আরম্ভ করবেন। অনেক সময়ে আবার হয় কি, কম রঙ ওঠার দরুণ ভালো ছাপ পড়ে না। সে রকম হ'লে কাঠিটা আবার রঙের কাপড়ের টুকরোয় চেপে অতি-সাবধানে আগেকার অপর্য্যাপ্ত বা অস্পষ্ট ছাপের ওপর চেপে ধরবেন। কিন্তু এ কাজে খুব সতর্কতার প্রয়োজন, না'হলে ছুটে
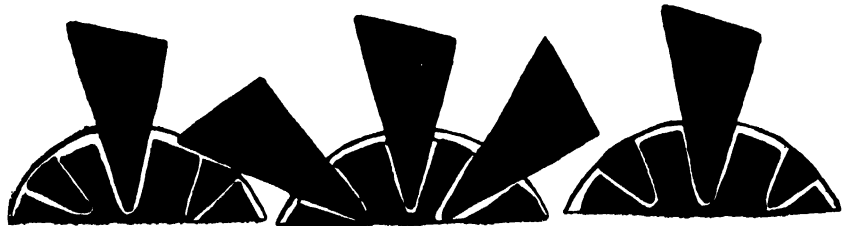
ছাপ পর-পর পড়বার সম্ভাবনা আছে। এ সংখ্যায় যে কটি নক্সা দেওয়া হলো, সেগুলি সকলের রুচিকর না হতে পারে, তবে তাঁরা যাতে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নক্সা কাপড়ের ওপর ছাপতে পারেন, সে-সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দ্দেশ দেওয়া হলো।

একেবারে হাতে-কলমে কাজ করতে যাবার আগে একবার পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো, নক্সাটি ধেবড়ে যেতে পারে কি না। মোটা এবং খসখসে কাপড়ে তোলবার জন্যে যে-নক্সা, সেটির পরীক্ষা হবে ব্লটিং-পেপারের ওপর। যদি দেখেন ব্লটিং-পেপারের উপর সে-নক্সা ধেবড়ে যায় নি, তা'হলে জানবেন সতর্কভাবে রঙ-কাঠির ব্যবহার করলেই সফলতা মিলবে। মিহি কাপড়ে যে-নক্সা তুলতে চান, সেটি ট্রেসিং-পেপারে কিম্বা খুব পাৎলা কাগজে পরীক্ষা ক'রে নেবেন। যে-নক্সাই করুন এবং যে-কাপড়েই তা করুন, এ কথা সব সময় মনে রাখবেন, এ কাজের সাফল্য সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভর করবে সতর্কতার ওপর।

শিশির রঙকে অনেকে আরো ফিকে ক'রতে জিঙ্ক-হোয়াইট ব্যবহার করেন। কিন্তু সেটা সাধারণ জিঙ্ক-হোয়াইট নয়, প্যাটার্ণ-প্রিন্টিং জিঙ্ক-হোয়াইট (Pattern printing zinc-white)।

নক্সা তোলা শেষ হয়ে গেলে সেটিকে শুকোতে দেবেন। রঙ সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে গেলে, অল্প-ভিজে একখানা কাপড় তার ওপর চাপা দিন; দিয়ে তার ওপর মাঝারি-গরম ইস্ত্রি চালান। তাতে ভিজে কাপড় শুকিয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান, রঙ যেন গলে না যায়!

নিটোল দেহ

মাথাটা কোনো রকমে দেহের উপরে বসানো; গলার কাছে কণ্ঠা' ঝিঁকের মতো উঁচু; হাত দু'খানি যেন কাঠের তৈরী,—অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোনোমতে জোড়াতালি খাইয়া মানুষকে খাড়া রাখিয়াছে—এমন পুরুষ বা এমন নারী আমাদের সমাজে চিরদিন চেহারার কদর্য্যতার জন্য প্রায় 'একঘরে' হইয়া থাকেন! অর্থাৎ এমন পুরুষ-নারীর যদি পয়সার জোর না থাকে, তাহা হইলে সমাজে তাঁরা অচল, এ-কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না!

বিধাতা দেহের কাঠামো করিয়া ছাড়িয়া দেন, এ-কথা মানিয়া লইলেও সে-কাঠামোর উপর মূর্ত্তিখানাকে এ্যাপলো বা ভেনাশের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে না পারি, অন্ততঃ তার Scare-crow ভাব কাটাইয়া, কদর্য্যতা মোচন করিয়া মানানসই ছন্দে-ঠামে গড়িয়া তোলা যায় না, এ-কথা মানি না। কদর্য্য কুৎসিত পুরুষকে কোনোমতে সহিতে পারিলেও কুগঠনা কুৎসিত নারীকে বিধাতার অভিশাপ বলিয়াই মনে হয়! এ অভিশাপ-মুক্তির উপায় নারীর নিজের হাতে; এবং সে-উপায় শুধু নিষ্ঠাভরে ব্যায়াম-সাধনা।

আমাদের চলাফেরা বসা-দাঁড়ানোর ভঙ্গীর উপর আমাদের দেহের ছাঁদ-গঠন নির্ভর করে, এ কথা আমরা বার-বার বুঝাইয়া বলিয়াছি। এবং সে-ছাঁদ গড়িয়া তুলিবার বহু হদিশও দিয়াছি।

দেহের গঠন মজবুত নিটোল করিতে পারিলে চেহারা শুধু সুশ্রী ও নয়নবিমোহন হইবে না, দেহ শক্ত-সমর্থ থাকিবে এবং দেহে তারুণ্যশ্রীর দীপ্তি-লাবণ্য বহুকাল যাবৎ ধরিয়া রাখা যাইবে।

দেহকে সুঠামে গড়িয়া তুলিতে প্রকৃতি দেবীর নিজস্ব প্রয়াস আছে। আমরা নিজের দোষে, ঔদাস্যে-অবহেলায় কৃত্রিমতার চাপে প্রকৃতি দেবীর সে-প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিই! যে-নারীর পানে চাহিলে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়, সেই নারীই প্রকৃত লক্ষ্মীস্বরূপিণী! Feminine attractiveness বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে, সে-কথা নিরর্থক নয়। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের কবি-শিল্পীরা রমণীকে রমণীয়তার আকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যায়ামে দেহের গঠন সুশ্রী সুকুমার হয় এবং নারীকে সন্তান-প্রসবের যে সঙ্কট সহিতে হয়, দেহের গঠনে বিকৃতি থাকিলে অনেক সময় সে-প্রসব-সঙ্কটে সাংঘাতিক পরিণাম ঘটিয়া যায়। তা ছাড়া স্ত্রীজাতির দেহে যে বিবিধ উপসর্গ-ব্যাধির আঘাত লাগে, ব্যায়ামে গঠিত সুকুমার দেহে সে সব ব্যাধি কোনো দিন উৎপাত বাধাইতে পারে না।

সুকুমার দেহ-গঠনে সাঁতারের উপযোগিতা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জলে সাঁতার কাটিবার সুযোগ অনেকের না মিলিতে পারে। যাঁহাদের সে-সুযোগ মিলিবে না, তাঁহারা ঘরে বসিয়া ডাঙ্গায় সাঁতারের অনুরূপ ব্যায়াম করিতে পারেন। সে ব্যায়াম,—দুই হাত সিধা ঝুলাইয়া সিধা

খাড়া দাঁড়ান। (১নং ছবি) তার পর দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া চক্রাকারে দশ মিনিটকাল সবেগে দুলাইয়া ঘুরাইতে থাকুন এবং এমনিভাবে দাঁড়াইয়াই সজোরে নিশ্বাস গ্রহণ করুন। নিশ্বাস লইবার সময় 'বুক-পেট' কুঞ্চিত হইবে—তার পর ক্ষণকাল নিশ্বাস রোধ করিয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করুন। নিশ্বাস-গ্রহণ এবং শ্বাস-ত্যাগ-কালে বক্ষ বেশ স্ফীত হইয়া উঠিবে এবং এই স্ফীতির তরঙ্গ-ভঙ্গ সমস্ত অবয়বকে পেশী-সমেত যে প্রসারিত রাখিবেন (২নং ছবি দেখুন)। উঠিবার সময় দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত করিয়া দিবেন। এ ব্যায়াম দশ মিনিট করা চাই।

তার পর তিন নম্বর বিধি,—একখানা বেঞ্চের উপর তোষক বা চাদর পাতিয়া (শক্ত কাঠে যদি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন) চিৎ হইয়া শুইতে হইবে। হাঁটু হইতে পায়ের তলদেশ ছড়াইয়া সিধা ও সরল রাখিবেন। এবার আধ সের ওজনের ছোট দুটি ডাম্বেল চাই।

১। দাঁড়ান্

২। ওঠ্-বোস্ করুন

সঙ্কুচন-প্রসারণের দোলা দিবে, তাহাতে দেহের 'টোল্' পূরন্ত হইয়া দেহ নিটোল-ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে।

দ্বিতীয় বিধি,—হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাত সামনে প্রসারিত করিয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করুন। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-ও-ত্যাগ-কালে হাঁটু বেশ সুদৃঢ়ভাবে প্রসারিত রাখিবেন। তার পর দশ বার ওঠ্-বোস্ করিবেন। ওঠ্-বোস্ করিবার সময় যখন বসিবেন, তখন হাত দুটিকে ডাম্বেলের অভাবে মোটা দু'খানি বই; দু'খানি বইয়ের ওজন যেন সমান এবং দুটিতে মিলাইয়া আধ সের হয়। দু'হাতে দুটি ডাম্বেল বা বই নিন; হাত রাখুন বুকের নীচে; কাঁচির মতো কব্জীতে-কব্জী সংলগ্ন থাকিবে। (৩নং ছবি দেখুন) এবং ঠিক এমনি কাঁচির মতো ভঙ্গীতে তলপেটের উপর কব্জী সংলগ্ন রাখিয়া ডাম্বেল ধরিয়া দু'হাত ঊর্দ্ধে তুলুন। ঊর্দ্ধে তুলিয়া দু'হাতে ৪নং ছবির মত

৩। কাঁচি-কব্জী
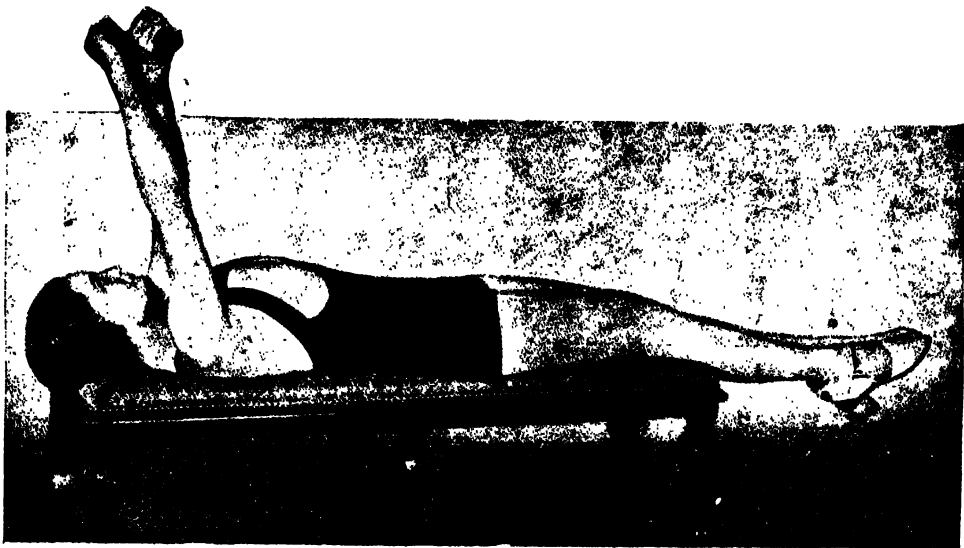
৪। ঊর্দ্ধে দু'হাত তুলিয়া
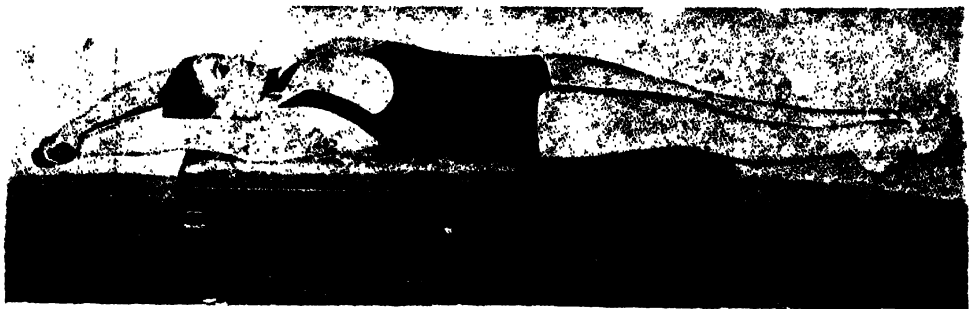
৫। মাথা ছাড়াইয়া প্রসারিত হাত

সংলগ্ন করুন। তার পর পিছন-দিকে কব্জীর বাঁধন খুলিয়া দু'হাত দশ বার ঘুরাইবেন; ঘুরাইবার পর মাথা ছাড়াইয়া দু'হাত প্রসারিত করিয়া দিন (৫নং ছবি দেখুন)। তার পর আবার কব্জীর উপর কব্জী রাখুন আগেকার কাঁচির

নিত্য-নিয়মিত সাধনা করিলে এ ব্যায়ামে দেহ পুরন্ত ও নিটোল ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে।

৬। বুকের উপর এক ইঞ্চি উর্দ্ধে

৭। ডাম্বেল ধরিয়া দু'হাত উর্দ্ধে

ভঙ্গীতে রাখিবার পর আবার হাত তুলিয়া দুলাইয়া আগেকার ভঙ্গীতে হাত রাখিতে হইবে। পাঁচবার এ ব্যায়াম করা চাই।
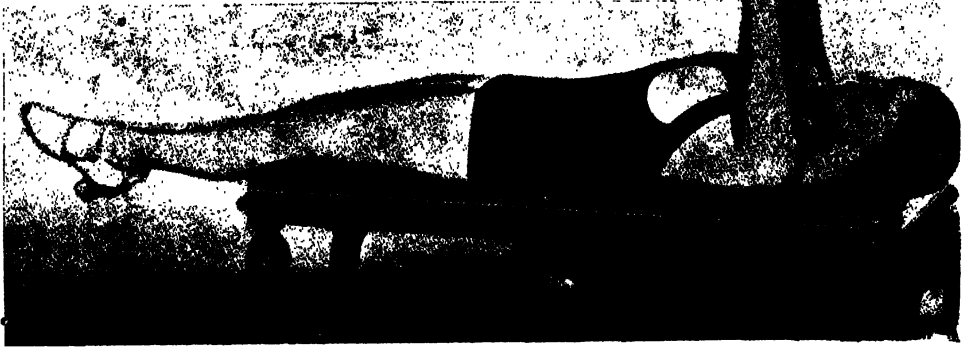
চার নম্বর বিধি,— বুকের উপর এক-ইঞ্চি উর্দ্ধে দু'হাতে দুটি ডাম্বেল ধরিয়া মুঠি করিয়া দু'হাত সংলগ্ন রাখুন (৬নং ছবি দেখুন)। তার পর ডাম্বেল ধরিয়া দু'হাত উর্দ্ধে তুলুন (৭নং ছবি দেখুন)। তুলিয়া ডাম্বেল-সমেত দু'হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া দিন; এবং একবার দু'হাত উর্দ্ধে তুলুন ও পরক্ষণে প্রসারিত করুন। এ ব্যায়াম করা চাই গণিয়া দশ বার। ক্ষিপ্রতালে হাত উঠাইতে নামাইতে হইবে। এবং দশ বার উঠা-নামা করিবার সময় এক দুই তিন সংখ্যাগুলি স্পষ্টভাষায় উচ্চারণ করিতে হইবে। দু'হাত নামাইতে হইবে দেহের সঙ্গে দু'হাতকে সমতল রেখায় রাখিয়া।

আরো দুটি কথা আছে।

প্রথম কথা, বহু পরিবারে বাসগৃহের প্রাঙ্গণে এখন ব্যাডমিণ্টন খেলার রেওয়াজ হইয়াছে। যে-গৃহে রেওয়াজ আছে, সে গৃহে মেয়েরা যদি প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া ব্যাডমিণ্টন খেলেন, তাহা হইলে দেহের গঠন সুকুমার ও নিটোল হইবে।

দ্বিতীয় কথা,—দিনে যতবার পারেন, অবসর করিয়া আট-দশ মিনিটকাল চুপ করিয়া খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া জোরে-জোরে নিশ্বাস লইবেন এবং ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবেন। তাহাতে টোল্ প্রভৃতি সারিয়া দেহ নিটোল-সুঠাম হইবে।

রবার-রায়বার

বড় বড় লরির টায়ার,—আকারে যেমন অতিকায়, শক্তিও তেমনি প্রচণ্ড। পাহাড়-প্রমাণ ভারী বোঝা লইয়া বিদ্যুতের বেগে লরি চলে শুধু ঐ টায়ারের ভরসায়! এ-টায়ার রবারের তৈয়ারী!

ওদিকে আবার সিনেমার ছবিতে দেখি শেটের বাড়ী-ঘরের কোণে মাকড়শার জাল! মাকড়শা এ-জাল বুনিয়া দেয় নাই! জালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূতাগুলি তৈয়ারী হইয়াছে

এরোপ্লেনে রবারের কুশন-গদি

রবারে! এক দিকে ঐ অতিকায় ভারী রবারের টায়ার, অন্য দিকে অতি-মিহি এই জালের সূতা! এ সূতা আমাদের মাথার কেশের চেয়েও মিহি! এ-সূতার একশ গাছি একত্র করিলে তার ওজন হইবে এক-আউন্স মাত্র!

রবারের যেন যাদু-শক্তি আছে! অথচ এই রবার-বস্তুটি কি, জানেন? গাছের নির্য্যাস!

মনসার ডাল-পাতা, পেঁপের ডাল-পাতা বা বটের ডাল পাতা ভাঙ্গিলে দুধের মতো যেমন সাদা আঠা বাহির হয়, রবারের গাছে ছালের নীচে ধারালো-ছুরির ফলা বা অন্য অস্ত্র দিয়া খোঁচা মারিলেও তেমনি সাদা আঠা পড়ে। এই সাদা আঠাকে বলে দুধ বা milk. নানা প্রক্রিয়ায় এই সাদা আঠা জমাট করিয়া বিবিধ রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণে রবারকে আজ নানা রূপে গড়িয়া তোলা হইতেছে। এবং বিভিন্ন রূপের এই রবার লইয়া টায়ার, জুতা, পেন্সিলের দাগ-তোলা ইরেজার, দস্তানা, টিউব প্রভৃতি কত কি বস্তু যে প্রস্তুত হইতেছে, তার আর সংখ্যা নাই!

আধুনিক যুগে এই রবার নানা দিক দিয়া মানব-সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে। সে-কাহিনী আরব-রজনীর গল্পের মতো মধুর এবং উপভোগ্য!

রবারের সেই কাহিনী বলিতেছি।

রবারের গাছ আমাজন-অঞ্চলে চিরদিন অজস্র প্রচুর ভাবে জন্মায়। সেখানকার আদিম-অধিবাসীরা এই রবারকে জমাট বাঁধাইয়া তাহা দিয়া বল, জুতা, কলসী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিত; নল তৈয়ার করিত। সে নলে জল ভরিয়া বনে পত্রপল্লবের আড়ালে লুকাইয়া রাখিত; সেদিকে বিদেশী কোনো লোক আসিলে সেই নলে পায়ের চাপ দিবামাত্র সকলের গায়ে তোড়ে গিয়া জল পড়িত! বিস্ময়-আমোদের অন্ত থাকিত না!

স্পানিয়ার্ডরা গাছের আঠার এই যাদুশক্তি দেখিয়া দেশে গিয়া গল্প করিত। বলিত, গাছ বিঁধিয়া দিলে দুধের মতো আঠা বাহির হয়! সে-আঠার কি শক্তি, চোখে না দেখিলে তাহা প্রত্যয় হইবে না!

ওদিকে ব্রেজিলেও ছিল রবার গাছ। যে সব পোর্ত্তুগীজ ব্রেজিলে যাইত, তাহারা ব্রেজিলের আদিম-অধিবাসীদের তৈয়ারী রবারের কোট, বোতল আনিয়া দেশের সম্ভ্রান্ত অভিজাতবর্গকে উপহার দিত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এক ভদ্রলোক ব্রেজিল হইতে মার্কিন যুক্তরাজ্যে একজোড়া রবারের জুতা আনিয়া সকলের তাক্‌ লাগাইয়া দেন! সে-জুতা দেখিয়া মার্কিন মুল্লুকে রীতিমত কলরব পড়িয়া যায় এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ৫০০ জোড়া রবারের জুতা আনিয়া বোষ্টনের ডকে জাহাজ হইতে নামাইলেন।

রবারের পাত শুকাইতে দেওয়া—মালয়-অন্তরীপ

দেখিতে দেখিতে রবার সম্বন্ধে আমেরিকায় দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। চতুর ব্যবসায়ীর দল লোকজন লইয়া কারখানা খুলিলেন; এবং ব্রেজিল হইতে রবার আনিয়া সেই রবার দিয়া লাইফ-বেল্ট, কাপড় এবং আসবাব-পত্রের আচ্ছাদন তৈয়ার করিতে লাগিলেন। এ রবার আমদানী করিয়া য়ুরোপে তাহা হইতে বর্ষাতি-কোট, টুপি এবং পেন্সিলের দাগ-মোছা ইরেশার তৈয়ার হইতে

রবারের গাছে ব্যাণ্ডেজ

কারখানার রেল-লাইন

গ। ব্রেজিল হইতে এ-সব রবার চালান আসিত। কত-বা! ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপে প্রতি-বৎসর ে চালান আসিত ১৫৬ টন মাত্র।

এই সময়ে কনেক্টিকাট-নিবাসী এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের হাতে পড়িল রবারের একটি বোতল এবং একজোড়া রবারের জুতা। ভদ্রলোকটি তখন ফিলাডেল-ফিয়ায় লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ে সর্ব্ব-স্বান্ত হইয়া 'দেউলিয়া' বনিয়াছেন।

ভদ্রলোকটি দু'পুরুষে ব্যবসায়ী। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতা মার্কিন-ফৌজের ইউনিফর্ম্মের জন্য ধাতব-বোতাম আবিষ্কার করিয়া যেমন নাম কিনিয়াছিলেন, ব্যবসাটিকেও তেমনি ফাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন।

উত্তরাধিকার-সূত্রে পৈতৃক ব্যবসা-বুদ্ধি পাইলেও পুত্র বার-বার নানা কারবারে লোকসান দিয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। নব নব তত্ত্ব-আবিষ্কারে তাঁর অখণ্ড অনুরাগ ছিল। অথচ কোনোটাতেই লাভ হয় না! শেষে মাথার ছাতা বাঁধা দিয়া পারানীর-কড়ি জোগাড় করিয়া দেশান্তরে আসেন। সেখানে দেনার দায়ে সিভিল জেলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এ ভদ্রলোকের নাম চার্লস গুডইয়ার। যে গুডইয়ার-টায়ারের নাম আজ বিশ্ববিখ্যাত, ইনি সেই গুডইয়ার!

রবার সম্বন্ধে অনুশীলন তাঁর জীবনে ছিল শেষ কীর্ত্তি! নিজের সংগ্রাম-কাহিনী তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সে-কাহিনী রবারের পৃষ্ঠায় রবারের কভারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বইখানির নাম Gum-Elastic; কভারের উপর ডিজাইন আছে, ব্রেজিলের জঙ্গলে দেশী লোকেরা গাছ খোঁচাইয়া রবারের নির্য্যাস বাহির করিতেছে। এ বহির পাতায় গুডইয়ারের কল্পিত ছাতার এবং অন্যান্য নানা বস্তুর নক্সা তাঁহার নিজের হাতে আঁকা আছে। শক্ত রবার দিয়া ট্যাঁকঘড়ির কেশ্, চাবি, চেন, শীল স্বহস্তে প্রস্তুত

করিয়া গুডইয়ার তাহা মণিরত্নখচিত করিয়া সম্রাজ্ঞী জোশেফাইনকে উপহার দিয়াছিলেন। তাঁর শিষ্যেরা ঠিক তাহারি আদর্শে রবারের তৈয়েরী একসেট ঘড়ি,চাবি, শীল ও চেন প্রস্তুত করিয়া গুডইয়ারের পত্নীকে উপহার দেন। সেগুলি ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়মে আজও সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

রবারের মিকি-বেলুন

বাইসিক্লে রবারের টায়ার

অন্তিম-শয়নে শায়িত থাকিয়াও রবারের সম্বন্ধে গুডইয়ার যে স্বপ্ন দেখিতেন, বহিখানিতে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। লিখিয়াছেন, এই রবার একদিন মানব-সমাজের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন মিটাইবে! এ রবারের ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল। চার্লস গুডইয়ারের মৃত্যুর পর দেশের এয়াটশন এবং হেওয়ার্ড রবারের সম্বন্ধে গবেষণা- এক ভদ্রলোক র রহিলেন না। বহু গবেষণায় রবার- জোড়া রবারের মাত্রা মাপিয়া সাল্‌ফার মিশাইয়া তাঁহারা দেন! সে-জুতা গবটুকু সম্পূর্ণ কাটাইয়া তুলিলেন।

বোষ্টনে রবার লইয়া যে-গবেষণা সুরু হইল, তার প্রভা গিয়া পৌঁছিল সুদূর আমাজনের জঙ্গলে। মার্কিন-গা স্থির করিল, মালয়-অন্তরীপে মার্কিন-অধিকারে যে বিপু জমি এমনি পড়িয়া আছে, সেখানে রবারের আবাদ করিবে তাহা হইলে রবারের জোগান-সম্বন্ধে নিঃসংশয়ভাবে
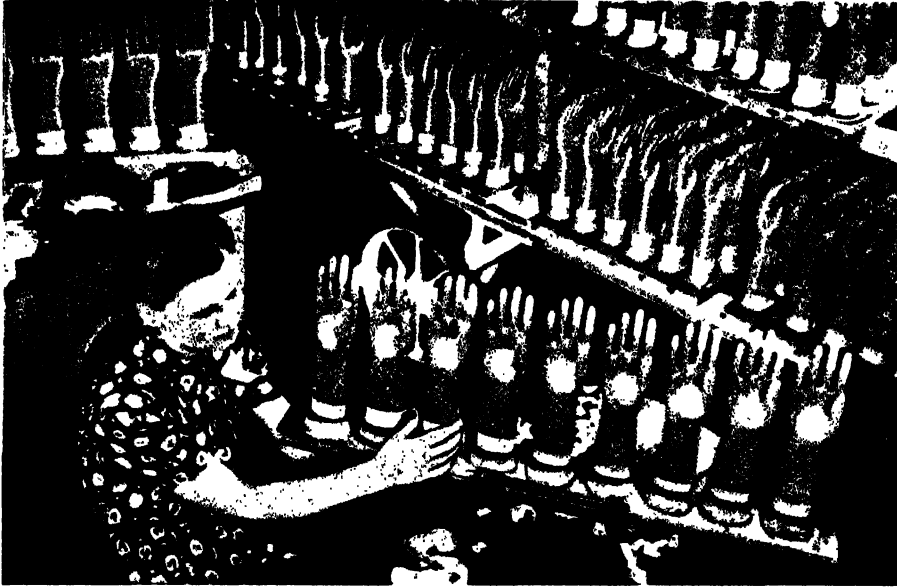
রবারের দস্তানা

রবারের হট্-ওয়াটার বোতল

সরকার বাধা দিল ব্রেজিল-গভর্ণমেণ্ট বুঝিল, অন্যত্র রবারের চাষ-আবাদ হইলে ব্রেজিলের এমন লাভের ব্যবসা মাটী হইয়া যাইবে! কাজেই সে সম্বন্ধে কঠিন বিধি-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইল

তখন সার হেনরি উইকহাম নামে একজন ইংরেজ-ব্যবসায়ী এক চাল চালিলেন! আমাজন হইতে বাছিয়া-গুছাইয়া গোপনে রবার-গাছের ৭০০০০ হাজার উৎকৃষ্ট চারা সংগ্রহ করিয়া সেগুলি তিনি চালান দিলেন ইংলণ্ডে "আমাজোনাস" জাহাজ-মারফৎ। খুব সাবধানে এ রবার আনিতে হইয়াছিল। জলপথে জাহাজে মূষিকের উৎপাত ঘটিলে একটি চারার অস্তিত্ব থাকিত না! জাহাজ আসিয়া লিভারপুলে থামিল। পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থানুযায়ী ডকের ধারে প্রকাণ্ড মাল-গাড়ী মজুত ছিল এই রবারের চারা বহিবার জন্য। এবং এ-চারা সেই মালগাড়ীতে চড়িয়া লণ্ডনের কিউ বোটানিক্যাল উদ্যানে আসিয়া পৌঁছিল।

কাজকারবার চলিবে। নহিলে রবারের চালানীর ভাড়া দিতেই পুঁজির কড়ি অনেকখানি বাহির হইয়া যায়!

তখনকার দিনে রবারের দাম ছিল সের-করা প্রায় আঠারো টাকা।

কিন্তু ব্রেজিল হইতে রবারের চারা আনিতে ব্রেজিল

এই রবার-আনার সম্বন্ধে কৌতুককর একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। সে-কাহিনী এই যে, আইন-কানুনের বাঁধন টপ্‌কাইয়া সিপাহী-শান্ত্রীর চোখে ধূলা দিয়া ব্রেজিল হইতে উইকহাম নাকি চোরাই মালের মতো গোপনে এসব চারা আনিয়াছিলেন! এ কাহিনীর মূলে এতটুকু সত্য নাই। রবার আনার সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য-বিভাগের কর্ত্তা ই, জী, হোর্থ বলেন,—এ চারা আনিতে উইকহাম্ কোনোরূপ বে-আইনী কাজ করেন নাই বা লুকাইয়া রবার আনেন নাই।

লণ্ডনের কিউ উদ্যানে এ চারা বসাইবার দু' মাস পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২০০০ হাজার চারা সিংহলে চালান দেওয়া হয়। কলম্বোতে সে

কাগজের মত রবারের পাত—লম্বে এক-মাইল

কলম্বোয় প্রথম নির্য্যাস-গ্রহণ

রবারের পাতে নক্সা তোলা

সুমাত্রায় তামিল ও যবদ্বীপ, কারিগর

চারা বসানো হয়। সে চারা বড় হইলে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলম্বোর গাছ হইতে সর্ব্বপ্রথম রবার-নির্য্যাস নিষ্কাশিত করা হয়।

তার পর ব্রিটিশ-মালয়ে, ডাচ্-অধিকৃত সুমাত্রায়, যবদ্বীপে রবারের আবাদ এবং রবার লইয়া বহু পরীক্ষা সুরু হইল। যে-সব জমিতে কফির চাষ হইতেছিল, সেই সব জমিতে রবারের চারা লাগানো হইল। এত সাধ্য-সাধনাতেও কিন্তু ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এদেশী রবার মিলিল চার টন মাত্র!

তার পর রবারের ভাগ্য যে ভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল সংক্ষেপে বলা যায়—ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সারা পৃথিবীতে রবার মিলিয়াছিল ৯৪০০ টন; তার মধ্যে ব্রেজিল ও

দুগ্ধ-আঠা জড়ো করা

তামিল বাহিকা

টায়ারের বহর দেখুন !
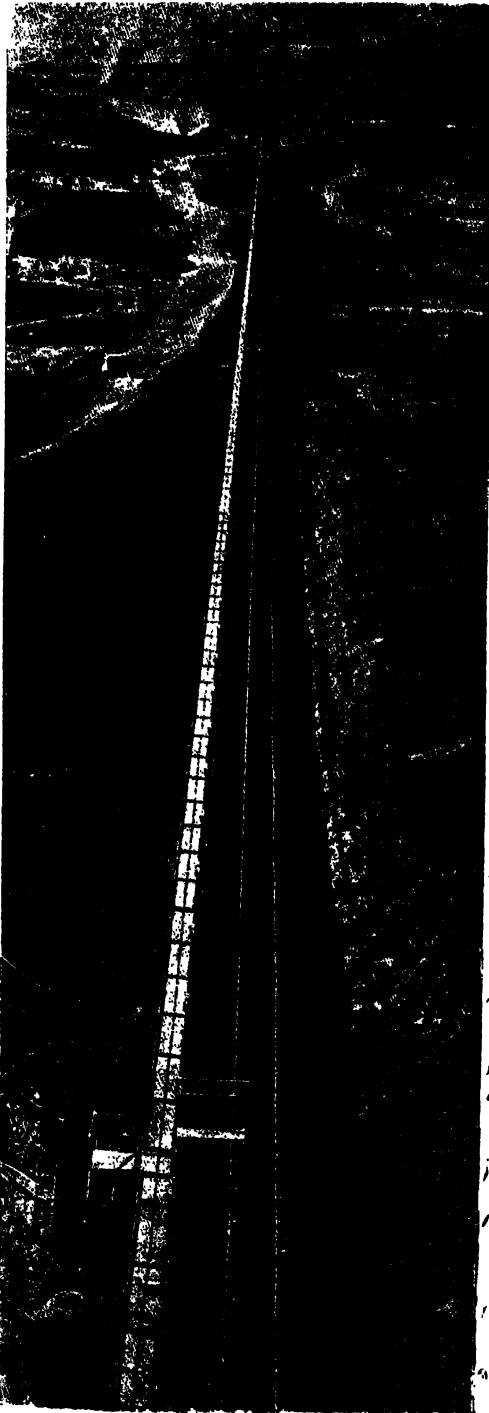
এক-মাইল লম্বা রবার-ব্যাণ্ড

আমাজনের রবার ছিল ৮৩০০০ টন। কিন্তু ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সারা পৃথিবীতে রবার মিলিল ১১৩৫০০০ টন এবং ঐ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলের রবার ছিল শতকরা দুই ভাগ মাত্র; বাকি সমস্ত রবার সিংহল, মালয়, সুমাত্রা এবং যবদ্বীপ হইতে আমদানী। বাণিজ্য-জগতে গুড-ইয়ার টায়ার-রবারের কারখানা আজ সবার অগ্রণী। তাদের আবাদের জমি আছে পানামায়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এবং কষ্টা-রিকায়। তার পর ফায়ারষ্টোন কোম্পানির আবাদের নাম উল্লেখযোগ্য। ফায়ারষ্টোন-টায়ারের রবারের আবাদ লাইবেরিয়ায়।

রবারের তৈরী যে-সব বস্তু আজ আমরা ব্যবহার করিতেছি বা চোখে দেখিতেছি, তার কোনোটা খাঁটী রবারের তৈয়ারী নয়। মূল রবার—বিশেষজ্ঞেরা যাহাকে বলেন, virgin rubber—তার আসল নাম লাটেক্স। পূর্ব্বে আমরা পেঁপের আঠা, বটের আঠা প্রভৃতি সাদা আঠার কথা বলিয়াছি। দুধের মতো সাদা আঠা—সে আঠা এবং গাছের রস (তাল-খেজুরের গা খোঁচাইলে যে রস বাহির হয়) দুটি এক পদার্থ নয়। ছাল এবং গাছের গায়ে যে কাঠ আছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী জায়গা খোঁচাইলে দুধের মতো সাদা এই আঠা বা লাটেক্স ঝরিয়া পড়ে। ঝড়ে বা অন্য দুর্বিপাকে আঘাত লাগিয়া গাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে এই আঠার জোরে গাছ আবার নষ্ট-স্বাস্থ্য সারাইয়া তোলে। এই লাটেক্সে রবার আছে শতকরা ৭০ ভাগ। তিনটি চারা-গাছ হইতে এক বৎসরে যতখানি আঠা পাওয়া যায়, সে-আঠায় রবারে বড়-সাইজের মোটর-গাড়ীর একখানা ফুল-সাইজ টায়ার তৈয়ারী হইতে পারে।

মোটর-গাড়ীতে ছোট-বড় নানা আকারের 'পার্টস্' আছে প্রায় তিনশো। নিউজার্শির এক বিরাট কারখানায় রবারের নানা বস্তু তৈয়ার হইতেছে—রঙীন খেলনা-পুতুল হইতে সুরু করিয়া ব্যাগ, বোতল, বল, জুতা, দস্তানা, পিষ্টন-ক্যাপ, অক্সিজেন-বাষ্পবাহী নল, পিচকারী, এবং অতিকায় ব্যাণ্ড ও বেল্ট। এই ব্যাণ্ড ও বেল্ট প্রায় দু'মাইল লম্বা হয়। কোনোটির ঘের সিকি ইঞ্চি—আবার কোনোটির ঘের বিরাট রকম।

নিউইয়র্কে প্রচণ্ড বাঁধ তৈয়ার হইয়াছে কোলি ড্যাম্—এটিতে এক-মাইল লম্বা রবারের যে ব্যাণ্ড বসানো হইয়াছে, তার সাহায্যে সমুদ্র-গর্ভ হইতে প্রত্যহ ৩০০০০ টন

বালুকা ও কঙ্কর তোলা হয়। এ-কাজের জন্য পূর্ব্বে ষাটখানি মাল-গাড়ীর প্রয়োজন হইত।

যে সব পুতুল-খেলনা তৈয়ার হয়, তার দাম খুব শস্তা। সপ্তাহে প্রায় ৫০০০০ করিয়া খেলনা-পুতুল তৈয়ার হয়। রবারের বগ্‌লি এখন কাগজের বগ্‌লির স্থান গ্রহণ করিতেছে। এ বগ্‌লিতে রুটী এবং বিবিধ খাদ্য রাখা হয়। কাগজের বগ্‌লি ছাড়িয়া রবারের বগ্‌লিতে রাখায় সুবিধা

রবারের সুতায় বোনা নকল মাকড়শার জাল

এই যে, রবারের বগ্‌লি ছেঁড়ে না এবং ধুইয়া সাফ করিয়া সে বগ্‌লিকে বারংবার শোধন করা চলে।

মোটর-গাড়ীর নির্ম্মাণে রবারের প্রয়োজন আজ ইস্পাত, লৌহ, পেট্রোল এবং কাঁচের সমতুল্য। তাছাড়া এ যুগের বৈদ্যুতিক আলোকদানে, টেলিগ্রাফে, রেফ্রিজারেটরে এবং রেডিয়োর ব্যাপারে রবার নহিলে কাজ চলে না!

রবারের ব্যাণ্ডেজ দিয়া গাছপালার দেহ ঘিরিয়া দুষ্ট কীটের আক্রমণ হইতে সে-গাছপালাকে রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে নিউইয়র্কের বিরাট বিশ্ব-প্রদর্শনীতে বিরাট ওজনের একখানি মোটর-গাড়ীকে শূন্যে ঝুলাইয়া দেখানো হইয়াছিল। মানুষের বাহুর মতো পুরু রবারের রজ্জু দিয়া এ গাড়ীখানিকে শূন্যে ঝুলানো হইয়াছিল। ইহা হইতে রবারের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বৈজ্ঞানিকেরা আজ রবারকে এমন নিরন্ধ্র করিয়া তুলিয়াছেন যে, রবারের আবরণ ভেদ করিয়া এক-বিন্দু

রবারের দুধ ভরা

জল বা কণা-পরিমাণ বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আবার রবার দিয়া যে-ব্যাটারি সেপারেটর তৈয়ারী হইতেছে, সে যেন শ্রীরাধার সেই শতছিদ্র কুম্ভ! অর্থাৎ এ সেপারেটরে অতিসূক্ষ্ম রন্ধ্র আছে, রন্ধ্রের সংখ্যা পঞ্চাশ কোটি! রবারের যে 'ম্যাট্রেস' ছাঁচ তৈয়ারী হইতেছে, তাহাতে বিঁধ বা রন্ধ্র আছে প্রায় আড়াই লক্ষ! এই রন্ধ্রপথে বায়ুপ্রবেশ করে এবং বায়ু প্রবেশের ফলে রবারের গায়ে যে-গন্ধ থাকে, সে-গন্ধ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে।

ফায়ারষ্টোন এবং আরো বহু রবার-কোম্পানি রবারের কুশন-গদি-বালিশ প্রভৃতি তৈয়ার করিতেছে, সেগুলিতে তখানি স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম, সে আরামের স্বাদ নি কোনো দিন পাইয়াছেন, তিনিই জানেন!

রবারের দারুণ দুশমন—রৌদ্র। রৌদ্র লাগিলে ার গলিয়া কিম্বা শুকাইয়া ড্যালা পাকাইয়া কঠিন অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিত। এখন বৈজ্ঞানিকেরা এ রবারে বানর গড়িতে পারেন, আবার ইচ্ছা হইলে শিব গড়িতেও এতটুকু বেগ পাইবেন না!

প্রথম যখন ইলেক্‌ট্রিক রেফ্রিজারেটরের সৃষ্টি হইল, তখন এ রবার যেমন শীত সহিতে লাগিল, গরম সহিতেও তেমনি বাধা রহিল না। তবে মুস্কিল ঘটিল এই যে, বৈদ্যুতিক প্রবাহ লাগিয়া রেফ্রিজারেটরের রবারে কালো কষ বাহির হইত! সে-কষ গৃহিণীদের কাপড়-

এ-সব রবারের গাছ

রবারকে রৌদ্রসহ করিয়াছেন। রবার এখন রৌদ্রে গলে না, শুকায় না! যেমন রবার, তেমনি থাকে।

রবারের একটি বৈশিষ্ট্য আছে—একই গাছের রবার অথচ তাদের গুণ-বৈষম্যের সীমা নাই। গাছ হইতে যে কাচা (raw) রবার পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে আরো ই বস্তু মিশাইতে হয়; মিশাইয়া রবারকে রাসায়নিক প্রণালীতে 'শোধন' করিতে হয়। শোধনের ফলে রবারের কম্পাউণ্ড মিলে, তাহা লইয়া যাহা-খুশী গড়িয়া তুলুন।

চোপড়ে লাগিয়া এমন দাগ ধরিত যে, সে-দাগ কিছুতে মুছিতে চায় না! তার উপর সে কষাণি লাগিয়া রেফ্রিজারেটরের রৌপ্যাভ অঙ্গে কালো কলঙ্ক ধরিতে লাগিল। গৃহিণীরা ভ্রূভঙ্গী-সহকারে অনুযোগ তুলিতে লাগিলেন। কোম্পানি তখন নানা পরীক্ষায় সে-কষাণি-জনিত কষ্ট রহিত করিলেন।

কিন্তু কষাণি রহিত করিলে কি হইবে, রেফ্রিজারেটরের মধ্যে ফল-মিষ্টান্ন তরকারী-ব্যঞ্জন রাখিলে তাহাতে রবারের

গন্ধ ধরিতে লাগিল। মাখন বাহির করিয়া মুখে দিতে যান্—মাখনে রবারের দুর্গন্ধ! মুখে দিতে রুচি হয় না! তখন কোম্পানির রাসায়নিকেরা রবারকে গন্ধহীন করিবার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সে সাধনা ব্যর্থ হয় নাই।

এখন এই রেফ্রিজারেটরের রবারকে তাঁরা এমন-ভাবে তৈয়ারী করিয়াছেন যে, রৌদ্র, আগুনের তাপ বা অক্সিজেন-বাষ্পের চাপেও রবারের ক্ষতি বা ক্ষয় নাই! শুধু তাই নয়, রবারকে নানা রঙে রাঙাইয়া যে রামধনুর বর্ণ গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে ভাবেই সে রঙীন রবার জলে ধৌত করুন, রবারের রঙ এতটুকু ঘুচিবে না বা মুছিবে না।

ইন্‌জেক্‌শনের হাইপোডার্ম্মিক ছুঁচ, তাহাতে যে প্লাঞ্জার (নল) আছে, তাহা রবারের তৈয়ারী। এ রবার এমন কৌশলে গঠিত যে, জলে বা মৃদু ও তীব্র আরকে গলে না, দাগ ধরে না। অথচ এ প্লাঞ্জারের ঘের (diameter) এক-ইঞ্চির $\frac{1}{10}$ ভাগ; এবং পুরু (thickness) $\frac{1}{100}$ ইঞ্চি মাত্র। এত ছোট মাপের বলিয়া ছুঁচে টাইট্‌ভাবে আঁটা চলে।

যে-রবার আশ্চর্য্য নমনীয়, সেই রবারকেই বৈজ্ঞানিকেরা তেমনি আবার ইস্পাতের মতো কঠিন অনমনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। তাই এ রবারে রেশমের মতো মিহি মোজা যেমন তৈয়ার করা চলে, তেমনি আবার অস্ত্র শাণানোর শাণ-যন্ত্র তৈয়ারী হয়!

আমেরিকার বড় বড় কারখানায় বিশেষজ্ঞ কারিগর, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির সংখ্যা পাঁচশো জন। তাঁহারা রবারের সহিত তুলা মিশাইতেছেন; আরো বহু দ্রব্য মিশাইতেছেন; মিশাইয়া নব-নব প্রয়োজন-সাধনের জন্ম নব-নব রূপে-বেশে-ছাঁচে রবারকে গড়িয়া তুলিতেছেন!

ঘোড়ার ও কুকুরের যেমন জাতি-বিভাগ আছে—বনিয়াদী বংশ ধরিয়া যেমন তাহাদের জাতি নিরূপিত হয়, রবারেরও তেমনি বনিয়াদী, গৃহস্থ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি-

ফায়ারষ্টোন-কারখানায় রবার-শোধন
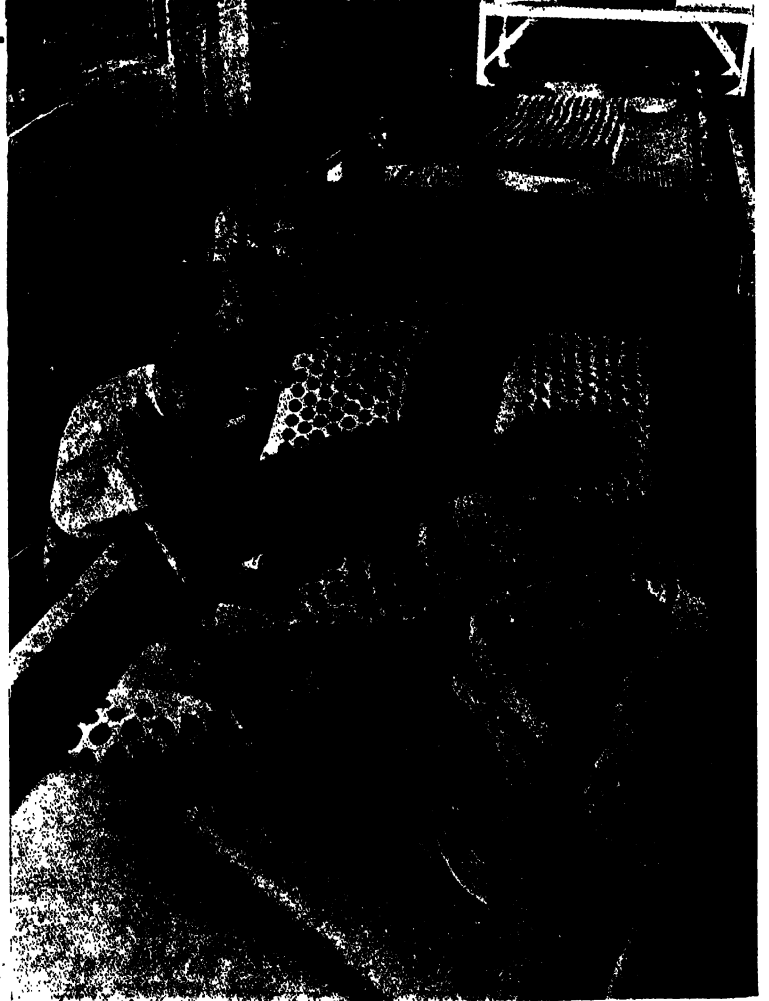
বিভাগ আছে। সব-চেয়ে সেরা রবার হইল ডোলো মেরাঞ্জির নং ১৫২; তার পর স্কটওন্‌ড্ গ্রেনশিল নং ১ জিরান্দজী নং ১; প্রাণ্ডবেশার নং ২৩।

রবারের গাছে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি এ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলে রুগ্ন বা আহত গাছকে সুস্থ করি তোলা যায়। গাছের কলম তৈরী করিতেও গাছের ছা

কাটিয়া তার উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয়। দশ দিন পনেরো দিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকে; তার পর ব্যাণ্ডেজ খুলিলে দেখা যায়, গাছের গায়ে ছোট-ছোট চারা বাহির হইয়াছে। তখন সেই চারা কাটিয়া মাটিতে পুঁতিবার পালা। ছ' সাত বৎসরে এ কলম-গাছ রবার-প্রসূ হয়।

তাহাদের প্রত্যেকের কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া আছে। কেহ গাছের গায়ে ছুরি বসায়; কেহ বালতি ধরিয়া আঠা সংগ্রহ করে; কেহ সে বালতি ভর্ত্তি করিয়া আঠা লইয়া যায়; কেহ আঠা জড়ো করিয়া তাহা জমাট বাঁধায়। সকালে বেলা ন'টার মধ্যে গাছ কাটার কাজ শেষ করিতে হয়—তার পর আঠা ভরিবার জন্ম পাত্র বাঁধা।

যবদ্বীপে মেয়েরা রবার শুকাইতে দিতেছে

প্রত্যহ যে-পরিমাণ আঠা সংগৃহীত হয়, তার ওজন কোনো কারখানায় ৫০০, কোনো কারখানায় বা ৫০০০ গ্যালন। এ্যালুমিনিয়ামের বালতিতে দুধ-আঠা ভরা হয়। সংগ্রহ করিবার পর আঠার সঙ্গে নানা রকম এসিড মিশানো হয়। এসিড মিশাইবার ফলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘন-তরল আঠা জমাট-পাতে পরিণত হইয়া ওঠে। এই জমাট-রবার মাদুরের মতো গোল করিয়া পাকাইয়া গুটাইয়া তিন-চার দিন ধরিয়া কারখানার ঘরে র‍্যাকে তুলিয়া তাহাতে ধোঁয়া লাগানো হয়। ধোঁয়া লাগানোর ফলে রবার গলিতে পারে না বা নির্য্যাসটুকু তাড়ির মতো ফেনাইয়া বা গাঁজিয়া ওঠে না!

এমনি ধোঁয়ানো পাত (smoked sheets) অবস্থায় রবার চালান যায়। তখন এ-রবারে সিদ্ধ মাংসের মতো গন্ধ থাকে।

আবাদ হইতে জাহাজে বা ট্রেণে এই পাত লইয়া যাইবার জন্ম কোম্পানির নিজস্ব ছোট রেল লাইন আছে। সেই লাইনের উপর দিয়া ছোট ছোট মাল-গাড়ীতে ভরিয়া সেগুলি আনা হয় রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে।

সুমাত্রায় গুডইয়ার কোম্পানির আবাদে ৪০০০০ একর জমির উপর বনিয়াদী জাতের রবারের গাছ আছে অজস্র। প্রতি-একর জমিতে প্রায় দেড়শো করিয়া গাছ। এখানে মিস্ত্রী কারিগর ও কুলি প্রভৃতি লইয়া কর্ম্মচারী আছে প্রায় ৬০০০। এ-সব কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকেই যবদ্বীপবাসী।

রবারের গাছে দুধ-আঠা বাহির হয় খুব অল্প মৃদুভাবে—একেবারে বিন্দু-ধারায়।

রবারের ক্ষেতে যান, দেখিবেন, সারি-সারি রবারের গাছ

উঠিয়াছে; সে সব গাছ হইতে টুপ্‌ টুপ্‌ করিয়া বিন্দু বিন্দু দুধ আঠা ঝরিতেছে! এক-একটি গাছ হইতে বছরে যে দুধ আঠা মিলে, তার ওজন হয় এগারো লক্ষ টন্‌।

মার্কিন মুল্লুকে যত রবার আসে, তার বারো-আনা ভাগ মোটর-গাড়ার নির্ম্মাণ কাজে লাগে। রাসায়নিকেরা এখন নকল লাটেক্স তৈয়ার করিতেছেন; আসলের চেয়ে নকল রবারে সুবিধা অনেক। তবে মোটর-গাড়ীর কাজে নকল লাটেক্স ব্যবহার হয় না; সে-কাজ হয় আসল লাটেক্সে।

"গাম্‌-ইলাষ্টিক" বহির প্রতিলিপি

আগামী-বারে টায়ার-টিউব তৈয়ারীর কথা বলিব। সে তথ্য-পাঠে এদেশের অনেকে টায়ার-টিউব তৈয়ারী করিবার কৌশল জানিতে পারিবেন।

সাঁঝে

সায়াহ্নের অন্ধকারে ম্লান ঘরে ধরণীর আলো
দিবসের কর্ম্মস্রোত শ্রান্ততটে আছাড়িয়া ঝরে।
দিগন্তের নভোলোকে ক্লান্ত-পক্ষ বিহঙ্গের দল
উড়ে চলে নীড়-মাঝে শঙ্কাহীন বৃক্ষের শিখরে।
সেথায় নীরব সাঁঝে মৃত্তিকার আঙিনার মাঝে
তুলসীর বেদীমূলে ভীরু ক্ষীণ প্রদীপের শিখা
জ্বালাইয়া ধীরে ধীরে প্রণমিয়া উঠ মৃদু-লাজে,
প্রশান্ত সিঁথিতে তব রেখান্বিত সিন্দূরের লিখা!
সহসা মরমকোণে কি স্মৃতি উঠিল জাগি ধীরে
নয়নের নভোকোণে নামি এল বরষা-বাদল—
জাগিল কাহার ছবি? স্মরণের সমুদ্রের তীরে
দুরন্ত ঝটিকা-বায়ে নিভে গেল প্রদীপ-কাজল।

সে কোন বিরহ লিখা? অগণিত তরঙ্গহিল্লোলে
ভেসে আসে মেঘস্তূপে গাঢ় করি দূর দিগঙ্গন
অজস্র স্মৃতির কূলে পরিপূর্ণ ব্যথার কল্লোলে
ভরি দিল ছন্দে ছন্দে বেদনায় মনের প্রাঙ্গণ!
বসন্তের ফুল্লবনে দক্ষিণের মৃদু সমীরণে
জীবন-প্রভাতে তব ফুটেছিল প্রথম কলিকা
তাহারে ভুলিয়াছিলে দিবসের সূর্য্যের কিরণে;
প্রদোষের সন্ধিক্ষণে ফুটে ওঠে পুনঃ সে মালিকা—
তোমারে রাঙায়ে দিল, মুহূর্ত্তেকে করিল উতল
সেদিনের স্মৃতিকথা ব্যথা-বাষ্পে বিভল-উচ্ছল!
তাহারে ভুলিয়ো প্রিয়, পুরাতন সেই স্মৃতিখানি—
ঢেকে দিয়ো রেখে দিয়ো স্মরণেতে সুপ্ত রেখা টানি

শ্রীমৃণালকান্তি রায়।

কেল্লা-ফতে

(গল্প)
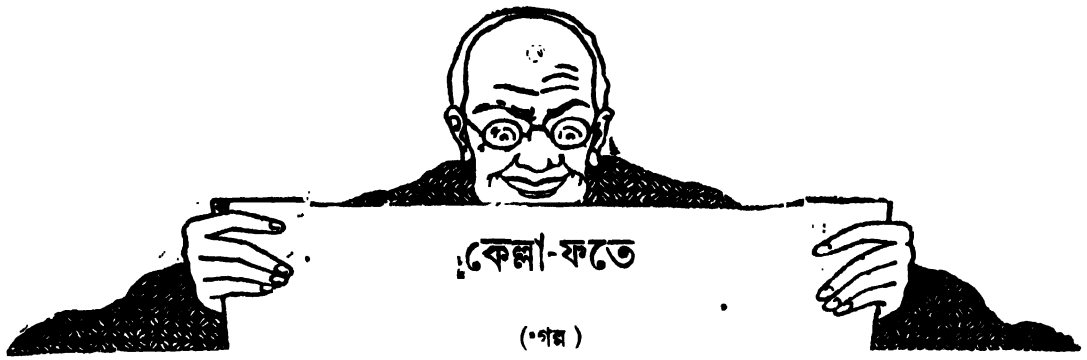
শ্রীযুক্ত গোবিন্দ আচার্য্য মহাশয় বরাবর দ্বিতলে উঠিয়া, যেখানে শিবরাণী বঁটি ও এক ঝোড়া তেঁতুল লইয়া বীচি ছাড়াইতে বসিয়াছিল, তথায় আসিলেন এবং শিবরাণীর উদ্দেশে কহিলেন, "ছেলেকে তলব করেচ কেন গো মা ।?"

শিবরাণী শশব্যস্তে উঠিয়া-আসিয়া তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কার্পেটের একখানা আসন বিছাইয়া কহিল, "বসুন বাবা; দেহটা আপনার ভাল আছে ত?" বলিয়া তেঁতুলের হাতটা ধুইতে গেল। হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "একটা দরকারে আপনাকে ডাকিয়েছি আচার্য্যি মশাই! হাতটা একবার ভাল-ক'রে দেখতে হবে। প্রত্যেকবারেই চারখানা পাঁচখানা ক'রে লটারির টিকিট কিনে যাচ্ছি; ওটা যেন কেমন একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু একবারও ত এ পর্য্যন্ত উঠ্‌লো না কিছু। তাই, ক'দিন ধ'রে ভাবচি, আপনাকে দিয়ে একবার হাতটা ভাল-ক'রে—"

"বেশ করেচ মা, এসব ব্যাপার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত কিনা, সুতরাং ভাগ্যের ফলাফলটা জেনে এসব কাজে নামা উচিত। পাঁজিখানা নিয়ে এসে একবার বোস দেখি মা, ভাল ক'রে দেখি।"

শিবরাণী ঘর হইতে পাঁজিখানা আনিয়া, গোবিন্দ আচার্য্যির সামনে আসিয়া বসিল। গোবিন্দ পাঁজি খুলিয়া তিথি-নক্ষত্র-রাশি-গণ মিলাইয়া, শিবরাণীর হাতের রেখার সহিত সে-সবের বিচার করিয়া, অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, "শনির বক্র-দৃষ্টি চলেছে খুবই। অষ্টমপতি আর লগ্নপতির মাঝেই দেখচি একেবারে……; ওঃ! এই যে রেখাটা দেখচো মা, এইটেই যত অনিষ্ট ঘটাচ্চে! এদিকে বুধ একেবারে দ্বাদশে জেঁকে বোসে রয়েচে, অর্থনাশ ত হ'বেই।"

শিবরাণীর মনটা খারাপ হইয়া গেল; বলিল,—"বুধকে ও-ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না? অর্থনাশ খুবই হ'চ্চে বাবা! বামুনঠাকুর আর কেষ্টাটার মধ্যে এতদিন ছিল ঝগড়া। কেউ কিছুই সুবিধে করতে পারত না ও কিছু গোলমাল করলে, এ এসে ব'লে দিত; এ কিছু গোলমাল করলে ও এসে ব'ল দিত। এখন সম্প্রিতি দু'জনে হোয়েচে গলায়-গলায় ভাব! আর চার হাত দিয়ে এলোপাতাড়ি চুরি চলচে! তার সাক্ষী এই দেখুন না; এই কি দশ সের তেঁতুল, বাবা? তা'ও সের নিয়েচে সাত পয়সা ক'রে! অর্থনাশের ঘটাটা বুঝুন একবার!"

ট্যাঁকের পাক খুলিয়া ছোট্ট নস্যের ডিবাটা গোবিন্দ আচার্য্য হাতে লইলেন, এবং এক টিপ্‌ নস্য লইয়া কহিলেন, —"ও আর কিছু আমাকে বল্‌তে হবে না মা, অর্থনাশ হ'তেই হবে; শাস্ত্র ত আর মিথ্যে হবার নয়; 'সন্তাপং বিত্তনাশঞ্চ বন্ধুনাশং পরাজয়ং: সৌরিঃ করোতি বৈকল্যং রবেরস্তগর্তে শনৌ।'—শনিকে না তুষ্ট করতে পারলে, ঠাকুর-চাকরের অত্যাচারও কমবে না, আর লটারীতে কিছু ওঠা—তারও কোন আশা-ভরসা নেই। আমি বলি কি, তিনটে মাস শনিবার শনিবার শনিপুজোর একটু ব্যবস্থা কর মা! তা হোলেই শনি একটু তুষ্ট হবেন; তখন লটারীর টিকিট কিনো।"

"তা' হোলে, এখন আর কিনবো না?"

"না;—টাকাগুলো যদি জলে ফেল্‌তে না চাও।"

অতঃপর প্রতি সপ্তাহে শনিপূজার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু রামবাবু অর্থাৎ বাড়ীর যিনি কর্ত্তা তিনি এই সবের ঘোর বিরোধী। বিশেষতঃ, গোবিন্দ আচার্য্যির প্রতি তিনি বিশেষ চটা। আচার্য্যির ফাঁকিবাজীর বিরুদ্ধে এ যাবৎ তিনি শিবরাণীকে অনেক বুঝাইয়াও গোবিন্দের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তিল পরিমাণও কমাইতে সমর্থ

হ'ন নাই। সুতরাং স্থির হইল, তিন মাস ধরিয়া প্রতি-সপ্তাহে শনিপূজা করিতেই হইবে; তবে-পূজাটা এ বাড়ীতে না হইয়া গোবিন্দের বাড়ীতেই হইবে। শিবরাণী বারো শনিবারের পূজার ব্যয় বাবদ দুইখানি দশটাকার নোট গোবিন্দের হাতে দিয়া প্রণাম করিল, এবং গোবিন্দ আর এক টিপ্ নস্য নাসারন্ধ্রে গুঁজিয়া সজল নেত্রে ও প্রসন্ন-চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইহার কিছু পরেই রামবাবু বাহির হইতে গৃহে ফিরিলেন, এবং হাতমুখ না ধুইয়াই আগে দেরাজ খুলিলেন এবং তন্মধ্যস্থিত নোটের তাড়াটার নোটগুলি পুনঃ পুনঃ গণিতে লাগিলেন। তিন-চারি বার গণিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া হাঁকিলেন—"হ্যাঁ গা?" কিন্তু 'হ্যাঁ গা'র কোন সাড়া-শব্দ নাই! সে তখন একান্ত মনে পুনরায় তেঁতুলের বীচি নিষ্কাশন-কার্য্যে রত।

"শুনতে পাচ্চ না? ওগো!"

শিবরাণী শুনিতেও পাইয়াছিল এবং বুঝিতেও পারিয়াছিল। গম্ভীরভাবে সাড়া দিল, "কি বোলচ? কাণের মাথা খাইনি, শুনতে পাই।"

"দু'খানা নোট কি হ'ল?"

"আমি এই তেঁতুলের সরবৎ ক'রে তাই দিয়ে গুলে' খেয়েচি।"

"গুলে' খেয়েচ, কি গোল্লায় দিয়েচ, যা হোক কিছু-একটা করেচ নিশ্চয়। ৩৫খানা থেকে পাঁচ আর তিন ৮খানা গেলে ২৭খানা থাকবে ত?"

"নেই ২৭খানা?"

"না, ২খানা নেই।"

"না থাকবার ত অপরাধ নেই। বুধ দ্বাদশে এসে যখন জেঁকে বসেচে, তখন এ রকম হবেই। নইলে এই কি তোমার গিয়ে দশ সের তেঁতুল! আর সাত পয়সা ক'রে সের এনেচে বলে, 'কি করব মা, যুদ্ধেতে সব অগ্নিমূল্যি হোয়েচে।' তা তেঁতুল দিয়ে কি কামানের গোলা তৈয়ারী হচ্চে! এমন অনাছিষ্টির কথাও জন্মে শুনি নি।"

"চুলোয় যাক তোমার তেঁতুল। এখন নোট দু'খানা হ'ল কি?"

"ঐ যে বললুম, তেষ্টা পেয়েছিল, সরবৎ ক'রে খেয়েচি।"

রামবাবু আর উচ্চবাচ্য করিলেন না; করিয়া কোন ফল নাই। ব্যাপারটা তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিবার পথে তিনি গোবিন্দ আচার্য্যিকে এই দিক্ দিয়াই যাইতে দেখিয়াছেন; এবং শিবরাণী যে তার এক জন বিশিষ্ট ভক্ত, তাহাও তিনি জানেন। সুতরাং নোট দুইখানি বেশ শক্ত দুই দুইটি পাকে যে তাঁরই —টাকশালে নয়—ট্যাঁকশালে বন্দী হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কিছু আর বলিলেন না, নীরব রহিলেন। শুধু মনে মনে গোবিন্দ আচার্য্যির চৌদ্দপুরুষান্ত করিতে লাগিলেন। শিবরাণীকেও তাঁহার গালি দিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু শিবরাণীর রাশিনক্ষত্রের এমন জোর ছিল যে, কখনও তাহার বিরুদ্ধে—সামনা-সামনি ত নয়ই—মনে-মনেও কোন কিছু বলিতে তাঁহার সাহসে কুলাইত না।

শিবরাণীও আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে তেঁতুল ছাড়াইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, 'আচার্য্যি মশায়ের ওপর ওঁর যে-রকম আক্রোশ, আজকের ব্যাপার চেপে যাওয়াই সব চেয়ে ভাল। কি-কথায় কি বোলে ফেলবো আর শনিপুজোর ব্যাপারটা ফাঁস হ'য়ে যাবে। দরকার নেই আর ও-কথায়।'

খানিক পরে রামবাবু আবার জামা-কাপড় পরিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিলেন। শিবরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "আবার বেরুচ্চ কোথায়?"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে রামবাবু কহিলেন, "বায়োস্কোপ, বায়োস্কোপ।"

শিবরাণী কহিল, "বুড়ো বয়সে সখের ত দেখচি সুমোর নেই!"

শিবরাণীর রাশিনক্ষত্র যদি জোরালো না হইত, তাহা হইলে ফিরিয়া আসিয়া এ কথার উত্তর ভাল করিয়াই রামবাবু শুনাইয়া দিয়া তবে ছাড়িতেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি নীরব থাকিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পথের মোড়ের কাছে আসিতেই তাঁহার গমনে বাধা পড়িল। বেহালার ফণীবাবু আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন;—কহিলেন, "তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম যে!"

ফণীবাবু রামবাবুর বাল্যবন্ধু। আলিপুর-কোর্টে ওকালতি করেন। বর্ত্তমানে বেহালায় বাড়ী করিয়াছেন।

রামবাবু কহিলেন, "হঠাৎ এ দিকে যে? খবর সব ভাল?"

"খবর সবই ভাল। ছোট ভাইয়ের ত আর বে না দিলে চলে না; ২৭।২৮ বছর বয়েস হোল ত। তার জন্যে একটি পাত্রী দেখতে এসেচি। তোমাকে যেতে হবে ভাই! বেশী দূর নয়, এই বাগবাজারে—নিরাকার ষ্ট্রীট।"

"কিন্তু আমি বায়োস্কোপে যাবার জন্যে বেরিয়েচি, একটা নতুন—"

"নতুন একদিনেই আর পুরানো হয়ে যাচ্ছে না, কাল দেখবে। চল, যেতেই হবে।" বলিয়া—ফণীবাবু একরকম জোর করিয়াই রামবাবুকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

* * * * *

গত সন্ধ্যায় নিরাকার ষ্ট্রীটে মেয়ে দেখিয়া আসিবার পর হইতেই—রামবাবুর যেন মানসিক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। আহারে রুচি নাই, চোখে নিদ্রা নাই; মনে স্বস্তি নাই; মন অত্যন্ত অস্থির, এবং তাহার গতি অত্যন্ত এলো-মেলো। কোন-একটা অবস্থায় দু'দণ্ড মন স্থির করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। একবার চেয়ারে হেলান দিয়া বসিতেছেন, একবার মেজের উপর শুইয়া পড়িতেছেন, একবার বাহিরের বারান্দায় পাইচারী করিতেছেন। কখনো জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আকাশ দেখিতেছেন, কখনো দেয়ালে-ঝুলানো ঠাকুরদাদার আমলের রাম-সীতা-হনুমানের পটখানার মধ্যে হঠাৎ কোন নতুনত্ব দেখিয়া স্থিরদৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন; আবার কখনো বা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বিছানায় ঢলিয়া পড়িয়া উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে কড়িকাঠ সম্বন্ধে মনে-মনে কোনরূপ গবেষণা করিতেছেন। দুপুরবেলা আহারাদির পর জামা গায়ে চড়াইয়া রামবাবু জুতার ফিতা বাঁধিতে বসিলে, শিবরাণী কহিল—"নাকে-মুখে ভাত গুঁজেই বেরুনো হচ্ছে কোথায়?"

"পার্কটায় এক পাক ঘুরে আসি।"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া শিবরাণী কহিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হো'ল? এই বোশেখী দুপুরের রোদে যাচ্ছ পার্কে ঘুরে বেড়াতে!"

"ওঃ!" বলিয়া রামবাবু বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন, এবং বসিয়া-পড়িয়া জুতা জামা খুলিতে লাগিলেন।

শিবরাণী কহিল—"তোমার হ'ল কি? এত বলি যে, একটু বেশী ক'রে মাথায় জল ঢেলে চান করো, তা কিছুতেই করবে না—। ওই ছিরিক ক'রে দু'মগ জল মাথায় ঢেলেই ব্যস্ হোয়ে গেল! সকালে বললুম—'এক-পো সুজি আনতে, আনলে কি না—পাঁচ-পো বিড়ঙ্গ! তোমার হোল কি?"

বেশ-একটু বিরক্ত হইয়া এবং মুখখানা বাঁকা করিয়া রামবাবু বলিলেন—"হবে আবার কি? কিছু হয়-টয় নি।"

"নিশ্চয় হোয়েচে, আলবৎ হোয়েচে!" বলিতে বলিতে শিবরাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে কহিল—"ঘরে মকরধ্বজ কেনা রয়েচে; কাল থেকে মাখন-মিছরি দিয়ে খেতে সুরু কর; আর না হয়, ফটিক ডাক্তারকে দেখিয়ে একটা ভাল ওষুধ-টোষুধ কিছু খাও। শেষকালে কি আমাকে দ'য়ে মজাবে!"

এবার আরও একটু উচ্চকণ্ঠে এবং আরও কিঞ্চিৎ বিকৃত মুখে রামবাবু বলিয়া উঠিলেন—"কিছু হয়নি আমার,—কিছু হয়নি আমার!"

কিন্তু কিছু-একটা হইয়াছে যে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই হইয়াছে। তরশু মঙ্গলবার কিছু হয় নাই। পরশু বুধবারও কোন-কিছু হইবার অবসর ঘটে নাই। কাল বৃহস্পতিবারও সকাল ও দুপুরে এমন কিছুই ঘটে নাই। ঘটিয়াছে কাল বৃহস্পতিবার বারবেলায় গৃহ হইতে বাহির হইবার পর। কি কুক্ষণেই যে ফণী-বাবুর সঙ্গে দেখা হইল ! কি অশুভ মুহূর্ত্তেই যে তাঁহাকে নিরাকার ষ্ট্রীটে যাইতে হইল! মেয়ে দেখিয়া আসিয়া কাল সারা রাত রামবাবু চোখের দু'পাতা এক করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তরে রেখার মুখখানা সারাক্ষণই ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহার মনকে নাচাই-য়াছে, দোলাইয়াছে, উঠাইয়াছে, নামাইয়াছে, আঘাত করিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে। ভোরের দিকে মানস-চক্ষে রেখার মুখ দেখিতে-দেখিতেই অল্প কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, আবার রেখার মুখ দেখিতে-দেখিতেই সে তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল। তাহার পর সমস্ত সকালবেলাটা এ মাসের 'বঙ্গ-কুসুম' মাসিক পত্রখানায় 'রেখার ডায়েরী' নামে যে ছোট গল্পটা বাহির হইয়াছে, তাহা বার বার পাঠ করিয়াছেন; তাহার পরে কাগজ পেন্সিল লইয়া নানাপ্রকার দাগ কাটিয়াছেন আর মনে

মনে বলিয়াছেন, 'সরল-রেখা', 'বক্র-রেখা', 'রেখা-চিত্র' ইত্যাদি। তার পর, দোকান হইতে এক পোয়া সুজি আনিতে গিয়া পাঁচ পোয়া বিড়ঙ্গ আনিয়াছেন। এখন বিছানায় শুইয়া-পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন :—

"আহা কি সুন্দর! কি-বা মনোহর! মুখের এমন সু-ডৌল ভাব বড়-একটা দেখা যায় না। মনে হয়, মুখখানার দিকে চিরকাল ধ'রে চেয়ে থাকি। যেমন চোখ, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি কাণ, তেমনি গাল, যেন ফুটন্ত গোলাপ! মাথার চুলেরই বা কি বাহার! 'সে এমনি-ক'রে চেয়ে গেল ক'রে মন চুরি!' আর সুন্দর ত অনেকই চোখে পড়ে, কিন্তু কি সাংঘাতিক সুন্দর সে। উঃ! না, যাক, আর ভাব্‌বো না। ভেবে শুধু শুধু কষ্ট পাওয়া। চুলের যে গোছা-দুটো দু'কাণের জুল্‌পীতে নেবে পড়েচে, তাই বা কি সুন্দর! তাই ত কি করা যায়। যাক্—চুলোয় যাক্। উঃ, কি বেজায় গরম পড়েচে! আজ কি বার? এবার আমের দফা রফা! বিষ্টিই হোল না, বোঁটা শক্ত হ'তে পেলো না, কচি বেলাতেই সব বোঁটা খসে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সামনের বাড়ীটার ছাদে যেরূপ বাঁধচে, সেই মেয়েটার বিয়ে বোধ হয়, যাকে সকলে খুব সুন্দর বলে। মেয়েটা সুন্দর বটে, কিন্তু রেখার সঙ্গে তুলনায় ও তার বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নয়। আহা-হাঃ, ভগবান যেন—দূর ছাই! আচ্ছা, দেশের যত কাক, সবগুলোরই কি আড্ডা এই কোলকাতায়! কৈ—পাড়াগাঁয়ে ত এত—ওঃ! ফণীকে যে একখানা চিঠি দিতে হবে; অনেক করে বোলে গেছে।"

রামবাবু কাগজ-কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন। খানিকক্ষণ ধরিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিলেন। তাহার পর আপন মনে কহিলেন, 'দোয়া যা'ক্ এক বোমা ছেড়ে, যা হয় তা' হবে।' বলিয়া ফণীবাবুকে এইভাবে পত্রাঘাত করিলেন,—

'ভাই ফণি, তোমার অনুরোধ মত নিরাকার ষ্ট্রীটের কনেটির সম্বন্ধে আজ প্রাতে অন্যান্য যাবতীয় খোঁজ খবর লইয়াছি। অন্য কাহারো কাজ হইলে, আমি এত করিয়া পরিশ্রমও করিতাম না, আর ব্যস্ত হয়ে পত্র লিখিতেও বসিতাম না। তোমার ছোট ভাই আর আমার ছোট ভাই—আমি ত পৃথক্ বলে মনে করি না—এ আমার ঘরেরই ব্যাপার বোলে মনে করি। যা'ক—বলি ভায়া! সম্বন্ধটি কোন্ ধুরন্ধর এনেছিলেন? পত্রে পাত্রীর গুণের আলোচনা করিব না। ভায়ার পাত্রীর জন্য অন্যত্র চেষ্টা কর। আমিও চেষ্টা করিতে থাকিলাম। ভাগ্যিস্ ঐ মেয়েটির সঙ্গে ভায়ার বিয়ে হইয়া যায় নাই, এই রক্ষা। এর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। ইতি।'

চিঠিখানা খামে আঁটিতে আঁটিতে রামবাবু নিজের মনে বলিলেন—'কেল্লার একটা দিক্ ত ঢসিয়ে দিলুম, দেখি, মাণিকের মুকুট দখল করতে পারি কি না!'

পত্রখানা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তখনি তিনি জামা-জুতা পরিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শিবরাণীর একটু আগের কথাগুলি মনে করিয়া আর বাহির হইতে সাহস করিলেন না। শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

বৈকালের দিকে রামবাবু চিঠিখানা পকেটে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাহা ডাকবাক্সে দিয়া ভাবিলেন, —"কোথায় যাই? পার্কে? ভাল লাগে না। বায়স্কোপ? তাতেও মন লাগচে না। বাড়ী ফিরে যাব? বাড়ীতেও ত মন টেঁকে না। নতুন দোকানটায় গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে এলে হয়।"

নতুন দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কি-ভাবিয়া ঢুকিলেন না। এক-পা এক-পা করিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। অবশেষে বাগবাজারের পথ ধরিয়া নিরাকার ষ্ট্রীটের দিকে পা-দুটাকে ধীরে ধীরে চালাইয়া দিলেন।

সেই একতালা ছোট্ট বাড়ীটা। যাহার ভিতর ভগবান শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য রাখিয়াছেন। রামবাবু বিপরীত দিকের ফুটপাতে মুড়কী-বাতাসার দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া বাতাসার দর-দস্তুর করিতে সুরু করিলেন। দোকানী কহিল—"গ্যাহেন কর্‌তা, জিনিসডা একবার ভাল কইর‍্যা গ্যাহেন।" একতলা বাড়ীর খোলা জানলা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া রামবাবু কহিলেন, "তা ব'লে তের আনা সের যে বড্ড বেশী দাম বলচ বাপু!"

"তের আনা কি কর‌তা, স্যার পাচ আনা কইলাম।"

ঐ—ঐ—ঐ রেখা আসিয়া দাঁড়াইল।

* * *

সন্ধ্যার পর পাঁচ পোয়া বাতাসা হাতে করিয়া রামবাবু গৃহে ফিরিলে, শিবরাণী কহিল—এ কি কাণ্ড! ওবেলা

বিড়ঙ্গ, এ বেলা বাতাসা! এত বাতাসা কি হবে? বিড়ঙ্গ দিয়ে ভিজিয়ে খাবে না কি?"

"সংসার করতে হলে বিড়ঙ্গও চাই, বাতাসাও চাই।"—গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়া রামবাবু বরাবর উপরে উঠিয়া গেলেন।

রাত্রে রামবাবুর চোখে নিদ্রা আসে না। এ-পাশ ও-পাশ করিয়া ঘড়ি বাজার ঘণ্টা গণিতে লাগিলেন আর নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'কি করা যায়? সব-দিক্ রক্ষা কোরে কাজ হাসিল করা বড় সোজা কথা নয়। ফণীকে না হয় এক ঘায়ে কাৎ করা গেল; কিন্তু রেখার বাবাকে……! সবার ওপর, ঘরের গিন্নীটিকে কায়দায় আনা—সেইটাই ত অসাধ্য ব্যাপার! তা হোলে ত কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসবে!'—রামবাবু একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন। পরক্ষণেই রেখার মুখখানা অন্তরে ফুটিয়া উঠিয়া অন্তরকে বলীয়ান্ করিয়া তুলে, উৎসাহে হৃদয়-মন নৃত্য করিতে থাকে।

সারারাত্রির অনিদ্রার পর সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া রামবাবু চায়ের জন্য হাঁক-ডাক করায় শিবরাণী আসিয়া কহিল—"বলি, চায়ের কি কল বসানো আছে যে, টিপ্ বো আর পেয়ালা ভর্ত্তি ক'রে আনব? হাত ত এই দুটো।"

"তা' কি করব বল? আর দু'টো হাত ত কাঁধে জুড়ে দেবার উপায় নেই।"

শিবরাণী কথাটা অন্যপথে লইয়া গেল; কহিল—"থাকবে না কেন, করলেই আছে। যেমন তোমার সেই বন্ধু নগেনবাবু করেচে। ও একটা গাড়োল! এক বউ থাকতে কোন্ ভদ্দর লোক আবার একটা বিয়ে করতে পারে! আমি হোলে ওর নাক-কাণ কেটে, দু'টো বউ নিয়ে ঘর করার মজাটা টের পাইয়ে দিতুম।"

"অতি যাচ্ছেতাই অতি যাচ্ছেতাই! ও লোকটাকে তাই আমিও দু'চক্ষে দেখতে পারি না। বলি, বিয়ে করাটা কি ছেলেখেলা! পঞ্চ পাণ্ডব ত অন্ততঃ পাঁচটি বৌ ঘরে আনতে পারতো, কিন্তু নিয়ে এলো একটি; অর্থাৎ প্রত্যেক এক-পঞ্চমাংশ বিয়ে করলে, একটা কোরে দু'টো কোরে ত দূরের কথা। এ থেকেও লোকের শিক্ষা হয় না! আশ্চর্য্য!"

রামবাবুর চা-খাওয়া মাথায় উঠিয়া গেল। তাঁহার অন্তঃকরণে একদিকে ভয়, একদিকে বিরক্তি সমান ওজনে জমিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার শিব-রাণীর ভয়টাই বড় হইয়া সঞ্চিত বিরক্তিকে ঢাকিয়া ফেলিল। তিনি কহিলেন, "আমরা ত ও সব কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। এই ধর, তুমি যে আমার স্ত্রী,—অর্থাৎ সহধর্ম্মিণী। তুমি আমার জীবনেও সঙ্গিনী, মরণেও সঙ্গিনী। অর্থাৎ আমি ম'লেও এ সম্বন্ধ—"

বাধা দিয়া শিবরাণী কহিল—"হোয়েছে; ও-সব অলুক্ষণে কথা আর মুখে আনতে হবে না।" বলিয়া বারান্দার ও-ধারে যেখানে ষ্টোভে চায়ের জল ফুটিতেছিল, শিবরাণী সেই দিকে গেল।

রামবাবু বসিয়া বসিয়া যেন পাতাল-প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন, "না, বৃথা চেষ্টা, আর অনর্থক মন খারাপ করা। সব দিক্ কায়দা করে নিতে পারব, কিন্তু এই দুর্জ্জয় মেয়েমানুষটিকে কায়দা করা আমার সাধ্যের অতীত। নগেনবাবু বাইরের লোক—একজন পর—সে দুই বিয়ে করেচে বলে তার ওপর এই রাগ, আর আমি যদি করি, তা হোলে কি আর রক্ষে আছে! নাঃ! ও সব ঘটে উঠবে না; বৃথা চেষ্টা। রেখা-লাভ আর ভাগ্যে নেই। মিছি-মিছি মনকে ব্যস্ত ক'রে কোন ফল নেই। সব ভুলে যাওয়া যা'ক। বিল্বমঙ্গলের মত চিন্তামণিকে ভুলে সেই পরম-চিন্তামণি-পদে প্রাণ-মন সমর্পণ করা যা'ক। ইহকালের সকল দুঃখ পরকালে সুখ হোয়ে ফুটে উঠ্‌বে।"

সকাল-সকাল স্নানাহার শেষ করিয়া রামবাবু সেই পরম চিন্তামণিপদে প্রাণ-মন সমর্পণ করিতে কালীঘাটে কালীদর্শনে রওনা হইলেন। সেখানে কালীদর্শন করিয়া হাড়ি-কাঠতলার সম্মুখে নাট-মণ্ডপে বসিয়া লোকের ভীড় দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটি প্রৌঢ় বয়স্ক লোককে দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "এই যে! নমস্কার। কালীদর্শনে এসেচেন বোধ হয়?"

লোকটি রামবাবুকে চিনিয়া ফেলিলেন; কহিলেন,—"হ্যাঁ। ভাল আছেন ত? নমস্কার। আপনার ফণিবাবু ত আর কোন খবর দিলেন না।"

লোকটি রেখার বাবা। উভয়ে নাট-মণ্ডপের একাংশে উপবেশন করিলেন।

দিবাকরবাবু অর্থাৎ রেখার বাবা কহিলেন—"মেয়েটি

আমার বড় হোয়ে উঠেচে, সুতরাং ওর বিয়ের জন্তে আমাকে একটু ব্যস্ত হোয়ে পড়তে হোয়েচে। এবং শুধু ব্যস্ত নয়, একটু ভাবিতও ক'রে তুলেচে। কারণ, তেমন অর্থসঙ্গতি ত নেই।"

রামবাবু সম্মুখে কালী-প্রতিমার দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন,—"ভাবনার কোন দরকার নেই। সকল ভাবনা ঐ-পায়ের তলায় ফেলে দিন; ঐ বেটীই সব যোগাযোগ ক'রে দেবেন।"

"আচ্ছা, আত্মীয় মনে করে আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, মেয়েটিকে ফণিবাবুর পচ্ছন্দ হয়েছে ত?"

একটু গম্ভীর হইয়া রামবাবু কহিলেন,"পচ্ছন্দ ত হবেই।"

"তবে, কোন সংবাদ ত আর দিলেন না।"

"না দিয়েছেন, ভালই হোয়েচে।"

একটু চমকিত হইয়া দিবাকর কহিলেন,—"কেন—এ কথা বলচেন কেন?"

ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া রামবাবু কহিলেন,—"নাঃ, এই দেবী-স্থানে আপনি আমাকে মহা মুস্কিলেই ফেল্‌লেন। এখানে ব'সে মিথ্যা কথা কি ক'রে বলি?"

অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত দিবাকর রামবাবুর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"কি ব্যাপার আপনাকে বলতেই হবে, না বল্লে কিছুতেই ছাড়বো না।"

"মহা মুস্কিলে ফেললেন আপনি। তীর্থস্থানে—দেবীর সামনে বোসে……"

ব্যাপারটা সঙ্কট-জনক হইয়া পড়িল। তীর্থস্থানে, দেবীর সামনে বসিয়া রামবাবু মিথ্যা কথাটাও বলিতে পারেন না; আবার কিছু না বলিলেও দিবাকর ছাড়েন না। সুতরাং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া রামবাবু কহিলেন—"কন্তার অন্তত্র বিয়ের চেষ্টা দেখুন।" শেষ পর্য্যন্ত দিবাকরের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে কারণটাও বলিতে বাধ্য হইলেন, কহিলেন—"টি. বি.—টি. বি-…থাইসিস্; বাপও ঐ রোগেই গিয়েচে কি না।"

দিবাকরের চক্ষু কপালে উঠিল।

রামবাবু আশ্বাস দিয়া কহিলেন…"এদের কথা ভুলে যান; অন্ত চেষ্টা করুন। অমন মেয়ে আপনার, বিয়ের ভাবনা কি? সকলে মিলে চেষ্টা করলে, ভাল পাত্র জুটবেই। মেয়ে আপনার সু-লক্ষণা, সুতরাং ভাল হাতেই পড়বে।"

আরও কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর স্থির হইল, রামবাবু কাল প্রাতে দিবাকর বাবুর বাসায় যাইবেন ও তাঁহার দ্বারা পাত্র অনুসন্ধান-কার্য্যে যতটা সাহায্য সম্ভব, তাহা তিনি করিবেন। মনে মনে রামবাবু ভাবিলেন, 'এদিকেও কামান দাগলুম; দেখা যা'ক, কতদূর কি হয়।'—রেখার কথা আবার নূতন করিয়া তাঁহার অন্তরে আশা ও উৎসাহের আলোক জ্বালিয়া দিল।

বৈকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি একটু অস্থির-চিত্ত হইয়া পড়িলেন। নিরাকার ষ্ট্রীটে গিয়া সদুপদেশ ও সাহায্য দান করিবার জন্ত তিনি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। অথচ সকালে যাইবার কথাই হইয়াছে। হউক। তিনি সেই অপরাহ্ণেই বাহির হইয়া পড়িলেন। রেখাকে যতবার দেখিতে পাওয়া যায়, ততবারই তাঁর অসীম তৃপ্তি, অতুল সুখ।

* * * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আইসক্রীমের ছোট ছোট গাড়ীগুলি এদিক-ওদিক যাইতেছে। ছোকরা ও আফিংখোরের দল চায়ের কেবিনগুলিতে আসর জমাইয়াছে। দৈনিক কাগজের ফেরীওয়ালা একপিট-সাদা একখণ্ড সান্ধ্য-সংস্করণ হাঁকিয়া হাঁকিয়া বিক্রয় করিতেছে…'জোর খবর! ভোট্‌-ভোট্ শেষ হইলো! সুবোশবাবু হিন্দুকে গলা টিপিলো!' কলেজের তরুণ-তরুণীরা পূর্ব্ব পরামর্শ ও ব্যবস্থা অনুযায়ী হয় পার্কের পথে পাক দিয়া হাস্ত ও গল্পে চলা-ঢলি করিতেছে, নয় ত-বা একান্তের কোন-এক বেঞ্চে বসিয়া গলা-গলি করিতেছে। যে সমস্ত ছোকরা ফোতো-বাবু অন্নাভাবে সারাদিন অনাহারে কাটিয়াছে, এক্ষণে তাহারা দুই-পয়সায়-ডাইং-ক্লিনিং-এ-কাচা একমাত্র ধব্-ধবে জামা কাপড় পরিয়া, বিনা-পয়সায় ঝাঁপ্‌ড়ি-টেরী উড়াইয়া, আধ পয়সায় পানের খিলি চিবাইতে চিবাইতে ও আধপয়সার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সিনেমার ভীড় বাড়াইতে চলিয়াছে। দু'একটা বেহারী গোয়ালা, খাঁটি দুগ্ধ-ভক্ত বাঙালী বাবুর গৃহে সামনে-দোহা পৃথিবীবৎ দুগ্ধ অর্থাৎ…তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল-মিশ্রিত দুগ্ধ… যোগান দিয়া, এক্ষণে তাহার সেই বিশালকায় গরু এবং শীর্ণকায় বাছুর তাড়াইয়া এবং সেই সঙ্গে পথিকদের সন্ত্রস্ত

করিয়া, মহানন্দে 'তু কালা নটবর' সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে বস্তীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

বাগবাজার নিরাকার ষ্ট্রীটে দিবাকরবাবুর বাসা। এক-খানি ঘরের মধ্যে মুখোমুখা বসিয়া—দিবাকর ও রামবাবু।

দিবাকর কহিলেন, "আপনিই দয়া করে আমায় উদ্ধার করুন। তা হোলে বুঝবো···রেখার সত্যিই ভাগ্য ভাল।" দিবাকর রামবাবুর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিলেন।

রামবাবু কহিলেন, "আপনাকে এত ক'রে বলতে হবে না। আমারই কতবার মনে হয়েচে যে, এই সব বিষয় সম্পত্তি, চক্ষু বুঁজলেই, সেই আমার বাঁদর শালাটি এসে ভোগে লাগাবে। ছেলে-পুলে ত এ-স্ত্রীর হয়নি, আর হবেও না। সে গুড়ে বালি! আমার অবর্ত্তমানে সেই নচ্ছার, পাজী, মুখ্যুটা যে সব দু' হাতে লুটবে, আর মহা-ফূর্ত্তিতে ভোগ করবে, এ কথা ভাবতে গেলে আমার প্রাণ-বিহঙ্গ দেহপিঞ্জরে সজোরে মাথা ঠোকে আর খাবি খায়! তা আপনাকে আর এ জন্যে···"

কথা শেষ হইতে পাইল না। রেখা এক ডিবা পান হাতে করিয়া বাপের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে-সঙ্গেই রামবাবুর দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু সেখান হইতে ছিট্‌কাইয়া প্রতিফলিত হইতে লাগিল—রেখার মুখের দিকে।

বাপের হাতে পাণের ডিবা দিয়া রেখা চলিয়া গেলে, রামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়ে—বয়স কত হ'লো?"

"এই উনিশে পড়ল আর কি।"

রামবাবু তৎক্ষণাৎ মনে মনে হিসাব করিয়া ফেলিলেন —উনিশ আর উনচল্লিশ, তফাৎ তো মোট কুড়ি বছরের; নাঃ, নেহাৎ বে-মানান্ হবে না। তা-ছাড়া বাড়ন্ত গড়ন আছে।

অতঃপর আরও ঘণ্টাখানেক ধরিয়া উভয়ের মধ্যে যে সব কথাবার্ত্তা আলাপ-আলোচনা হইল, তাহার ফলে উভয়েরই মন আশায় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। রামবাবু মনে মনে কহিলেন—'একে একে ত সব 'ক্লীয়ার' করলুম, এইবার একটু শক্ত পাল্লা। দেখা যাক।' অন্তরে তাঁহার আনন্দের ফোয়ারা উপ্‌চাইয়া পড়িতেছিল।

রাত প্রায় দশটার সময় রামবাবু বাড়ী ফিরিলে শিবরাণী কহিল, "বায়োস্কোপে গেছলে—বোধ হয়?"

"নেহি বিবিসাব! হেমবাবুকো ছেলিয়াকা বেমার হুয়া হায়, উসিয়াস্তে দেখনেকো গিয়া থা।"

"এ আবার কি ঢং?"

"ঢং নয়; আইন হোচ্চে, বাংলায় আর কথা-টথা বোলতে পারবে না, হিন্দীতে বলতে হবে। এখন থেকে সেটা অভ্যেস করা্ত দরকার।"

"হেমবাবুর ছেলেটার আবার অসুখ করেচে?"

"আবার। এবার একটু বেশী বেশী।"

"তা ওরা আচায্যি মশাইকে একবার ঠিকুজিটা, হাতটা দেখাক না। খারাপ দশা পড়েচে নিশ্চয়। উনি একবার দেখলেই সব বুঝতে পারবেন আর ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"আচ্ছা—গোবিন্দ আচায্যির ওপর তোমার অগাধ বিশ্বাস, না?"

"বিশ্বাস কি শুধু শুধু হয়? আমার বিয়ের আগে বাবার অত-বড় মকদ্দমাটা কত সহজে জিতিয়ে দিলেন। আজ যেন উনি এদিকে এসে আছেন, বরাবরই ত আমাদের ভবানীপুরেই থাকতেন। রজনী মিত্তিরের বৌটাকে বড় বড় ডাক্তারদের কেউ দেখতে বাকী রাখেনি। বৌটা মরতে বসেছিলো; উনিই ত ঝাড়-ফুক্ ক'রে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। উনি ত শুধু জ্যোতিষী ন'ন, খুব ভাল ঝাড়-ফুক জানেন। আবার কত রকম ওষুধ-পত্তর, মাদুলী, কবচ—। তোমাদের বিশ্বাস নেই, তাই—"

"খুব বিশ্বাস আছে। তোমার যখন আছে, তখন আমার কি না থেকে পারে?"

"আমার বিয়ের সময় উনি গুণে যা বলেছিলেন, ঠিক তাই ত হোল। আমার ত সম্বন্ধ ঠিক-ঠাক হোয়েছিল—নৈহাটীতে; কিন্তু উনি বলেছিলেন—'ওখানে কিছুতেই হবে না, কোলকাতাতেই হবে'—তাই ত ঠিক হোল। আমার মাথা-ধরার জন্যে বলেছিলেন—'মা, রোজ একটু-ক'রে রামায়ণ পোড়ো।'—তা আর আমার হোয়ে উঠলো না।"

"আমাকেও বলেছিলেন—'শিব-রাত্রি'র দিন উপোস করতে, আমারও তা হোয়ে উঠলো না।"

একটু বিরক্ত হইয়াই শিবরাণী কহিল, "আজ রস যে খুব উপচে উঠেচে দেখচি! কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রসের কথা শোনবার ত আমার সময় নেই; রাত দশটা বেজে

গিয়েচে।" বলিয়া শিবরাণী রামবাবুর খাবার ব্যবস্থা করিবার জন্য চলিয়া গেল। রামবাবু মনে মনে বলিলেন—"আচায্যি মশায়ের ওপর আমারও অগাধ বিশ্বাস, গিন্নী! এ অকূল সমুদ্রে তিনি ছাড়া আর পারের ভরসা নেই। কাল সকালেই তাঁর শরণ নোবো।"

সত্যই পরদিন সকালে রামবাবু গোবিন্দ আচায্যির কাছে গিয়া হাজির হইলেন। হঠাৎ পশ্চিমাকাশে সূর্য্যোদয়ের মত রামবাবুকে তাঁহার কাছে আসিতে দেখিয়া তিনি প্রথমটা ভড়কাইয়া গেলেন। রামবাবু অতি ভক্তিভরে তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় লইলেন। চমকিত অন্তরে গোবিন্দ আচায্যি রামবাবুর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "কল্যাণ হোক।"

রামবাবু কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ সফল করাতে হবে, ঠাকুর; কল্যাণ করাতেই হবে।"

গোবিন্দ মানুষ-রাখাল; অর্থাৎ মানুষ চরাইয়া জীবিকার্জ্জন করেন, কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই অনুমান করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে রামবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। রামবাবু কহিলেন, "আনুপূর্ব্বিক সব খুলে না বললে, বুঝতে পারবেন না, বাবা। সবই আমি বলচি। মতলব আমার, আপনি শুধু মাঝে থেকে আমায় সাহায্য করবেন। আর তার জন্যে আপনার শ্রীচরণে প্রণামী নগদ পাঁচ শ'খানি রজত মুদ্রা! তার ভেতর এই দু'শো আজ 'য়্যাড্‌ভান্স' প্রণামী ধরুন।"—এক তাড়া নোট রামবাবু গোবিন্দ আচায্যির পদপ্রান্তে রাখিলেন।

গোবিন্দ আচায্যির মত চতুর লোকেরও এবার ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গেল! তাহার পর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া রামবাবুর নিকট সমস্ত শুনিয়া তাঁহার প্রাণ ধাতস্থ হইল। সমস্ত ব্যাপার বিস্তারিত বলিয়া রামবাবু কহিলেন, "দুটো পূজো, কি গ্রহশান্তি ক'রে আমার ওখান থেকে কি ছাই আর আপনার প্রাপ্তি হয়! পাঁচ সিকে, ন' সিকে, বড় জোর না হয় পাঁচটা কি দশটা টাকা—এই ত? আর এ ব্যাপারে এক দমে একেবারে কর্‌করে পাঁচটি শো! তারপর শুধু এইখানেই শেষ নয়। এর আবার 'বাই-প্রডাক্টস' (By-products) আছে। ঘরে দু' পাঁচটা ছেলেপুলে না থাকলে আপনাদের রোজগার হবে কোত্থেকে, এটা হোলে আশা করা যায় দু-পাঁচটা ছেলেমেয়ে হবেই। তখন আপনাদের উপায়ের নানান্ পথ খুলে যাবে, লক্ষ্মী-পূজো, ষষ্ঠীপূজো, অন্নপ্রাশন, ফাঁড়া-কাটানো—কত কি! বুঝতেই পারছেন ত।"

এবার একগাল হাসিয়া গোবিন্দ কহিলেন, "খু[illegible] বুঝেছি, বাবাজী; তুমি নিশ্চিন্ত থাক; ঠিক লাগিয়ে দিচ্ছি। তবে ফটিক ডাক্তারকেও ঠিক করে রেখো। ধারে ভারে কাটে কি না।"

"আজই দুপুরবেলা তার কাছে যাব। ডাক্তারখানা[illegible] বোসে এ সব কথার আলোচনা চল্‌বে না; আর কারো সামনেও বলা ঠিক হবে না।"

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে নানারূপ আলোচনা ও পরামর্শ চলিল। তাহার পর আর এক দফ[illegible] প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের পালা শেষ হইলে, রামবাবু চলিয়া আসিলেন, এবং আচায্যি মহানন্দে নোটগুলি গণিতে বসিলেন।

* * * *

কয়দিন হইতে রামবাবুর শরীরটা ভাল নাই। থাকিয়া থাকিয়া বুক ধড়ফড় করিয়া উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুক চাপিয়া ধরিয়া শয্যায় শুইয়া পড়েন। আজ সকালে ফটিক ডাক্তারকে ডাকানো হইয়াছিল। তিনি দেখিয়া শুনিয়া বলিয়া গিয়াছেন, 'লংস' খুবই 'উইক', পুষ্টিকর খাদ্য আহারের প্রয়োজন।

দ্বিপ্রহরে সামনে বসিয়া থাকিয়া শিবরাণী রামবাবুকে খাওয়াইতেছিল। মাছের মুড়াটা রামবাবুর খাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শিবরাণীর তাগাদায় না খাইয়া পারিলেন না। তাহার পর দইয়ের বাটিটা চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিয়া, দুইটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করতঃ একটু জল খাইয়া গলা ভিজাইয়া লইয়া, আর একটি যেই মুখে তুলিতে যাইবেন, অমনি বুক চাপিয়া ধরিয়া সেইখানে ঢলিয়া পড়িলেন! শিবরাণী প্রমাদ গণিয়া পাখা আনিতে ছুটিল, বামুন ঠাকুর এক বাল্‌তি জল আনিয়া ফেলিল, কেষ্টা চাকর ফটিক ডাক্তারকে ডাকিতে ছুটিল।

ফটিক ডাক্তার আসিয়া বুকে-পিঠে 'ষ্টেথেসকোপ' বসাইয়া, নাড়ী দেখিয়া, জিভ পরীক্ষা করিয়া, চোখের কোল টানিয়া, নানাভাবে পরীক্ষা করিবার পর মুখখানাকে একটু চিন্তা-বিকৃত করিয়া কহিল, "এই রকমই একটা

কিছু আশঙ্কা করছিলুম যে—হবে। 'ফল্পিটোলিয়া অফ্ হার্ট'—এ বড় শক্ত রোগ!"

শিবরাণীর মাথা ঘুরিয়া গেল, চক্ষে সে জগৎ অন্ধকার দেখিল।

রামবাবুকে ধরা-ধরি করিয়া শয্যায় আনিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি কখনো স-চেতন, কখনো অ-চেতন। চক্ষু অধিকাংশ সময়ই মুদ্রিত। বাক্য একেবারেই বন্ধ; মুখে শুধু মধ্যে মধ্যে গোঁ-গোঁ শব্দ!

একটা জরুরী ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া ফটিক ডাক্তার কেষ্টাকে ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দিল, খানিকটা গরম জল আনিতে বামুনঠাকুরকে নীচে পাঠাইল, শিবরাণীকে কহিল, "আপনি দুটি মৌরী ভিজিয়ে ছটাকখানেক জল নিয়ে আসুন ত।"

শিবরাণী চলিয়া গেলে রামবাবু ফিস্-ফিস্ করিয়া ফটিক ডাক্তারের উদ্দেশে কহিলেন—"বাজে ওষুধ-ফষুদ খাইয়ে যেন প্রাণবধ ক'রো না, ডাক্তার; দেখো বাবা!"

তেমনি ফিস্-ফিস্ করিয়া ফটিক ডাক্তার কহিল, "কোন ভাবনা নেই। কিন্তু অনেক মিথ্যা কথা আর পরিশ্রম, 'ফি' আর কিছু বাড়িয়ে দিতে হবে, রামবাবু! আপনি হচ্চেন রাজা লোক; এ রকম একটা ব্যাপারে—"

"আচ্ছা, আরও একশো দোবো। তার পর, এ-বাড়ীতে যখন পাঁচটা ছেলেপুলের আমদানী হবে, তখন ত তোমার আয় বেড়ে যাবে হে ডাক্তার, কিন্তু, দেখো যেন—"

সিঁড়ীতে পদশব্দ শুনিয়া উভয়কেই তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাক হইতে হইল।

ফটিক ডাক্তার বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল। আহারের যেন কোন বৈলক্ষণ্য না হয়; ভাত, রুটী, লুচি, দুধ, ফল ইত্যাদি। রোগীর আহারে অরুচি নাই। আধ-সচেতন আধ-অচেতন অবস্থায় সকল পথ্যই সুন্দরভাবে উদরস্থ করিতেছেন। তবে বাক্য পূর্ব্ববৎই বন্ধ, এবং বুক চাপিয়া গোঙানী শব্দ—তাহার আর বিরাম নাই।

দুশ্চিন্তায় শিবরাণীর মনের অবস্থা শোচনীয়। বার বার জিজ্ঞাসা করাতেও ফটিক ডাক্তার বলিয়াছে—"রোগ খুবই শক্ত, তবে কোন ভয় নেই।" এই আশ্বাসে বুক বাঁধিয়া শিবরাণী যত দেব-দেবীর কাছে মানত মানিল।

রাতটা একরকমে কাটিল। কিন্তু পরদিন রোগ যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। শিবরাণী বুঝিতে পারিল, ফটিক ডাক্তারের স্তোকবাক্য ভুয়া! শিবরাণী ঠাকুর-দেবতাদের পায়ে প্রার্থনা জানাইয়া গোবিন্দ আচায্যিকে ডাকাইয়া আনিল। গোবিন্দ আসিয়া, সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কহিলেন, —"কালকেই আমাকে খবর দাওনি কেন মা? যাই হোক, কোন ভয় নেই, আমি দেখ্‌চি।" গোবিন্দ পাঁজি-পুঁথি, কাগজ-কলম প্রভৃতি লইয়া গণনায় বসিলেন। রামবাবুর রাশিলগ্নের ছক আঁকিয়া নানারূপ হিসাব করিয়া কহিলেন, —"ইস্! মঙ্গল একেবারে পঞ্চমে! তার ওপর, রাহুর বিশ অংশে অবস্থান ও দৃষ্টি! যা'ক, এখনি এর প্রতিকার করে ফেল্‌চি।"

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া নানারূপ জপ-তপ ও মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গোবিন্দ কহিলেন, "রাশিকে জাগ্রত করিয়ে রাহুকেই ভর করাতে হবে। রোগীর ওপর ভর কোরে গ্রহই প্রতিবিধানের পথ বোলে দেবে।"

রামবাবুর ছিল ধনুরাশি। গোবিন্দ একটি ঝাঁটার কাঠি বাঁকাইয়া তাহার দুই প্রান্তে সূতা বাঁধিয়া ধনুকের মত করিলেন, এবং তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য নানাপ্রকার মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধনুকের সূতা 'ফট্' করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। গোবিন্দের মুখে হাসি ফুটিল; কহিলেন,—"ব্যস্! রাশি যখন জাগ্রত হোয়েচে আর কোন ভয় নেই। এইবার মা-লক্ষ্মী, তুমি ওঁর শিওরে বোসে মাথায় হাতখানা ছুঁইয়ে রাখো, দণ্ডাধিপতি রাহুই এবার রোগীর মুখ দিয়ে ওঁর রক্ষার উপায় বোলে দেবেন।"

গোবিন্দের মন্ত্রপাঠ, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান সমানে চলিতে লাগিল। ওদিকে রোগীর গোঁয়ানী পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠিল। রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য। শিবরাণী ভীত সন্ত্রস্ত মনে স্বামীর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল। কিছু পরে গোবিন্দ উচ্চস্বরে 'ওঁ স্বাহা' বলিয়া কিছু ধুনা ধুনুচিতে নিক্ষেপ করিবামাত্র রোগীর গোঁয়ানী বন্ধ হইয়া গেল, এবং রোগী অতি ধীরে, অতি স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন, —'আকর্ষণ! বিকর্ষণে মৃত্যু! রাম-রেখা-বিবাহ-মিলনে জীবন! ব্যাঘ্র-হট্টে, নিরাকার পঞ্চমে সা কন্যা!'

শিবরাণী কিছুই বুঝিতে পারিল না, একটা অজ্ঞাত

আতঙ্কে গোবিন্দের মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। গোবিন্দ বলিলেন, "আর ভয়ের কোনই কারণ নেই। এইবার বাবাজীর মহা-রিষ্টি কেটে গেল। এখন স্বয়ং দণ্ডাধিপতির নির্দ্দেশ মত কাজ করতে হবে। ভালই হোল, তোমার এ সংসারে মা-লক্ষ্মী, আর কোন আপদ-বিপদ সহসা ঘটবে না।"

"ব্যাঘ্র-হট্ট কাকে বলে বাবা?"

"সবই বুঝতে পারা যাবে। রোগী আরও কিছু বলবে; ঠোঁট কাঁপচে।"

রোগীর মুখ হইতে আরও অনেক কথা বাহির হইল। তাহার পর রোগী স্তব্ধ হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার গোঁয়ানী বন্ধ হইয়া গেল, এবং দুই দিনের পর এইবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন গোবিন্দ-আচায্যি শিবরাণীকে—'ব্যাঘ্র-হট্ট' এবং 'রাম-রেখা' সম্পর্কে নির্দ্দেশের যে অর্থ বুঝাইয়া দিলেন, আশা করা যায়, পাঠক পাঠিকাগণ অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে হট্ট অর্থাৎ হাট ও বাজার শব্দ অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, আচার্য্য শিবরাণীকে ইহা বুঝাইয়া দিলেন।

* * * * *

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

রামবাবু কহিলেন—"যত সব আজগুবি কাণ্ড! ও সব আমার দ্বারা হ'বে-ট'বে না।"

শিবরাণী কহিল, "তোমার যে কি ব্যাপার হোয়েছিল, তা ত আর কিছু জ্ঞান নেই! নারায়ণের দয়াতে তোমাকে আবার ফিরে পেয়েছি। এতে আর অমত কোরো না।"

"যত সব অনাছিষ্টি ব্যাপার। ঐ আচাযি মশায়ের সব চালাকী! বোধ হয়, ঘুস্-টুস্ খেয়ে কাদের ঐ মেয়েটাকে ঘাড়ে চাপাবার মৎলব। ও-সব আমার দ্বারা হবে-টবে না। আমার এই জীবনের তুমিই একমাত্র সঙ্গিনী, আমি আর কাউকে বিয়ে ক'রে ঘরে আন্‌তে পারব না।"

"আনতেই হবে; এ যে দৈবের ব্যাপার। তোমার-আমার মঙ্গলের জন্যে, সংসারের মঙ্গলের জন্যে এ কাজ তোমার করতেই হবে। এতে আর অমত করা চলবে না।"

এই সময়ে গোবিন্দ আচায্যি আসিয়া পড়িয়া কহিলেন, —"নিয়াকার ষ্ট্রীটের পাঁচ নম্বর বাড়ীতে গিয়ে ব্যবস্থা সব ঠিক করে এলুম মা-লক্ষ্মী! দৈবের যোগাযোগ কি না, কিছু বলতে হোল না—। যেন বহুপূর্ব্ব থেকেই সব ঠিক হোয়েছিল, কথা পাড়বামাত্রই সব ঠিক হোয়ে গেল। বৈকালে মেয়ের বাবা এসে বাবাজীকে দেখে যাবেন।"

শিবরাণী কহিল, "সব ভার আপনার ওপর বাবা; এ ব্যাপারে মাথার ওপর আর আমাদের কেউ অভিভাবক নেই। সবই যখন ক'রলেন, শেষ পর্য্যন্ত থেকে কাজটি শেষ ক'রে দিতে হবে।"

রামবাবু বিষম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমি বিয়ে করলে ত উনি কাজ শেষ করবেন! আর একটা বিয়ে আমি কিছুতেই করব না; তার চেয়ে—"

বাকী কথা মুখ দিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই রামবাবুর সর্ব্বাঙ্গ হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। তখনি গোবিন্দ আচার্য্য রামবাবুর মস্তকোপরি হাত রাখিয়া রাহুর স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। প্রায় মিনিট দুই তিন পরে রামবাবু প্রকৃতিস্থ হইলেন। ইহার পর আর তিনি—অমত করিতে সাহস করিলেন না।

কিন্তু একটু গোল বাধাইয়াছিলেন—১০ই জ্যৈষ্ঠ, বিবাহ-তারিখের—সন্ধ্যায়, বরবেশে গৃহ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বক্ষণে।

চন্দন চর্চ্চিত দেহ, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, পরিধানে বেনারসী জোড়, পশ্চাতে নাপিত সুদৃশ্য টোপর হস্তে দণ্ডায়মান বহির্দ্বারে রাস্তার উপর পত্রপুষ্পে-সজ্জিত মোটর-কার তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে—এমন সময় হঠাৎ তিনি বাঁকিয়া বসিলেন। শিবরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"আমি যাব না।" শিবরাণী কহিল—"দেখ, শুভদিনে অনাছিষ্টি কথা বোলো না; ও-রকম করলে ঠিকই আমি আফিং খেয়ে মরবো তা ব'লে রাখ্‌চি।"

আর কোন কথা রামবাবু বলিতে সাহস করিলেন না। অগ্রসর হইয়া হুলুধ্বনির মধ্যে মোটরে উঠিয়া বসিলেন।

অন্তরে তাঁহার আনন্দের ঝড় বহিলেও, যেন জ্যৈষ্ঠ-সন্ধ্যার নির্ব্বাত গুমট্ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

মোটর চলিতে সুরু করিলে মনে মনে তিনি কহিলেন, —"যা'ক্, কার্য্যসিদ্ধি!—আজ আমার কেল্লা-ফতে!"

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

গল্পদাদুর বৈঠক

(রূপকথা)

তুন বৎসরের প্রথম দিনটিতে এবার ছোটদের মনে আর ানন্দ ধরে না! বছরের শেষে কত আগ্রহেই তাহারা

গল্পদাদুর বৈঠক

ই দিনটির আশায় দিন গণিতেছিল। পুণ্যি-পুকুর, যম-কুর, সেঁজুতি—আদা-হলুদ, গুপ্তধন, ফলগছানি বছরের র্তিম মাসের ব্রতগুলির কথাই ছিল অন্যান্য বছর ইহাদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ; কিন্তু এবার গল্পদাদুর গল্প শুনিবার লোভে সে-সব ব্রতকথার উপর তাদের আর একটুও ঝোঁক নাই। কত মজার মজার গল্পই তিনি বলেন!

সংক্রান্তির দিন সকাল বেলা পুণ্যি-পুকুরে জল ঢালিয়া টুনি কহিল,—কি মজা, কাল পয়লা বোশেখ! কাল থেকে গল্পদাদুর গল্প আরম্ভ হবে।

গৌরী টুনির চেয়ে বছর তিনেকের বড়। সে কহিল,

—দু' বছর আগে পুজোর সময় গল্পদাদু একবার এসেছিলেন। দশ দিন ছিলেন। সে দশটা দিন আমাদের নাওয়া-খাওয়ার কথা মনেই থাকতো না ভাই! কেবল গল্প আর গল্প; কার সাধ্যি দাদুকে ছেড়ে ওঠে?

রমা কহিল,—আমার বয়সে গল্পদাদু ছুটিবার ছুটি পেয়ে এসেছিলেন। একবার ছিলেন এক হপ্তা, আর একবার দশ দিন। আমি কিন্তু দু'বারই ভাই, ওঁর কত মজার গল্প শুনিছি।

আশা কহিল,—আমার ভাই একটু-একটু মনে পড়ে দাদুর সেই রাক্ষসীর গল্পটা। মাগো! মনে হ'লে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।

ছেলে-মহলেও গল্পদাদুর সম্বন্ধে ছেলেদের এইরূপ কত জল্পনা চলিয়াছে। হকি, সিনেমা, প্যাবোল ওয়ার্ডের চর্চ্চা এখন শিকায় উঠিয়াছে; ছেলেদের মনেও জাঁকিয়া বসিয়াছেন এই গল্পদাদু! স্থির হইয়াছে, শুভ পয়লা বৈশাখ হইতে বৈকালের দিকে দুটি ঘণ্টা দুর্গাবাড়ীর নাটমন্দিরে গল্পদাদুর গল্পের আসর বসিবে।

সেই আসর আজ বসিয়াছে। নূতন বছরের নূতন দিনটিতে গল্পদাদুর মুখে গল্প শুনিবার আনন্দে পাড়াশুদ্ধ সকলেই যেন মাতিয়া উঠিয়াছে। ছোটদের দল ত আছেই, তাহাদের উপর বড়দেরও আগ্রহ কি কম! গল্পদাদুকে ঘিরিয়া আসরে যাহারা বসিবার—তাহারা ত বসিয়াছেই; পিছনের দিকে পূজার ঘর দু'খানিও পল্লীবাসিনীদের সমাগমে ভরিয়া গিয়াছে; বড়-সড় মেয়েরা এবং পাড়ার বধূরা তথায় গল্প শুনিতে বসিয়াছে।

বয়স বেশী হইলে কি হইবে, ছোট গালিচাখানির উপর পাকা আমটির মতই গল্পদাদু বসিয়া আছেন। পিছনে একটি তাকিয়া, পাশে তাঁহার প্রিয় গড়গড়া। পঁচিশ বৎসরের উপর হইতে চলিল, ইঁহার আসল নাম ও গ্রাম-সুবাদের নানা প্রকার সম্বন্ধ সমস্তই চাপা পড়িয়া গিয়াছে; এবং গ্রামশুদ্ধ সকলেই ইঁহাকে আদর করিয়া খেতাব দিয়াছেন—গল্পদাদু।

আসরে বসিয়াই গড়গড়ার নলে সজোরে কয়েকটি টান দিয়া গল্পদাদু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আবদারে একটি নূতন রূপকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

তোমাদের অনেকেই রামায়ণ পড়েছ, আর জনক রাজার দেশ মিথিলার নামও শুনেছ। এই মিথিলাতেই জনকনন্দিনী সীতাদেবীর জন্ম। রামচন্দ্র প্রকাণ্ড একখান ধনুক ভেঙ্গেছিলেন। সেই ধনুকখান ছিল শিবের। জনক রাজার প্রতিজ্ঞা ছিল, যে বীর সেই ধনুকে ছিলা দিতে গিয়ে তা ভাঙ্গতে পারবেন, সীতাদেবী তাঁরই গলায় মালা দেবেন। রাম এই হরধনু ভেঙ্গে সীতাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন। হাজার হাজার বছর পরে এই মিথিলার যিনি হ'লেন রাজা, তাঁর নাম মহাসেন; আর রাজকন্যার নাম সীপ্রা দেবী। রাজরাণী সুমিত্রা দেবী পাঁচ বছরের মেয়ে সীপ্রাকে রাজার হাতে সঁপে দিয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করলেন; আর রাজা চোখের জল মুছে, পরম যত্নে মেয়েটিকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সম্মান সবই তাঁর অসার মনে হ'ল।

রাজকন্যা পরম রূপবতী, আশ্চর্য্য সে রূপ! তার রূ দেখলে চোখ যেন ঝল্‌সে যেতো; বয়সের সঙ্গে তার রূপে জলুস বেড়েই চললো। রাজবাড়ীর সকলেই বলে লাগলো—জনকনন্দিনী সীতাদেবী আবার মাটী ফুড়ে উ এসেছেন।

যেমন রূপের তেজ, রাজকন্যার মনের তেজও তেমন অসাধারণ। তোষামদে কেউ তাঁকে ভুলাতে পারে না খোসামুদেদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। ছ চাতুরী ক'রে রাজকন্যার চোখে ধুলো দিতে গেলে তা দুর্দ্দশার একশেষ! যত বড় বিদ্বান বা মানী লোক হন কেন, তিনি অন্যায় কিছু ব'লে, নাম আর বিদ্যার জো রাজকন্যার কাছে এড়িয়ে যাবেন, তার উপায় নেই। দো দেখিয়ে দোষীদের থেঁতামুখ ভোঁতা ক'রে দিতে রাজ কন্যার এতটুকু চক্ষুলজ্জা নেই। রাজকন্যার দাপটে রা বাড়ীর সকলেই ভয়ে তটস্থ; রাজার মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত কি কথা ব'লে কখন অপদস্থ হবেন, এই ভয়ে সর্ব্বদাই জড়সড়

রাজার ইচ্ছা—রূপে গুণে বিদ্যায় এমন অপূর্ব্ব কন্যাটি —তিনি যোগ্য পাত্রেই সম্প্রদান করবেন। কিন্তু রাজা মন্ত্রীদের ইচ্ছা আর এক রকম! তাঁরা বলেন—মিথিল রাজ্যের এলাকার মধ্যেই রাজকন্যার জন্য বর ঠিক করতে হবে। মিথিলার রাজকন্যা মিথিলার লোক-ছাড়া ভি এলাকার—অন্য কোন দেশের লোকের গলায় মালা দিবে

্যারেন না। তাতে মিথিলার মানসম্ভ্রম নষ্ট হবে। রাজকন্যারও অগৌরব হবে।

কিন্তু কথাটা শুনে রাজকন্যার মুখে হাসি দেখা গেল। সে হাসি যেন ক্ষুরের ধার! সে হাসি মন্ত্রীদের ভাল লাগলো না। বুড়ো প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং শিং-এর মত গোঁফজোড়াটা নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"এ কথায় হাসবার কি কারণ পেলে মা!"

রাজকন্যা মুখের হাসি আরও একটু শানিয়ে তু'লে বললেন,—"আপনাদের যুক্তি শুনে না-হেসে থাকা যায় কি, মন্ত্রী মশায়!"

শ্রীকৃষ্ণ সিং-এর সহযোগী মন্ত্রী প্রসাদ সিং চোখ দু'টো কপালে তু'লে রাজকন্যার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—মন্ত্রীরা যে যুক্তি দেয়, তাতে হাসি পাবার ত কথা নয় রাজকন্যা!

এ কথায় রাজকন্যা মুখের হাসি চাপতে পারলেন না; অমনি হাসিমুখেই বললেন, "যে যুক্তির বনিয়াদ নিতান্ত কাঁচা, সে যুক্তি শুনে—যার একটু বুদ্ধি আছে, তার হাসি সামলান দায়। আপনারা বলছেন—মিথিলার রাজকন্যা মিথিলাবাসী ছাড়া ভিন্নদেশের কোন লোকের গলায় মালা দিতে পারেন না।"

মন্ত্রীরা সকলেই এবার কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে একসঙ্গে ব'লে উঠলেন—হ্যাঁ, পারেনই না ত।

রাজকন্যা এবার মুখখানি একটু কঠিন ক'রে ব'ললেন, —তাহ'লে এই মিথিলারই রাজকন্যা সীতাদেবী ভিন্ন দেশ অযোধ্যার অধিবাসী রামচন্দ্রের গলায় মালা দিতে পেরেছিলেন—কোন্ যুক্তিতে?

এক ঝাঁক জোঁকের মুখে কে যেন খানিকটা চুণ ঢেলে দিল। মন্ত্রী প্রসাদ সিং কিন্তু সহজে অপদস্থ হবার পাত্র ন, তিনি তখনই নতুন যুক্তি দেখিয়ে বললেন—সে সীতাদেবীর কথা আলাদা। তাঁর বিয়ে নির্ভর করেছিল রীতিমত একটা পণের ওপর, সেটা হচ্ছে ধনুর্ভঙ্গ পণ!

রাজকন্যা এবার গম্ভীর ভাবে বললেন,—তাহ'লে আমার জন্যও আপনারা ঐ রকম কোন একটা পণের ব্যবস্থা ক'রে ফেলুন, নৈলে আপনাদের নজীর ভেস্তে যা'বে।

এর পরই রাজার এক ঘোষণা প্রচারিত হ'য়ে রাজ্যের সকল লোককে অবাক ক'রে দিল। রাজ্যের সকল লোক সেই ঢ্যাঁড়া শু'নে জান্‌তে পারল—আশ্চর্য্য-রকমের ক্ষমতা দেখিয়ে যে-লোক রাজকন্যাকে খুসী করতে পারবে—রাজকন্যা সীপ্রা দেবী তারই কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করবেন।

এই ঘোষণার পর আশ্চর্য্য-রকমের ক্ষমতা দেখিয়ে রাজকন্যাকে খুসী করবার জন্য কত লোকই রাজসভায় এসে জুটলেন; কিন্তু কোন লোক রাজকন্যাকে খুসী করতে পারলেন না।

এক ধনুর্দ্ধর এসে জানালেন—দুনিয়ায় আর কোন তীরন্দাজ আমার মত তীর ছুঁড়তে পারে না।

রাজকন্যা বললেন,—ভালো কথা, আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিন।

রাজসভার সামনে প্রকাণ্ড উঠানের এক কিনারায় ছিল একটা কদম গাছ। তীরন্দাজ সেটি লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন তাঁর তীর। সে তীরে গাছটি এফোঁড়-ওফোঁড় হ'য়ে গেল। সভাশুদ্ধ সকলেই অমনি বাহবা দিয়ে উঠলো। লোকটি আবার মিথিলাবাসী; মন্ত্রীরাও খুসী হ'য়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বল্‌লেন,—হ্যাঁ, অদ্ভুত ক্ষমতা বটে! কিয়াবাৎ কেরদানী, তোফা!

রাজকন্যা হেসে বললেন,—ছাই! একটা সাঁওতালও এ ক্ষমতা দেখাতে পারে। তীর দিয়ে গাছ ফুটো করতে দেখে যারা বাহবা দিতে লজ্জাবোধ করে না, তাদের বাহুবলের ধারণা অদ্ভুত বটে! মন্ত্রীদের পক্ষে তা স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃত বীরের নিকট অতি তুচ্ছ।

তীরন্দাজ-বেচারী মুখ চুণ ক'রে সরে' পড়লো। রাজকন্যার মন্তব্য শুনে মন্ত্রীদের মুখগুলোও অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌লো।

এর পর এলেন এক মস্ত পালোয়ান। তাঁর বিরাট চেহারা দেখে সভাস্থ সকল লোকের তাক্ লেগে গেল! ইয়া সণ্ডা চেহারা, হাতের গুলদুটো যেন নিরেট লোহায় গড়া, বুক যেন এক-জোড়া পাথরের কপাট, উরুৎদুটি যেন কলাগাছের গুঁড়ি; আর চোখের তারাদুটি আগুনে পোড়া ভাঁটার মত জ্বল্‌জ্বলে!

মন্ত্রীরা বললেন,—অদ্ভুত এঁর দেহের শক্তি, গায়ের জোরে ইনি মিথিলার গৌরব।

তখন তাঁর ক্ষমতা দেখাবার পালা সুরু হ'ল। গায়ের জোরে লোহার মোটা শিকল ছিঁড়ে, ইস্পাতের সুগোল

নিয়েট ডাণ্ডা দু'হাতে চোখের পলকে বেঁকিয়ে ফেলে, পিঠের ধাক্কায় প্রকাণ্ড একটা লোহার থাম টসিয়ে দিয়ে, হাজার হাজার লোককে অবাক ক'রে দিলেন। মন্ত্রীরা বললেন,—এমন অদ্ভুত ক্ষমতা এর আগে কখনো দেখা যায়নি!

রাজকন্যা মুখ-টিপে হেসে বললেন,—একটা হাতীকে আনলে এর চেয়েও তার অনেক বেশী ক্ষমতা সকলে দেখতে পেতেন।

সকলেই বুঝলেন যে, পালোয়ানের ক্ষমতা রাজকন্যাকে খুসী করতে পারেনি। পালোয়ানকেও অগত্যা মাথা চুলকিয়ে স'রে পড়তে হলো। মন্ত্রীরা তার পর যাঁকে আনালেন আরও অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাতে,—তিনি এক জন মস্ত যোগসিদ্ধ পুরুষ। মন্ত্রীরা বললেন,—দেবতাদের মত ইনি দিব্যশক্তি পেয়েছেন। কুম্ভক ক'রে মাটী থেকে দশ হাত শূন্যে ঠেলে উঠ্‌তে পারেন; আর আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঠায় সেখানে ঝুল্‌তে থাকেন।

কথাটা শুনেই অনেকে থ' হয়ে গেল; মানুষ মাটীতে ব'সে থাকতে-থাকতে আপনি উঠবে আকাশে—আধ ঘণ্টা ঠায় সেখানে থাকবে ব'সে! তার নেই কোন ঠেকো, নেই আসন! অদ্ভুত! এ কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে?

কিন্তু এটা যে হ'তে পারে—যোগী কুম্ভক ক'রে শূন্যে উঠে, আর বিনা-অবলম্বনে সেখানে আধ ঘণ্টা থেকে তা' দেখিয়ে দিলেন। সবাই ধন্য ধন্য শব্দে রাজসভা প্রতিধ্বনিত করলেন। মন্ত্রীরা রাজকন্যার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কেমন, এবার খুসী? এ কি সত্যই অদ্ভুত ক্ষমতা নয়?

রাজকন্যা তেমনই মৃদু হেসে উত্তর দিলেন,—না। একটা পাখীও অনায়াসে আকাশের একশো হাত উপরে উঠ্‌তে পারে, আর এমন কত ঘণ্টা ধ'রেই সে উড়ে বেড়ায়। যে কাজ পাখীর সাধ্য, মানুষের তা অসাধ্য নয় দেখে মন্ত্রীরা তার তারিপ করচেন, এতেই একটু বিস্মিত হবার কথা বটে!

মন্ত্রীরা মনে মনে রাগে গর-গর করতে লাগলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না; অথচ তাঁদের পুঁজিপাটাও সব শেষ হ'য়ে গেল, ঝুলি একদম খালি! মিথিলার ভেতরে আশ্চর্য্য-রকমের ক্ষমতা দেখাবার মত আর একটি প্রাণীও মিললো না। শেষে মিথিলার বাইরে রাজার ঘোষণা প্রচার না ক'রে তাঁরা আর পারলেন না।

কিন্তু বাইরে থেকেও যাঁরা-সব এলেন, তাঁরাও অদ্ভুত কোন ক্ষমতা দেখিয়ে রাজকন্যাকে খুসী করতে পারলেন না। মন্ত্রীরা হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলেন। মিথিলার রাজ-কন্যা মিথিলার বাইরে যান, এটা তাঁদের মোটেই ইচ্ছা নয়; তার চেয়ে রাজকন্যার যদি বিয়ে না হয়—সারাজীবন তিনি আইবুড়ো থাকেন, সে-ও বরঞ্চ ভালো ব'লে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন।

শেষে এক দিন একই সময় এক সঙ্গে দুই প্রতিযোগী এলেন রাজসভায়—তাঁদের ক্ষমতা দেখিয়ে রাজকন্যাকে লাভ করতে। দু'জনেরই বয়স প্রায় সমান, দিব্য সুন্দর চেহারা, শ্রীমান্ তরুণ যুবা।

এক জনের মাথায় নৌকোর মত টুপি, কাণে মুক্তা গাঁথা বীরবৌলী, গায়ে খুব দামী কিংখাপের পিরাণ, পরণে জমকালো বেনারসী কাপড়, গলায় মুক্তোর মালা, কোমরে কিরিচ, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো। যুবা সভায় ঢুকেই বুক ফুলিয়ে বললো,—এই রাজকন্যা আমারই বধূ হবেন; আমি অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়ে এঁকে লাভ করতে এসেছি।

যুবার সুন্দর চেহারা দেখে যারা মনে মনে খুসী হয়েছিল, এখন তার মুখের কর্কশ কথা শু'নে তারা বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো।

রাজকন্যার কাণেও কথাগুলো যেন তীরের মত বিঁধলো। তিনি সোজা হয়ে বসলেন, আর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে এই অশিষ্ট যুবার পানে একবার চেয়েই মুখখানা ফিরিয়ে নিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—তোমার পরিচয়?

যুবা তেমনি অবিনীত নীরস স্বরে উত্তর দিল,—মিথিলা আমার জন্মভূমি, কিন্তু শিক্ষার জন্য এত দিন বিদেশে ছিলুম। শিক্ষা শেষ ক'রে দেশে ফিরেই আমার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখাতে এসেছি। আমার নাম পেটেল পণ্ডিত।

মন্ত্রীরা এবার পেটেল পণ্ডিতকে যেন লুফে নিলেন তার চেহারা দেখে আর স্পর্দ্ধার পরিচয় পেয়ে বুঝলেন, এই যুবক তাঁদের আশা পূর্ণ করবেই। তাকে সমাদরে আহ্বান করলেন।

কিন্তু তখনই পিছন থেকে অন্য যুবক তাঁর শান্ত সুন্দর মুখখানি তুলে বললেন,—আর আমি?

মন্ত্রীরা ভ্রূভঙ্গি ক'রে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁরা দেখলেন যে, ছেলেটির কাপড়-চোপড়ে বড়-মানুষীর চিহ্নমাত্র নেই। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মুখখানা হাসি-মাখা; কিন্তু তার ভেতরেই এমন একটা ভঙ্গী যে, তা দেখলে বুঝতে পারা যায়—এই যুবকের মনের বল অসাধারণ, সঙ্কল্প অটুট, উৎসাহ অসীম, সাহস অনুপম। মাথায় কোঁকড়া কালো চুল, কিন্তু মাথায় টুপি বা কোন রকম আবরণ নেই। একখানা ধবধবে সাদা কাপড় কোমরে ফের দিয়ে বাঁধা; ভেতর থেকে চামড়ার খাপে-ভরা একখানা লম্বা তলোয়ারের চকচকে হাতলটা দেখা যাচ্ছে। গায়ে কোন জামা নেই; কাপড়ের মত সাদা একখানা চাদর দিয়ে পীঠ ও বুক ঢাকা; চোখ দুটো কান পর্য্যন্ত টানা, আর চক্ষুর তারা আকাশের মত নীল ও স্বচ্ছ, আকাশের তারার মতই স্থির।

মন্ত্রীরা পেটেলকে নিয়েই ব্যস্ত, এই যুবকের কথা তাঁরা গ্রাহ্য করলেন না। রাজাই তখন যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কে?

বাঁশীর মত মিষ্টি সুরে যুবক উত্তর দিলেন,—আমি বাঙ্গলা মায়ের সন্তান।

কিন্তু মন্ত্রীদের মনে হল, যুবকের কণ্ঠস্বর যেন রণ-দামামার ধ্বনি। সেই স্বর শু'নে রাজা, রাজকন্যা পর্য্যন্ত সকলের মনে চমক লাগল। তাঁদের বিস্ময়ের কারণও ছিল। বাঙ্গলা দেশের রাজার সঙ্গে মিথিলার রাজার এই সময় ভয়ঙ্কর বিরোধ চলছিল। বাঙ্গলার রাজা দীপঙ্কর মগধ ও মিথিলাকে বাঙ্গলার অধীন ক'রবার সঙ্কল্প ক'রে-ছিলেন। মগধ তাঁর অদ্ভুত কৌশলে বিনা-যুদ্ধেই বাঙ্গলার অধীনতা স্বীকার ক'রেছে; কিন্তু মিথিলা এখনো স্বতন্ত্র, সে স্বাধীনতা বজায় রেখেছে। তার প্রতিজ্ঞা—কিছুতেই সে বাঙ্গলার অধীনতা স্বীকার করবে না। তার সঙ্কল্প সে মগধকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঙ্গলাকেও তার তাঁবে আনবে। তাই বাঙ্গলার ওপর মিথিলা এখন খড়্গহস্ত, আর এই জন্যই বাঙ্গলা দেশের এই যুবককে দেখে রাজসভা পর্য্যন্ত বিস্ময়ে স্তব্ধ।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার পরিচয়?

যুবক উত্তর দিলেন,—পরিচয় ত আগেই দিয়েছি রাজা, আমি বাঙ্গলা-মায়ের ছেলে, বঙ্গ আমার জননী; এছাড়া আমার আর কোন পরিচয় নেই। আর এর চেয়ে ভাল পরিচয়ই বা কি থাকতে পারে?

মন্ত্রীরা বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ?

যুবক মৃদু হেসে বললেন,—যে উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ-বিদেশের যুবকগণ এই সভায় এসেছিল। মিথিলার রাজকন্যাকে পত্নীত্বে বরণ ক'রে বাঙ্গলায় নিয়ে যাওয়া ভিন্ন এই বাঙ্গালী যুবকের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই রাজা!

প্রধান মন্ত্রী বললেন,—বাঙ্গলার সঙ্গে মিথিলার বিরোধ চলেছে। শত্রুভূমি বাঙ্গলার সন্তানের স্থান এ রাজসভায় নেই।

রাজকন্যা এতক্ষণ অপলক নেত্রে এই বাঙ্গালী যুবকের দিকে তাকিয়েছিলেন। মন্ত্রীর কথা তাঁর কাণে প্রবেশ ক'রতেই তিনি চমকিয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু তখনই মনের ভাব গোপন ক'রে দৃঢ়স্বরে বললেন, আপনার এ কথা সঙ্গত নয় মন্ত্রি! রাজার ঘোষণায় এ রকম কথা প্রচার করা হয়নি; তিনি সব দেশের লোকদেরই প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছিলেন। যে দেশেই এঁদের বাস হোক, এঁরা দু'জনেই ক্ষমতা প্রকাশ করুন।

রাজা এই সময় বাঙ্গালী যুবককে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—তুমি কোন্ আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাতে এসেছ?

যুবক বললেন,—ঐ পণ্ডিতের পুত্র যে ক্ষমতা প্রকাশ করবেন, তাতেই আমি জয়লাভ করব; এই রকমই আমার আশা।

পণ্ডিতের পুত্র পেটেল বল্লো, আমার বাবা ছিলেন বিশ্ব-বিজয়ী মহা-পণ্ডিত, আমি তাঁর পুত্র এবং শিষ্য; পাণ্ডিত্যে আমাকে পরাস্ত করবার যোগ্যতা পৃথিবীতে কারও নেই।

বাঙ্গালী যুবক বললেন,—বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করবার কি দরকার? পরীক্ষা আরম্ভ হোক।

পেটেল পণ্ডিত মুখে পাণ্ডিত্যের বোঝা নামিয়ে বল্লো, তবে সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনুন; আমি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব বলতে পারি। আমি যা বলবো, তার চেয়ে আশ্চর্য্য কিছু নেই। আমি বলছি—আজ রাত ঠিক বারোটার সময় ভয়ঙ্কর একটা দুর্য্যোগ হবে, আর সেই দুর্য্যোগে বজ্রাঘাতে আমাদের রাজা মারা পড়বেন। উনি এই

দৈবনির্ব্বন্ধ রদ ক'রে আমাকে পরাস্ত করুন, শক্তির পরিচয় দিন।

এমন ভয়ঙ্কর কথা শুনে সভাশুদ্ধ সবাই নিস্তব্ধ! রাজার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল, রাজকন্যার বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করতে লাগল। কিন্তু পেটেলের প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালী যুবক তখনই দৃঢ় স্বরে ব'লে উঠলেন—আপনার পরাজয় সুনিশ্চিত। রাজা দীর্ঘজীবী হোন, তাঁর মৃত্যু হবে না; কালই তিনি হাসিমুখে আমাকে কন্যা সম্প্রদান করবেন। আমার মিথিলায় আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

রাজকন্যা বোধ হয় ভগবানের নিকট এই কামনাই করলেন।

কিন্তু পেটেল এবার চীৎকার ক'রে বল্‌লো, যদি আমি হারি, তাহ'লে তোমার ক্রীতদাস হব—ব'লে রাখছি।

বাঙ্গালী যুবক একটু হেসে বললেন,—এখন থেকেই সেজন্য প্রস্তুত হও পণ্ডিত! পণ্ডিতকে দাসরূপে লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয় বটে!

মন্ত্রীরা বললেন,—তাই ত, এ যে ভারী একটা উৎকট সমস্যায় পড়া গেল! কিন্তু তাঁদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যে, মিথিলার সেই পণ্ডিত যুবকের মুখ রাখতে রাজাকে যদি বজ্রাঘাতে নিহত হ'তে হয় তাও বরং ভাল, কিন্তু রাজা বেঁচে থেকে যদি বাঙ্গলার ঐ সন্তানের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার সুবিধে ক'রে দেন—তবে তাঁদের আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

রাজকন্যা এর পর বললেন—এখন তাহ'লে সভা ভঙ্গ হোক। রাত ঠিক এগারোটার সময় আবার সভা বসবে। আর এঁদের দু'জনকেই নজরবন্দী করে রাখা হোক; ঐ সময় সভায় আনা হবে। আমি স্বীকার করছি—এঁদের মধ্যে যিনি জয়ী হবেন, তাঁরই কণ্ঠে আমি বরমাল্য অর্পণ করবো।

সন্ধ্যার সময় পেটেল পণ্ডিত তাঁর বাসাঘরে ব'সে রাজার ভাগ্যগণনা করছিলেন। সহসা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন রাজকন্যা সীপ্রা; তাঁর পেছনে খোলা-তলোয়ার হাতে যোদ্ধবেশধারিণী একদল প্রহরিণী। রাজকন্যাকে হঠাৎ সেখানে দেখে ভয়ে পেটেল পণ্ডিতের মাথা ঘুরে গেল।

রাজকন্যা বললেন,—ভয় নেই; একটা কথা জানতে এসেছি।

পেটেল পণ্ডিত নির্ব্বাক্, রাজকন্যার মুখের উপর তার নির্নিমেষ দৃষ্টি! রাজকন্যা বললেন,—আপনি বলেছেন, রাত্রি ঠিক বারোটার সময় বজ্রাঘাতে বাবার প্রাণ—রাজকন্যার মুখে কথা বাধিয়া গেল।

পেটেল বল্‌লো,—যা বলেছি, তার নড়-চড় হবে না। এ পর্য্যন্ত একুশবার রাজার ভাগ্য গণেছি, ফল একই দেখছি—বজ্রাঘাতে অপমৃত্যু।

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন প্রতীকার এর নেই?

পেটেল মাথা নেড়ে বল্‌লো, না; প্রতীকার থাক্‌লে সে কথা আগেই জান্‌তে পারতেন।

রাজকন্যা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, মাটীর নীচে কোন ঘরে যদি বাবাকে লুকিয়ে রাখি?

পেটেল বল্‌লো, তা রাখতে পারেন; কিন্তু প্রতিকূল দৈব তাতে অনুকূল হবে না।

মলিনমুখে রাজকন্যা শেষবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোন উপায় নেই তাহ'লে?

পেটেলের গলার স্বর ঝন্-ঝন্ করে উঠ্‌লো—না। তাঁর মৃত্যু অনিবার্য্য; তবে তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সুখী হবে রাজকন্যা! তোমার ভাগ্যে রাজমহিষীর সম্মান সুস্পষ্ট দেখছি।

রাজকন্যা তখনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে সেই স্থান ত্যাগ ক'রলেন। তাঁর প্রহরিণীরাও তাঁর অনুসরণ করলো।

বাঙ্গলার সন্তান বাঙ্গালী যুবকটি তাঁর বাসার ভিতরে তখন ধীরে ধীরে পাইচারী করছিলেন। হঠাৎ একদল প্রহরিণী-পরিবেষ্টিতা রাজকন্যাকে সেই ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তাঁর মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বেতের আসনখানা এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন,—আমার সৌভাগ্য, বসুন আপনি।

রাজকন্যা গম্ভীর স্বরে বললেন, বস্‌তে আসিনি এখানে, একটা কথা জানতে এসেছি।

মুখে কিছুমাত্র কৌতূহলের চিহ্ন প্রকাশ না ক'রেই বাঙ্গালী যুবক মৃদুস্বরে বললেন,—বলুন।

রাজকন্যা বললেন, আপনি বলেছেন—আমার বাবার অপমৃত্যু হবে না।

যুবক বললেন, আমার কথা মিথ্যা নয়। আপনি তা অনায়াসে বিশ্বাস ক'রতে পারেন।

রাজকন্যার মনে কথাগুলো যেন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করলো। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, কিন্তু পেটেল পণ্ডিত বলেছেন, বজ্রাঘাত হবেই, আর তাতেই তাঁর মৃত্যু।

যুবক রাজকুমারীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—কিন্তু মৃত্যু তাঁর হবে না রাজকন্যা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বুদ্ধিমতী রাজকন্যা এ-কথায় যেন কেমন ধোঁকায় প'ড়লেন; এবার সন্দিগ্ধ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—তাহ'লে বজ্রাঘাত হবে—আপনিও এ-কথা স্বীকার করচেন?

যুবক জানালেন, বজ্রাঘাত থেকে আপনার বাবাকে বাঁচাবো বলেই আমি বাঙ্গলা থেকে ছুটে এসেছি। আর আমার আশ্চর্য্য ক্ষমতার এইটিই হচ্ছে পরীক্ষা।

কথাটা শুনে রাজকন্যা কিছুক্ষণ কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর আস্তে আস্তে বললেন, তাহ'লে বাবার সম্বন্ধে আপনি কি করতে চান? তাঁকে কি ভাবে আমরা রাখবো?

যুবক বললেন, আপনি ভাববেন না, আমি তার সব ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছি।

সন্ধ্যার একটু পরেই আকাশে দুর্য্যোগ দেখা দিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হ'ল! চারদিকেই একটা কেমন থম্‌থমে ভাব। এই দুর্য্যোগ মাথায় ক'রে লোকজন সব সভায় এল ছুটে; সকলের ভাবনা—কি হয়, কি হয়; কে হারে, কে জেতে!

যথাসময় রাজা এলেন, রাজকন্যা এলেন, মন্ত্রী, সভাসদ, পাত্র-মিত্র সবাই যে যাঁর জায়গায় বসলেন। পেটেল পণ্ডিত আর বাঙ্গালী যুবক সভায় ঢুকতেই সভাশুদ্ধ সকলেই তাঁদের দিকে চেয়ে রইল।

বাঙ্গালী যুবকের আদেশে সভার বাইরের আঙ্গিনায় একটা তাঁবু উঠ্‌লো। সেই তাঁবুটি দেখিয়ে তিনি বললেন, রাজা এবার ঐ তাঁবুর ভেতরে গিয়ে বসবেন।

মন্ত্রীরা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

বাঙ্গালী যুবক বললেন, বাঁচবার জন্য।

পেটেল পণ্ডিত টিটকিরী দিয়ে বললো, না, মৃত্যুর এগোবার জন্য।

বাঙ্গালী যুবকের অনুরোধে রাজা সিংহাসন ছেড়ে হাতখানি ধ'রে তাঁবুর দিকে এগুলেন। রাজাকে দেখে সভার সমস্ত লোক উঠে দাঁড়াল। রাজা গম্ভীর মুখে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রজাদের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন, তারা সকলে যেন ভয়ে আড়ষ্ট!

একটু পরেই আকাশে যেন দেব-দানবের যুদ্ধ বেধে গেলো। মেঘের কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন! আকাশের বুক চিরে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের আভা ফুটে বেরুতে লাগলো, হুড়হুড় শব্দে বৃষ্টির ধারা বইলো; দেখতে দেখতে মিথিলায় যেন প্রলয়ের সূচনা হ'ল!

এই দুর্য্যোগের মধ্যে কালো রঙের একটি বিড়াল কোলে ক'রে বাঙ্গালী যুবক তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। সমস্ত লোক তাঁর পানে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। কিন্তু যুবক কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সভার ভিতরে ঢুকে তাঁর জায়গায় বসলেন। ঠিক এই সময় সবার কাণে তালা লাগিয়ে—ভীষণ আভায় সকলের চক্ষু ধাঁধিয়ে তাঁবুর ওপরে কড়-কড় শব্দে বাজ পড়লো!

কত লোক মূর্চ্ছা গেল ভয়ে, কত লোক চেঁচিয়ে উঠলো ভগবানের নাম নিয়ে, কাছের কত লোক বাজের জ্বালায় মূহ্যমান হ'য়ে কাঠের মত স্থির!

পেটেল পণ্ডিতের কর্কশ চীৎকার বুঝি সভাশুদ্ধ সকলকে দিলে প্রকৃতিস্থ ক'রে। পেটেল বলে উঠলে, কেমন আমার ক্ষমতা, এখন তাঁবুতে গিয়ে দেখ, রাজা বেঁচে নেই, ম'রে কাঠ হ'য়ে আছেন।

মন্ত্রীরা রাজার শরীর-রক্ষীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভেতরে গেলেন, তার পর রাজার প্রাণহীন দেহ নিয়ে আবার সভায় ঢুকলেন। প্রধান মন্ত্রী কান্নার সুরে ঘোষণা করলেন, সর্ব্বনাশ হয়েছে, মহারাজ বজ্রাঘাতে মারা গিয়েছেন।

প্রজারা হাহাকার ক'রে উঠলো। রাজকন্যার মুখে কথা নেই। এই সময় বাঙ্গালী যুবক বললেন, মহারাজ ঠিক আছেন, ওঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দিন।

প্রধান মন্ত্রী বললেন, তুমি পাগল! দেখছ না—রাজার দেহ অসাড় হ'য়ে গেছে। এতে প্রাণের কোন স্পন্দনই নেই।

রাজকন্যা বললেন, উনি যা বলছেন তাই করুন। রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিন।

রক্ষীরা অতিকষ্টে কোন রকমে রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে চেপে ধ'রে রইল। বাঙ্গালী যুবক তখনি তাঁর

কোলের বিড়ালটি সিংহাসনের সামনে হাতীর দাঁতে তৈরী আধারটির ওপরে রাখলেন।

পেটেল পণ্ডিত এই সময় চেঁচিয়ে উঠলো,—হার হ'ল কার? ক্রীতদাস হ'ল কে? রাজকন্যা এখন কার?

কালো বিড়ালটা হঠাৎ আধারের উপর নেতিয়ে পড়লো, আর সদ্য ঘুম-ভাঙ্গার পর মানুষ যেমন ক'রে চায়, ঠিক তেমনই ভাবে সিংহাসনে রাজার আড়ষ্ট দেহের চোখ দু'টো গেল খুলে—সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহখানা উঠলো ন'ড়ে।

ভয়ে-বিস্ময়ে-আনন্দে নানা ভাবে নানা লোক কোলাহল সুরু ক'রে দিল।

বাঙ্গালী যুবক এইবার দিলেন পেটেলের প্রশ্নের উত্তর,—হারলে তুমি, হ'লে ক্রীতদাস, রাজকন্যা আমার! রাজার আত্মাকে এই মরা-বিড়ালের দেহের মধ্যে রেখে, বজ্রের আঘাত থেকে আমি ওঁকে রক্ষা করেছি। ওঁর আত্মা ওঁর দেহে যেতেই বিড়ালও ঢলে পড়েছে।

পেটেল তখন কাঁপতে কাঁপতে বিজয়ী যুবকের পায়ের তলায় ব'সে বল্‌লো,—সত্যই আমি হেরেছি। আমি তোমার ক্রীতদাস।

মন্ত্রীরাও ক্ষুব্ধ হয়ে ব'লে ফেললেন,—সত্যই এ ক্ষমতা অদ্ভুত!

রাজকন্যা বললেন,—তুমি আমাকে খুশী করেছ, রাজ্যের রাজার জীবন দিয়েছ; রাজকন্যাকে লাভ ক'রে এ রাজ্যও তুমি ভোগ করো।

যুবক তখন শান্ত স্বরে বললেন, রাজকন্যার কল্যাণে আমার স্বপ্ন আজ সত্য হ'ল। মগধের সঙ্গে মিথিলাও বাঙ্গলার সঙ্গে মিশে গেল।

রাজা এই সময় বিদ্যুতের বেগে সিংহাসন থেকে উঠে বললেন, তুমি কে? সত্য বল—তুমি কে?

শান্ত ও সংযত স্বরে বাঙ্গালী যুবক উত্তর দিলেন—আমি দীপঙ্কর; রাজ্যের পর রাজ্য জয় ক'রেও তৃপ্তি পাইনি, তাই রাজলক্ষ্মীর সন্ধানে এসেছি মিথিলায়।

রাজকন্যা অমনি তৎক্ষণাৎ উঠে নিজের গলার গজমতি হার-ছড়াটি রাজা দীপঙ্করের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—এ রাজ্যও তুমি জীবন দিয়ে জয় ক'রেছ ব'লেই রাজলক্ষ্মীও তোমাকে ধরা দিলে রাজা!

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফুটবল

শুভ বৈশাখের সঙ্গে খেলার মাঠে ভিড় জম্‌তে সুরু হয়েছে। এখন এলো ফুটবল্-সীজ্‌ন্! এ খেলা দেখবার জন্য ছেলে-বুড়ো সকলের সমান উৎসাহ! যে সব ছেলে মাঠে বেরুতে পারে না, তারাও একটা বল পেলে ঘরের মধ্যে ফুটবল খেলা সুরু করে।

সকল দেশেই ফুটবল খেলার আদর আজ সব-চেয়ে বেশী। এ খেলার আয়োজনে সমারোহ যেমন নেই, তেমনি খরচও পড়ে সামান্য।

বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই ফুটবল খেলায় নামা চলে। এ খেলায় পারদর্শিতা লাভ ক'রতে হ'লে বুদ্ধি চাই, আর চাই সাহস, আত্ম সংযম, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা,

পুতুল রাখিয়া ট্যাক্‌লিং-অভ্যাস

উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং স্বার্থত্যাগ। এ স্বার্থত্যাগের মানে হলো, নিজে বাহাদুরী নেবার প্রয়াস ছেড়ে দলের বাহাদুরী-প্রকাশে সহায়তা করা। অবশ্য এ-কটি গুণের সঙ্গে দৌড়ানোর শক্তি; (দৌড়ুতে গেলে হাঁপালে চলবে না) শক্ত-সমর্থ দেহ এবং ভালো স্বাস্থ্য চাই।

কি করে' ফুটবল খেলায় পারদর্শিতা লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় লেখা অনেক বই আছে। সে সব বইয়ে যে সব বিধি-নিয়মের কথা লেখা হয়েছে, তার সার মর্ম্ম দাঁড়ায় এই, offensive এ অর্থাৎ আক্রমণ করে' গোল্ দিতে হ'লে চাই অপর-দলের খেলোয়াড়কে প্রতিরোধ করা (blocking); তার খেলায় বাধা সৃষ্টি করা (interfering); বলটি বিপক্ষের আক্রমণ বাঁচিয়ে নিজেদের

বল পাশ করা; ও শুট্ করার নিখুঁত ভাগ্, অর্থাৎ প্রত্যেক দখলে রাখা (ability to handle the ball); এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে নিঃসংশয় লক্ষ্য চাই (perfection in the execution of details)। বিপক্ষ তেড়ে এলে defensiveএ অর্থাৎ প্রতিরোধের খেলা চাই। ফরওয়ার্ড পাশকে ধাক্কায় হঠাতে হবে (knocking down forward-passes)। তখন বিপক্ষ-দলকে খেলিয়ে নিয়ে খেলা চলে না (tackling)।

এ খেলায় কৃতিত্ব লাভ ক'রতে হ'লে অভ্যাসের রীতিমত প্রয়োজন। হঠাৎ ম্যাচ্ খেলতে মাঠে গিয়ে

আমেরিকায় রাত্রেও খেলার প্রাক্‌টিশ চলে

নামলে চলবে না। এগারো জনে মিলে দল গ'ড়ে খেলার রীতিমত প্রাক্‌টিশ প্রয়োজন।

দল গড়তে হ'লে পূর্ব্বে যে-সব গুণের কথা বলেছি, কার-কার সে-সব গুণ আছে দেখে এগারো-জন খেলোয়াড় বেছে তবে দল গড়া চাই। তাদের নিয়ে নিত্য ভালো রকম খেলা প্রাক্‌টিশ করতে হবে, তবেই যোগ্য খেলোয়াড় তৈয়েরী হবার সম্ভাবনা। নচেৎ এলোপাতাড়ি বল পেলেই পা ছুড়বো বা হেড করবো—এ-রীতিতে কোনো কালে খেলোয়াড় তৈয়েরী হয় না!

অনেক দল যে মাঠে দাঁড়াতে পারে না তার কারণ, প্রাক্‌টিশের অভাবে খেলায় অনেক খুঁত থেকে যায়। প্রাক্‌টিশ ছাড়া ফুটবল-খেলায় কৃতিত্বের আশা দুরাশা হবে। ভালো খেলোয়াড়ের লক্ষ্য শুধু নিজের দলের খেলার দিকে থাক্‌বে না; বিপক্ষ দলের ধাঁচঘোঁচ নিমেষে বুঝে নিয়ে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই! তাছাড়া প্রতি-নিমেষ বলের উপর লক্ষ্য রেখে কখন কি করতে হবে, সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা-নির্দেশে মন যেন সচেতন থাকে। ভয় পেয়ে বা ঝোঁকের মাথায় যেমন করে হোক্ বল মারা, বা বিপক্ষ-দলের একজন খেলোয়াড়কে কায়দা করতে গেলে চলবে না। You not only have to know when to do a thing, but when not to do it. অর্থাৎ কখন কি ক'রতে হবে, সে সম্বন্ধে যেমন সঠিক ধারণা থাকা চাই, তেমনি কখন কি ক'রবে না, সে সম্বন্ধেও নির্দেশ-নির্দ্ধারণে এতটুকু ভুল হ'লে চলবে না!

ব্যাকে যে খেলবে, ফরওয়ার্ডকে কখন ঠিক রুখতে হবে, তা তার জানা চাই। ভালো ফরওয়ার্ড কোনো কালে জোর-বাতাসের বিপরীত মুখে পাশ করার চেষ্টা করবে না; নিজের এলাকার মধ্যে গোলের কাছে কখনো "পাশ" করবার প্রয়াস পাবে না; বিপক্ষ দলের গোলের কাছে বল পাশ করা অনুচিত; বিপক্ষ দল যখন আক্রমণের জন্য রুখে সামনে আসে, তখনো বল্ "পাশ" করা উচিত নয়। এবং দু'একখানি গোল খাওয়া হলে বল্ পাশ ক'রে খেলার প্রবৃত্তি একদম্ ত্যাগ ক'রতে হবে।

যে ব্যাকে খেলবে, নিজের দলের কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা না থাকলে তখন এবং শুধু তখনমাত্র 'ব্যাক' বল্ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে বাহাদুরী-দেখানোর সাধ মেটাতে পারে,

নচেৎ নয়। অনেক সময় 'ব্যাক্'কে দেখি, বল পাশ ক'রে কেরামতি দেখায়! এ কেরামতি কখন দেখাবে? যখন নিজের দল ছ'চারখানি গোল দিয়ে জিতের দিকে পাল্লা ঝুঁকিয়ে তুলেছে, তখন।

নিজের উপর ব্যাকের খুব বেশী প্রত্যয় থাকা চাই—এবং নিজের দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের খেলার সম্বন্ধে তার জ্ঞান সুস্পষ্ট এবং অভ্রান্ত হবে।

ফুটবল খেলতে হ'লে পোষাক সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। আমাদের দেশের বড়-বড় খেলোয়াড়রা শুধু-পায়ে খেলেন এবং শুধু-পায়ে খেললেও জোয়ান গোরাদের খেলায় হারিয়ে দিচ্ছেন। শুধু-পায়ে তাঁদের কৃতিত্ব

ফরোয়ার্ড-পাশ প্রাক্‌টিশ

ক্ষুণ্ণ না হ'লেও শুধু-পায়ে খেলায় বহু ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়। এজন্য গোড়া-থেকে জুতা পায়ে দিয়ে খেলার অভ্যাসই সমীচীন।

ফুটবল খেলার জন্ম প্যাণ্ট চাই। এ প্যাণ্ট বিশেষভাবে তৈয়েরী করাতে হবে। পায়ে এবং কাঁধে যদি shoulder guards আঁটতে পারো, আরো ভালো। অনেক খেলোয়াড় মাথায় head-gear পরেন। Head-gearএ সুবিধা এই যে, কাণদুটি বলের আঘাত থেকে রক্ষা পাবে। ফুটবল-খেলোয়াড়ের head-gearএর দাম বেশী নয়।

খেলোয়াড়দের খাদ্য এবং পানীয় সম্বন্ধে নিয়ম-কানুন মানা দরকার। এ সম্বন্ধে বিশেষ ওস্তাদ খেলোয়াড়রা বলেন, সুরা বা অতিরিক্ত চা পান করলে চলবে না; সিগারেট-সেবা বন্ধ করলে ভালো হয়; লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য—তাও অপ্রচুর ভাবে গ্রহণ কর্ত্তব্য; চকোলেট, কোকো, ঘীয়ের রান্না, কলা—এগুলি বিষবৎ বর্জ্জন করতে হবে। এগুলি গুরুপাক দ্রব্য। আহার-সম্বন্ধে সময়ানুবর্ত্তিতা মেনে চলতে হবে। টিফিন হবে সামান্ত। খাবার সময় বা খাবার পূর্ব্বে বরফ-জল কদাচ পান করা হবে না। রাত্রি দশটা বাজলেই শয্যা গ্রহণ করতে হবে। ন'ঘণ্টা নিদ্রা চাই।

শরীরে এতটুকু বেদনা বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে খেলায় নামবে না। নামলে গোঁয়ার্ত্তুমি করা হবে, এবং সে গোঁয়ার্ত্তুমির ফল সাংঘাতিকও হ'তে পারে। খেলতে খেলতে শরীরের কোথাও যদি বেদনা বোধ হয় কিম্বা কেটে ছ'ড়ে যায়, তাহ'লে তোয়ালে গরম ক'রে তার সেঁক দিলে উপকার হবে।

বল নিয়ে pass করার কথা পূর্ব্বে যা বলেছি, বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে passingএ বেশ খেলিয়ে নিয়ে খেলা করা চলে। Tackling ক'রে বল নিয়ে সরতে হ'লে নিজের দেহকে বিপক্ষের সামনে নীচু ক'রে বলের

দিকে নজর রেখে তার পাশ কাটিয়ে যাওয়া চাই। বলের উপর থেকে লক্ষ্য যেন নিমেষের জন্য বিচ্যুত না হয়। ও-পক্ষ তোমাকে যে-কোন মুহূর্তে ধাক্কা দিতে পারে—সে ধাক্কা তোমার গায়ে না লাগে, সেদিকে বিলক্ষণ হুঁশিয়ার থাকা চাই। Tacklingএ চাই তীব্র দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ হুঁশ, বিচার-সম্বন্ধে অভ্রান্ত মন এবং leg-draw.

তার পর blocking বা বিপক্ষ-দলের আক্রমণ রোধ করা। বিপক্ষ-দলকে হঠাতে হ'লে তার হাঁটুর একটু উর্দ্ধে একটি ধাক্কা – ব্যস্, সে ধাক্কা সফল হবেই! বিপক্ষ প'ড়ে যাবে—অমনি রন্ধ্র-পথে বল নিয়ে সোজা তুমি বেরিয়ে যেতে পারবে।

কাঁধে ষ্ট্রাপ আঁটিয়া প্রাক্‌টিশ

আক্রমণোদ্যত বিপক্ষের গতি রোধ ক'রে বলটিকে তার কবলচ্যুত করার প্রকৃষ্ট উপায় হলো তার সামনে উপুড় হ'য়ে পড়ে-যাওয়া। অতর্কিত এ-পতনে বিপক্ষ চমকে উঠবে; তার গতি রুদ্ধ হবে! তখন নিজের দলের কেউ-না-কেউ বলটিকে আয়ত্তে নিতে পারে। অবশ্য এ খেলোয়াড়কে খুব হুঁশিয়ার এবং সপ্রতিভ থাকতে হবে। কেন না, এ-পতন এবং স্বদলের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল নেওয়া—এ-ব্যাপার চকিতে নিঃশেষ করা চাই; এক মিনিটও দেরী করা চলবে না। বিচার-বিবেচনার বা পতনের মর্ম্ম উপলব্ধির সম্বন্ধে যেন ভুল না হয়!

হাফ ব্যাকের প্রধান কর্ত্তব্য, ফরোয়ার্ডকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা। ফুটবলের মাঠে সবচেয়ে বেশী স্বার্থ-ত্যাগ যদি কারো পক্ষে প্রয়োজন হয় তো সে এই হাফ-ব্যাকের।

ব্যাককে সব সময় খুব সপ্রতিভ, সতর্ক থাকতে হবে। লম্বা-কিকে বল কখন এসে পড়বে, কিম্বা পাশ ক'রে কে ফশ ক'রে বল-সমেত সামনে এসে হাজির হবে—সে-দিকে এক মিনিটের জন্য বেহুঁশ বা অন্যমনস্ক থাকলে চলবে না।

বিপক্ষ যদি খুব শক্তিমান হয়, তাহ'লে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়—লম্বা কিক্। Kick, kick and keep on kicking.

বর্ষায় কর্দ্দমাক্ত ভিজা মাঠে লম্বা-কিক্ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। এ সময় পাশ করার দিকে লক্ষ্য রাখলে কৃতকার্য্য হবার আশা পূর্ণ হবে না, জেনো। সাইড্-লাইন ঘেঁষে কখনো থাকবে না; সেণ্টার-লাইনেও কদাচ থাকবে না। বাতাসের বিপরীত দিকে বল নিয়ে যাবার সময় মাটিতে সেঁটে থাকতে হবে (Stall) এবং বাতাসের অনুকূলে বল নিয়ে যাবার সময় গতিবেগ খুব ক্ষিপ্র হওয়া চাই। নিজের দল যখন পরিশ্রান্ত, কিম্বা ও-দলের 'জিত্' চলেছে, তখনো মাটি আঁকড়ে থাকা চাই। এই মাটি এঁটে থাকার নাম Stall করা বা stick in। হারের মুখে গতিবেগ ক্ষিপ্র রাখবে, কদাচ মন্থর বা slow হবে না। স্বদলে লম্বা কিক্ করার সামর্থ্য যদি কারো না থাকে, তাহলে বল পাবামাত্র যথাসাধ্য লম্বা কিক্ করতে ভুলো না।

বিপক্ষের এলাকায় খেলায় ক্ষিপ্রকারিতা এবং মনকে ও চোখদুটিকে খুব সতর্ক রাখা চাই। Trick খেলা ভালো, কিন্তু ক্ষিপ্র শক্তিমান বিপক্ষদলের সঙ্গে খেলায় trick চালাতে গেলে অনুতাপ করতে হবে।

মোটামুটি এই বিধি-নিয়ম মেনে চললে ফুটবল-খেলায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করা কঠিন বা অসম্ভব হবে না।

—

খেলনার শিক্ষা

শুধু বই পড়িয়াই মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় বিভূষিত হইয়া মানুষের মতো মানুষ হয় না। খেলা-ধূলায় মানুষ হইবার উপকরণ এবং উপাদান প্রচুর আছে। খেলার দৌলতে পৃথিবীতে অনেকে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া মানুষের মতো মানুষ হইয়াছেন,—সে পরিচয় পৃথিবীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

জেম্‌স্ ওয়াট্ ঘরে বসিয়া চায়ের কেট্‌লি হইতে বাষ্পোদ্গম দেখিতেছিলেন—নেহাৎ খেলার ছলে, ক্রীড়া-কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া! নিউটনের ঘুড়ি উড়ানো—তাহাতেও ছিল খেলার আমোদ!

খেলা ও খেলনার প্রভাব ছেলেমেয়ের মনে যে ভাবে বিস্তার লাভ করে, তাহার ফলে বুদ্ধিবৃত্তি কোন্ দিকে বাড়িয়া উঠিবে—ছেলেমেয়ের মন এই খেলার দিক দিয়া কি উৎকর্ষ লাভ করিবে, পূর্ব্বাহ্নে অনুমান করা কঠিন।

তবে যুগ-ভেদে শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের খেলায় ও খেলনায় যে পার্থক্য ঘটিতেছে, সেই খেলা ও খেলনার জোরে জীবনের রূপ নব নব ভাবে বিকাশ লাভ করিতেছে। তাহার পরিচয় আমরা নিত্য পাইতেছি।

আমাদের দেশে মেয়েদের ছিল একদিন শুধু পুতুল খেলা—মাটির ভাঁড়-খুরি লইয়া রান্নাবান্না খেলা—পুতুলের বিবাহ দিয়া গৃহিণীপনার অভিনয়। এ খেলার ফলে সেকালের মেয়েরা গৃহিণীপনায় যে পটুতা, ছেলে-মেয়ের পালনে-পরিচর্য্যায় যে কুশলতা দেখাইয়া গিয়াছেন, একালের সংসারকে তাহার তুলনায় বিশৃঙ্খল বলিব। ঐ পুতুল-খেলা এবং রান্নাবান্না খেলার ফলে সহযোগিতা আর প্রীতি-স্নেহ-মমতায় তাঁদের মন ভরিয়া উঠিত। ও-সব খেলায় মন দরাজ হইত। সংসারের বহু খুঁটিনাটি ব্যাপার হাতে কলমে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে শিখিতে পারিতেন।

ছেলেদের খেলার মধ্যে সেকালে ছিল ব্যাট্ বল, ডাণ্ডা-গুলি ও কপাটি। সে খেলায় দেহ সুস্থ সবল হইয়া গড়িয়া উঠিত—কিন্তু তাহাতে মনের শিক্ষার বা জ্ঞানলাভের তেমন উপায় ছিল না।

এ যুগে খেলা ও খেলনায় বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং খেলা ও খেলনার সাহায্যে বহু বিষয়ে জ্ঞান-লাভের সুবিধা হইয়াছে। মনের প্রসার বাড়াইবার বহু উপায় মিলিয়াছে। "ট্রিপ রাউণ্ড দী ওয়ার্লড" বা "চীন মুলুকে" বা "ওভার দি সীজ" প্রভৃতি খেলা দেখুন। সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র হয় এ-খেলায় ছক্। ডাইশ্ ফেলিয়া নম্বর দেখিয়া ঘুঁটি চালার রীতি। এ খেলায় ভূগোলের সঙ্গে পরিচয় যত সহজে, যত নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয়, দশ-বিশখানা ভূগোল মুখস্থ করিলেও শিক্ষা তেমন হইবে না।

বিলাতী খেলনা Building blocks অর্থাৎ নানা আকারের বেলে-মাটীর, পাথরের বা কাঠের তৈয়ারী কার্নিশ, খিলান,
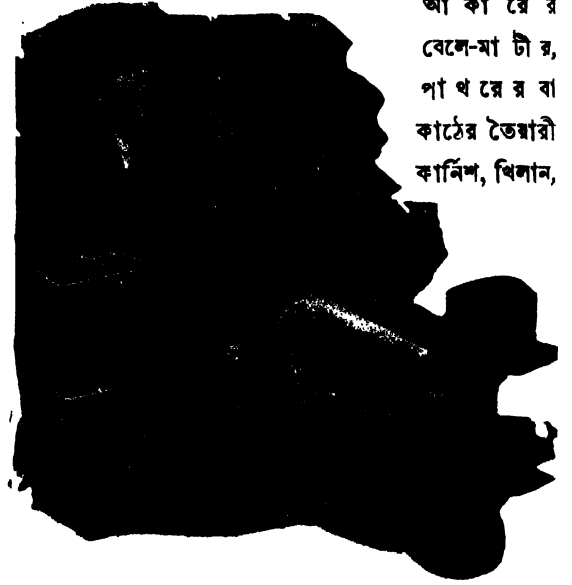
খেলা-ঘরের প্লেন আকাশে ওঠে

দেওয়াল, এই কতকগুলা জিনিষ; তার সঙ্গে থাকে নক্সা। ছেলেরা নক্সা দেখিয়া ঐ সব খণ্ড-দ্রব্য লইয়া বাড়ী, কারখানা, ষ্টেশন, পুল প্রভৃতি তৈয়ার করে। ইহাতে খেলার সখ যেমন মিটে, তেমনি বাড়ী-ঘর-তৈয়ারী বা এঞ্জিনীয়ারিংয়ের দিকে ছেলেদের মনে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়—তাদের সুকুমার মনে শিল্প-বোধের উন্মেষ হয়।

বহুকাল পূর্ব্বেকার কথা। সুইডেনে একটি ছেলে বিল্ডিং ব্লক লইয়া খেলা করিত। ছেলেটি এক উইণ্ডমিল দেখিয়া খেলা-ঘরের উইণ্ডমিল গড়িবার অভিলাষী হয়; কিন্তু তাহার কাছে যোগ্য 'ব্লক' ছিল না। ছেলেটি তখন ছোট
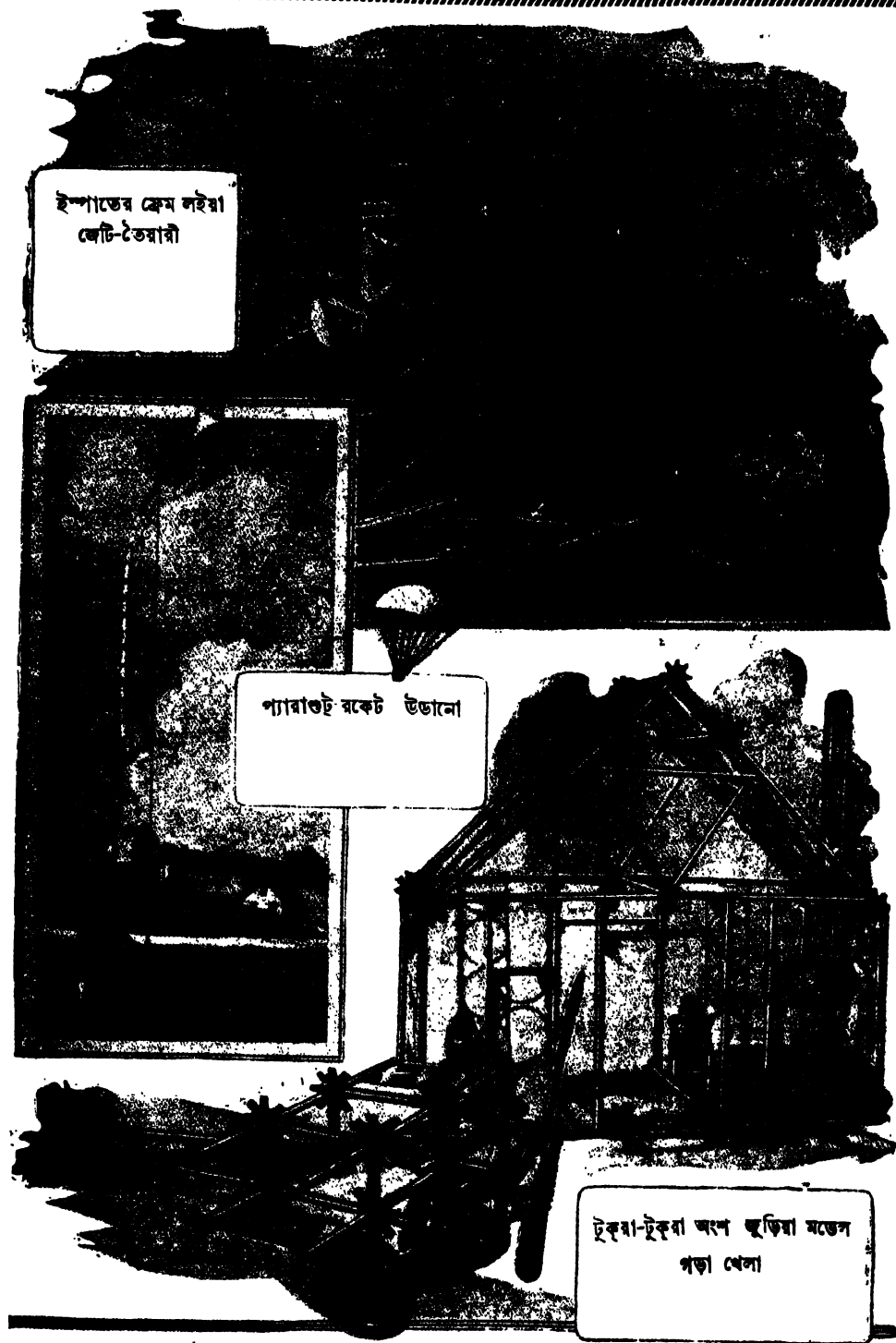
করাত, বাটালি, কাঠ কিনিয়া উইণ্ডমিলের আদর্শে প্রয়োজনীয় নানা অংশ কাটিয়া জুড়িয়া খেলাঘরের উইণ্ডমিল গড়িয়া তোলে। এবং এ-কাজে রুচি ও অধ্যবসায়ের ফলে এ-বালক পরে বয়স-কালে বড় বড় রণতরী-নির্ম্মাণে

অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হন। ইনি এখন মস্ত একজন পূর্ত্ত-শিল্পী। নাম জন এরিক্‌শন।

আর একটি বালক বইয়ের পাতায় নির্দ্দেশ দেখিয়া

বালির গ্রাম-নগর

যন্ত্র-শেট্ খেলনা

পাৎলা ঘুড়ীর কাগজ, পাখীর পালক ও রবার-ব্যাণ্ড লইয়া উড়ন্ত পাখী তৈয়ারী করিত। বহু আয়াসে একদিন পাখী তৈয়ারী হইল, এবং সে পাখী আকাশে উড়িল। তখন উৎসাহিত হইয়া আরো বড় আকারের পাখী তৈয়ারী করিল। সে পাখীও আকাশে উড়িল। এবং এই খেলার পাখী উড়ানোর ফলে সে-বালক বড় হইয়া আমেরিকায় প্রকাণ্ড কারখানা খুলিয়া এরোপ্লেন রচনা করিতেছেন। তাঁহার নাম প্লেন-শিল্পী উইলিয়াম ষ্টাউট।
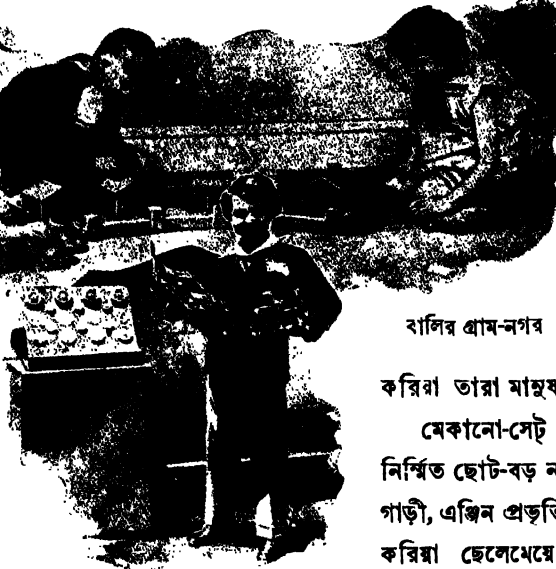
১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে জার্ম্মাণীতে এবং সুইজারল্যাণ্ডে খেলনার রাজ্যে যেন যুগান্তর আসিয়াছে! প্রত্যেকটি খেলনার নির্ম্মাণ-কার্য্যে তারা দেখে—খেলার আমোদের সঙ্গে কতখানি শিক্ষা মিলে। সেকালে পাশ্চাত্য দেশের ছেলেদের খেলনা ছিল,—দম-দেওয়া গাড়ী, লাফ-খাওয়া পুতুলের ডিগবাজী, ঝুম্‌ঝুমি-ক্লাউন, দম-দেওয়া বানর। এ খেলনার পাট একালে উঠিয়া গিয়াছে। এখন খেলনা তৈয়ারী হইতেছে ইলেক্‌ট্রিক শক্তি-সাহায্যে। পুতুলকে এখন সক্রিয় এবং সজীববৎ করিয়া তোলা হইতেছে। তা' ছাড়া বিবিধ রুচি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক খেলনার সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের খেলনা এমন যে, ছেলেরা খেলিতে বসিয়া এ যুগের বাস্তব জগতের বহু বিষয়ের সঙ্গে হাতে-কলমে পরিচিত হইতে পারে। খেলার টেলিফোন, খেলার বেতার-সেট্ লইয়া খেলা করিতে বসিয়া তারা এ দুইটি বস্তুর বৈজ্ঞানিক তথ্য সহজে বুঝিতেছে। এখন বালির তৈয়ারী এমন ছাঁচ বিক্রয় হইতেছে যে, তাহা লইয়া বালির গ্রাম-নগর ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তারা মানুষ হইবার সুযোগ পাইতেছে!

মেকানো-সেট্ এ যুগের চমৎকার খেলনা। ষ্টীলে নির্ম্মিত ছোট-বড় নানা অংশ লইয়া পুল, বাড়ী-ঘর, মোটর-গাড়ী, এঞ্জিন প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া ছেলেমেয়েরা প্রচুর আনন্দ পায়; তা' ছাড়া বস্তু-বিজ্ঞানে তাদের জ্ঞান এমন গভীর হইতেছে যে, বই পড়িয়া তাহা আয়ত্ত করা যায় না।

একালের খেলার-মোটর বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে

সেকালের ছেলে-মেয়ে পায়ে 'প্যাড্‌ল্' করিয়া খেলার মোটর-গাড়ী চালাইত। সে গাড়ীর রেওয়াজ আর নাই এখন ছেলেমেয়েদের খেলার মোটর-গাড়ীও বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। ছেলেরা ছেলে-বয়স হইতেই মোটর-গাড়ীর পরিচালনা এবং তার বিভিন্ন কলকব্জা, নক্সা প্রভৃতি
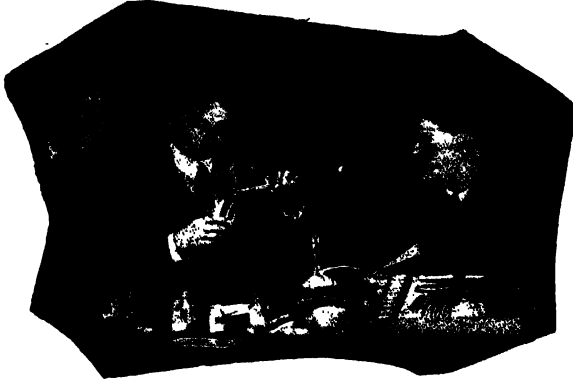
রসায়নের খেলা

ও প্রত্যেকটি অংশের পারস্পরিক-সম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতেছে।

রাসায়নিক খেলনাপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এ খেলনার আসবাবে থাকে এক সেট্ কম্প্লীট ল্যাবরেটরি। এ খেলা ও খেলনার ফলে নিরুপদ্রব বহু রাসায়নিক পরীক্ষায় আমোদ এবং জ্ঞান প্রচুরভাবে মিলিতেছে।

বর্ত্তমানের যুগ কর্ম্মযুগ। কাজেই ছেলেমেয়েদের হাতে এমন খেলনা দিতে হইবে যে-খেলনায় আনন্দ ও শিক্ষা পাইয়া নিজেদের যেন তারা যুগোপযোগী করিয়া গড়িতে পারে—যে খেলায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটে।

যাত্রা

যাবার সময় হ'ল মাগো, রাত্রি নেমে আসে,
পূর্ব্বাচলে মেঘের ফাঁকে সূর্য্য নাহি হাসে;
পল্লবে আর পুষ্পদলে
কি গান গাহে কতই ছলে,
শিশির-কণা ছড়িয়ে গেছে কচি সবুজ ঘাসে,—
মাগো, সূর্য্য নাহি হাসে।

একলা আমায় যেতে হবে অরণ্যানীর মাঝে
যেইখানেতে পাতায় পাতায় কার মা বাঁশী বাজে?
গভীর ঘন অন্ধকারে
ডাক দিল কে বারে বারে,
ঘরের মাঝে যখন থাকি মগ্ন শত কাজে—
কার মা বাঁশী বাজে?

যখন আমি চলেই যাব নাম-না-জানা দেশে,
ধরার বুকে যেথায় আসি' আকাশখানি মেশে;
তখন যদি আমার তরে
সেই অজানা খুঁজে মরে,
বলবে তারে, পালিয়ে গেছি সপ্ত সাগর শেষে,
নাম-না-জানা দেশে।

হয়ত তখন আমায় ডাকি গহনে কান্তারে
নিবিড় নিশায়, বর্ষা-ধারায় খুঁজবে বারে বারে;
নদীর কূলে বকুল-ছায়ে
নিকষ-কালো শৈল-গায়ে,
পাগল সম ছুটবে সে মা, অকূল পারাবারে—
খুঁজবে বারে বারে।

দিগন্ত-হীন মাঠের বুকে ক্লান্ত রবি-করে,
সে যদি মা আমায় ডাকে কাঁদন-ভরা স্বরে,
এই কথাটি ব'লো তারে,—
যে রয়েছে সাগর-পারে
তারো দুটি নয়ন বেয়ে অশ্রু-ধারা ঝরে
মাগো, কাঁদন-ভরা স্বরে।

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেঙ্গুন-মেল

রেঙ্গুন-মেল চলিয়াছে।
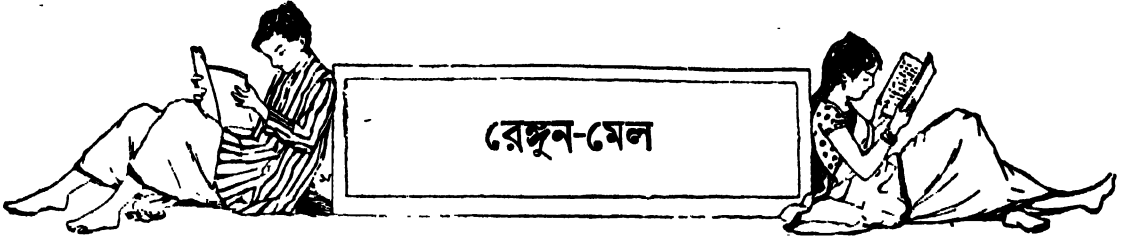
রাত্রি এগারোটা বাজিয়াছে। অকূল সমুদ্র। জাহাজে যাত্রীদের কলরব নাই। শুধু তরঙ্গের বিপুল কলোচ্ছ্বাস, তার সঙ্গে ষ্টীমারের এঞ্জিনের ধীর-গম্ভীর শব্দ…

মাথার উপর আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ। সমুদ্রের বুকে জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার সঙ্গে সহস্র তরঙ্গ-বাহু মেলিয়া সমুদ্র যেন লীলা-ভরে খেলা করিতেছে!

ডেকে রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে চন্দ্রা…

আর একটা দিন…তার পর মেল গিয়া রেঙ্গুনে পৌঁছিবে। সেখানে স্বামী ইন্দ্রনাথ…বারো বছর বয়সের ছেলে দুলাল। কত দিন দেখে নাই! আর একটা দিন পরে দেখা হইবে!

ভাবিতেছিল, নিজের জীবনের কথা। জীবনে কি না পাইয়াছে! এত পাওয়ার প্রত্যাশা সে করে নাই!

কলেজে বি-এ পড়িত। বাপের পয়সার জোর ছিল না। মেয়েকে যোগ্য-ঘরে কি করিয়া দিবেন, সে ভাবনায় বাপের মনে দারুণ অশান্তি…

তার পর কোথা হইতে ইন্দ্রনাথ আসিয়া জীবনের পথে দাঁড়াইল…যেন স্বপ্ন! এবং ইন্দ্রনাথ আপনা হইতে…

তার পর শুধুই সুখ…শুধুই আরাম! আঃ!

চন্দ্রা চক্ষু মুদিল। একটা নিশ্বাস রোধ করিতে পারিল না।

ইন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে এ্যাডভোকেট। চন্দ্রা আসিয়াছিল কলিকাতায়। মামার বাড়ীতে মামার মেয়ের বিবাহ… চন্দ্রাকে মামা লিখিয়াছিলেন, তোরা ছাড়া আমার কে আর আছে মা,…তোদের আসিতেই হইবে! না আসিলে…

আসা সহজ নয়! মক্কেল ছাড়িয়া এ সময় ইন্দ্রনাথের আসা ছিল অসম্ভব…ছেলে দুলালের এগজামিন্! চন্দ্রা কাহার সঙ্গে আসিবে?

পরিহাস করিয়া ইন্দ্রনাথ বলিল—তোমার লেখাপড়া শেখা মিথ্যা হলো চন্দ্রা! পথে একা বেরুতে এখনো ভয় করো! ছাখো তো ঐ ইংরেজের মেয়েদের পানে চেয়ে। একা ওরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে বেড়াচ্ছে! কোথায় সেই বুনো কাফ্রীর দেশ আফ্রিকা…কোথায় চীন-জাপান, সুমাত্রা-জাভা…

হাসিয়া চন্দ্রা বলিল—তোমরা আমাদের সে-স্বাধীনতা দিয়েছো কি? ঘরে এনে পাখীর মতো খাঁচায় পুরে রাখো যে!

ইন্দ্রনাথ বলিল—যদি খাঁচার দরজা খুলে দি?…একা পারো যেতে কলকাতায়?

চন্দ্রা বলিল- কেন পারবো না?

ইন্দ্রনাথ বলিল- বেশ, খাঁচা খুলে দিচ্ছি। যাও আমার পাখী…নীল-আকাশের বুকে ডানা-মেলে ওড়ো…

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে চন্দ্রা বলিল—সত্যি?

ইন্দ্রনাথ বলিল—সত্যি, চন্দ্রা। কবির কথা মনে পড়ছে—রেখেছো বাঙালী করে' মানুষ করোনি!…সত্যি, কিসের ভয়?…কিন্তু তোমার ভয় ক'রবে না তো?

চন্দ্রা বলিল,—না। মানুষকে আজ পর্য্যন্ত ভয়ের বস্তু বলে' জানবার মতো দুর্ভাগ্য আমার হয়নি!

ইন্দ্রনাথ বলিল—অল্ রাইট মাই ডার্লিং…

এ-ভূমিকার পর চন্দ্রা একদিন ষ্টীমারে চড়িল…

এখন কলিকাতা হইতে নিমন্ত্রণ সারিয়া চন্দ্রা রেঙ্গুনে ফিরিতেছে…

মনে বিজয়ের গর্ব্ব! কাল বাদে পরশু গিয়া রেঙ্গুনে পৌঁছিবে…নিজের ঘরে। গিয়া বলিবে, ঘরে-বাহিরে সর্ব্বত্র এমন নিরাপদ নিশ্চিন্ত ভাব! বাহিরকে মানুষ কেন যে ভয় করে…

ফিরিবার সময়। জাহাজ কলিকাতা ছাড়িয়াছে,…প্রায় ডায়মণ্ড-হার্বার পার হইয়াছে, এমন সময় আলাপ এক জন

পুরুষ-যাত্রীর সঙ্গে···বিপুল সেন। একা বর্ম্মায় চলিয়াছে। মাণ্ডালেতে কাঠের কারবার আছে।···নামিবে রেঙ্গুনে। রেঙ্গুনে আর্ক-রাইট কোম্পানির সঙ্গে কারবার···তাদের সঙ্গে কি-একটা জরুরি প্রয়োজন সারিয়া কোন্ জঙ্গলে যাইবে।

ডেক-চেয়ারে বসিয়া চন্দ্রা একখানা ইংরেজী নভেল পড়িতেছিল, বিপুল সেন আসিয়া বলিল—যদি কিছু মনে না করেন···

ডাগর দুটি চোখের দৃষ্টি বিপুল সেনের মুখে নিবদ্ধ করিয়া চন্দ্রা বলিল—বলুন···

সে-দৃষ্টির সামনে বিপুল সেনের ক্ষণেক বিভ্রম।···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিপুল সেন বলিল,—বড্ড ভুল করেছি। মানে, দু'চারখানা বই সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল···বরাবর নিই। এবারে নেওয়া হয়নি। আপনার কাছে অনেক কেতাব রয়েছে। একখানা যদি···

হাসিয়া চন্দ্রা বলিল—বেশ তো!···আসুন আমার কেবিনে। অনেকগুলো বই বার ক'রে রেখেছি···তার মধ্য থেকে যেখানা হয়···

বিপুলকে লইয়া চন্দ্রা তার কেবিনে আসিল। একরাশ বই···বাঙলা ইংরেজী নভেল···

বাছিয়া বিপুল একখানা ইংরেজী নভেল হাতে লইল। সমারশেট্ মমের লেখা কতকগুলো ছোট গল্প।

তার পর এই বই হাতে লইয়া দু'জনের আলাপ সুরু।···

বই শেষ করিয়া বিপুল বলিল—চমৎকার লাগলো। বিশেষ Pool গল্পটি!···এ-গল্প প'ড়ে আমার মনে পড়ছিল মাণ্ডালের কথা। অম্নি এ্যাটমস্ফীয়ার! সেখানেও দু'চার ঘর বাঙালী আছেন···বিয়ে না ক'রে কেমন এক রকম হ'য়ে আছেন···না বাঙালী, না বর্ম্মীজ! মন যেন কিসের ভাবে আচ্ছন্ন···এমন লোককে জানি!

সাগ্রহ দৃষ্টিতে বিপুলের পানে চাহিয়া চন্দ্রা তার কথা শুনিল। বলিল—আমার মনে কিন্তু ভারী কষ্ট হয় ঐ নায়ক লশনের জন্য! বেচারী!

উচ্ছ্বাস-ভরে বিপুল বলিল—হিরোইন এথেলের সঙ্গে তার প্রথম দেখা···সিম্প্লি চার্ম্মিং! জলে সাঁতার কাটছে আপন-মনে···তার পর পাহাড়ের উপর উঠলো···উঠে মাথার চুল ঝেড়ে জল ঝরাচ্ছে! দুটি লাইনে কি চমৎকার ছবি এঁকেছেন ভদ্রলোক!

বলিয়া বই খুলিয়া পড়িল,—She wrung out her hair···she looked like a wild creature of the woods···সত্যি মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী, সমাজের নানা চাপে আপনাদের সহজ চার্ম, natural femininty সব চুর্ণ হয়ে যাচ্ছে···

কথাটা বলিয়া, বিপুল চাহিয়া রহিল চন্দ্রার পানে···

চন্দ্রা কোনো জবাব দিল না। তার মনের মধ্যে একরাশ কুয়াশার বাষ্প আসিয়া জমিল। কোথা হইতে, কে জানে!

জ্যোৎস্না-রাত্রি। জাহাজ চলিয়াছে। রেলিঙ ধরিয়া ডেকে দাঁড়াইয়া চন্দ্রা চাহিয়া আছে দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের চক্ররেখার পানে···জ্যোৎস্না আর সাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ওদিকটা অস্পষ্ট! দেখিলে মনে হয়, সামনে শুধু অজানা রহস্যের মায়া··গাঢ় নিবিড় হইয়া আছে!

পাশেই হঠাৎ কণ্ঠ জাগিল,—কি দেখছেন মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী? সাগরের বুকে ঢেউ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রা ফিরিয়া চাহিল। তার মন ভরিয়া স্বামীপুত্রের চিন্তা! ঘরে সেখানে বিছানায় শুইয়া দুলাল ঘুমাইতেছে···একা! নিশ্চয় উনি এখনো বাহিরের ঘরে মক্কেলের ব্রীফ্ লইয়া তাহাতে নিমগ্ন আছেন! চন্দ্রা তা জানে! নিত্য কি রকম তাড়া দিয়া ইন্দ্রনাথকে শোয়াইতে হয়···ব্রীফ্ কাড়িয়া ভর্ৎসনা করে, —না, আর নয়। রাত বারোটা বাজে! ঘুমোবে চলো··· না হ'লে শরীর থাকবে কেন? হাসিয়া মিনতি-ভরে ইন্দ্রনাথ বলে—ওগো আর পাঁচ মিনিট···ওই মাংলুর এভিডেন্সটা পড়ছিলুম···আর দু'খানা ফোলিয়ো! ওটুকু শেষ করতে দাও! চন্দ্রা বলে—না···আর এক-মিনিটও ব্রীফ্ পড়া চলবে না! হাসিয়া ইন্দ্রনাথ বলে—অবোধ তোমার দণ্ড কঠিন বিধান!

কি সুখের সংসার তার!···

বিপুল বলিল—কি ভাবছেন? আর কালকের দিন-রাতটুকু সামনে—তার পর রেঙ্গুন!

মৃদু হাসিয়া চন্দ্রা বলিল—তাই ভাবছি, সত্যি···

বিপুল বলিল—আপনারা মেয়ে-জাতটা বড্ড বেশী

সেণ্টিমেণ্টাল ··শুধু ভবিষ্যতের কথাই ভাবেন! বর্ত্তমানকে চিরদিন অগ্রাহ্য করেন!

চন্দ্রা বলিল,—তার মানে?

বিপুল বলিল—You are always home-sick···

চন্দ্রা বলিল—যদি মেয়েমানুষ হতেন, আর মা হতেন, বুঝতেন···

হাসিয়া বিপুল বলিল,—ও-দুটোর কোনোটাই হ'বার সম্ভাবনা যখন এ জন্মে নেই, তখন ওটা দুর্ব্বোধ থেকে গেল মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী। তা' ছাড়া ঘর-সংসার—তার দাম কোনো দিন আমি বুঝলুম না।

চন্দ্রা কহিল,—বিয়ে করেননি বুঝি?

বিপুল বলিল,—না···এবং এ-জন্মে করবোও না!

চন্দ্রা কোনো জবাব দিল না···বিপুলও নীরব···

সুনিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জ্জন, আর এঞ্জিনের গম্ভীর শব্দ···স্তব্ধতা সে-শব্দে যেন কাঁপিতেছিল!

চন্দ্রার মনে বিস্ময়! সে ভাবিতেছিল, পুরুষের মন এমন হয়···সত্য? রেঙ্গুনে দেখিয়াছে বিবাহ না করিয়া পুরুষমানুষ কাজে খাটিয়া যাইতেছে, পয়সা রোজগার করিতেছে···জীবনে নানা ঝড় তুফান চলিয়াছে!·· ভাবিত, কেন এরা বিবাহ করিয়া সংসার পাতে না? সংসারে কি মোহ···কি মায়া! ওদের সাধ হয় না? কি সুখে ওরা কাজ করে? কি অবলম্বনই বা পায়?

বিপুল বলিল—ষ্টীমারে আপনাকে দেখে আমার এমন ভালো লাগলো! খপর নিলুম। শুনলুম, আপনি একা চলেছেন রেঙ্গুন।···আশ্চর্য্য হলুম। ভারী ভালো লাগলো। বাঙালীর মেয়ে···এ-বয়সে একা চলেছেন ··চমৎকার! তখনি বুঝলুম···আর পাঁচ জন বাঙালীর মেয়ের মতো আপনি নন্!

চন্দ্রার কাণে কথাটা বাজিল গানের মতো! ফশ্ করিয়া সে জবাব দিল—কাদের মতো মনে হলো?

একটা সিগারেট ধরাইয়া বিপুল বলিল,—তা জানি না। তবে but you don't mind if I smoke?

চন্দ্রা বলিল,—না।···কিন্তু বলুন না, আমাকে কাদের মতো মনে হলো? রহস্যময়ী? না, weird?

বিপুল চাহিয়া রহিল চন্দ্রার পানে। চন্দ্রার মুখে জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়াছে! অধরে হাসির রেখা··· চোখে অপরূপ দৃষ্টি!

বিপুল বলিল—তখনি ঠিক করলুম, আপনাকে জানতে হবে চিনতে হবে।

হাসিয়া চন্দ্রা বলিল—জেনে-চিনে ফেলেচেন আমাকে? এক নিমেষে? আশ্চর্য্য! ···তা হ'লে এ বইখানা পড়ুন ···সত্যি, এতে যে hero, সে বলেছে, মেয়েদের সম্বন্ধে তার মনে এতটুকু অজানা রহস্য নেই। মেয়েদের সম্বন্ধে সব কথা তার জানা!

বিপুল বলিল—বই পড়ে মেয়েদের পরিচয় আমাকে নিতে হয়নি, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী ··

কথাটা তীক্ষ্ণ তীরের মতো চন্দ্রার মনে বিঁধিল! হাসিয়া চন্দ্রা বলিল—এত গর্ব্ব ভালো নয় মিষ্টার সেন।

—এ গর্ব্ব নয় · simple truth

—ও ·

বিপুলের পানে চন্দ্রা চাহিতে পারিল না · চাহিল সমুদ্রের পানে। জ্যোৎস্না লইয়া লীলা-ভরে সমুদ্রের লোফালুফি চলিয়াছে···অবিরাম অবিচ্ছিন্ন লীলা!

চন্দ্রা বিপুলের পানে চাহিয়া দেখিল! বিপুল তাহারি পানে চাহিয়া আছে! চন্দ্রার দেহে-মনে কেমন একটু অস্বস্তি

চন্দ্রা কহিল,– আপনার কাঠের কারবারের কথা বলুন। সত্যি, ভারী চমৎকার লাগছিল! বর্ম্মীজরা কাঠ চুরি করতে আসে···চারিদিক দিয়ে তাদের ঘিরে আপনাদের রীতিমত লড়াই করতে হয় বুনো হাতীর জটলা···যেন গল্পের মতো! বেশ থি্ল আছে!···তার পর?

বিপুল বলিল—যদি শুনতে চান···তা' হলে দু'খানা ডেক চেয়ার আনাই। বসা যাক। আপনি বসবেন শ্রোতা হয়ে···আর আমি বসবো বক্তার আসনে।

বিপুল বলিতে লাগিল। বলিবার শক্তি আছে! তার কথায় চন্দ্রা যেন চোখে প্রত্যক্ষ করিতেছিল—ভীষণ বন ···গাছে গাছে মেশামেশি-ঠাশাঠাশি···ঘেঁষাঘেঁষি কি ভীষণ ঘন জঙ্গল রৌদ্র যেন সে-জঙ্গলে প্রবেশ করিতে পারে না! সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতেছিল, এত সাহস··· এমন শক্তি ··এ-মানুষ কাজ লইয়া পাগল চিরদিন··· আশ্চর্য্য!

জীবনে কোনো নারী কোনো দিন আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়াছে···বিপুলের কথায় কোথাও তার এতটুকু ইঙ্গিত

নাই! শুধু কাজ আর শিকার! কখনো বসিয়া বই পড়িয়া সময় কাটান ··

চন্দ্রার মনে বিস্ময়ের সীমা নাই! প্রীতি স্নেহ মমতা··· সে-সবের রেখা কোন দিক দিয়া বিপুলের মনে পড়ে নাই! কি করিয়া এমন সুস্থ মন লইয়া দিন কাটায়? কোনো সখ, কোনো বাসনা নাই?···মানুষের সঙ্গ···স্ত্রী··পুত্র··· সংসার! · এ-জীবনের সঙ্গে আর কাহারো জীবনের এতটুকু মিল নাই ··

গল্পে-গল্পে ঘড়িতে একটা বাজিল। চন্দ্রা চমকিয়া উঠিল। কহিল—রাত একটা ··না, না, আর নয়! যান, শুতে যান্।

বিপুল বলিল—ঘুম পায়নি···

চন্দ্রা বলিল—আমার কিন্তু ঘুম পেয়েছে···

নিশ্বাস ফেলিয়া বিপুল বলিল—আপনি তা'হলে শুতে যান···

চন্দ্রা বলিল—আর আপনি?

বিপুল বলিল—এখানে জেগে ব'সে সমুদ্র আর আকাশ দেখে রাত কাটিয়ে দি। আমার জীবনের সঙ্গে ওদের অনেকখানি মিল আছে কি না···ওদের সুখ-দুঃখ, আমোদ-আহ্লাদ নেই যেমন···নিজেদের নিয়েই আছে চিরদিন···কারো লাভ-ক্ষতির পানে দৃষ্টি নেই···নিজেদের খেয়ালে চলেছে ত চলেছেই···আমারো তেমনি ·

কথাটা বলিয়া বিপুল হাসিল···

চন্দ্রা কোনো জবাব দিল না; উঠিয়া ধীর-পায়ে নিজের কেবিনে চলিয়া গেল।

পরের দিন। সকালে উঠিয়া কেবিন হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রা দেখে, ডেকের উপর ডেক-চেয়ারে পড়িয়া বিপুল···ঘুমাইতেছে!

চন্দ্রার পা যেন বাধিয়া গেল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্রা তার পানে চাহিয়া রহিল···

এত কর্ম্ম-উদ্দীপনার মাঝে থাকিলেও মুখ নিঃসঙ্গতার বেদনায় মলিন! কারবারে অনেক পয়সা রোজগার করে। ···কার জন্য? ইন্দ্রনাথের মুখে চন্দ্রা শুনিয়াছে তো··· চন্দ্রা যখনি অনুযোগ তুলিয়া বলিয়াছে, এত খাটো··· আমোদ-আহ্লাদে মন নেই···কেন এত করো? নিজেকে সকল সুখে বঞ্চিত রাখো কেন? হাসিয়া ইন্দ্রনাথ জবাব দিয়াছে,—যাদের ভালোবাসি, তাদের জন্য খাটি। এ-খাটায় যে-আমোদ পাই, খেলাধুলায় সে-আমোদ নেই চন্দ্রা··· সে কথা মনে পড়িল! এ ভদ্রলোক···স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, গৃহ নাই, সংসার নাই···কার জন্য এত ছুটাছুটি করেন?

চন্দ্রা নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কতক্ষণ···খেয়াল নাই!

রৌদ্র আসিয়া বিপুলের মুখে লাগিল। তার ঘুম গেল ভাঙ্গিয়া। ধড়মড়িয়া সে উঠিয়া বসিল। বসিবামাত্র দেখে, সামনে চন্দ্রা···

হাসিয়া বিপুল বলিল—সুপ্রভাত্!

চন্দ্রা বলিল—সুপ্রভাত্! এখানেই ব'সে ঘুমিয়েছেন···

বিপুল বলিল—ঘুমোইনি। ঘুম যেন দেশছাড়া হয়েছিল। কেবল আপনারই কথা ভেবেছি। ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা···you are really wonderful···

চন্দ্রার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এ-লোকটা ধীরে-ধীরে যেন তাকে কাছে টানিতেছে···যেন গ্রাস করিতে চায়! নহিলে চন্দ্রার মনেও এ-লোকটির চিন্তা···

নিজের উপর রাগ হইল। দু' দণ্ডের আলাপ···কোথাকার মানুষ···এ কি তার মনের খেয়াল!

চন্দ্রা কোনো জবাব দিল না।

বিপুল বলিল,—আপনি বেশ ঘুমিয়েছিলেন?

পরিহাস? চন্দ্রা বলিল,—কেন ঘুমোবো না, বলুন?

—তা নয়! তবে চোখ দেখে মনে হচ্ছে না, সুনিদ্রা হয়েছিল! এর মধ্যে টয়লেট হ'য়ে গেছে···বাঃ! এই তো চাই। সত্যি, কিছু মনে করবেন না···মেয়েদের আমি দেখতে চাই, সব সময়ে ফিট্···never clumsy or shabby. আপনাকে দেখে সেই কবিতা মনে পড়ছে,··· Dawnlike you come···celestial light thou!··

চন্দ্রা বলিল—সকালেই কাব্যালোচনা বন্ধ রেখে মুখ-হাত ধুয়ে নিলে ভালো হয়, বোধ হয়!

বিপুল বলিল—হবে'খন! এত তাড়া কিসের!··· বসবেন? আপনার আসন শূন্য পড়ে আছে···সে-আসন পূর্ণ করুন!

লোকটার কথায় কি যে আকর্ষণ!

চন্দ্রা ভাবিল, বেচারী! বনে জঙ্গলে থাকে…মানুষের সঙ্গ পায় না! চন্দ্রা বসিল।

মুখে কথা নাই। চন্দ্রা চাহিয়া রহিল সমুদ্রের পানে…ফেনিল উচ্ছল সেই তরঙ্গভঙ্গ…শুধু তার রঙ বদলাইয়া গিয়াছে। রাত্রে জ্যোৎস্নাধারা বুকে লইয়া যে-রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ দিনের আলোয় সে-রহস্য মুছিয়া সাগরের বুকে যেন কঠিন নির্ম্মমতা জাগিয়া উঠিয়াছে! এ-মূর্ত্তি দেখিয়া সাগরকে চিনিতে ভুল হয় না!

বিপুল বলিল—কি ভাবছেন?

চন্দ্রা বলিল—আপনার কালকের কথা। সত্যি, বলুন না, আমাকে কি রকম জেনেছেন?

—শুনে লাভ?

—না, মানে, আপনি এত জানেন…আপনার মুখে নিজের পরিচয়টুকু না হয় শুনতুম!…কেমন সে-পরিচয়…

কথাটা বলিয়া চন্দ্রা হাসিল…

সঙ্গে সঙ্গে মনের উপর কাঁটার চাবুক পড়িল।…এ কথা কেন বলিলি? উত্তরে কি কথা তুই শুনিতে চাস্?

বিপুল বলিল—কাল বুঝি ঐ চিন্তাই ক'রেছেন সারা-রাত?

বিপুলের চোখের দৃষ্টিতে যেন একগোছা ধারালো তীর!

চন্দ্রা শিহরিয়া উঠিল, বলিল,—না, না। রাত্রে ঘুমিয়েছিলুম। বললুম তো, ভয়ঙ্কর ঘুম পেয়েছিল। বিছানায় যেমন পড়া, অমনি ঘুম।

গম্ভীর কণ্ঠে বিপুল বলিল—হুঁ…

তার পর একটু থামিয়া বিপুল উঠিয়া পড়িল, বলিল,—নাঃ, আপনার কথা শোনা যাক। মুখ হাত ধুয়ে আসি। তার পর চা-পান…কি বলেন?

বিপুল গেল নিজের কেবিনে। চন্দ্রা বসিয়া রহিল…যেন পাথরের মূর্ত্তি।

সমুদ্রে জোয়ার আসিয়াছে…তার বুকের কলরোল অনেকখানি নিথর!

দুপুরবেলায় ডেক-চেয়ারে বসিয়া চন্দ্রা সোয়েটার বুনিতেছিল। দুলালের জন্য। ছেলের সাধ, মা তাকে সোয়েটার বুনিয়া দিবে! কলিকাতায় পছন্দ করিয়া উল কিনিয়া চন্দ্রা তাই নূতন প্যাটার্ণে সোয়েটার বুনিতেছে নামিয়াই তৈয়ারী সোয়েটার ছেলেকে দিবে…

পাশে ডেক-চেয়ারে বসিয়া বিপুল। বিপুলের কোলে একখানা ইংরেজী নভেল। দৃষ্টি নভেলের পাতায় নয়…রৌদ্র-প্লাবিত আকাশের পানে।

চন্দ্রা ভাবিতেছিল…অনেক কথা…

বিপুলকে তার ভালো লাগিয়াছে। দুনিয়ার বাহিরে এ এক নূতন পরিচয়! দু'দিনেই তাকে এমন চিনিয়াছে? বলিয়াছে, চন্দ্রাকে দেখাইতেছিল যেন Dawn! চমৎকার কথা! যেমন উজ্জ্বল দীপ্তি…তেমনি আবার সে-দীপ্তি অকলুষ, অমলিন! এমন কথা তাকে আর কেহ কখনো বলে নাই! না, কোনো দিন না! ইন্দ্রনাথও না।

মৃদু একটা নিশ্বাস পড়িল। তা'ছাড়া বিপুল বলিয়াছে, তার মন যেন নূতন ধাতুতে গড়া…এমন মন বাঙালীর ঘরের আর কোনো মেয়ের নয়! বিপুল নিশ্চয় জানে…অনেকের সঙ্গে মিশিয়াছে! অনেক দেখিয়াছে! কিন্তু বিপুল বলিল, বই পড়িয়া মেয়ে-জাতের পরিচয় লয় নাই…প্রত্যক্ষ পরিচয়! কাকে সে এমন করিয়া চিনিল?…নিশ্চয় দেখিয়াছে, চিনিয়াছে…নহিলে কি করিয়া তাকে চিনিল?

কথাটা মিথ্যা বলে নাই! চন্দ্রাও দেখিয়াছে চিরদিন…তার সঙ্গে অন্য কাহারো মিল নাই…তার মন সত্যই ভিন্ন ছাঁচে গড়া…সে-মনের কোথাও কুয়াশা নাই…ঝাপ্‌সা নাই…ধূলি-জঞ্জাল নাই…সেখানে চিরদিন বসন্ত-বাতাস! সেখানে শুধু আলো…অন্ধকারের ছায়া নাই! …ইন্দ্রনাথ এ-মনের পরিচয় লয় নাই! পরিচয় পায় নাই! অথচ ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সে আছে চিরদিন…ইন্দ্রনাথের ছায়ার মতো…না, এ লোকটি সত্যই অদ্ভুত!…দুনিয়ায় এমন লোক আছে, চন্দ্রা তা কোনো দিন কল্পনা করে নাই…

চন্দ্রা চাহিল বিপুলের পানে।…

আর একটা রাত্রি পাশাপাশি…তার পর পৃথিবীর বিশাল ভিড়ে কোথায় মিশিয়া অদৃশ্য হইবে!…ইচ্ছা করে, নিজের পরিচয় শুনিয়া লয়…

মৃদু হাস্যে চন্দ্রা বলিল,—কথা বন্ধ! কি ভাবছেন?

বিপুল একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল,—আপনার কথা। সত্যি, you are gloriously wonderful! আপনার মতো কোনো নারী আমার মনে কোনো দিন এতখানি চিন্তার সৃষ্টি করেনি! আপনাকে যত জানবার চেষ্টা করছি··· ততই···তবু আপনার অন্তরের রুদ্ধ দ্বারে প্রবেশ করতে পারিনি···যেটুকু জেনেছি, তা শুধু আপনার মনের বাইরেই দাঁড়িয়ে—আপনাকে দেখে···

নারীর মনে চিরদিনের সেই বিজয়-বাসনা···

চন্দ্রা বলিল,—অন্তরে প্রবেশ করবার মন্ত্র জানা চাই মিষ্টার সেন। দোরে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি মানুষ দোর খোলা পায়? সেই আলিবাবার গল্প জানেন তো···গুহায় ঢোকবার মন্ত্র সে জেনেছিল···open sesame···

কথাগুলা নিজের কাণ দিয়া মনে গিয়া লাগিল যেন আগুনের হল্কার মতো! সে হল্কায় দারুণ দাহ! তখনি সবলে মনকে পা দিয়া চাপিয়া-ধরিয়া চন্দ্রা বলিল,—না, এ-সব কথা নয়। এ হলো পাগলের কথা! তার চেয়ে···

সে থামিয়া বলিল,—বলুন আপনার কথা···রেঙ্গুনে দু'দিন থেকে কোন্ বনে যাবেন, বলছিলেন! সে-বনে জানোয়ার আছে···শিকার করবেন?

বিপুল কহিল,—জঙ্গল চিরদিন আছে, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী। জঙ্গলের কথা নয়। আপনার কথা বলি··· এই passing fantasy আমার জীবনে রঙীন স্বপ্ন হ'য়ে থাকবে কাল-থেকে। আমার কি মনে হচ্ছে, জানেন? আরো কিছু দিন আগে যদি আপনার সঙ্গে পরিচয় হতো!

মনের দুর্ব্বল জায়গায় এ-কথা আবার আঘাত দিল। ···এ-কথায় কি মোহ!

চন্দ্রা বলিল,—তা'হলে কি হতো?

কথাটা বলিয়া ভয়ে সে কাঁটা হইয়া রহিল। যে-কথায় ভয় হয়···বারে-বারে সেই কথাই খোঁচাইয়া তুলিতেছে! এ তার কি হইয়াছে?

কি হইয়াছে, নিজে বুঝিতে পারিল না·· তবু উৎকর্ণ রহিল উত্তরের প্রতীক্ষায়।

বিপুল বলিল,—তা'হলে আমার পৃথিবীটাই যেতো বদলে! হয় তো আমি আর এক-রকমের মানুষ হতুম ··

চন্দ্রার বুকের মধ্যে একসঙ্গে হাজার বোমা ফাটিয়া গেল! ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মন ভরিয়া গেল···চোখের সামনে ধোঁয়ার রাশি!···মনে হইল, তাহার জীবন যেন শেষ হইয়া গিয়াছে ··

এবং আর-এক জন চন্দ্রা যেন বিপুলের কথার জবাব দিল। সে-চন্দ্রা বলিল,—আমার স্বামী আছেন, মিষ্টার সেন···আমার ছেলে···বারো বছরের ছেলে।

বিপুল বলিল,—না, আপনার কেউ নেই···কেউ থাকতে পারে না! আপনি শুধু চন্দ্রা দেবী। আপনি একা আছেন ···আপনি যেন কবির সেই উর্ব্বশী! নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী···

আকাশের রৌদ্র লজ্জায় যেন মরিয়া গেল! চন্দ্রার চোখের সামনে অন্ধকারের মলিন ছায়া···

শিহরিয়া চন্দ্রা বলিল,—ছি ছি মিষ্টার সেন, এ-সব কি বলছেন!

বিপুল বলিল,—জানেন এ-সব ফাঁকির মিথ্যা একটা লৌকিক বন্ধন শুধু। কে স্বামী? কে ছেলে?···শাস্ত্রের বাঁধা বুলি! চেয়ে দেখুন ঐ অবাধ মুক্ত আকাশের পানে··· ঐ সমুদ্রের পানে···পৃথিবী ওদের চেয়ে বড়···ঢের বড়! উদার পৃথিবীতে ছোট্ট একটু গণ্ডী টেনে তার মধ্যে নিজেকে এমন বন্দী ক'রে রাখবেন?···এরি জন্য জন্ম নিয়েছেন? না···

উচ্ছ্বসিত বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল চাপিয়া ধরিল চন্দ্রার একখানা হাত···

চন্দ্রার সমস্ত দেহ-মন কাঁপিয়া উঠিল···হাত ছাড়াইয়া চারিদিকে ভীত দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া চন্দ্রা বলিল,—ছি ছি···কি করেন! পাঁচ জনে কি বলবে?

বিপুল বলিল,—সংসার! সংসার! এত দিন তো সংসারের দাস্য ক'রলেন! কি পেয়েছেন? দেহ-মনকে কতখানি আরো ছড়িয়ে দিতে পারতেন, ভাবুন তো! পৃথিবীর সব যে অজানা রয়ে গেল। পৃথিবীকে ভালো ক'রে দেখবেন না? জানবেন না? মনটাকে এমন ক'রে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলবেন বন্ধনের চাপে?···

চন্দ্রা যেন আর নাই! এ যেন আর কে সেখানে বসিয়া বিপুলের কথা শুনিতেছে!

কথা শুনিয়া চন্দ্রার মনে হইল,···যেন তার চোখের সামনে ঘর বাড়ী লোকজন···কেহ নাই, কিছু নাই! সীমাহীন প্রান্তরের মতো বিরাট পৃথিবী পড়িয়া খাঁ-খাঁ

করিতেছে! আর সেই প্রান্তর-পথে চন্দ্রা চলিয়াছে…পাশে ওই বিপুল সেন! পিছনে কেহ ডাকে না—আশে-পাশে কেহ ডাকে না! যেন তার কোনো দায় নাই, কর্ত্তব্য নাই, কিছু নাই! সে চলিয়াছে…চলিয়াছে…মন শুধু বার-বার অধীর প্রশ্ন তুলিতেছিল—কোথায়? কোথায়? সে-প্রশ্নের জবাব মিলে না…তবু চলিয়াছে…চলিয়াছে! এ-চলার শেষ নাই…চলিতে ক্লান্তি নাই!

বিপুল বলিল—না…আমি আপনাকে বাঁচাতে চাই… আপনি আর পাঁচ জনের মতো নন্। নন্ ব'লেই আমার এ ব্যাকুলতা! এত দিন স্বামী-পুত্রের মুখ চেয়ে বেঁচেছেন… এবার নিজের মুখ চেয়ে বাঁচুন!…শুধু আপনার একটা কথার ওয়াস্তা! একবার বলুন, হ্যাঁ!…ছোট্ট রেঙ্গুন! তার সাধ্য নয়, আপনাকে বেঁধে রাখে! সামনে চেয়ে দেখুন—চায়না, জাপান, মাঞ্চুরিয়া, রাশিয়া, আর্কটিক-রিজন্‌স্…

চন্দ্রা কোনো কথা বলিল না…তার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া প্রবল শিহরণ! মনটা মরিয়া পাথরের মতো ভারী…

সমুদ্র যেন তার সমস্ত তরঙ্গ লইয়া চন্দ্রার বুকের মধ্যে প্রবেশ করিতে চায়!…

চন্দ্রা আর পারে না!

যন্ত্র-চালিতের মতো উঠিয়া টলিতে টলিতে নিজের কেবিনে আসিল। কেবিনের দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানায় দেহ লুটাইয়া দিল!

চোখের সামনে অশ্রুর বাষ্পে সব মিলিয়া-মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল! জাহাজখানা…মনে হইল, জলের তলায় চলিয়াছে!

সন্ধ্যার পর চন্দ্রার ঘুম ভাঙ্গিল। জাগিয়া উঠিয়া বসিল। ভাবিল, ভাগ্যে ঘুম আসিয়াছিল! নহিলে কি যে করিত…

জাহাজ দুলিতেছে!…বুঝিল, না, জাহাজ তবে ডুবিয়া যায় নাই! চলিয়াছে…

এ সেই জাহাজ…এ-জাহাজে আছে চন্দ্রা…আর আছে ঐ বিপুল সেন…বিপুল সেনের সেই ধারালো চোখ, ধারালো মুখ! ধারালো মুখে সেই আরো ধারালো কথা …মুক্তির বাণী!

কেবিনেও থাকা যায় না! কে যেন গলা চাপিয়া ধরে!

দ্বার খুলিয়া চন্দ্রা ডেকে আসিল।…

ডেকচেয়ার পড়িয়া আছে…বিপুল নাই! চন্দ্রা স্বস্তি বোধ করিল।

আসিয়া রেলিঙের ধারে দাঁড়াইল!…আকাশে আবার সেই চাঁদ…সাগরের বুকে আবার সেই তরঙ্গ। ভয়ে চন্দ্রার বুক কাঁপিয়া উঠিল…

নিশ্বাস রোধ করিতে পারিল না। বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে মনে হইল, এ সেই পৃথিবী! সে-সব কথায় এ-পৃথিবীর কোথাও তো এতটুকু চিড় খায় নাই! পৃথিবীর চেহারা কোথাও এতটুকু বদলায় নাই তো!

পাশে কাণের কাছে সেই মৃদু স্বর—কিছু ঠিক ক'রলেন?

চন্দ্রা চাহিল বিপুলের পানে।

চন্দ্রা বলিল,—কিসের কি ঠিক করবো?

বিপুল বলিল—আর এই একটি রাত! তার পর…

চন্দ্রার চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল! চন্দ্রা কোনো জবাব দিল না…দূরে সরিয়া গেল।

চাঁদ আসিয়া বসিল আকাশের বুকের উপর। আর এই রাত্রিটুকু!…আঃ…এ রাত্রি কি পোহাইবে না?

অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রা ফিরিয়া চাহিল…বিপুল কাছে আসিয়াছে…তাহারি পানে চাহিয়া আছে।

বিপুল বলিল—রাগ করেছেন?

মনের কি যে বিমূঢ়তা…চন্দ্রা বলিল—না।

বিপুল বলিল—আমার কথা আপনার মনে থাকবে?

কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল…চন্দ্রা কোনো কথা বলিল না।

বিপুল বলিল—ভুলে যাবেন না আমাকে? বলুন…

জ্বালাতন! কঠিন-স্বরে চন্দ্রা বলিল—না।

—মনে থাকবে তা'হলে?

আঃ! তবু মুক্তি নাই? চন্দ্রা কহিল—থাকবে।

তার পর দু'জনেই চুপ…

বহুক্ষণ পরে বিপুল কথা কহিল; বলিল,—কি ভাবছেন?

চন্দ্রা বলিল—আমার নিজের কথা…

—কি…বলবেন?

চন্দ্রা বলিল—ভাবছিলুম, কি দিয়ে ভগবান এই মেয়ে-জাতটার সৃষ্টি করেছিলেন!

বিপুল কহিল—আপনাকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন …তা শুধু মায়া…মোহ…আবেশ! সত্যি, আপনার উপর আমার জীবন কতখানি নির্ভর করছে…

চন্দ্রা কথা কহিল না!

বিপুল সেন বলিল,—আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে বুঝেছি, আমি কতখানি নিঃস্ব, কতখানি দুর্ভাগা! এতকাল শুধু মরীচিকার পিছনে ছুটেছি…

বিপুল সেন নিশ্বাস ফেলিল। সে-নিশ্বাসে মমতার রুদ্ধ নির্ঝর খুলিয়া গেল।

বিপুল সেন বলিল—আগে যদি আপনার সঙ্গে দেখা হতো…মনে হয়, ঠিক পথে চলতে পারতুম! এখনো পারি…আপনি যদি…

চন্দ্রা বলিল—ও-সব কথা বলবেন না মিষ্টার সেন।

তার দু'চোখে একরাশ বাষ্প…

বিপুল সেন বলিল—সংসারে নিজেদের আপনারা এমন ক'রে বিসর্জ্জন দ্যান সব প্রীতি-মায়া-স্নেহ এমন নিঃশেষে ঢেলে দেন যে, দুঃখী-আতুর বাইরে এসে কোনো দিন হাত পেতে যদি ভিক্ষা চায়…তার প্রাণখানা যদি ভেঙ্গে যায়…তবু তার উপর একবিন্দু মমতা বর্ষণ করবেন না!…এমন নিষ্ঠুর নির্ম্মম কি ক'রে হন?

বিপুল সেন নিশ্বাস ফেলিল, আবার বলিল,—সত্যি আপনারা পরের দুঃখ বোঝেন না?

কে যেন কাহাকে কি বলিতেছে! চন্দ্রা স্থির অবিচল…

কোনো কথা বলিল না। বিপুলের কথাগুলা সাপের মতো তার দেহ-মনকে ঘিরিয়া জড়াইয়া কষিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে চায়! এ বন্ধন হইতে মুক্তির যেন উপায় নাই!

বিপুল সেন বলিল—আমরা আপনাদের দেখি…অন্য লোকের কথা জানি না…তবে আপনি আমার সামনে উদয় হয়েছেন কি রহস্য নিয়ে…যেন আপনি নারী নন্! মানুষ নন…আপনি যেন আমার জীবনে…কি বলবো?… তবু, বিবাহ-বন্ধনে নিজেকে বেঁধে অপরের হাতে ছেড়ে দ্যান্ এমনভাবে যে, তার ইঙ্গিতে আপনার চলা-ফেরা, চিন্তা-করা পর্য্যন্ত চলবে? একে দাস্য বলে। এ-দাস্যে আপনার এতটুকু ত্রুটি হ'লে নিগ্রহ ভোগ করতে হবে, শাস্তি পেতে হবে। নারীর জীবন কি এই?…

চন্দ্রার বুকের উপর নানা চিন্তা, নানা কথা জমিয়া পাহাড় রচিয়া তুলিয়াছিল…কোথা হইতে কে সে পাহাড়ে সবলে যেন আঘাত করিল…পাহাড় গেল চূর্ণ হইয়া…চন্দ্রা স্বস্তি বোধ করিল।

চন্দ্রা বলিল—দাস্য নয়, মিষ্টার সেন। বিবাহে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনকে দু'জনে দেয় মনের অখণ্ড বিশ্বাস! যে-স্বামী স্ত্রীর চৌকিদারী ক'রে বেড়ায়, সে স্বামীর উপর স্ত্রীর মনে কি-ভাব জাগে, জানি না। কিন্তু আমার স্বামী… আমাকে একা ছেড়ে দেছেন অজানা পৃথিবীর বুকে। কেন দেছেন?…তাঁর মনে এ-বিশ্বাস আছে, যাকে নিয়ে তিনি ঘর বেঁধেছেন, আশ্রয়-নীড় রচনা করেছেন, সে তাঁরই থাকবে…দেহ-মন দিয়ে সে-স্ত্রী তাঁর সে-বিশ্বাস রক্ষা ক'রবে! স্ত্রীর উপর এ বিশ্বাস তাঁর আছে। স্বামীর উপরেও স্ত্রী এ-বিশ্বাস রাখে।…আপনার কথা আমি ভেবেছি…সব ছেড়ে পথে যেতে বলছেন আপনার সঙ্গে। যদি যাই…আমাকে আপনার বিশ্বাস হবে কেন? পথে যদি আর-কেউ আমাকে ডাকে?…আপনাকে ছেড়ে তার সঙ্গে আমি চলে যাবো না, এ বিশ্বাস কি ক'রে আপনি রাখবেন? একবার যে এক জনের বিশ্বাস ভাঙ্গতে পারে, ঘরে-বাইরে কোথাও তাকে কেউ বিশ্বাস ক'রতে পারে না, মিষ্টার সেন! আমি অনেক ভেবে দেখেছি…যে-স্বাধীনতার কথা বলছেন, সে-স্বাধীনতার মানে,-যখন যা খুশী হবে, তাই করবো, তা নয়!

কথাগুলা তপ্ত মনের উপর যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলাইতে-ছিল…

বিপুল যেন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া এ-কথা শুনিল…কোনো জবাব দিল না।

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া ন'টা বাজিল। চন্দ্রা বলিল,—পাগলামি ক'রবেন না…আমাকে আপনি বলেছেন wonderful…আমিও আপনাকে বলছি, you are also wonderful! অন্য লোক হ'লে এ-অবস্থায় হয় তো আমার অপমান করতো…আপনি সে-লোক নন। এজন্য

…আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা অনেকখানি…শুনুন আমার কথা…এ চিন্তা ত্যাগ করুন। ··আসুন দিকিন্, বড্ড খিদে পেয়েছে আমার ·· please, to give me company. খেতে যাবো…আপনি আসুন।

আহার শেষ হইলে চন্দ্রা বলিল—এখন্ কি ক'রবেন ?

বিপুল বলিল—বলুন…

—গল্প ?

—বেশ…

চন্দ্রা বলিল—না। কাল রাত্রে ঘুমোন্নি…ঘুমোতে যান। চলুন, আমি আপনাকে কেবিনে পৌছে দিয়ে আসি…

বিপুল যেন মন্ত্র-চালিত…

বিপুলের বিছানা ঝাড়িয়া সাফ করিয়া দিয়া চন্দ্রা বলিল—নিন, শুয়ে পড়ুন···নিশ্চয় ঘুমোবেন। না'হলে আমি ভয়ানক রাগ করবো · বুঝলেন ?

বিপুল মৃদু হাসিল…কহিল—বেশ…

বিছানায় বসিয়া বিপুল ভাবিতেছিল, শিকার করিতে গিয়া দেখিয়াছে, সব পশুকে শিকার করা চলে না। এমন পশুও আছে···

তেমনি…

…কিন্তু ঘর-সংসার···তার এত মায়া ? ও ঘর-সংসারে কি আছে ? শুধুই বন্ধন…শুধুই দায়…

আশ্চর্য্য !

কেবিনের বিছানায় চন্দ্রা শুইয়া আছে…

চোখে ঘুম নাই! ভাবিতেছিল, মনে এত কিসের দুশ্চিন্তা জাগাইয়া তুলিয়াছিলাম ? চিন্তার কি ছিল ?…আশ্চর্য্য !

—ইন্দ্রনাথ ··দুলাল…

চন্দ্রা উঠিয়া ট্রাঙ্ক খুলিল…ছবি বাহির করিল। ইন্দ্রনাথের ফটো…দুলালের ফটো…

দুটি মুখে কি স্নেহ…হাসির কি নিশ্চিন্ত দীপ্তি…

ছবি দু'খানিকে বুকে চাপিয়া ধরিল…চোখের কোণে অশ্রু ঠেলিয়া আসিল !…

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভোরের আলো সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিবার আগে…

চন্দ্রা কেবিন হইতে বাহিরে আসিল ··

আসিয়া দেখে, সাগর নয়, নদী। ইরাবতী নদী। দুই তীরে বসতির আভাস ! জাহাজ চলিয়াছে। ডেকে দাঁড়াইয়া আছে বিপুল সেন।

চন্দ্রাকে দেখিয়া বিপুল বলিল,—সুপ্রভাত…

চন্দ্রা বলিল—সুপ্রভাত···

বিপুল বলিল—ঐ দেখা যাচ্ছে রেঙ্গুনের আকাশ… তার পর ঐ সব বাড়ী-ঘর !

দিক্‌চক্ররেখার পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রা বলিল—ওরি মধ্যে একটি ঘর·· আমার !

সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা নিশ্বাস !

বিপুল চাহিল চন্দ্রার পানে…

চন্দ্রার দু'চোখে সজল দৃষ্টি···সে দৃষ্টি রেঙ্গুনের দিকে নিবদ্ধ ! সে-চোখের দৃষ্টিতে মায়ার সুনিবিড় আবেশ !

বিপুল সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল !…আজিকার প্রভাতে চন্দ্রার চোখের দৃষ্টিতে এ এক নূতন দীপ্তি !…এ-দীপ্তি আরো উজ্জ্বল · আরো মধুর !

তীরভূমি ক্রমে অস্পষ্ট আব্‌ছায়ার ঘোর কাটাইয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল · দূরে ঐ কত-কত জাহাজ… নৌকা…চিমনী···ঘর-বাড়ী …পথ … গাড়ী ·· লোক-জন ! অস্পষ্ট গুঞ্জন ক্রমে সুস্পষ্ট কলরবে জাগিয়া উদ্দাম উত্তাল…

চন্দ্রার মনে পুলকের উচ্ছ্বাস…

চন্দ্রা ডাকিল—মিষ্টার সেন…

বিপুল বলিল—Yes মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী…

বিপুলের স্বর মৃদু…

চন্দ্রা বলিল—একটি request…আপনাকে তা রাখতে হবে ··

—বলুন…

চন্দ্রা বলিল—যদি আমাদের ওখানে গিয়ে ওঠেন… অসুবিধা হবে ?

নিরুত্তরে বিপুল চাহিয়া রহিল চন্দ্রার পানে…

ষ্টীমার বাঁশী দিল…তীব্র তীক্ষ্ণ ধ্বনি !…

চন্দ্রার চোখে সহসা মেঘের মলিন ছায়া…বিপুল তা লক্ষ্য করিল।

বলিল—গেলে আপনি খুশী হবেন ?

—শুধু আমি নই…আমার স্বামী…ছেলে দুলাল ‥

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিপুল বলিল—বেশ। To please you I could do all…what you say.

চন্দ্রা বলিল,—Thank you that's like a good boy !…তাহ'লে আসছেন ?

বিপুল বলিল,—কি পরিচয় দেবেন ?

চন্দ্রা বলিল,—বলবো, a friend…a gentleman… good and charming…

ঐ দেখা যায় জেটি …চন্দ্রার দৃষ্টি জেটির দিকে…

ঐ যে…ইন্দ্রনাথ…দুলাল !

বিপুলের হাতখানা আবেগ-ভরে চাপিয়া ধরিয়া চন্দ্রা বলিল,—ঐ উনি…গ্রে-স্যুট্ পরা…তাঁর পাশে দুলাল… শার্ট আর শর্ট পরা…! ওঃ! ওরা বোধ হয় রাত্রে ঘুমোয় নি…কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে ?…দেখুন তো পাগলামি…যদি দেরীই হ'তো কি হ'তো তাতে ?… একটুতেই অস্থির হন্ ওই ওঁর দোষ !…

বিপুল নিঃশব্দে শুনিতেছিল…

চন্দ্রা বলিল,—লগেজগুলো…তাই তো বইগুলো নীচে পড়ে আছে…বিছানা-পত্তর…যান, যান…আসছেন আমাদের ওখানে ?

কথা শেষ হইল না। চন্দ্রা ছুটিল কেবিনে…

বিপুল সেন দাঁড়াইয়া রহিল‥ তেমনি নিশ্চল… নিস্পন্দ ! ‥

তীক্ষ্ণ বাঁশী বাজাইয়া জাহাজের এঞ্জিন থামিল। তীরে লোকজনের বিরাট অট্টরোল……

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

চির নারী

নর নই, নর নই, নর নই আমি—
নারী আমি, নারী আমি, তুমি মোর স্বামী।
পুরুষের বেশ ধরি
নিজেরে আড়াল করি
জনম-জনম ফিরি তোমারি লাগিয়া
বক্ষে মোর চির নারী রয়েছে জাগিয়া।

পৌরুষের অভিমান সে ত' মিছে ছল
সত্য মোর মর্ম্মকোষে নারী-আঁখিজল।
এ আমার বার বার
শুধু তব অভিসার
পথ চেয়ে আসা-যাওয়া শ্যামা ধরণীতে
যদি দেখা পাই কভু খুঁজিতে খুঁজিতে।

দাস নই, দাস নই, দাস নই তব—
অনাদি অনন্ত কাল দাসী হ'য়ে রব'।
দাসত্বের অভিলাষী
কখন' কি হয় দাসী ?
শুধু মান অভিমানে—শুধু আঁখিজলে
তোমারে ভুলাব আমি রমণীর ছলে।

সৎ নই, সৎ নই, সতী আমি সতী—
ভালো-মন্দ যাহা থাক, সুমতি-কুমতি
তোমার বিরহে হিয়া—
বারে বারে ব্যাকুলিয়া
উঠে মোর জীবনের রেণুতে রেণুতে,
পরাণ উতলি উঠে তোমার বেণুতে।

শ্রীঅনাথবন্ধু সেনগুপ্ত (বি এল)।

সমর বিভাগে ভারতের দান

(আলোচনা)

লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল সার ফ্রেডারিক ও'কোনর ভারতে আসিয়া দীর্ঘকাল সমর-বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; পরে তিনি তিব্বতে, পারস্যে, ও নেপালে পররাষ্ট্র বিভাগের কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি লণ্ডনের 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোশিয়েসনে' সমর বিভাগে ভারতের দান সম্বন্ধে যে সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার সার-সঙ্কলন প্রকাশিত হইল।

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ভারত বৃটিশ সরকার ও মিত্রশক্তি-সমূহকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিল; তন্মধ্যে সৈন্য দ্বারা যে সাহায্য করিয়াছিল, সার ফ্রেডারিক সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ভারতের আকার ও জনসংখ্যার তুলনায়, শান্তির সময় সে যে সকল সৈন্য পোষণ করে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প—দেড় লক্ষ মাত্র; তবে এই সকল সৈন্য ব্যতীত ভারতে বৃটিশ সৈন্যও সংরক্ষিত আছে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে ভারতের সমরনিপুণ জাতিসমূহ হইতে ইহার বহু গুণ অধিক সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় প্রায় পনের লক্ষ ভারতীয় সৈন্য সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল; সুতরাং সমর বিভাগের কার্য্যে যোগদানের জন্য আগ্রহবান উপযুক্ত সৈনিকের অভাব হয় না। সম্প্রতি ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। নূতন নূতন সামরিক কর্ম্মচারী সংগৃহীত হইয়াছে; এবং ভারত হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—সহস্র সহস্র লোক সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইতেছে, এবং তাহাদের নামের তালিকাও প্রস্তুত হইতেছে। প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে সৈন্যদলে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইবে। প্রার্থীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে তাহাদিগকে চাকরী দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন, স্বেচ্ছাসৈনিকের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক; তাহারা সৈনিকের কার্য্যে যোগদানের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। প্রয়োজন হইলেই তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে। ভারতীয় টেরিটোরিয়াল সৈন্যদলের পাঁচটি নূতন ব্যাটেলিয়ন সংগঠিত হইয়াছে।

বিগত যুদ্ধের সময় ভারত বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল যুদ্ধোপকরণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিল, তাহাদের মূল্য ধরা হইয়াছিল আট কোটি পাউণ্ড। এতদ্ভিন্ন, যে সকল কাঁচা-মাল প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের পরিমাণও অত্যন্ত অধিক। এই যুদ্ধের পর হইতে ভারতে কাঁচা-মাল উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিনই প্রচুর বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এ-পর্য্যন্ত ঢালা-লোহা উৎপাদনের পরিমাণ আট গুণ, এবং ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ত্রিশ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের জন্য যে সকল ধাতুর প্রয়োজন, তাহাও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে দশ লক্ষাধিক টন ম্যাঙ্গানিজ ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন, ক্রোমাইট এবং উচ্চ শ্রেণীর অভ্রের রপ্তানীর পরিমাণও অল্প নহে। সমরোপকরণ এবং এরোপ্লেন-নির্ম্মাণের পক্ষে এই সকল দ্রব্য অপরিহার্য্য। ভারতে কামান ও গোলা-গুলী নির্ম্মাণের কারখানাগুলির আকারও বিস্তৃততর করা হইয়াছে, এবং এই সকল কারখানায় প্রচুর পরিমাণে সমরোপকরণ নির্ম্মিত হইয়া বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যগণের ব্যবহারের জন্য সাগর পারে প্রেরিত হইতেছে।

যুদ্ধের সময় পাটনির্ম্মিত দ্রব্যের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। পাট ভারতেরই একচেটে সম্পদ। ভারত বর্ত্তমান যুদ্ধে পাটজাত দ্রব্য কি পরিমাণে সরবরাহ করিতেছে, তাহা শুনিলে বিস্ময় জন্মে! বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর প্রথম তের সপ্তাহে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পাটজাত দ্রব্যের ফরমায়েস পাওয়া গিয়াছে; ৭১ কোটি ৩০ লক্ষ বালির বস্তা (sand-bags) ইহার অন্তর্ভূত। প্রয়োজনানুসারে ভারত হইতে প্রতিমাসে এইরূপ দশ লক্ষ থলি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইবে। এতদ্ভিন্ন, ভারতে প্রচুর পরিমাণে খাকি, ড্রিল, কার্পাস-বস্ত্র, কম্বল, ও পশমী বস্ত্রাদিরও বরাত দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে, মোটর-কার, জাহাজ, এরোপ্লেন, রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য ভিন্ন ভারতে উৎপাদিত প্রচুর সমরোপকরণ, ও কাঁচা মাল কেবল যে ভারতেরই ব্যবহারে লাগিতেছে এরূপ নহে, ভারত নিজের অভাব পূরণ করিয়া তাহা প্রচুর পরিমাণে গ্রেটবৃটেন এবং মিত্র-শক্তির সাহায্যের জন্যও প্রেরণ করিতেছে। ইহাতে সাম্রাজ্যের নিকট তাহাদের সামরিক মূল্য (military value) বিপুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী ভারত হইতে প্রচুর তৈলশস্য, বাদাম, নারিকেল প্রভৃতির তেল, খৈল, ক্রোমাইট, অভ্র, রবার, চর্ম্ম ক্রয় করিয়া অভাব মোচন করিতেছিল; কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পর তাহাকে এই সকল কাঁচামালে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

বিগত যুদ্ধে ভারতীয় রাজন্যবর্গ যে-ভাবে বৃটিশ সরকার ও মিত্রশক্তিবর্গকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর! ভারতে রাজন্যবর্গের সংখ্যা কয়েক শত হইলেও কাহারও কাহারও রাজ্য য়ুরোপের কোন কোন দেশ অপেক্ষাও বৃহৎ। ভারতের হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর এই উভয় রাজ্যের প্রত্যেকটি আকারে ইংলণ্ড অপেক্ষা দেড়গুণ বৃহৎ। বস্তুতঃ, ভারতীয় রাজন্যবর্গ সমগ্র ভারতের এক তৃতীয়াংশের অধিকারী, এবং এই সকল রাজ্যের জনসংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় নয় কোটি, অর্থাৎ সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই সকল রাজ্যের শাসকগণ গ্রেট বৃটেন ও তাহার মিত্রশক্তি সমূহকে ধন, জন এবং বহুবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধেও তাঁহাদের রাজভক্তি

ও সহযোগিতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এবারও ভারতের তিন শতাধিক রাজন্য অর্থ ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন, ইংরেজ বিপন্ন হইলে ভারতে তাঁহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইবে।

ভারতের বিভিন্ন করদ বা মিত্র রাজ্য যে সকল সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, স্বতন্ত্রভাবে তাহার তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব নহে; এজন্য এখানে কয়েকটি প্রধান রাজ্য হইতে প্রেরিত সাহায্যের পরিচয় দেওয়া গেল। দক্ষিণাপথের হায়দরাবাদ রাজ্যের পরিমাণ-ফল ৮৩ হাজার বর্গ মাইল, এবং ইহার জনসংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষেরও অধিক। এই রাজ্যের শাসনকর্তা মুসলমান হইলেও অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু। হায়দরাবাদপতি নিজাম এবার তাঁহার রাজ্যের সৈন্যসমূহ বৃটেনের হস্তে অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন; তদ্ভিন্ন, তাঁহার এরোপ্লেনের বহরও বৃটিশ উড়ো-বহরের সাহায্যের জন্য প্রেরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ভারতে ক্ষাত্রশক্তির নিদর্শন বিকানীরের মহারাজা বিগত যুদ্ধে যোগদান করিয়া স্বয়ং তাঁহার সৈন্যমণ্ডলীর পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবারও তিনি ছয় ব্যাটেলিয়ন পদাতিক সৈন্য, এবং তাঁহার উষ্ট্রসাদী দ্বারা সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন। এবার তাঁহার শেষোক্ত সৈন্যের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এবারও তিনি স্বয়ং যুদ্ধে যোগদানের সংকল্প করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন, তাঁহার জীবিতাবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকেও এই যুদ্ধে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। কাশ্মীর রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা মুসলমান হইলেও এই রাজ্যের নরপতি হিন্দু। তিনি দুই দল পদাতিক সৈন্য, এবং এক দফা 'মাউণ্টেন-ব্যাটারী' প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রামপুর, ভূপাল, এবং ভাওয়ালপুর রাজ্যের নৃপতিগণ মোটর এম্ব্যুলান্স দ্বারা সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। পূর্ব্ব-ভারতীয় রাজন্যবৃন্দও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন। ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থান হইতেই, এমন কি, উত্তরে শিকিম হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের চিত্রল ও গিলগিট এজেন্সী—সকল স্থানের রাজন্যবর্গ, এবং পঞ্জাব, রাজপুতানা, ও দক্ষিণভারতস্থ বিভিন্ন রাজ্যের পরিচালকগণ নানাভাবে সাহায্য করিয়া নিজেরাও যুদ্ধে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতীয় রাজন্যবর্গ যে পরিমাণ অর্থদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের উদারতার পরিচায়ক। হায়দরাবাদের নিজাম যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার প্রেরিত সৈন্যগণের ব্যয়ভার স্বয়ং বহনের জন্য মাসিক ১১ হাজার ২ শত পাউণ্ড আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবেন। ইন্দোরের মহারাজা মাসিক ৩৮ হাজার পাউণ্ড, বিকানীরের মহারাজা মাসিক ১১ হাজার পাউণ্ড, এবং ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা মাসিক ৪৫ হাজার পাউণ্ড সাহায্য পাঠাইবেন। নৌনগরের জাম সাহেব তাঁহার রাজ্যের বার্ষিক আয়ের দশমাংশ প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অন্যান্য রাজগণও সাধ্যানুসারে সাহায্য করেন। গত ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গ-প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৩১ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল; এতদ্ভিন্ন, এককালীন দানের পরিমাণ এক লক্ষ পাঁচ হাজার পাউণ্ড হইলেও তাহাই শেষ নহে। সাম্রাজ্যের বিপদে ভারতীয় রাজন্যবর্গের এই প্রকার সহায়তা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের প্রজাবর্গ, এমন কি, তাঁহাদের রাজ্যসীমার বাহিরের অধিবাসীবর্গও যে এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে।

ভারতীয় করদ ও মিত্র রাজগণের সহিত নেপালের মহারাজার তুলনা চলিতে পারে না; কারণ নেপাল, হায়দরাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতির ন্যায় ইংরেজের আশ্রিত রাজ্য নহে; নেপাল সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য, এবং এই রাজ্যের গুর্খা সৈন্য ভারতীয় সৈন্যগণের অগ্রগণ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নেপালের রাজাও যেমন স্বাধীন, তাঁহার রাজ্যের শাসনপ্রণালীও সেইরূপ বৃটিশ ভারতের শাসনপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বাধীন নেপাল-রাজ ইচ্ছা করিলে জার্ম্মাণীর সহিত ইংরেজের যুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য না করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত থাকিতে পারিতেন; এজন্য কাহারও নিকট তিনি জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধে নেপাল মিত্র-শক্তিকে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং এবারও যেরূপ সাহায্য-দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিলে যুদ্ধে ভারতের সাহায্যদানের প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; কারণ, স্বাধীন নেপাল বৃটিশ ভারতের সীমান্তে অবস্থিত হইলেও ভারতেরই অংশ। নেপাল-রাজ স্বেচ্ছায় ২০ হাজার গুর্খা সৈন্য ভারত-রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; ইহারা ২০টি গুর্খা ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত।

এই সকল সমরকুশল নির্ভীক গুর্খা সৈন্য এক শতাব্দীরও অধিক কাল হইতে বৃটিশ সৈন্যের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শত শত যুদ্ধে যে অসীম শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহা উপকথা-বর্ণিত বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ন্যায় বিস্ময়াবহ! নেপালরাজ বৃটিশ ভারতে ইংরেজকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল সৈন্য নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহাদের বাদ দিলেও নেপালের নিজের যে গুর্খা-বাহিনী আছে, তাহারা রণনিপুণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ, এবং সুপরিচালিত; যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের সাহস, বীরত্ব এবং ত্যাগের তুলনা নাই। বিগত মহাযুদ্ধ যে দিন বিঘোষিত হইয়াছিল, সেই দিনই নেপালের তদানীন্তন মন্ত্রী-মহারাজ সার চন্দ্র সমসের জঙ্গ তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি সম্রাটের কার্য্যে ন্যস্ত করিয়াছিলেন; এবং যে সকল গুর্খা সৈন্য ভারতীয় সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যত দিন যুদ্ধ চলিয়াছিল, তত দিন তিনি তাহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন, মিত্রশক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য দুই লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যে ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসী-সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের অধিক নহে, সেই রাজ্যের পক্ষে মিত্রশক্তির সাহায্যের জন্য দুই লক্ষ সমরকুশল কর্তব্যনিষ্ঠ সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণ বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

নেপালের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী—সার চন্দ্র সমসেরের ভ্রাতা, এবং তাঁহার পদেরও উত্তরাধিকারী। তিনি—সার যোধ সমসের জঙ্গ তাঁহার ভ্রাতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধেও বৃটিশ জাতিকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এবং আট হাজার নেপালী সৈন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সার বাহাদুর সমসের জঙ্গের নেতৃত্বে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, নেপাল বৃহৎ রাজ্য না হইলেও তাহার প্রেরিত সাহায্য অত্যন্ত মূল্যবান, এবং বৃটেনের পক্ষে আদরণীয়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

সুদীর্ঘ আট মাস নিক্রিয়তার পর য়ুরোপীয় রণক্ষেত্রে প্রকৃত শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। দুর্ভেদ্য ব্যূহ ও নিরপেক্ষ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিরন্ধ্র বর্ম্মে আবৃত জার্ম্মাণী কৌশলে মিত্রশক্তির অবরোধ-প্রচেষ্টা বিফল করিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করিতেছিল। অবশেষে সূক্ষ্মাগ্র অর্থনৈতিক যষ্টির আঘাতে জার্ম্মাণ শার্দ্দূল তাহার বিবর হইতে নিক্রান্ত হইতে বাধ্য হয়। উত্তরাঞ্চলে সদর্পে বৃটিশসিংহের কেশরাকর্ষণের পর তাহার সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন সে বৃটেন ও ফ্রান্সের মর্ম্মস্থলে নখরাঘাত করিতে প্রয়াস করিতেছে।

নরওয়ে অভিযান—

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নরওয়ের সুরম্য উপকূল ও গিরিকন্দরে বিস্ফোরণ আরম্ভ হইলেও বহু পূর্ব্ব হইতেই ঐ অঞ্চলে বিস্ফোরক উপাদান সঞ্চিত হইতেছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ক্ষুদ্র ফিন্‌ল্যাণ্ড যখন তাহার প্রবল প্রতিবেশীর সহিত অসম সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত, তখন বৃটেন্ ও ফ্রান্স ফিন্‌ল্যাণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। জার্ম্মাণী তখন নরওয়ে ও সুইডেনকে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিল যে, ঐ দুই দেশের মধ্য দিয়া যদি ফিন্‌ল্যাণ্ডে সাহায্য গমন করে, তাহা হইলে সে তাহাদিগের কণ্ঠ রোধ করিবে। বৃটেন ও ফ্রান্স তখন উত্তর-য়ুরোপের অসহায় রাষ্ট্রদুইটিকে পক্ষপুটে গ্রহণ করিয়া জার্ম্মাণীর সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; ফলে তখনই ঐ অঞ্চলে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা আরম্ভ হইবার লক্ষণ দেখা যায়। সরল বিশ্বাসী নরওয়ে ও সুইডেন সে সময় মনে করিয়াছিল, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চলিলেই তাহারা নিরাপদ থাকিবে। তাই, তখন তাহারা বৃটেন ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনীকে ফিন্‌ল্যাণ্ডে গমনের অনুমতি দিয়া প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হওয়া সঙ্গত মনে করে নাই।

কিন্তু স্বয়ং বিধাতা যাহাদিগের প্রতি বিরূপ, তাহারা রক্ষা পাইবে কিরূপে? প্রকৃতিদেবী ইহাদিগকে সম্পদশালিনী করিয়া বিপন্ন করিয়াছেন; পৃথিবীর গঠনকর্ত্তা ইহাদিগের ভৌগোলিক অবস্থিতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রবলের দংষ্ট্রার সম্মুখে রাখিয়াছেন। তাই, নরওয়ে তাহার বলদর্পিত প্রতিবেশীর প্রচণ্ড দন্তাঘাতে নিষ্পেষিত হইয়াছে।

নরওয়ে ও সুইডেনের উপকূল ভাগের ভৌগোলিক গঠন বিচিত্র। সুইডেনের মূল্যবান লৌহ নরওয়ের নার্ভিক বন্দরে জাহাজে চাপিয়া নিরাপদে ঐ দুই দেশের উপকূল-পথে জার্ম্মাণীতে পৌছিতে পারে। মিত্রশক্তির যে সকল রণপোত জার্ম্মাণ পোতের সন্ধানে উত্তর সাগরে ও আট্‌লান্টিকে বিচরণ করে, তাহারা নরওয়ে ও সুইডেনের এলাকাভুক্ত সমুদ্রাংশে (territorial waters) প্রবেশ না করিয়া এই সকল জার্ম্মাণ পোত আটক করিতে পারে না। অথচ নিরপেক্ষ দেশের এলাকাভুক্ত সমুদ্রাংশে প্রবেশ আন্তর্জ্জাতিক বিধানে নিষিদ্ধ। কাজেই, গত সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর সুদীর্ঘ সাত মাস এই পথে নিরাপদে জার্ম্মাণীতে পণ্য প্রবেশ করিয়াছে। ইহা জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির অর্থনৈতিক অবরোধ-প্রচেষ্টার পথে সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছিল। মিঃ চার্চ্চিলের ভাষায়—There ha[s] been no greater impediment to the blockade o[f] Germany than this Norwegian corridor. উত্তরাঞ্চলের এই উপদ্বীপের মূল্যবান খনিজ সম্পদ এবং এই বিচিত্র ভৌগোলিক গঠনই তাহার সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে।

মিত্রশক্তি নরওয়ে ও সুইডেনকে জার্ম্মাণীর সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ বর্জ্জন করাইবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সকল নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে মিত্রশক্তির সহিত লোভনীয় সর্ত্তে বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া জার্ম্মাণীর সহিত তাহাদিগের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করাইবার নীতি গৃহীত হয়। গত এপ্রিল মাসের প্রথমে এই উদ্দেশ্যে লণ্ডনে "বৃটিশ কমার্শিয়াল্ কর্পোরেশন" নামক একটি সরকারী সাহায্যপুষ্ট বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। যে কারণেই হউক, নরওয়ের উপকূলপথে জার্ম্মাণীতে পণ্য প্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে মিত্রশক্তি স্থির করেন, তাঁহারা নরওয়ের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করিয়া ঐ রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত সমুদ্রাংশে মাইন স্থাপন করিবেন। ইহাতে জার্ম্মাণীর বাণিজ্যপোতগুলি মধ্য সমুদ্রে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইবে; তখন মিত্রশক্তির পর্য্যবেক্ষণকারী রণপোত অনায়াসে তাহাদিগকে আটক করিতে পারিবে। গত ৮ই এপ্রিল এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য হয়—ঐ দিন প্রাতে মিত্রশক্তির স্থাপিত মাইনে নরওয়ের পূর্ব্ব-উপকূল কণ্টকিত হয়।

সতর্ক জার্ম্মাণী বহু পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিল যে, উত্তরাঞ্চলের এই পথ আর নিরাপদ নহে; এই জন্য সে ঐ অঞ্চল অধিকার করিবার আয়োজন পূর্ব্বেই শেষ করে। বাল্টিক সাগরের বন্দরগুলিতে জার্ম্মাণবাহিনী বহু দিন হইতে দ্রুত পোতারোহণ ও পোতাবতরণ শিক্ষা করিতেছিল। কোন্ দিন তাহারা পোতে আরোহণ করিয়া আর অবতরণ করে নাই, কোন্ নিশীথ রাত্রিতে জার্ম্মাণ পোত তাহাদিগকে বহন করিয়া উত্তর সাগর অতিক্রম করিয়াছে, সে সংবাদ মিত্রশক্তি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই। ৮ই এপ্রিল নরওয়ের উপকূলে মাইন স্থাপিত হইবামাত্র জানা গেল—নরওয়ের প্রত্যেকটি বন্দরে জার্ম্মাণ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে; রাজধানী অস্‌লো তাহার অধিকারভুক্ত; রাজপরিবার ও নরওয়ে সরকার রাজধানী ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পরদিনই ঘোষিত হইল, ডেনমার্ক জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার "মাথা বাঁচাইয়াছে।"

তাহার পর ঘটনাস্রোতের গতি দ্রুত। জার্ম্মাণী যাহাতে নরওয়ের সহিত সামুদ্রিক সংযোগ রক্ষা করিতে না পারে, তদুদ্দেশে মিত্রশক্তি, ত্বরা করিয়া নরওয়ের উপকূলে শক্তিশালী নৌবহর প্রেরণ করিলেন; ডেনমার্কের উপকূলে স্ক্যাগেরাক, ক্যাটেগাট, গ্রেট্ বেল্ট, লিটল্ বেল্ট প্রভৃতি অঞ্চল মাইন স্থাপন করিয়া

টকিত করিলেন। বিভিন্ন স্থানে জার্ম্মাণ নৌবহরের সহিত
টশ নৌবহরের সজ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল। মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে
লা হইয়াছে যে, ১৩ই এপ্রিল এক নৌযুদ্ধে জার্ম্মাণীর নৌবহর
ধ্বস্ত হয়। মিষ্টার চেম্বারলেন ঘোষণা করিয়াছেন—জার্ম্মাণ
নৌবহর এত অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে, উত্তর
াগর হইতে বৃটিশ নৌবহরের কতকাংশ ভূমধ্য সাগরে প্রেরণ
রা সম্ভব হয়—"...it has been thought possible
) divert a more normal distribution of ships to
e Mediterranean, which for sometime has been
ffe ted by our requirement in the North Sea."

নৌ-যুদ্ধে জার্ম্মাণী ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও নরওয়েতে অধিকার
স্তির জন্য তাহার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই পূর্ব্ব হইতে
াপ্ত হইয়াছিল। ডেন্‌মার্কের ন্যায় নরওয়ে সরকার নির্ব্বিবাদে
র্ম্মাণীর দাবী মানিয়া লন নাই। কাজেই, তাহাকে ঐ অঞ্চলে
ছকিং সামরিক বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। নরওয়ে
কার মিত্রশক্তির সাহায্য প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা
রওয়েতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া জার্ম্মাণীকে প্রতিরোধ করিতে
যোগ পান। নরওয়ের উপকূলস্থিত প্রধান প্রধান বন্দরে জার্ম্মাণী
ম হইতেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; কাজেই, জার্ম্মাণীর
তিরোধের সম্মুখীন হইয়া সৈন্য অবতরণ করান মিত্রশক্তির সহজ-
াধ্য ছিল না। যাহা হউক, কয়েক দিনের চেষ্টার ফলে উত্তর অঞ্চলে
র্ভিকের নিকটবর্ত্তী একটি দ্বীপে কিছু বৃটিশ সৈন্য অবতরণ করে;
প্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নামসস্ এবং য্যান্‌ডাল্‌স্‌নেসে কিছু বৃটিশ
ফরাসী সৈন্য অবতরণ করে। নার্ভিক অঞ্চলে মিত্রশক্তির সৈন্যের
ান উল্লেখযোগ্য তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই; নার্ভিক-
ত জার্ম্মাণদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের অগ্রগতির কথাই
নঃপুনঃ প্রচারিত হইয়াছে—তাহাদিগের শেষ সাফল্যের কথা
খনও শুনা যায় নাই। নামসস্ ও য্যান্‌ড্যাল্‌স্‌নেসের মিত্রশক্তি-
িনী ট্রণ্ডহীম্ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে; তাহারা
কি মধ্য-নরওয়েতে নরওয়েজিয়ান্ সেনাবাহিনীর সহিত সংযোগ
পনও করিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক হইতে জার্ম্মাণ
িনী প্রবলবেগে ট্রণ্ডহীমের দিকে অগ্রসর হয়। ইতোমধ্যে
দ্রপথে ও বিমানযোগে আরও জার্ম্মাণ সৈন্য নরওয়েতে পৌঁছিয়া-
ল। দক্ষিণ-নরওয়ের ষ্ট্যাভেঙ্গার প্রভৃতি স্থানে জার্ম্মাণ অধিকৃত
ানঘাঁটীগুলি হইতে বৃটিশ ও ফরাসী-বাহিনীর প্রতি প্রবলভাবে
োমা বর্ষণ চলে। এই বোমা বর্ষণে এবং জার্ম্মাণ-বাহিনীর
চণ্ড আক্রমণে মিত্রশক্তির সৈন্য বিধ্বস্ত হইতে থাকে।
শেষে তাহারা সমগ্র দক্ষিণ-নরওয়ে হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে
াধ্য হয়। য্যান্‌ড্যাল্‌স্‌নেস্ এবং নামসস্ নামক যে দুইটি
ন্দরে মিত্রশক্তির বাহিনী অবতরণ করিয়াছিল, মে মাসের প্রথম
াহে রাত্রির অন্ধকারে তাহারা পুনরায় সেই দুইটি বন্দরেই
াহাজে আরোহণ করে। দক্ষিণ-নরওয়েতে জার্ম্মাণীকে প্রতিরোধের
াশা মিত্রশক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছেন; সুইডেনে প্রবেশের
প্রধান দ্বার ট্রণ্ডহীম্ পুনরধিকারের আশা পরিত্যক্ত হইয়াছে।
-নরওয়েতে সুইডেনের লৌহ-রপ্তানীর সিংহদ্বার নার্ভিক
িকারের জন্য তাঁহারা এখনও সচেষ্ট; সেখানেও সামরিক অবস্থা
শাপ্রদ বলিয়া শুনা যায় নাই। নার্ভিক সম্বন্ধে জার্ম্মাণী আর
তত আগ্রহান্বিত নহে; কারণ, নরওয়ে অধিকার করিবার পর
সুইডেনের উপর জার্ম্মাণীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতঃপর
সুইডেনের কাঁচা লৌহ নার্ভিকের পথে না আসিয়া অন্য পথে
জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করিতে পারিবে। এখন জার্ম্মাণী বাল্টিক
সাগরে অপ্রতিহত। সুইডেনের বাল্টিক সাগরস্থিত লিউলিয়া বন্দর
গ্রীষ্মকালে তুষারমুক্ত থাকে; কাজেই আপাততঃ লৌহ প্রাপ্তি
সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা নাই। পরে নূতন পথের সৃষ্টি হইতে পারিবে।

নরওয়ে অভিযানের ব্যর্থতায় বৃটেনের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি
হইয়াছে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন
এবং বাল্টিক সাগরের তীরবর্ত্তী দেশগুলি হইতে বৃটেন আর কোন
পণ্য পাইবে না। বাল্টিক সাগর বৃটেনের পক্ষে অনধিগম্য
হইয়াছে। নার্ভিকের পথে বৃটেনে প্রতি বৎসর যে ৫ লক্ষ ৭০
হাজার টন অপরিস্কৃত লৌহ আমদানী হইত, তাহা বন্ধ হইয়াছে।
বৃটেন ও ফ্রান্সের যে পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতি হইয়াছে, জার্ম্মাণী
ঠিক সেই অনুপাতে লাভবান হইয়াছে। নরওয়ের কাষ্ঠে জার্ম্মাণীর
একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; যুদ্ধোপকরণরূপে কাষ্ঠের গুরুত্ব
নিতান্ত অল্প নহে। অতঃপর ডেনমার্কের দুগ্ধজাত পণ্য ও মাংস
জার্ম্মাণীর সেনাবিভাগের আহার্য্য যোগাইবে। সুইডেনের কাষ্ঠ ও
অপরিস্কৃত লৌহ জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করিবে। জার্ম্মাণীর এই সকল
সুবিধা লাভের পর তাহাকে অর্থনৈতিক বিষয়ে অবরোধ করিবার
প্রয়াস সফল হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে জার্ম্মাণী এই অভিযানে যে সাফল্য
লাভ করিয়াছে, তাহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপেক্ষা সামরিক গুরুত্ব
আরও অধিক। আজ ডেনমার্ক জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত;
ইহার পর নরওয়েতে যদি সে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা
হইলে সে সমগ্র উত্তর সাগরে এবং অংশতঃ আটলাণ্টিক মহাসাগরে
স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে; ইহা বৃটেনের পক্ষে
অল্প উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার বিষয় নহে। মিঃ লয়েড্ জর্জ্জের
ভাষায় জার্ম্মাণীর দক্ষিণ-নরওয়ে অধিকারে তাহার সাবমেরিণ ও
বিমান বৃটেনের ২০০ মাইল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে—The German
occup tion of Norway brings German aeroplanes
and submarines 200 miles nearer our coast.

বৃটেনে নূতন মন্ত্রিসভা—

নরওয়েতে জার্ম্মাণীর অধিকার বিস্তৃতির এই ভয়াবহ পরিণাম
নিশ্চিত জানিয়াও মিত্রশক্তি নিতান্ত বাধ্য হইয়াই দক্ষিণ-নরওয়ে
হইতে সৈন্য অপসারণ করিয়াছেন। চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার অনুসৃত
নীতির এই শোচনীয় পরিণতি অত্যন্ত লজ্জাকর। ঘটনা-পরম্পরা
লক্ষ্য করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, মিত্রশক্তির মনোভাব ও ভবিষ্যৎ
কর্ম্মপদ্ধতি জার্ম্মাণী হয় অনুমান করিয়াছিল, না হয় এসম্বন্ধে সঠিক
সংবাদ পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিল। অথচ বিচক্ষণ মিত্রশক্তি জার্ম্মাণীর
প্রকৃত মনোভাব আদৌ বুঝিতে পারেন নাই! এই জন্যই মিত্রশক্তির
সৈন্য নরওয়েতে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বে জার্ম্মাণী তথায় আপনাকে
সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়; ইহাই মিত্রশক্তির সৈন্যের পরাজয়ের
প্রধান কারণ। চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার এই অদূরদর্শিতার জন্য বৃটিশ
পার্লামেণ্টে তাঁহাদিগকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।
মিষ্টার চেম্বারলেনকে ব্যক্তিগতভাবে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ

করা হইয়াছে। তিন দিন পার্লামেন্টে উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কের পর ৯ই মে যখন মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গৃহীত হয়, তখন উহার ফল সকলকে বিস্মিত করে। মন্ত্রিসভার বিপক্ষে ২০০ এবং পক্ষে মাত্র ২৮১ ভোট প্রদত্ত হয়; ১৭০ জন ভোট দানে বিরত থাকেন। ভোটের এই ফল এতদূর অপ্রত্যাশিত যে, পার্লামেন্টের বিরুদ্ধ দল পর্য্যন্ত ইহাতে বিস্মিত হন; এমন কি, মন্ত্রিসভার সমর্থক ৪০ জন সদস্য মন্ত্রিসভার বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। মিষ্টার চেম্বারলেন প্রমাদ গণিয়া উদারনৈতিক ও শ্রমিকদলের সদস্যদিগকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু শ্রমিকদল মিষ্টার চেম্বারলেনের অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতঃপর ১০ই মে রাত্রিতে মিষ্টার চেম্বারলেন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদত্যাগ করিলেন; রাজা তাঁহার পদত্যাগ গ্রহণ করিয়া মিষ্টার চার্চ্চিলকে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের ভার প্রদান করেন। মিষ্টার চার্চ্চিলের নেতৃত্বে গঠিত নূতন মন্ত্রিসভায় শ্রমিক এবং উদারনৈতিক দলের সদস্যগণ যোগদান করিয়াছেন। মিষ্টার চেম্বারলেনও এই মন্ত্রিসভায় মিষ্টার চার্চ্চিলের অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নরওয়ে অভিযানের বিফলতা চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও, বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মিষ্টার চেম্বারলেনের অনুসৃত appeasement policyর বিরুদ্ধে বৃটেনে যে অসন্তোষ সৃষ্ট হইয়াছিল, ৯ই মে কমন্স-সভায় ভোটের ফলে তাহার অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর পদে মিষ্টার চার্চ্চিলের প্রতিষ্ঠা সেই বিরোধী মতবাদের বিজয় ঘোষণা করিয়াছে। কমন্স-সভায় বিতর্ককালে মিষ্টার লয়েড্ জর্জ্জ চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার অনুসৃত নীতির ভয়াবহ ফল ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"জেকোশ্লোভাকিয়ায় আমরা প্রথম একটি সামরিক সুবিধা হারাই; য়ুরোপের দশ লক্ষ সুদক্ষ সৈন্যের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হই। এই সময় ফ্রাঙ্কো সোভিয়েট মৈত্রীর ফলে সোভিয়েট রুশিয়া জেকোশ্লোভাকিয়ার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইত; জার্ম্মাণীকে আর একটি নূতন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইত। কিন্তু আজ কি ঘটিয়াছে? রুশিয়া আজ বাল্টিক সাগর অতিক্রম করিয়া জার্ম্মাণীকে তৈল যোগাইতেছে। রুমানিয়া আজ সর্ব্বতোভাবে জার্ম্মাণীর পদানত; নরওয়ে সম্পর্কে আমাদিগের নীতির ফলে আমরা জার্ম্মাণীকে রুমানিয়া হাতে তুলিয়া দিয়াছি।" স্পেনের মনোভাব সম্পর্কেও মিষ্টার লয়েড্ জর্জ্জ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কমন্স সভায় বিতর্ককালে মিষ্টার চেম্বারলেন ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নরওয়ে অভিযানে বৃটেনের নৌযুদ্ধের সাফল্য এবং জার্ম্মাণীর সৈন্যক্ষয়ের কথা উল্লেখ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মিষ্টার লয়েড্ জর্জ্জ ও সার আর্চ্চিব্যাল্ড সিন্‌ক্লেয়ার ইহার উত্তরে বলেন যে, তুচ্ছ লাভ-ক্ষতির হিসাব নিরর্থক; এই অভিযানের সাফল্যে জার্ম্মাণী যে সামরিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনায় জার্ম্মাণীর ক্ষতির পরিমাণ অধিক নহে।

কমন্স-সভার বিতর্কের গতি লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয়, বিরোধীপক্ষ এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, প্রথম হইতে চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন, নরওয়ের ব্যর্থতা তাহারই চরম শোচনীয় পরিণতি। যুদ্ধের পূর্ব্বে ঐ মন্ত্রিসভা ভ্রান্তনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর তাহারা পোল্যাণ্ডকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। গত সেপ্টেম্বর মাসে বাল্টিক সাগর অবরুদ্ধ ছিল না; ঐ অঞ্চলের যুদ্ধ শেষ হইবার পর পোল্যাণ্ডের সামান্য নৌবহর বাল্টিক সাগরের পথেই উত্তর সাগরে আসিয়া মিত্রশক্তির নৌবহরে যোগ দিয়াছে। অথচ, যুদ্ধের সময় পোল্যাণ্ডের সাহায্যার্থে একখানিও মিত্রশক্তির রণপোত ড্যানজিগে অথবা ডিনিয়ায় যাইতে উদ্যত হয় নাই। তাহার পর, যে কারণেই হউক, ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যার্থেও মিত্রশক্তি অগ্রসর হইতে পারেন নাই; আজ নরওয়েরও এই দুর্দ্দশা! তাই মিষ্টার লয়েড্ জর্জ্জ বলিয়াছিলেন—There was the promise to Poland, the promise to Norway, the promise to Finland. Our promissory note are now rubbish in our hands.

নরওয়ে অভিযানের বিফলতার কারণ সম্বন্ধে মিষ্টার চার্চ্চিল যাহা বলিয়াছেন, তাহার জন্য প্রত্যক্ষভাবে চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভাই দায়ী। মিষ্টার চার্চ্চিলের বক্তৃতায় প্রকাশ পায়, পাঁচ বৎসরের চেষ্টাতেও বৃটেনের বিমানবাহিনী জার্ম্মাণীর সমকক্ষতা লাভ করে নাই; এই জন্যই কোন ক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর পূর্ব্বে বৃটেন আঘাত করিতে পারে না। ইহার জন্যও মিষ্টার চেম্বারলেনের appeasement মনোভাবই দায়ী। মিষ্টার চার্চ্চিল, মিষ্টার ডাফ্ কুপার প্রভৃতি রক্ষণশীলগণ এই নীতি সমর্থন করেন নাই। উদারনৈতিক মিষ্টার লয়েড্ জর্জ্জ ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এই appeasment নীতির ফলেই সমরোপকরণ বৃদ্ধির দিকে বৃটেন তত মনোযোগী হয় নাই, আজ এই জন্যই যে বিমানশক্তিতে জার্ম্মাণীর সমকক্ষ নহে। কাজেই, মিষ্টার চেম্বারলেনের প্রতি বৃটিশ জাতির বিরক্তি স্বাভাবিক। মিষ্টার চার্চ্চিল যেমন এক দিকে স্পেন, জেকোশ্লোভাকিয়া এবং সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে মিষ্টার চেম্বারলেনের নীতির বিরোধী ছিলেন, তেমনই স্বদেশে সমরোপকরণ বৃদ্ধি সম্পর্কে তৎকালীন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। মিষ্টার চার্চ্চিল এক সময় বলিয়াছিলেন যে, রুশিয়ার সহিত বৃটেন ও ফ্রান্স যদি মৈত্রী স্থাপনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণীকে অর্থনৈতিক বিষয়ে অবরোধ করিবার আশা দুরাশায় পরিণত হইবে। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইতেছে। তেমনই সমরোপকরণ বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁহার সময়োচিত সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করায় আজ ভয়াবহ ফল অনুভূত হইতেছে। বৃটিশ মন্ত্রিসভার পতন মিষ্টার চেম্বারলেনের ব্যক্তিগত পরাজয় নহে; তিন বৎসর তিনি যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই নীতির বিরুদ্ধে আজ বৃটিশ জাতি অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছে এবং যাহারা সেই নীতির বিরোধী, তাহাদিগকে সমর্থন করিয়াছে।

ডেন্‌মার্কের আত্মসমর্পণ—

৮ই এপ্রিল রাত্রিতে জার্ম্মাণ সেনাবাহিনী দীনেমার-জার্ম্মাণ সীমান্ত অতিক্রম করে; সীমান্তস্থিত দীনেমার সৈন্যের ক্ষীণ প্রতিরোধ তাহারা অনায়াসে ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয়। পরদিন প্রাতে

দীনেমারগণ শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে, আকাশ-পথে অসংখ্য জার্ম্মাণ বিমান উড়িতেছে। ডেনমার্ক কি অবস্থায় জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করে, তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। দীনেমার প্রধান-মন্ত্রী মঃ ষ্টনিঙ্গ তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন, দীনেমার সরকার জার্ম্মাণীর দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হয়—"...the Government had to accept the German demands for the admission of German troops into Denmark. মঃ ষ্টনিঙ্গের ঘোষণায় প্রকাশ—দীনেমার সরকার জার্ম্মাণীর নিকট হইতে ডেনমার্কের স্বাধীনতা ও রাজ্যগত অখণ্ডতা রক্ষার আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা জার্ম্মাণীর দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বস্তুতঃ, ডেনমার্ক পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মাণীর অনুগত ছিল। গত বৎসর মে মাসে জার্ম্মাণী উত্তর-য়ুরোপের চারিটি রাষ্ট্রকে তাহার সহিত পারস্পরিক অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছিল। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ষ্টকহলমে নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের রাষ্ট্রনায়কগণ সমবেত হইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা আলোচনান্তে এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন যে, ঐ সকল রাষ্ট্র য়ুরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের দলাদলির বাহিরে থাকিতে চাহে এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনটি রাষ্ট্র জার্ম্মাণীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু ডেনমার্ক জার্ম্মাণীর সহিত পারস্পরিক অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বর্ত্তমানে সে যদি স্বেচ্ছায় জার্ম্মাণীর রক্ষণাধীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ অনাক্রমণ-চুক্তি লঙ্ঘিত হইয়াছে বলা চলে না; বস্তুতঃ জার্ম্মাণী না কি আশ্বাস দিয়াছে, সে ডেনমার্কের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা রাজ্যগত অখণ্ডতা ক্ষুণ্ন করিবে না। প্রতিবেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রের সহিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অনাক্রমণ-চুক্তি প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের আশ্রয় গ্রহণের সমতুল্য। কাজেই, জার্ম্মাণীর ডেনমার্ক অধিকার সম্পর্কে বলা যায় যে, দুর্ব্বল ডেনমার্ক পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এখন জার্ম্মাণী প্রয়োজনবোধে তাহার আশ্রিতের ভাগ্য আপনার ভাগ্যের সহিত গ্রথিত করিয়াছে।

জার্ম্মাণীর অন্যান্য দুর্ব্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পক্ষে নরওয়ে ও ডেনমার্কের অবস্থা এক অশুভ উদাহরণের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল রাষ্ট্র দেখিতেছে, পোল্যাণ্ড জার্ম্মাণীর প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া পক্ষকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়; নরওয়ে জার্ম্মাণীর দাবীতে অসম্মত হইয়া শ্মশানে পরিণত হইল, নরওয়ের সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণী মিত্রশক্তির সৈন্য বিতাড়িত [illegible]। পোল্যাণ্ডের বাক-বিভূতিসম্পন্ন মিত্রগণ তাহার সাহায্যার্থ [illegible] হইবার সুযোগে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, নরওয়েতে তাঁহারা [illegible] হইলেও সমরাগ্নির লেলিহান জিহ্বায় ঐ দেশ ভস্মে পরিণত [illegible]; যদি নামে মাত্র নরওয়ের স্বাধীনতা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত [illegible] তাহার রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষিত হইবে না, ইহা নিশ্চিত। [illegible], ডেনমার্ক জার্ম্মাণীর নিকট সামরিক বিষয়ে আত্মসমর্পণ [illegible] অক্ষতই রহিয়াছে। জার্ম্মাণী যদি এই যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহা [illegible] ডেনমার্ক পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির আশা করিতে পারে। [illegible] জার্ম্মাণী যদি পরাভূত হয়, তাহা হইলেও, সে বাধ্য হইয়া জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে—এই যুক্তিতে অন্যান্য শক্তির নিকট সহানুভূতি আশা করিতে পারে। ডেনমার্ক যদি অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণীর শত্রুপক্ষের আক্রমণে বিধ্বস্ত না হয়, তাহা হইলে নরওয়ে ও পোল্যাণ্ডের তুলনায় সে ভাগ্যবান হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এইরূপ দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকায় ভবিষ্যতে জার্ম্মাণীর কোন কোন দুর্ব্বল প্রতিবেশীর পক্ষে সামরিক বিষয়ে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

জার্ম্মাণীর নূতন অভিযান :—

নরওয়ে অভিযানের সাফল্যে জার্ম্মাণী বিজয়লাভ সম্বন্ধে অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছে। সে দেখিয়াছে যে, পূর্ব্বাহ্নে সে যদি কোন অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে আপনার সামরিক অধিকার বিস্তার করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিরোধ করা অত্যন্ত দুষ্কর। বস্তুতঃ, দক্ষিণ-নরওয়েতে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী তাহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

কাজেই, নিশ্চিত বিজয়-লাভের আশায় জার্ম্মাণী আর কাল-বিলম্ব না করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত প্রত্যক্ষ শক্তি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলাণ্ড ও বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন না করিলে দ্রুত বৃটেন ও ফ্রান্সকে আঘাত করা সম্ভব নহে। এই জন্য জার্ম্মাণী ১০ই মে প্রাতে এক সঙ্গে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মকে আক্রমণ করিয়াছে; ভৌগলিক কারণে ক্ষুদ্র লাক্সেমবার্গও আক্রান্ত হইয়াছে।

জার্ম্মাণী এই নূতন অভিযান আরম্ভ করিবার সময় বলিয়াছে যে, বৃটেন ও ফ্রান্স তাহার রুর জেলা আক্রমণ করিবার আয়োজন করিয়াছিল; হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের মধ্য দিয়াই তাহাদিগের এই আক্রমণ পরিচালিত হইত। ঐ দুইটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বৃটেন ও ফ্রান্সের অনুকূল মনোভাবাপন্ন, ইহাতে জার্ম্মাণীর সন্দেহ ছিল না। এই জন্যই সে ঐ অঞ্চলে পূর্ব্বাহ্নে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মিত্রশক্তি রুর আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন কি না, ইহা জানিবার উপায় নাই। তবে, তাঁহারা যে সত্বর কোন স্থানে জার্ম্মাণীর সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাহা ৯ই মে বৃটিশ কমন্স-সভার বিতর্কে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই বিতর্কের উত্তর দান কালে মিষ্টার চার্চ্চিল বলিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ নরওয়ে হইতে জার্ম্মাণীকে বিতাড়িত করিবার জন্য আমরা আমাদিগের বিমানবহর বিপন্ন করিতে চাহি নাই; কারণ, অন্যত্র আরও বৃহত্তর বিপদের জন্য উহার প্রয়োজন হইতে পারে। মিষ্টার চার্চ্চিলের এই উক্তি হইতে মনে হয় যে, অন্যত্র জার্ম্মাণীর সম্মুখীন হইবার উদ্দেশ্যে বৃটেন হয় ত স্বেচ্ছায় দক্ষিণ-নরওয়েতে পরাজয়ের গ্লানি মাথা পাতিয়া লইয়াছে। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের মনোভাব সম্পর্কে জার্ম্মাণীর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। এই দুইটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকিলেও তাহারা জার্ম্মাণীর নিকট হইতেই আক্রমণের আশঙ্কা করিয়াছে এবং সেই জন্য জার্ম্মাণীর সীমান্তের দিকেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা দৃঢ় করিয়াছে। সময় সময় হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া বৃটেনের বিমান জার্ম্মাণীতে গিয়াছে—জার্ম্মাণীর এই অভিযোগও মিথ্যা নহে। বস্তুতঃ, এই দুইটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হইলেও তাহাদিগের মনোভাব মিত্রশক্তির অনুকূলই ছিল।

জার্ম্মাণীর আক্রমণের বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্ব্বপ্রথম সে

বিমান ঘাঁটি, সামরিক কেন্দ্র এবং পেট্রোলের গুদামের প্রতি মনোযোগ প্রদান করে; সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী লঘু অস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্য বিমান হইতে "প্যারাসুটের" সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করায়। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম সম্পর্কেও সে ঠিক এই নীতিই অবলম্বন করিয়াছে।

সে এই দুই দেশের প্রত্যেকটি সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থানে প্রবলভাবে বোমা বর্ষণ করিতেছে। বিমান হইতেও দলে দলে জার্ম্মাণ সৈন্য নানা স্থানে অবতরণ করিতেছে; এই সকল সৈন্য ধর্ম্মযাজকের বেশে, ওলন্দাজ, ফরাসী ও বৃটিশ সৈন্যের বেশে আত্মগোপন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। বিমান হইতে যে সকল সৈন্য অবতরণ করিতেছে, তাহারা এবং ওয়াল্ নদী বহিয়া নৌকাযোগে আগত কিছু সৈন্য রটারডেম্ ও হেগের বোমাঘাঁটী অধিকার করিয়াছিল। ওলন্দাজ বাহিনী ও বৃটিশ বিমান-বহরের বিশেষ চেষ্টায় এই সকল সৈন্য তাহাদিগের অধিকৃত স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। জার্ম্মাণী দাবী করিতেছে যে, তাহারা উত্তর-হল্যাণ্ডে জুডার জীর পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। বেলজিয়ামে জার্ম্মাণ-বাহিনী ম্যাসট্রীক্ট হইতে য়্যালবার্ট খাল ধরিয়া উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, এই অঞ্চলে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাই জার্ম্মাণ-বাহিনীর উদ্দেশ্য। এদিকে জার্ম্মাণী লাক্সেমবার্গে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীকে বিব্রত রাখিতে চেষ্টা করিতেছে।

হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম্ সর্ব্বতোভাবে জার্ম্মাণীকে প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মিত্রশক্তির নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছে; মিত্রশক্তিও অবিলম্বে ঐ দুইটি অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী এখন হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামে জার্ম্মাণ-বাহিনীর সহিত প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত। এই সঙ্ঘর্ষের ফলাফল কি হইবে, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের সময় ইহা নহে। তবে, জার্ম্মাণী এবার প্রত্যক্ষভাবে মিত্রশক্তির বিরোধিতা করিতেছে; এই সঙ্ঘর্ষেই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সংগ্রামের চরম জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে, ইহা নিশ্চিত।

জার্ম্মাণী তাহার নরওয়ের অভিজ্ঞতা হইতে মনে করিতেছে যে, সে যদি পূর্ব্বাহ্নে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে বৈমানিক সৈন্যের সহযোগিতায় পদাতিক সৈন্য যখন অগ্রসর হইবে, তখন তাহাদিগকে প্রতিরোধ করা মিত্রশক্তির পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। সে আশা করে, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম হইতে যদি সে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীকে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার বৃটেন আক্রমণের স্বপ্ন সফল হইবে। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের উপকূল হইতে বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনই হিট্‌লারের চরম লক্ষ্য!

হিট্‌লার স্বয়ং পশ্চিম রণক্ষেত্রে গমন করিয়া জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"The hour has come for the most decisive struggle of the German people...The fight, which begins to-day will determine Germany's future for the next 1,000 years."

হিট্‌লারের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া আজ জগদ্বাসী মনে করিতেছে—পশ্চিম-য়ুরোপে যে সঙ্কট আরম্ভ হইল, ইহাতে আগামী সহস্র বৎসরের জন্য কেবল জার্ম্মাণ জাতির ভাগ্যই নিয়ন্ত্রিত হইবে না; বস্তুতঃ, সমগ্র সভ্য জগতের ভবিষ্যৎ এই সঙ্ঘর্ষের ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে। তাই, আজ সমগ্র বিশ্ববাসী আকুল আগ্রহে এই যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিতেছে।

ইটালী ও ভূমধ্য সাগর—

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধ সম্পর্কে ইটালীর মনোভাব প্রথম হইতেই রহস্যজনক; সে নিরপেক্ষ হইলেও তাহার ভাবগতি ঠিক নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ন্যায় নহে। গত নভেম্বর মাসে ইটালীর মনোভাব সম্পর্কে 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো'তে মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, সে বিজয়ী-পক্ষের সহিত যোগদান করিয়া লাভবান হইতে চাহে—"...waiting to join the winning side and share in the spoil" ইটালী বিজয়ী-পক্ষে যোগদানের জন্য প্রতীক্ষায় থাকুক আর না থাকুক, সে যে বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে আপনার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত। ইটালীতে সংবাদপত্রগুলি রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন; কাজেই ঐ সকল পত্রের উক্তিকে ইটালীয় সরকারের ভবিষ্যৎ নীতির ইঙ্গিত বলা যাইতে পারে। জার্ম্মাণীর নরওয়ে অভিযানের পর হইতে ইটালীয় সংবাদপত্রগুলি জার্ম্মাণীর গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়াছে এবং ইটালীর সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে কাউণ্ট সিয়ানোর পত্র 'টেলিগ্রাফো'র অন্যতম ডিরেক্টর সীনর য়্যান্স্যালডো এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "নরওয়েতে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগের ব্যাপৃত হইবার সম্ভাবনা আছে; রণভেরী যদি বাজে, তাহা হইলে আমরাই তাহা প্রথমে বাজাইব।" তাঁহার একটি উক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক; তিনি বলিয়াছিলেন—Italy is preparing for the moment which will be most opportune. ইহার পর, তার হিট্‌লারের জন্মতিথিতে মুসোলিনীর প্রতিষ্ঠিত 'পপলো ড ইতালিয়া' পত্রে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল,—"যে সকল ঘটনাবলী য়ুরোপের মানচিত্রকে নূতন ভাবে অঙ্কিত করিবে, তাহার সম্বন্ধে ইটালীয়দিগের ন্যায় বিরাট জাতি কখনও উদাসীন থাকিতে পারে না; নিজের গৃহে অবস্থান করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে এই ঘটনাবলী লক্ষ্য করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে।" তাহার পর, এই পত্রে ইটালীর জাতীয় আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সমুদ্রপথের অবাধ অধিকার ব্যতীত কোন বিশাল জাতি তৃপ্ত থাকিতে পারে না; বর্ত্তমানে মাসোয়া ও ত্রিস্তে বন্দরের সংযোগ যে কোন মুহূর্ত্তে অবরুদ্ধ হইতে পারে। সম্প্রতি রোম রেডিও হইতে খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে—ইটালী নিরপেক্ষ নহে। কয়েক দিন পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান-মন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিস্ ইটালী ও বৃটেনের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইটালীয় ভাষায় কয়েকটি বেতার বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতার উত্তরে রোম রেডিও ঘোষণা করিয়াছে—Italy is not neutral and she does not intend to be pushed aside in the present conflict because she has claims to put forward. ইটালীর দাবী সম্পর্কে বলা

হইয়াছে যে, ভূমধ্য সাগরে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ—ইটালীর প্রধান দাবী।

ইটালীর পক্ষ হইতে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত এই সকল মন্তব্য হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, যুদ্ধের সময়েই ইটালী তাহার আশু দাবীগুলি পূরণ করাইতে চাহে এবং যুদ্ধাবসানে নূতন করিয়া যে ভাগবাঁটোয়ারা হইবে, সেই 'কালনেমির লঙ্কাভাগে' সে বাদ পড়িতে চাহে না। ইটালীর সন্দেহজনক মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মিত্রশক্তি পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়াছেন; গত ১লা মে হইতে ভূমধ্যসাগরপথে মিত্রশক্তির বাণিজ্যপোতের গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়াছে; উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া পক্ষকাল অধিক সময় এবং প্রায় দ্বিগুণ শক্তি ব্যয় করিয়া প্রাচীর সহিত বৃটেনের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। আলেকজেণ্ড্রিয়া নৌঘাটীতে মিত্রশক্তি তাহাদিগের বিরাট নৌবহর সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কেবল ইটালীর সন্দেহজনক মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই এই ব্যবস্থা হয় নাই—ইটালীর কার্য্যও হয় ত আপত্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, যুগোশ্লোভিয়ার সীমান্তে ইটালীর সৈন্যের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; গ্রীসের নিকটে ডোডেকেনীস্ দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্বে ইটালীর নৌবহর সমাবেশের সংবাদও রাষ্ট্র হইয়াছে।

ইটালীর প্রধান দাবী—সুয়েজ খালের পথ ইটালীর জাহাজের পক্ষে অপ্রতিহত থাকিবে। আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় ইটালী সুয়েজ খাল কোম্পানীকে ২০ লক্ষ পাউণ্ড শুল্ক যোগাইয়াছে; আবিসিনিয়ার সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য এখনও তাহাকে শুল্ক দিতে হইতেছে। সুয়েজ খাল কোম্পানীর (Compagnie Universelle du Canal de Suez) ২৮ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ১৬ জন ফরাসী, ১০ জন বৃটিশ, এক জন ওলন্দাজ এবং একজন মিশরীয়। কাজেই সুয়েজ খাল সম্পর্কে ইটালীর দাবী প্রধানতঃ বৃটেন ও ফ্রান্সের নিকট। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে টিউনিসে ফরাসী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ঐ অঞ্চলের প্রতি ইটালীর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। টিউনিসে প্রায় ১ লক্ষ ইটালীর বাস; ইহার সীমান্তবর্ত্তী লিবিয়ায় (পূর্ব্ব নাম ত্রিপলি) ইটালী নূতন নৌ-ঘাঁটী স্থাপন করিয়াছে। কাজেই টিউনিস্ সম্পর্কে নূতন করিয়া ব্যবস্থা করা ইটালীর বিশেষ প্রয়োজন; এই বিষয়ে ফ্রান্স ইটালীর প্রতিদ্বন্দ্বী। আবিসিনিয়ার সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য জিবুতি বন্দর ইটালীর পক্ষে অপরিহার্য্য; ফরাসী-অধিকৃত জিবুতি বন্দর দিয়া ইটালীয়রা তাহাদিগের সাম্রাজ্যে পৌঁছিবে, ইহা সাম্রাজ্যবাদী ইটালীর দুঃসহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কর্সিকা পূর্ব্বে ইটালীরই অধিকারভুক্ত ছিল; এক দুর্দ্দিনে ফ্রান্স উহা অধিকার করে। সাম্রাজ্যবাদী ইটালী এই অপমানের বোঝা নির্ব্বিকার চিত্তে বহন করিতে পারে না। এই সকল অঞ্চলে অধিকার বিস্তৃতির পর ইহাদিগের সহিত অপ্রতিহত সংযোগ রক্ষার জন্য ভূমধ্য সাগরে ইটালীর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহা ব্যতীত, সাম্রাজ্যবাদীদিগের ভোগ্য য়ুরোপীয় অঞ্চলগুলি যখন বণ্টন করা হইবে, তখন ইটালী তাহার ন্যায্য অংশ পাইবার দাবী রাখে। সম্পূর্ণরূপে স্বীয় পদানত করিয়াই হউক, অথবা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াই হউক, বলকান্ অঞ্চলের অর্থনৈতিক শোষণে ইটালী আপনার অংশ বুঝিয়া লইবার জন্য সচেষ্ট।

ইটালীর এই দাবীগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেন ও ফ্রান্স। জার্ম্মাণীর—হয় ত সোভিয়েট রুশিয়ার সহিতও রফা করিয়া ইটালী দক্ষিণ পূর্ব্ব য়ুরোপ সম্পর্কে স্বীয় অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে পারিবে। শুনা যাইতেছে, বলকান অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার সম্পর্কে ইটালী, জার্ম্মাণী ও রুশিয়ার মধ্যে রফা হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণীর পক্ষে এখন ইটালীর পোষকতার বিশেষ প্রয়োজন। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর নিকট হইতে কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাইয়াই হয় ত ইটালী তাহার সহিত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং যুদ্ধের সময় সে জার্ম্মাণীর সহিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা করিতেছে। ইটালীর টিউনিস্-কর্সিকা-জিবুতি-সুয়েজ ও ভূমধ্য সাগর সংক্রান্ত দাবী বৃটেন্ ও ফ্রান্সকে অবনমিত করিতে না পারিলে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। গত মহাযুদ্ধের ফল সম্পর্কে ইটালীর অভিজ্ঞতা প্রীতিকর নহে; তাহার স্মরণ আছে, ভার্সাইয়ের ভাগ-বাঁটোয়ারার বৈঠকে তাহাকে কেবল দক্ষিণ-টাইরল পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। পরে, ফ্রান্সের নিকট হইতে সাহারা অঞ্চলের তিবেস্তি, লোহিত সাগরের ডুমারিয়া দ্বীপ এবং জিবুতি রেলপথের কয়েকটি অংশ পাইয়াই ইটালীকে তৃপ্তিলাভ করিতে হইয়াছে। কাজেই, এবার ইটালীর নীতি সুস্পষ্ট; সে প্রথম হইতেই জার্ম্মাণীর অনুকূল মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে। সে মনে করে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে বৃটেন ও ফ্রান্সের শক্তি যদি আরও বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে উহা তাহার পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না।

বৃটেন ও ফ্রান্সের শক্তি বৃদ্ধি ইটালীর আকাঙ্ক্ষিত না হইলেও সে এতদিন জার্ম্মাণীর অনুকূলে অস্ত্রধারণ করে নাই। ইহার কারণ, সে নিরপেক্ষ থাকিয়া অর্থনৈতিক সহযোগিতার দ্বারা জার্ম্মাণীর অধিকতর উপকার করিতে পারিয়াছে। ইহা ব্যতীত, সে হয় ত মনে করিয়াছে, বৃটেন ও ফ্রান্স যখন জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে জটিলভাবে জড়াইয়া পড়িবে এবং তাহাদিগের কিছু শক্তি ক্ষয় হইবে, সেই সময় তাহাদিগকে আঘাত করাই কূটনীতিসঙ্গত কার্য্য হইবে। বর্ত্তমানে মিত্রশক্তি জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে বিশেষভাবে জড়িত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের কিছু শক্তিক্ষয়ও হইয়াছে মনে করিয়াই ইটালী ভূমধ্যসাগরের জলে ও উপকূলে তৎপর হইয়াছে কি না কে বলিবে? বিশেষতঃ সম্প্রতি জার্ম্মাণীর সহিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ করাইবার জন্য মিত্রশক্তি বিশেষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন। ইটালী বুঝিয়াছে যে, নিরপেক্ষতার নামে জার্ম্মাণীকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান আর অধিককাল সম্ভব হইবে না।

শ্রীঅতুল দত্ত।

ভারত-সচিবের প্রস্তাব

বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড গত ৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবারে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন যে, ভারতের যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলী শাসন-কার্য্যের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন, সেই সাতটি প্রদেশের প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা আরও বার মাসের জন্ত শাসন-সংস্কার আইনের ৯৩ধারা মতে শাসন-কার্য্য পরিচালিত করিতে থাকিবেন; তিনি তাঁহার এই প্রস্তাবের মঞ্জুরী প্রার্থনা করায় পার্লামেণ্ট প্রস্তাবটি মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু এই উপলক্ষে লর্ড জেটল্যাণ্ড লর্ড সভায়, এবং সহকারী ভারত-সচিব কমন্স সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে এক সম্প্রদায়ের মুসলমান ভিন্ন আর কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ভারতে এইরূপ রাজনীতিক অচল অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় অনেককেই চঞ্চল হইতে হইয়াছে। লর্ড জেটল্যাণ্ডের উক্তির ছত্রে ছত্রেই রাজনীতিক কূট চা'ল পরিস্ফুট! যুদ্ধারম্ভের পরই ভারতের বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো গান্ধীজীর সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে শিমলায় আহ্বান করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর সহিত বড়লাটের যে সকল আলোচনা হইয়াছিল, তাহা কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের প্রীতিপ্রদ হয় নাই; সেই জন্য গত ৫ই কার্ত্তিক কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কংগ্রেসের সদস্যদিগকে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিবার জন্য এক নির্দ্দেশ প্রদান করায় কংগ্রেসী সদস্যগণ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন; তদবধি প্রাদেশিক গভর্ণররা ঐ সাতটি প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আইন মতে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা বড়লাটের অনুমতি লইয়া ছয় মাসের অধিককাল এই ভাবে শাসন-কার্য্য পরিচালন করিতে পারেন না। গত এপ্রিল মাসেই সেই সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে; অগত্যা ভারত-সচিব পার্লামেণ্টের নিকট মঞ্জুরী লইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে আরও বার মাস এই ভার অর্পণ করিলেন। আমাদের দেশের লোককে একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া—তাহাদের মতামতের প্রতীক্ষা না করিয়া,—তাহাদের স্বদেশীয় রাজনীতিক সভার বিনা-অনুমোদনে আইন-নির্দ্দিষ্ট কালকে অতিক্রম করিয়া এই ভাবে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন স্বৈরশাসন প্রণালীর যে সুস্পষ্ট নিদর্শন, ইহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার কি পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই ব্যাপারেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক সরকাররা অতি অল্পসংখ্যক পরামর্শদাতার সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালিত করিবেন; অথচ এই পরামর্শদাতা মনোনীত করিবেন কে? তাঁহারা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদেরই মনোনীত; অর্থাৎ প্রাদেশিক গভর্ণররা গাছেরও পাড়িবেন, তলারও কুড়াইবেন। এরূপ ক্ষেত্রে গভর্ণরের পরামর্শদাতাদিগের পরামর্শের গুরুত্বের পরিমাণ কতখানি হইবে, তাহা বুঝিতে অতি-বড় নির্ব্বোধেরও বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা নাই। শাসনকর্ত্তারা ঐ সাতটি প্রদেশে পুনঃ-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া এ সম্বন্ধে জনমত অবগত হইবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের কথা ও কাজের সামঞ্জস্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝেন যে, জনমত পুনর্নির্ব্বাচনেও কংগ্রেসওয়ালাদিগেরই সমর্থন করিবে। সেই জন্য ঐ পথ ত্যাগ করাই তাঁহাদের পক্ষে নিরাপদ। অথবা তাঁহারা সমস্ত প্রতিপক্ষ দলকে সম্মিলিতভাবে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে আদেশ করিলেন না কেন? ইহাই কি গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা? লর্ড জেটল্যাণ্ড "আর্য্যাবর্ত্তের হৃদয়" নামক গ্রন্থে তাঁহার ভারতীয় অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, বাঙ্গালায় কিছুদিন লাটগিরিও করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে ভারতবাসীকে ঠিক চিনিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার উক্তিতেই সুপ্রকাশ।

লর্ড জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতা

বৃটিশ লর্ডসভায় উল্লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় লর্ড জেটল্যাণ্ড এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা আমাদের দেশের কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই আকৃষ্ট করিতে পারে নাই; তাহাতে এদেশের শিক্ষিত সমাজের মত-পরিবর্ত্তনও হয় নাই। তাঁহার সেই একই কথা—কংগ্রেস ও লীগে আগে মিলন কর, তাহার পর স্বাধীনতার দাবী করিও। লর্ড জেটল্যাণ্ড এই একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াও কাহাকেও ভুলাইতে পারিবেন না। লীগের সহিত কংগ্রেসের সর্ব্ব-বিষয়ে একমতাবলম্বী হওয়া কখনই সম্ভব হইবে না, ইহা তিনিও জানেন; এবং কি কারণে ইহা অসম্ভব, তাহা আমরা বারংবার বলিতে চাহি না। লর্ড জেটল্যাণ্ড জানেন কি না জানি না, কিন্তু একথা সত্য যে, শাসকদিগের মধ্যে কতকগুলি অদূরদর্শী সঙ্কীর্ণচেতা লোক আছেন, তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ স্থায়ী করিয়া ভারতে বৃটিশ অধিকার কায়েম করিয়া রাখিবার জন্য সচেষ্ট। অধ্যাপক সীলি, মিষ্টার জে. এ. হবসন (J. A. Hobson) প্রভৃতি বলিয়াছেন, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আছে বলিয়া এখানে বৃটিশ জাতির পক্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীরা যে এই বিরোধ স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে মুস্‌লিম লীগের সহিত কংগ্রেসের মিলন হইবে না; সুতরাং স্বাধীনতার দাবীও গ্রাহ্য হইবে না। লর্ড জেটল্যাণ্ড তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "কংগ্রেসওয়ালারা বহু মুসলমানের মনে যে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, তাহার উপশান্তি তাঁহারাই করিতে পারেন?" কংগ্রেস এমন কোন কাজই করেন নাই, যে জন্য ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মনে শঙ্কার সঞ্চার হইতে পারে। লর্ড জেটল্যাণ্ড কি জানেন না যে, তিনি তাহার একটি দৃষ্টান্তও দেখাইতে পারিবেন না! তিনি আরও বলিয়াছেন—এই সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু সমস্যা এই যে, কংগ্রেস যে মিলনের জন্য একান্ত কামনা করেন, সেই মিলনের পথ কি একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন? অসাধ্যসাধন করিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। কংগ্রেস যখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, লীগের পশ্চাতে যবনিকার অন্তরালে শকুনীর ন্যায় মন্ত্রণাদাতা থাকিতে পরস্পরের মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন বৃথা তাঁহারা আর রাজনীতিক মরুকান্তারে প্রাণহারিণী মৃগতৃষ্ণিকায় আকৃষ্ট হইয়া

নেরাজ্য মাত্র সঙ্কর করিবেন কেন? উহা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। লর্ড জেটল্যাণ্ড কি জানেন না যে, হিন্দুস্থানকে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থানে পরিণত করিবার যে প্রস্তাব মুস্লিম লীগ কর্তৃক উত্থাপিত হইয়াছে, অনেক লীগপন্থী মুসলমানেরই নিকট সেই প্রস্তাব অসারবোধে উপেক্ষার যোগ্য; দিল্লীতে অধিবিষ্ট আজাদ সমিতি উহা আমলে আনেন নাই। উঁহারাও লীগপন্থী। তদ্ভিন্ন, জমায়েৎ উলেমা, মোমিন, অর্হর ও সিয়া মুসলমানগণ লীগের এ প্রস্তাব কাণেই তুলেন নাই। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায় যাহাতে এক মত হইতে পারেন, লর্ড জেটল্যাণ্ড কি সর্ব্বাগ্রে তাহারই ব্যবস্থা করিবেন? ইঁহাদিগকে একমত করিবার জন্ত তাঁহার আগ্রহ কোথায়? অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র লীগের গোঁড়ামী করিবারই বা হেতু কি?

—

রেলওয়ে দুর্ঘটনায় দণ্ড

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের মাজদিয়া ষ্টেশনে যে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে বহু যাত্রীকে হতাহত হইতে হইয়াছিল। কর্ত্তব্যে ত্রুটির অভিযোগে সংঘর্ষণের নিমিত্ত দায়ী ঢাকা মেল-ট্রেনের গার্ড এবং ড্রাইভার উভয়েই চুয়াডাঙ্গার মহকুমা আদালতে ফৌজদারী-সোপর্দ্দ হইয়াছিল। চুয়াডাঙ্গার মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ঐ ট্রেণের গার্ড এবং ড্রাইভার উভয়েই অপরাধী প্রতিপন্ন হওয়ায় দণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত আসামীদ্বয় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে নদীয়ার দায়রা-জজের আদালতে আপীল করিয়াছিল। আপীলের বিচারে গার্ড মুক্তিলাভ করিয়াছে। দায়রা-জজ ড্রাইভারের তিন বৎসরের কারাদণ্ড হ্রাস করিয়া দুই বৎসর কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। এই ভীষণ দুর্ঘটনায় বহু পরিবারের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, অপরাধীর দণ্ড যতই কঠিন হউক, সে ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে এইরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্য যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন একান্তই প্রয়োজন। বিশেষতঃ, ট্রেণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর ত্রুটিতে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহাদের কার্য্যে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য থাকা বিশেষ আবশ্যক। এইরূপ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটির জন্য দোষীদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিলে ট্রেণের কর্ম্মচারীরা সতর্ক হইতে পারে।

—

সাফল্যের সুষমা

লর্ড জেটল্যাণ্ড তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালায়, পঞ্চনদ প্রদেশে, সিন্ধুতে, এবং আসামে সরকারের নির্ব্বাচিত শাসন-ব্যবস্থা অতি সুন্দর ভাবে পরিচালিত হইতেছে।" কি চমৎকার মন্তব্য! "সর্ব্বঃ কান্তমাত্মীয়ম্ পশ্যতি।" মানুষের স্বভাব এই যে, যাহার দ্বারা যাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সে তাহাকেই আত্মীয় মনে করে; আত্মীয়কেই লোক সুন্দর দেখে। তাই বলিয়া বহুদর্শী ও প্রখরবুদ্ধি লর্ড জেটল্যাণ্ডের এই অশোভন অসার উক্তি শুনিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। লীগের ন্যায় সাম্প্রদায়িক মুসলীম-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত বাঙ্গালা সরকার কিরূপ যোগ্যতা সহকারে বাঙ্গালার শাসন সংরক্ষণ কার্য্য করিতেছেন, তাহা 'বিদিত হইবে।' আবার পঞ্চনদে মুসলমান শাসন কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহা ঐ প্রদেশের শ্রমশিল্প বিভাগের অধ্যক্ষ (Director of Industries) রায় বাহাদুর রামলালকে অকালে কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য করাতেই সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হইয়াছে। তথাকার সচিবদলের বিরুদ্ধবাদীরা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, প্রধান-সচিবের কোনও ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত লোককে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্যই রায় বাহাদুর রামলাল এই ভাবে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিকাশ-সাধন বিভাগের সচিব এই আত্মীয়তার কথা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে সে ব্যক্তি মুসলমান হইলেও যোগ্যতায় তাহার জোড়া মেলে না! এইরূপ অজুহাতে যদি হিন্দুদিগকে তাহাদিগের স্থায়ী পদ হইতে বিতাড়িত করা হয়,—তাহা হইলে সে শাসন কেমন সুন্দর লর্ড জেটল্যাণ্ডের তাহা বুঝিতে বিলম্ব না হইবারই কথা বটে! এমন দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় কি? ঐ চারিটি অকংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থার প্রশংসা-কীর্ত্তনে লর্ড জেটল্যাণ্ড কি জন্য লজ্জা বোধ করিলেন না, তাহা বুঝাইতে লজ্জাকেও কি লজ্জা পাইতে হয় না? কিন্তু 'গরজকা নাহি লাজ!'

—

প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি

ভারত-সচিব ফাঁকতালে ভারতবাসীকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দানের আর এক দফা প্রতিশ্রুতি খয়রাৎ করিয়াছেন; সুতরাং 'দানে দানে ধূল-পরিমাণ!' তিনি কি আশা করেন তাঁহার এই ফাকা আওয়াজেই ভারতের লোক গুরু-ভোজনের উদ্গার তুলিয়া পেটে হাত বুলাইবে? তাঁহারা যখন যাহা-যৎকিঞ্চিৎ বিতরণ করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতির আড়ম্বরে আসর না জমাইয়াই দিয়াছেন, এবং চাল কাঁড়া কি আকাঁড়া সে সম্বন্ধে ভারতবাসীর অভিমতের বা অভিযোগেরও প্রতীক্ষা করেন নাই! উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের কথাই বলা যাইতে পারে। তাঁহারা ভারতবাসীর মত না লইয়া একেবারে আচম্কা দড়াম করিয়া উহা ভারতবাসীর দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন; তাহার পর সেই বোঝা বহিতে ভারতবাসী লবেজান! এবারও তাঁহারা ঐ ভাবে ভারতবাসীর মতামত না লইয়া তাহাদের ঘাড়ে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মধুর হাঁড়া চাপাইয়া দিলেন না কেন? প্রভু, কাঙ্গালকে পুনঃ পুনঃ শাকের ক্ষেত আর দেখাইবেন না, খালি পেটে অত করুণা বরদাস্ত হইবে না; অনাহারের উপর অজীর্ণ সাংঘাতিক হইতে পারে। যদি ওয়েষ্ট মিনিষ্টারী ছাঁদের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়াই মালিকদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আবার দেশরক্ষার কথা উঠে কেন? ভারতবাসীর পক্ষে দেশ রক্ষার জন্ত ইংরেজের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইবেই ত। সে ব্যবস্থা তখনকার রাষ্ট্রনায়কগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। উপনিবেশগুলির রক্ষার ভার যেমন গ্রেটবৃটেন গ্রহণ করিয়াছেন ভারতের রক্ষার ভারও সেইরূপ গ্রেটবৃটেনকে গ্রহণ করিতে হইবে। ঘোড়া নাই, চাবুক জুটিবে কিনা ভাবিয়া দুশ্চিন্তায় ঘুম হইতেছে না! ইহা কি হাস্যোদ্দীপক নহে?

—

বৃটিশ জাতির বিপ্লব

গত ২২শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে সার আলফ্রেড ওয়াটসন "ভারতের শাসন যন্ত্র ও সংগ্রাম" নামক একটি সন্দর্ভ পাঠ করেন। উহাতে তিনি বলেন যে, "আন্তর্জ্জাতিক এই মহাসঙ্কটের সময় ভারতীয় রাজনৈতিকরা যে তাঁহাদের স্বায়ত্ত শাসন লাভের পথে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়াছেন, ইহাতে ইংরেজ-জাতি স্তম্ভিত হইয়াছেন!" এই কথা লইয়া এদেশে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুত পিয়ারী লাল এ সম্বন্ধে "হরিজন" পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "বৃটিশ জাতির বিবেক-বুদ্ধি অনেকটা স্থিতিস্থাপক; অর্থাৎ উহা যখন যেমন তখন তেমনই হইয়া দাঁড়ায়। কাজের সময় ইহারা গম্ভীরবেদী হন, এবং স্তম্ভিত হন না।" ভারতের অন্যতম অবসরপ্রাপ্ত শাসক মিষ্টার এফ, জি প্র্যাট (Pratt) ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বিগত যুদ্ধ যখন প্রবল ভাবে চলিতেছিল, তখন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে বিলাতে যে ঔপনিবেশিক মন্ত্রীদিগের মহাসম্মেলন হইয়াছিল, তখনও সেই সভায় ভারতকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিবার কথা হইয়াছিল। তখন ত, রুশিয়ায় বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, ভীষণ শৈলমালায় তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তখন কর্ত্তৃপক্ষ উপনিবেশগুলির এবং ভারতের শাসন-সংস্কারের কথা বলিতে পারিয়াছিলেন। তখন ত এই ইংরেজ জাতি উপনিবেশগুলির অধিকার-প্রাপ্তির কথায় রাজনৈতিক দরকষাকষির কথা বলেন নাই। এখন কেবল ভারতের ভাগ্যেই বাক্যের জোয়ার ছুটিল! ভারতের লোক নিজের ঘর সামলাইবার কথা বলিলেই গৃহস্থের মন বুঝিবার জন্য তাহাদের ঘরের বেড়া নাড়িয়া দেখিবার ধুম পড়িয়া যায়! বাক্-বিভূতিতে এ দেশের লোককে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা কি কখন বিরাম হইবে?

আজাদ সম্মেলন

গত ১৪ই বৈশাখ শনিবার নয়া দিল্লীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের আজাদ সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়; এই বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল তিনদিন। ইহা আজাদি অর্থাৎ স্বাধীনতাকামী মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মেলন। খাঁন বাহাদুর সেখ মহম্মদ জান অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও খাঁন বাহাদুর আল্লাবক্স এই সমিতির মূল সভাপতি হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বাধীনতালাভের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যথাকালে প্রকাশ, ঐ দিন অপরাহ্ন সাড়ে ৪ ঘটিকার সময় অধিবেশন আরম্ভ হইবার কথা ছিল—কিন্তু শ্রোতার এবং সদস্যের সংখ্যাধিক্য না হওয়ায় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পূর্ব্বে সভার কার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই। সভাপতির অভিভাষণে যে কষ্ট-কল্পনার আভাস ছিল, কথাগুলি সংক্ষেপে বলিলে সেই ত্রুটি সংশোধিত হইতে পারিত। এই সমিতি মস্লিমলীগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইলেও বহু বিষয়ে লীগের বিরোধী মত ইহাতে প্রকাশ হই- পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে এই সমিতি কংগ্রেসের সহিত একমত; কিন্তু ইহা ভারতবর্ষকে জবাই করিয়া তাহার ধড় ও মুণ্ড দ্বারা হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থান নির্ম্মাণের প্রস্তাবের বিরোধী। গত ১৬ই বৈশাখের অধিবেশনে এই সমিতি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সুস্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছিল, "পূর্ণ স্বাধীনতাই তাঁহাদের কাম্য; ভারতবর্ষ সকল সম্প্রদায়ের জননী, এই হেতু উহা অবিভাজ্য। অধিকন্তু সাম্রাজ্যবাদের কতকগুলি পাণ্ডা বলিয়া থাকেন, মুসলমান সম্প্রদায়ই ভারতের স্বাধীনতালাভের পক্ষে অর্গলস্বরূপ, তাঁহাদের এ কথা সত্য নহে। মুসলমান সম্প্রদায় স্বাধীনতা-সংগ্রামে কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকা লজ্জাজনক মনে করেন," ইত্যাদি। ইহারা মুস্লিম-লীগকে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক-মাত্র মুখপাত্র বলিয়া মনে করেন না। এই সমিতিতে মৌলবী ও মৌলানাগণের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহারা নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহারা আপনাদিগকে সাম্প্রদায়িকতার মোহপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। সাম্প্রদায়িকভাবে গণপরিষদ-গঠন প্রস্তাবেই তাহা সুপ্রকাশ।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরামর্শ

সার জগদীশ প্রসাদ এবং সার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার গত ১৪ই বৈশাখ দার্জ্জিলিং হইতে এই অভিমত প্রচার করিয়াছেন যে, কংগ্রেস যে সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব বর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সাতটি প্রদেশে তাঁহাদের অবিলম্বে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা আবশ্যক; তাঁহারা মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া এইভাবে অচল অবস্থায় সৃষ্টি করিয়া রাখিলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন মতেই সমাধান হইতে পারিবে না। সার জগদীশ প্রসাদ আরও বলিয়াছেন,—লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ভারতে থাকিতে এই অচল অবস্থার অবসান ঘটাইলে দেশের স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে। সার নৃপেন্দ্র নাথ সার জগদীশ প্রসাদের উক্তির সমর্থন করিয়া আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন; বলিয়াছেন,—ভারতের মঙ্গল সাধন করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া সে কার্য্যভার ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু যত অধিক দিন তাঁহারা উহাতে অবিচলিত থাকিবেন—তাঁহাদের প্রভাব ততই ক্ষয় পাইবে। অতএব অবিলম্বেই কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা উচিত।—ইহারা উভয়েই ভারত সরকারের অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সেই জন্য, ইহাদের উভয়ের মিলিত কণ্ঠের ঐকতানিক ধ্বনি শুনিয়া অনেকে মাথা নাড়িয়া নেপথ্যে যে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সংশয়-তিমিরবর্জ্জিত নহে; তবে ঐ সকল কথা খয়ের খাঁয়ের দলের মুখ হইতে বাহির হইলে যেরূপ চাপা উপেক্ষার হাসি ও সুতীব্র বিদ্রূপের বাঁশি ঘরে ও বাহিরে বাজিয়া উঠিত, তাহার অভাব লক্ষিত হইতেছে বটে; ইহার আরও একটি কারণ, উভয়েই স্বদেশের কল্যাণ কামনা করেন। যাহা হউক, লর্ড লিন্‌লিথগো যদি এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন—তাহা হইলে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব পুনঃ-গ্রহণ না করিলেও তাঁহার পক্ষে সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব না হইতেও পারে। ন্যায় পথে ব্যবস্থা করিলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার বা সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সমস্যার সমাধান করা কঠিন হইবে না। সকল সম্প্রদায়ই ত তাঁহাদের বক্তব্য বড়লাটের সকাশে পেশ করিয়াছেন; স্ব স্ব দাবীও তাঁহার গোচর

করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি যদি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন—তাহা হইলে ভারতবাসী হিতৈষী-জ্ঞানে তাঁহাকে চিরদিনই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পণ করিবে! প্রত্যেক সম্প্রদায় যাহাতে আপনাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম্ম প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারে যদি তাহার সুব্যবস্থা হয়, এবং যদি রাজনীতি-ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও মনীষা যথাযোগ্যভাবে সমাদৃত হয়, তাহা হইলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে। ইহা ভিন্ন অন্য পথ আছে বলিয়া মনে হয় না। সার নৃপেন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সংখ্যাল্প সম্প্রদায় নিজ সম্প্রদায়ের লোকের ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়া আপনাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যাহাই চাহিবেন, তাহাই পাইবেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাতে কথাটিও কহিতে পারিবেন না, এরূপ ব্যবস্থা করিলে তখন যে অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা অসম্ভব, এবং তদনুসারে কার্য্য করা কঠিন হইবে।"—এ কথা সত্য; এবং যদি ইহাই ধার্য্য হয় যে, ঐরূপ ব্যবস্থা কেবলমাত্র সম্প্রদায়গত কৃষ্টি, সভ্যতা, এবং ধর্ম্ম বিষয়ে নিবদ্ধ থাকিবে, সাধারণ রাজনীতিক অধিকার সম্পর্কে তাহা ব্যবহৃত হইবে না,—তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। তিনি আর একটা কথা বলিয়াছেন—ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনযন্ত্র-গঠনে বৃটিশ জাতির কোন হাত থাকিবে না,—এ কথাটা তর্কশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে, কিন্তু উহা বাস্তবিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলা হইতেছে না। তর্কশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্রের উপর বেশী জোর দেওয়া ঠিক নহে। ইংরেজ তাহা করেন না; মুসলমানেরাও তাহা করেন না। মুসলমানগণ সে জন্য কিছু সুবিধা করিতে পারিয়াছেন—ইহাই সার নৃপেন্দ্রনাথের উক্তি। ন্যায়ের পথ ছাড়িয়া সুবিধাবাদের পথ ধরা সঙ্গত কি না, সে বিষয় লইয়া আমরা সুধী সার নৃপেন্দ্রনাথের সহিত তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু সত্যের অনুরোধে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটের কংগ্রেসের অধিবেশন পর্য্যন্ত এবং তাহার পরেও কিছুদিন কংগ্রেস এই সুবিধাবাদকে আশ্রয় করিয়া চলিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোন সুবিধাই হয় নাই। আসল কথা, মুসলমানদিগের সুবিধার অন্য কারণ আছে। আমরা এস্থলে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বোলতার চাকে খোঁচা দিতে চাহি না।

স্বাস্থ্যরক্ষাতত্ত্ব শিক্ষা

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে হাতে-কলমে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের তথ্যগুলি বুঝাইবার জন্য গত ১৪ই বৈশাখ শনিবার হইতে তিন দিন কলিকাতাস্থিত নিখিল ভারতীয় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাদুঘরে (All India Institute of Hygiene and Calcutta Corporation of Health Museum) ছাত্রগণকে উপদেশদানের আয়োজন করা হইয়াছিল। ঐ দিন সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যেই কলিকাতার বহু স্কুলের শত শত ছাত্রে উভয় স্থানই পূর্ণ হইয়াছিল। জনতা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় চিত্র এবং আদর্শগুলি প্রদর্শন করিয়া ছাত্রদিগকে তাহা বুঝাইবার অসুবিধা হইয়াছিল। ছাত্ররা উহা শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। স্বাস্থ্যরক্ষা-সংক্রান্ত অনেক তথ্যই তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিরূপ জল পান করা উচিত, কিরূপ খাদ্য খাইলে দেহের পুষ্টি সাধিত হয় তাহা জানিয়া রাখা ভাল; কিন্তু গ্রামে যাহাদের বাস, যাহাদের নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব, যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, এই সকল উপদেশ তাহাদের পক্ষে নিষ্ফল, উপহাস মাত্র। যাহা হউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার খান বাহাদুর আজিজুল হক ছাত্রদিগকে কি প্রকারে শরীর এবং স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে দেহ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা কিরূপ আবশ্যক, ইহা বাঙ্গালা ভাষায় পরিস্ফুটরূপেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ছাত্ররা এই সম্বন্ধে আলোকচিত্রাদি দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিল। জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জীবন ধারণের উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক, তাহা অর্থসাপেক্ষ; সেই অর্থার্জ্জনের উপায় নির্দ্ধারণই সর্ব্বপ্রধান সমস্যা; এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে না করিলে অন্য কোন চেষ্টাই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদ

বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচন দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল। যতদিন ইহার থাকিবার কথা, তাহার প্রায় দ্বিগুণ কাল ইহাকে কার্য্যে নিয়োজিত রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থানুসারে আগামী ১৪ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর) ইহার স্থিতিকাল শেষ হইবার কথা। কিন্তু অতঃপর কার্য্যের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে 'প্রশ্ন ইহাই এখন।' কেহ কেহ বলিতেছেন, যুদ্ধের সময় নির্ব্বাচন বন্ধ রাখা হউক। যুদ্ধ কতদিন চলিবে কেহই তাহা বলিতে পারেন না। যদি যুদ্ধের স্থায়িত্বকালের উপর এই ব্যবস্থা-পরিষদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই পরিষদকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য টানিয়া লম্বা করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, কংগ্রেস কর্ত্তৃক যদি আগামী শরৎকালে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা হইলে এই নির্ব্বাচনের কাল পিছাইয়া দিতে হইবে। তবে গান্ধীজীর প্রস্তাব, সহসা তিনি আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবেন না। কংগ্রেস গণ-পরিষদ সম্বন্ধে দেশের লোকের অভিমত জানিবেন; মস্লিম লীগও পাকিস্থানের প্রস্তাব সম্বন্ধে মুসলমান সমাজের পাকাপাকি মত জানিবার চেষ্টা করিবেন। অনেকেই ত পাকিস্থানের প্রস্তাব উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া কাঁচাইয়া দিয়াছেন। এখন লর্ড লিন্‌লিথগো এ বিষয়ে কি করিবেন? আগামী ২৫শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর) ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদের শারদীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবার কথা। কিন্তু মেঘাড়ম্বর দেখিয়া মনে হইতেছে ইহার অধিবেশন কিছু পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব। আর এতদিন ধরিয়া যদি নির্ব্বাচন বন্ধ রাখা হয় তাহা হইলে উহাতে জনমত যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত হয় কি?

আইন অমান্য আন্দোলন

গান্ধীজী সম্প্রতি 'হরিজন'-পত্রে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা লিখিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন, এখন সকলে মিলিয়া আইন ভঙ্গ আন্দোলন আর চালান হইবেই না। তবে কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আইন

অমান্ত আন্দোলনের কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বকই করিয়াছিলেন। যদি উহা প্রবর্ত্তিত করিতেই হয়, তাহা হইলে কি ভাবে উহার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা পরামর্শ-সমিতির বিচার্য্য বিষয় ছিল। তাঁহাদের কাছে অন্ত কোন বিচার্য্য বিষয় ছিল না। এখন কথা হইতেছে, যদি ইহা অবলম্বন করিতেই হয়, তাহা হইলে একমাত্র গান্ধীজীই তাহার রূপ প্রদান করিতে পারিবেন; অন্ত কেহ পারিবেন না। গান্ধীজীর মতে দেশে এখন যেরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই সময় আইন অমান্ত আন্দোলন চালাইলে উহাও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং নিয়মবহির্ভূত ব্যাপারেই পরিণত হইবে। খাকসার আন্দোলন অহিংসার পথে চালিত হইতেছে না। যে সকল কৃষাণ গয়া এবং কিউল ষ্টেশনের মধ্যে ট্রেণ থামাইয়াছিল, তাহাদের কার্য্যও বৈধ আইন অমান্ত নহে; অথচ ঐ কৃষাণরা কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব এখন আইন অমান্ত আন্দোলন চালাইবার সময় হয় নাই। রামগড়ে আইন অমান্ত আন্দোলন সম্বন্ধে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, গান্ধীজীর অনুমোদন ব্যতীত কংগ্রেস আইন অমান্ত প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন না। অতএব ইহা স্থির যে, এখন আইন অমান্ত আন্দোলন চলিবে না।

প্রচারের বাহাদুরী

খাজা সার নাজিমুদ্দীন এবার জৌনপুর জিলা-মুস্লেম লীগের সভাপতি হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার সহিত সত্যনিষ্ঠার কতটুকু সম্বন্ধ ছিল,—তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লীগপন্থী মুসলমানরাও স্বাধীনতা কামনা করেন; তবে তাঁহাদের মনে এই একটা মস্ত ভয় জন্মিয়াছে যে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চাপে, যাহারা সংখ্যাল্প তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে! পৃথিবীর কোন দেশেই গণ শাসনের ব্যবস্থায় সংখ্যাল্প সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চাপে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাওয়া ত দূরের কথা, কোনরূপ ক্লিষ্ট হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না। যে রাজ্যে নিয়মানুগ ভাবে গণ-শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,—তথায় ঐরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইতেই পারে না; কারণ, প্রকৃত গণ-শাসনে ক্ষমতার পরিবর্ত্তে যুক্তিরই প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা মনে করেন যে, প্রকৃত গণ-শাসনে সংখ্যাল্প সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতে পারে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে গণ-শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। খাজা সাহেবের যদি শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানও থাকিত, তাহা হইলে তিনি বুঝিতেন যে, সর্ব্বপ্রকার হিতসাধক শাসনের,—বিশেষতঃ গণ-শাসনের,—মূলনীতিই হইতেছে যে, উহার আইন এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যে, সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল-সাধনই যেন উহার লক্ষ্য হয়, এবং সাধারণের হিতসাধন করিবার জন্ত কোন সম্প্রদায়-বিশেষকে বিশেষ অধিকার দেওয়া না হয়। কেবলমাত্র সাধারণের হিতসাধন করিবার জন্তই নিতান্ত আবশ্তক হইলে ঐরূপভাবে বিশেষ অধিকার দিতে হইবে। (সিজউইক Elements of politics p. 582)। সুতরাং গণ-শাসন যদি ঠিক মত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে কখনই উহার ফলে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকা ত দূরের কথা, কোন সম্প্রদায়ের কোনরূপ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকিবার পর্য্যন্ত কথা নয়। ইহাতে লাভ হইতেছে কাহার, তাহা সহৃদয় হিন্দু এবং মুসলমান নেতৃবর্গ ভাবিয়া দেখিবেন।

বসু-লীগ যোগযাগ

শ্রীযুত সুভাষ বসুর দল কলিকাতা কর্পোরেশনের মুস্লিম লীগদলের সহিত যে যোগযাগ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা 'কোন চোখে বা হাসি, আর কোন্ চোখে বা কাঁদি!' আমরা ইহার পূর্ব্বে সুভাষ বাবুর অনেক কার্য্যের সমর্থন করিয়াছি, কোন কোন কার্য্যের সম্বন্ধে ভিন্ন মতও প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আমরা তাঁহার এই কার্য্যে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত এবং দুঃখিত হইয়াছি। কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কংগ্রেসের লোক বলিয়া কলিকাতা-কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে কাহাকেও দাঁড় করাইবেন না; এ বিষয়ে তাঁহারা উদাসীনই থাকিবেন। কিন্তু তাহা হইলেও বসু মহাশয়ের দলস্থ যাঁহারা কংগ্রেসের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা আপনাদিগকে কংগ্রেসের লোক বলিয়া কেন পরিচিত করিলেন, তাহা আমরা বুঝি না। ইহা অসঙ্গত। অধিকন্তু, লীগের সহিত কংগ্রেসী উপদল সুভাষ বাবুর যোগযাগ হইল কি উপায়ে তাহাও আমরা বুঝি নাই। সুভাষ বাবুর অগ্রগামী দল আর যাহাই করুক, তাহারা সমস্ত ভারতবর্ষের লোকদিগকে এক অখণ্ড জাতি মনে করে, এবং একই জাতীয়ভাবে প্রভাবিত করিতে চাহে। মুস্লিম-লীগ ভারতকে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থানে বিভক্ত করিয়া ইহাকে জীর্ণ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। মুস্লিম-লীগ কেবল বলিতেছে যে, কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর নিদারুণ অত্যাচার করিতেছে, অথচ সে সম্বন্ধে তাহারা একটি প্রমাণও উপস্থিত করিতে পারে নাই। সুভাষ বাবু যখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন তিনি কংগ্রেসের সহিত লীগের মিলন ঘটাইবার জন্ত একাধিক বার জিন্নার দ্বারস্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু তখন ত তিনি মিলন ঘটাইতে পারেন নাই—এখন সে মিলন হইল কি করিয়া? সুভাষ বাবুকে এ ভাবে রাজনৈতিক পঙ্কে লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়া আমরা কেবল দুঃখিত নহি, স্তম্ভিত!

মৌলবী মুজীবর রহমান

গত ১৩ই বৈশাখ শুক্রবার মৌলবী মুজীবর রহমানের মৃত্যু হইয়াছে। মৌলবী সাহেব জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন। তিনি দক্ষতার সহিত 'মুসলমান' নামক সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় ব্রত পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় উদার ছিল, এবং তিনি জাতীয়তাবাদী হিন্দুর সহিত দীর্ঘকাল একযোগে কার্য্য করিলেও স্বার্থের অনুরোধে কোন দিন তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা না থাকিলেও অর্থের জন্ত সম্পাদকের পবিত্র ব্রত হইতে তাঁহাকে কখন বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি ও খিলাফৎ সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তিনি এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। সততা ও স্বদেশানুরাগের জন্ত সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বহু সদ্গুণের কথা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার মৃত্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছি।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ অসুস্থ দেহে কলিকাতা হইতে তাঁহার ঘাটশীলার ভবনে গমন করিয়া ১০ই বৈশাখ মঙ্গলবার হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ নানা ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি কিছুদিন 'ভারতবর্ষে'র অন্যতর সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন; তাহার পর একে একে 'সঙ্কল্প' 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি কয়েকখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে পঞ্চপুষ্পই

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কিছুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি মিষ্টভাষী ও নিরহঙ্কার ছিলেন, এবং বাক্যচ্ছটায়ও লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিতেন। ভাষা সম্বন্ধে তিনি গবেষণাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া শেষজীবনে বঙ্গীয় 'মহাকোষ' সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশে একজন বহু-ভাষাবিদের অভাব হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, এবং সর্ব্ব-প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ২০শে বৈশাখ শুক্রবার রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার বালিগঞ্জস্থ ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পরদিন প্রভাতে সার্কুলার রোডস্থ শবদাহ-স্থলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যানুরাগী ছিলেন; তিনি সাহিত্যানুশীলনে তাঁহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, এবং ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। কিন্তু তিনি সাহিত্যে স্থায়ী-কিছু রাখিয়া যান নাই। তাঁহার হৃদয় স্নেহ-প্রবণ ও উদার ছিল; তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগের অভাবে জনসাধারণ কোন দিন তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পায় নাই। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহাও অনন্যসাধারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা তিনি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বীমার কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি এদেশে বীমার উন্নতি-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার একটি বীমা-প্রতিষ্ঠানের সহিত বহুদিন তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। সুরেন্দ্রনাথের বৃদ্ধা জননী এখনও জীবিতা আছেন; তিনি একমাত্র পুত্রের বিয়োগে বার্দ্ধক্যে যে শোক পাইলেন, তাহার সান্ত্বনা নাই। আমরা সুরেন্দ্রনাথের শোকার্ত্ত পরিজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জর্জ্জ লান্সবারী

জর্জ্জ ল্যান্সবারী পরলোকে

সংপ্রতি জর্জ্জ ল্যান্সবারীর মৃত্যু হওয়ায় ইংরেজের মধ্যে ভারতের একজন প্রকৃত হিতৈষীর অভাব হইল। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসান-কালে এই বিচক্ষণ রাজনীতিক স্পষ্ট-ভাষায় বলিয়াছিলেন, বৃটেন, সার্ব্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে বলিতেছে,—ভারতবর্ষকে যদি সেই পরিমাণ স্বাধীনতা প্রদান না

করে, তবে সে অন্যান্য জাতির স্বায়ত্ত শাসনের দাবী লইয়া শান্তি-সম্মিলনে যাইতে পারে না।—তাঁহার এই দুরাশা পূর্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু এই উক্তিতে তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী হিতৈষীর মৃত্যুতে ভারতের শিক্ষিত সমাজ আজ ক্ষুব্ধ। তিনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন বৈচিত্র্যবহুল। তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন, কিন্তু স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁহাকে পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত করা হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লামেণ্টে পুনঃ প্রবেশ করেন। তিনি লেনীনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রমিকনায়ক হইয়াছিলেন। তিনি ইটালীর আবিসিনিয়া আক্রমণের প্রতিবাদে ইটালীর বিরুদ্ধে সামরিক 'স্যাংসনের' সমর্থন করেন। চিরদিনই তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। এতদিনে সেই সংগ্রামের অবসান হইল; ভগবান তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।

শোক-সংবাদ

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাপন্ন এটর্ণী রমেন্দ্রলাল গুপ্ত গত ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় বারটার সময় তাঁহার ধর্ম্মতলাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

রমেন্দ্রলাল বাবু ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া
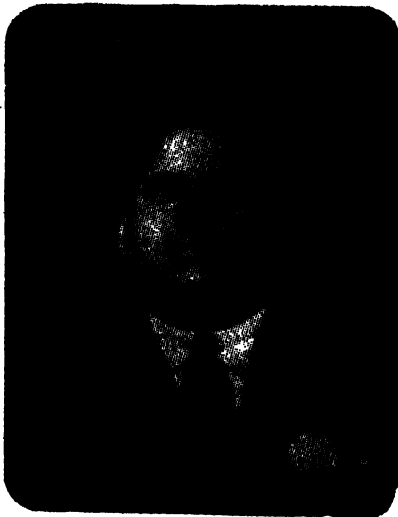
রমেন্দ্রলাল গুপ্ত

অধ্যবসায় এবং আইন-শাস্ত্রে পারদর্শিতাবলে অল্পদিনেই ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় দয়ায় পূর্ণ ছিল; বহু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি বিধবা পত্নী, এক পুত্র, এবং দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

সুরেশ্বরী দেবীর স্মৃতি-পূজা

কলিকাতা নিমু গোস্বামীর লেনের মহীয়সী মহিলা স্বর্গীয় সুরেশ্বরী দেবী আহিরীটোলা পল্লীর হিতসাধন ব্রতে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী—বুদ্ধিমতী প্রবীণা মহিলার

সুরেশ্বরী দেবী

সংখ্যা বর্ত্তমান যুগে দিন দিন বিরল হইতেছে। তিনি স্বগৃহে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসেবার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই ইংরেজী শিক্ষাসভ্যতার অন্ধ অনুকরণের যুগে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার তাঁহার একান্ত কাম্য ছিল। তাঁহার স্মৃতিপূজা উপলক্ষেও বাঙ্গালার বিভিন্ন টোলে সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ সোম

গত ২১শে বৈশাখ শনিবার অপরাহ্ণে কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম ৭০বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পাটনায় ওভারসিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিভিন্ন স্থানে কাজ করিয়াছিলেন; পরে কলিকাতায় কর্পোরেশনের কার্য্যেও অনেক দিন নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সেকালের বহু মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতা প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন; কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিতই তাঁহার রচিত বহু তথ্যপূর্ণ প্রধান গ্রন্থ। তিনি চিরকুমার ছিলেন। ভগবান এই মধুরহৃদয় সাহিত্য-সেবকের আত্মার কল্যাণ করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তাড়াতাড়ি

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭] [শিল্পী—মিষ্টার টমাস

১৯শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ [২য় সংখ্যা

শাক্ত-সিদ্ধান্তের পরিচয়

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যত প্রকার উপাসক-সম্প্রদায় প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতিই তন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত; এই তন্ত্রের প্রভাব এরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, বৈদিক এবং পৌরাণিক উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যেও তাহার চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের ভেদও বহুপ্রকার। এই সকল সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই কোন না কোন একটি দার্শনিক মতবাদকে অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শাক্ত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই প্রসঙ্গে এখানে বক্তব্য—চার্ব্বাক-মত ব্যতীত ভারতবর্ষের সমস্ত দার্শনিক মতবাদেই শাস্ত্রকে অর্থাৎ আপ্ত-বাক্যকে কোন না কোন ভাবে প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে; বৌদ্ধ এবং জৈন দার্শনিকগণ যদিও বেদকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন নাই, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মূল গুরুর উক্তিকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে, যদি সকল সম্প্রদায়ই শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরস্পর মতভেদ হয় কেন? একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমরা নানারূপ অবান্তর ভেদ দেখিতে পাই কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্র এবং সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পুরুষ এক হইলেও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ নিজ নিজ অনুভব অনুসারে সেই সকল শাস্ত্র ও গুরুর উক্তির যেরূপ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহারা শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা-পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্নতা লক্ষিত হইলেও, মূলতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লক্ষ্য এক একটি কেন্দ্রের অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত আছে। এইরূপ মত-ভেদের হাত হইতে অবৈদিক জৈন এবং বৌদ্ধগণও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই; এই জন্যই জৈনদের মধ্যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামক দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সত্তা লক্ষিত হয়। বৌদ্ধগণের মধ্যে সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক নামক চারিটি প্রধান সম্প্রদায় এবং সেই চারিটি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অবান্তর অনেক সম্প্রদায়

দেখিতে পাওয়া যায় (১)। বৌদ্ধ দার্শনিকগণও এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—শিষ্যগণের বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য অনুসারে গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য বিভিন্নভাবে প্রচারিত হওয়ায় সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে, একথা তাঁহারাও বলিয়া গিয়াছেন (২)।

মনুসংহিতার কুল্লুকভট্টের টীকায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে (২।১) একটি হারীতের বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, "শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ"। এই বচনের বঙ্গদেশে অনেকে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন;—শ্রুতি দুই প্রকার, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী; বৈদিক শ্রুতি অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া যেরূপ ধর্ম্মে প্রমাণ, তান্ত্রিকী শ্রুতিও সেইরূপ স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মে প্রমাণ; অর্থাৎ বেদ যেরূপ নিজের প্রামাণ্যের জন্য তন্ত্রের বা অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ, তন্ত্রও সেইরূপ বেদের বা অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ। বেদ ও তন্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু; ইহাদের প্রবর্ত্তিত পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন; যদি কোন স্থানে বেদের সহিত তন্ত্রের বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে এই বিরোধের জন্য যেমন বেদের অপ্রামাণ্য হয় না, সেইরূপ এই বিরোধের ফলে তন্ত্রেরও অপ্রামাণ্য হইতে পারে না; যেহেতু, তন্ত্র স্বয়ং প্রমাণ।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অপ্পয় দীক্ষিত এইভাবে তন্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের শ্রীকণ্ঠ-প্রণীত শৈববিশিষ্টাদ্বৈত-মতানুযায়ী যে ভাষ্য আছে, অপ্পয় দীক্ষিত "শিবার্কমণিদীপিকা" নামে তাহার একখানি বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছেন; সেই টীকায় তিনি প্রসঙ্গক্রমে তন্ত্রের প্রামাণ্য বিচার করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, তন্ত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—কতকগুলি তন্ত্র বেদের অনুকূল এবং কতকগুলি তন্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ। যাঁহারা বেদে অধিকারী, বেদানুকূল তন্ত্রগুলি তাঁহাদের জন্য; যাঁহারা বেদে অধিকারী নহেন, বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রগুলিতে তাঁহাদের অধিকার (৩)।

শাক্ত দার্শনিক ভাস্কর রায় বলিয়াছেন,—তন্ত্রশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের (স্মৃতিশাস্ত্রের) অন্তর্গত (৪)। তন্ত্রশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত হইলেও মনু-প্রভৃতি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের যে বৈলক্ষণ্য আছে, তাহার উল্লেখ করিতে তিনি ভুলেন নাই। ভাস্কর রায় বলিয়াছেন, মন্বাদি-প্রণীত স্মৃতি বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অনুকূল হওয়ায় সেগুলি বেদের কর্ম্মকাণ্ডভাগের উপযোগী; তন্ত্রশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র হইলেও বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত উহার সম্পর্ক নাই, উহা বেদের ব্রহ্মকাণ্ডের উপযোগী (৫)।

শাক্ত দার্শনিকগণের মধ্যে ভাস্কর রায় এক জন অতি প্রধান ব্যক্তি। ভাস্কর রায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার উপাসনা কৌলপদ্ধতির অনুযায়ী ছিল—ইহা তাঁহার লিখিত নানা গ্রন্থ ও পরম্পরা-প্রচলিত কিংবদন্তী হইতে বুঝিতে পারা যায়। নানা প্রমাণের বিচার করিয়া স্থির করা হইয়াছে, ভাস্কর রায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন (৬)।

---

(১) এইরূপ মতভেদ মুসলমান এবং খৃষ্টানসম্প্রদায়েও আছে; মুসলমানগণের সিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায় ব্যতীত সুফি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা অনেকেরই সুবিদিত; খৃষ্টানসম্প্রদায়েও রোমন্ ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট্ সম্প্রদায় ছাড়া আরও অনেক অবান্তর সম্প্রদায় আছে।

(২) দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়-বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোক উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ পুনঃ।—বোধিচিত্ত-বিবরণ,—ভামতীতে (২।২।১৮) উদ্ধৃত।

(৩) দ্রষ্টব্য—শিবার্কমণিদীপিকা ২।২।৩৮, ৪২। আচার্য্য শঙ্করের সৌন্দর্য্যলহরীর লক্ষ্মীধরকৃত টীকাতেও এই কথা বলা হইয়াছে (৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

(৪) তন্ত্রাণাং ধর্ম্মশাস্ত্রেঽন্তর্ভাবঃ।—ভাস্কররায়কৃত বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ১।৬

পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার "শক্তিভাষ্যে" (৩।১।২৫) হারীতের উক্ত বচনের বঙ্গদেশে প্রচলিত অর্থের অনুসরণে তন্ত্রকে শ্রুতির মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন,—"শ্রুতিরপি দ্বেধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ"। ভাস্কররায় তন্ত্রকে শ্রুতি বলেন নাই। শ্রুতির অনুগামী বলিয়াছেন—"সর্ব্বপ্রমাণমূর্দ্ধন্যা শ্রুত্যা তদনুসারিতন্ত্রৈশ্চ" (বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ১।৩)। ভাস্কর রায় তন্ত্রের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে পরিগণনার অনুকূলে তাঁহার তন্ত্ররাজ-ব্যাখ্যানে যে বিস্তৃত বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। দ্রষ্টব্য—বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ১।৬।

(৫) পরমার্থস্তু তন্ত্রাণাং স্মৃতিত্বাবিশেষেঽপি মন্বাদিস্মৃতীনাং কর্ম্মকাণ্ডশেষত্বং তন্ত্রাণাং ব্রহ্মকাণ্ডশেষত্বমিতি সিদ্ধান্তাৎ।—সৌভাগ্যভাস্কর (ললিতাসহস্রনামভাষ্য) প্রথম শতকের উপক্রম

(৬) We may therefore unreservedly assume that the literary career of Bhaskara Raya lasted from begining of the 18th Century A. D. to some where near 1768 A. D—Intorduction (Barivasyarahasya, Adyar edition, 1934.)
P. XXIV.

আমরা এই প্রবন্ধের অনেক স্থলে ভাস্কর রায়ের মত উদ্ধৃত করিব।

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাবে তিনটি সিদ্ধান্ত প্রচলিত,—আরম্ভবাদ (৭), পরিণামবাদ (৮), এবং বিবর্ত্তবাদ (৯)। শাক্ত দার্শনিকগণ পরিণামবাদ স্বীকার করিতেন।

পরম শিব জ্ঞানস্বরূপ,—এই জ্ঞানকে প্রকাশ শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয় (১০)। এই জ্ঞানের আনন্দরূপ যে অংশ, আগম শাস্ত্রে তাহাকে স্ফুরণ, পরাহংতা, বিমর্শ, পরা, ললিতা ভট্টারিকা, ত্রিপুরসুন্দরী প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে (১১)। এই স্ফুরণ বা বিমর্শ ইহা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি; এই বিমর্শশক্তির সহায়তায় শিব জগতের উৎপত্তি, পালন এবং সংহার করিয়া থাকেন (১২)। তন্ত্রশাস্ত্রে পরমেশ্বরের পঞ্চ কৃত্য (কার্য্য) বর্ণিত আছে। উৎপত্তি, পালন এবং সংহার ব্যতীত পরমেশ্বরের অপর দুইটি কৃত্য আছে,—তিরোধান ও অনুগ্রহ (১৩)। এই বিমর্শ-শক্তির সহায়তায় পরমেশ্বরের এই দুইটি কৃত্যও (তিরোধান ও অনুগ্রহ) নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে (১৪)। শিব ও শক্তির মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে,—সেই সম্বন্ধের নাম 'সামরস্যসম্বন্ধ'; এই সামরস্যসম্বন্ধে শক্তিবিশিষ্ট শিব পরব্রহ্ম (১৫)। ইহার তাৎপর্য্য এই—শক্তি ও শিব পরস্পর অভিন্নভাবে পরস্পরের মধ্যে অনুস্যূত আছেন, এই অবস্থাই সমরস অবস্থা; এই সমরসভাবে মিলিত শক্তি ও শিব পরব্রহ্ম; কেবল শিব অথবা কেবল শক্তি পরব্রহ্ম নহেন। শক্তি ও শিব—এই উভয়ের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই সম্বন্ধ এরূপ ঘনিষ্ঠ যে, ইহাকে "সামরস্য" নাম ব্যতীত অন্য নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটি পদার্থের মধ্যেই একটি সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিতে পারে, ইহা আমরা জাগতিক ব্যবহারক্ষেত্রে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আমাদের এই জাগতিক অভিজ্ঞতার ফলে মনে হইতে পারে,—শিব ও শক্তির মধ্যে একটি সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, অতএব এই দুইটি পরস্পর সম্পূর্ণরূপে

(৭) কোন পরম সূক্ষ্ম অবিভাজ্য বস্তু তাহারই সদৃশ অন্য সূক্ষ্ম বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্রমে স্থূল বস্তুরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে,—ইহাই আরম্ভবাদ; নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, ভাট্ট-মীমাংসক, জৈন প্রভৃতি দার্শনিকগণ আরম্ভবাদী।

(৮) কোন একটি সূক্ষ্ম বস্তু ক্রমশঃ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া স্থূলরূপে পরিণত হইয়াছে,—ইহা পরিণাম-বাদ; সাংখ্য, পাতঞ্জল, ভট্টভাস্কর, বল্লভাচার্য্য, নিম্বার্ক, রামানুজ, মাধ্ব গৌড়ীয়বৈষ্ণব প্রভৃতি দার্শনিকগণ পরিণামবাদী।

(৯) কোন পরমার্থ বস্তুর কোন বিকার না ঘটিয়াও বিকৃতরূপে যে প্রতীতি,—ইহাই বিবর্ত্ত; আচার্য্য শঙ্কর এই বিবর্ত্তবাদের প্রধান সমর্থক। ইহা ব্যতীত কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞামতাবলম্বী আচার্য্যগণ "আভাসবাদ" নামক পৃথক্ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেন। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বৌদ্ধগণ পরমাণুবাদী ছিলেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের নাম "সংঘাতবাদ"। নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও জৈন দার্শনিকগণ পরমাণুবাদী হইলেও আরম্ভবাদী; ভাট্ট-মীমাংসক জগদ্বস্তুকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং আরম্ভবাদের সমর্থক ছিলেন।

(১০) জ্ঞানমেব প্রকাশাভিধং—বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ১।৩

(১১) তস্য চানন্দরূপাংশ এব স্ফুরণং পরাহংতা বিমর্শঃ পরা ললিতাভট্টারিকা ত্রিপুরসুন্দরীত্যাদিপদৈর্ব্যবহ্রিয়তে।—বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ১।৩

এখানে ইহা বক্তব্য, ভাস্কর রায় স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসক ছিলেন; এই জন্য ব্রহ্মশক্তিকে ত্রিপুরসুন্দরীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা অন্য দেবীর উপাসক, তাঁহাদের পক্ষে নিজ উপাস্য দেবীকে ব্রহ্মশক্তিরূপে বুঝিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে ভাস্কর রায় এখানে "ইত্যাদি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

(১২) নৈসর্গিকী স্ফুরত্তা বিমর্শরূপাঽস্য বর্ত্ততে শক্তিঃ।
তদ্‌যোগাদেব শিবো জগদুৎপাদয়তি পাতি সংহরতি চ॥
বরিবস্যারহস্য ১।৪

এখানে "তদ্‌যোগাদেব" এই স্থলে "এব" শব্দের প্রয়োগ করায় ইহা সূচিত হইতেছে, এই শক্তির সম্পর্ক ব্যতিরেকে কেবল জ্ঞান দ্বারা কোন কিছুই সাধিত হয় না। ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "সৌন্দর্য্যলহরী"তে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং।
নোচেদেবং দেবো ন ভবতি কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥

(১৩) পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং—সৃষ্টি-স্থিতিসংহৃতী তিরোভাবঃ। তদ্বদনুগ্রহকরণং জগতঃ সততোদিতস্যাস্য—সৌভাগ্যভাস্কর ১১৫

পরমেশ্বরের স্বেচ্ছায় জীবভাবপ্রাপ্তিরূপ যে বন্ধন, তাহার নাম তিরোধান। সেই বন্ধন হইতে যে ব্যাপারের ফলে পুনরায় স্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ ঘটে, তাহার নাম অনুগ্রহ। তিরোধানানুগ্রহৌ বন্ধমোক্ষৌ। সৌভাগ্যভাস্কর ১১৫

(১৪) ইহোৎপাদনাদিত্রয়ং তিরোধানানুগ্রহয়োরুপলক্ষণম্ বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ১।৪

(১৫) সামরস্যসম্বন্ধেন শক্তিবিশিষ্টঃ শিব এব হি পরং ব্রহ্ম।
সৌভাগ্যভাস্কর (ললিতাসহস্রনামভাষ্য) ২০১

পৃথক্ পদার্থ; কিন্তু এরূপ মনে করা অনুচিত। শাক্ত-মতে শক্তি ও শক্তিমান্ তথা উপাদান কারণ ও তাহার কার্য্য—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আত্যন্তিক অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে (১৬); সুতরাং এ স্থলে পৃথগ্‌ভাবের (ভেদের) কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

পূর্ব্বে একথা বলা হইয়াছে যে; শাক্তদার্শনিকগণ পরিণামবাদী। তাঁহাদের মতে বিমর্শশক্তির পরিণতিতেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের আবির্ভাব। এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চকে ভাস্কর রায় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন;—(১ম) অর্থময়ী সৃষ্টি, (২য়) শব্দময়ী সৃষ্টি (৩য়) চক্রময়ী সৃষ্টি এবং (৪র্থ) দেহময়ী সৃষ্টি (১৭)।

এই সৃষ্টিকে আপাতদৃষ্টিতে শক্তির পরিণাম বলিলেও বাস্তবপক্ষে ইহা কেবল শক্তির পরিণাম নহে; যেহেতু কেবল শিব অথবা কেবল শক্তির দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না; সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় এই দুইটি বস্তু একটি অন্যকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্য সম্পাদন করে; সুতরাং যে স্থলে কেবল শিব অথবা কেবল শক্তিকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সেই সকল স্থলেই উভয়কে মিলিতরূপে জগতের কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে (১৮); তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি,—এই জগৎ কেবল শক্তির পরিণাম না হইয়া শিব ও শক্তির সামরস্যরূপ যে পরব্রহ্ম, তাহারই পরিণাম (১৯)। শক্তিরহিত শিব কোন কিছু করিতে সমর্থ নহেন; শিব শক্তিযুক্ত হইয়াই সমস্ত ব্যাপারে সমর্থ হইয়া থাকেন (২০)।

(১৬) শক্তিশক্তিমতোরুপাদানোপাদেয়য়োরত্যন্তমভেদঃ। —বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ১।৩

কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞামতানুযায়ী শৈবাচার্য্যগণও শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করিতেন,—

শক্তিশ্চ শক্তিমদ্রূপাদ্ ব্যতিরেকং ন বাঞ্ছতি।
তাদাত্ম্যমনয়োর্নিত্যং বহ্নিদাহিকয়োরিব॥
অভিনবগুপ্ত-কৃত বোধপঞ্চদশিকা ৩

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরিও শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করিয়াছেন।—দ্রষ্টব্য—বাক্যপদীয় ১।২

(১৭) সাংবশ্যং বিজ্ঞেয়া যৎপরিণামাদভূদেবা।
অর্থময়ী শব্দময়ী চক্রময়ী দেহময্যপি সৃষ্টিঃ॥
বরিবস্যারহস্য। ১।৫

(১ম) অর্থময়ী সৃষ্টি—ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব, (২য়) শব্দময়ী সৃষ্টি—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। (৩য়) দেবতার পূজার যে যন্ত্র, তাহার নামান্তর চক্র,—তৃতীয় প্রকার সৃষ্টি চক্রময়ী। (৪র্থ) স্থূল সূক্ষ্ম দেহ চতুর্থ প্রকারের সৃষ্টি।

বক্তব্য—আগম (তন্ত্র) শাস্ত্রের অনুগামী—শাক্ত এবং কোন কোন শৈব-সম্প্রদায়—৩৬ পদার্থ স্বীকার করেন,—এই ৩৬ পদার্থকে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব বলা হয়। ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব এই—(১) শিব (২) শক্তি (৩) সদাশিব (৪) ঈশ্বর (৫) শুদ্ধ বিদ্যা (৬) মায়া (৭) কলা (৮) (অশুদ্ধ) বিদ্যা (৯) রাগ (১০) কাল (১১) নিয়তি (১২) পুরুষ (জীব) (১৩) প্রকৃতি (১৪) অহঙ্কার (১৫) বুদ্ধি (১৬) মনঃ (১৭) শ্রোত্র (১৮) ত্বক্ (১৯) নেত্র (২০) জিহ্বা (২১) ঘ্রাণ (২২) বাক্ (২৩) পাণি (২৪) পাদ (২৫) পায়ু (২৬) উপস্থ (২৭) শব্দ (২৮) স্পর্শ (২৯) রূপ (৩০) রস (৩১) গন্ধ (৩২) আকাশ (৩৩) বায়ু (৩৪) তেজঃ (৩৫) জল (৩৬) এবং পৃথিবী।

দেহের মধ্য স্থানের নাম মূলাধার,—পায়ু ইন্দ্রিয় হইতে দুই অঙ্গুলী উর্দ্ধে ও উপস্থ ইন্দ্রিয় হইতে দুই অঙ্গুলী নীচে এই মূলাধার অবস্থিত, ইহার আকার অধোমুখ ত্রিকোণ। ইহা কুলকুণ্ডলিনীর স্থান:—

দেহস্য মধ্যমং স্থানং মূলাধার ইতীর্য্যতে।
গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
ত্রিকোণোঽধোমুখাগ্রশ্চ কন্যকাযোনিসন্নিভঃ।
তত্র কুণ্ডলিনী নাম পরা শক্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা॥
মানসোল্লাস—৪।১২-১৩

পরম সূক্ষ্ম যে শব্দ, তাহার স্থান মূলাধার; এই মূলাধারে অভিব্যক্ত পরম সূক্ষ্ম শব্দের নাম "পরা" বাক্। এই পরম সূক্ষ্ম শব্দ যখন নাভিদেশে সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত হয়, সেই অবস্থায় তাহাকে "পশ্যন্তী" বলে। এই বাক্ যখন হৃদয়দেশে ঈষৎ স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হয়, সেই অবস্থায় তাহার নাম "মধ্যমা"। যখন এই বাক্ (শব্দ) কণ্ঠ তালু প্রভৃতির ব্যাপারের দ্বারা শ্রোত্র-গ্রাহ্য স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হয়, সে অবস্থায় তাহাকে "বৈখরী" বলে।—

"পরাবাঙ্‌মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা।
হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা॥"

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ বাক্‌তত্ত্বের বিষয়ে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি ও ভর্ত্তৃহরির পরবর্ত্তী বৈয়াকরণ-গণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে সংক্ষেপে শাক্তসিদ্ধান্তেরই উল্লেখ করিলাম।

(১৮) প্রকাশস্ফুরণয়োশ্চ মিলিতয়োরেব জগৎকারণত্বম্, অন্যতরমাত্রস্য জগৎকারণতানুপপত্তেঃ "কামকলাবিলাস" ব্যাখ্যায়াং স্ফুটতরমুপপাদনাৎ। তেন শুদ্ধস্য শিবস্য শুদ্ধায়াঃ শক্তের্বা জগৎ-কারণত্বং তত্র তত্রোচ্যমানং শিবশক্তিরূপস্তোভয়াত্মন এব বোধ্যম্।
—বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ। ২।৬৭।৬৮

(১৯) ইয়ং সৃষ্টিঃ পরব্রহ্মপরিণামঃ।—বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ২।৬৭,৬৮

(২০) পরো হি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন কিঞ্চন।
শক্তস্তু পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো যদা ভবেৎ।—
বামকেশ্বরতন্ত্র-নিত্যা-ষোড়শিকার্ণব। ৪।৬

প্রথমতঃ এই সৃষ্টিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেও বাস্তবপক্ষে এই সৃষ্টি দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত হইবার যোগ্য,—অর্থময়ী সৃষ্টি ও শব্দময়ী সৃষ্টি; চক্রময়ী সৃষ্টি ও দেহময়ী সৃষ্টি—এই দুই প্রকারের সৃষ্টি—অর্থসৃষ্টিরই অন্তর্গত,—অর্থসৃষ্টি হইতে এই দুই প্রকার সৃষ্টির (যন্ত্রসৃষ্টি ও দেহসৃষ্টির) আত্যন্তিক ভেদ নাই (২১)। এই দুই প্রকার সৃষ্টির (অর্থসৃষ্টি ও শব্দসৃষ্টির) এক সময়েই উৎপত্তি হয় এবং এক সঙ্গেই বৃদ্ধি হইয়া থাকে; বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর ও অঙ্কুরের ছায়া এক সময়েই উৎপন্ন হয় এবং এক সঙ্গেই উভয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ অর্থসৃষ্টি ও শব্দসৃষ্টি এক সঙ্গে উৎপন্ন হইয়া এক সঙ্গেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (২২); শব্দ ও অর্থের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের আরম্ভে, জগতের মাতাপিতা পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে বাক্ (শব্দ) ও অর্থের ন্যায় পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২৩)।

এই দুই প্রকার (অর্থময়ী ও শব্দময়ী) সৃষ্টির জ্ঞান মনের দ্বারা হয়। এই মনঃ শব্দকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করে; অর্থের মধ্যে কতকগুলি অর্থকে সাক্ষাৎ গ্রহণ করে, অপর কতকগুলি অর্থকে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করে।

এই দুই প্রকার সৃষ্টির প্রত্যেক সৃষ্টিই আবার চারি প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম। শব্দের মধ্যে বৈখরী স্থূল, মধ্যমা সূক্ষ্ম, পশ্যন্তী সূক্ষ্মতর এবং পরা সূক্ষ্মতম। স্থূল শব্দের বাচ্য যেরূপ স্থূল বস্তু, সেইরূপ সূক্ষ্মশব্দের বাচ্য সূক্ষ্ম বস্তু; বৈখরীর বাচ্য যেরূপ স্থূল ঘট, সেইরূপ মধ্যমার বাচ্য সূক্ষ্ম ঘট, পশ্যন্তীর বাচ্য সূক্ষ্মতর ঘট এবং পরার বাচ্য সূক্ষ্মতম ঘট। শ্রবণেন্দ্রিয় এবং মনঃ এই উভয়েরই স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতমস্বরূপ শাক্ত-সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। স্থূল শ্রোত্রের দ্বারা যেমন স্থূল শব্দের জ্ঞান হয়, এইরূপ স্থূল মনের দ্বারা স্থূল বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। শাস্ত্র এবং যোগের অভ্যাস হইতে যে উৎকর্ষলাভ হয়, সেই উৎকর্ষই মনঃ ও শ্রোত্রের সূক্ষ্মতার প্রতি কারণ। স্থূল ঘট হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, এবং সূক্ষ্মতম ঘটের কোন ভেদ নাই; এক জাতীয় অবয়বসমূহই চারি প্রকার ঘটে বিদ্যমান আছে; স্থূল ঘটে সেই অবয়বসমূহ যে ভাবে আছে, সূক্ষ্মঘটে তাহা অপেক্ষা সঙ্কুচিতভাবে সেই অবয়বই আছে; অবয়বের সঙ্কোচ ও বিকাশবশতঃ ঘটের পরিমাণ-ভেদ ঘটিলেও ঘট বস্তু সকল অবস্থাতে একই আছে, ইহা শাক্ত-সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য—বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ২। ৬৭-৬৮)।

ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বরূপে পরব্রহ্মের পরিণামকে স্পন্দ বলে। এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব "আত্মতত্ত্ব," "বিদ্যাতত্ত্ব" ও "শিবতত্ত্ব" রূপে তন্ত্রশাস্ত্রে বিভক্ত হইয়াছে। যে সকল পদার্থ শিবের জীবভাবের কারণ এবং যে পদার্থগুলি এই জীবের ভোগোপযোগী, তাহাদের নাম "আত্মতত্ত্ব"। এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের মধ্যে পৃথিবী হইতে মায়া পর্য্যন্ত একত্রিশটি পদার্থের নাম "আত্মতত্ত্ব"। শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর এবং সদাশিব এই তিনটি তত্ত্বের নাম "বিদ্যাতত্ত্ব।" এই অবস্থায় মায়ার কোন প্রভাব না থাকায় বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান স্বচ্ছ অবস্থায় থাকে; এই জন্য এই তিনটি পদার্থ "বিদ্যাতত্ত্ব" শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। ইহার ঊর্দ্ধে শিবতত্ত্ব—শক্তি এবং শিব। এই ষট্‌ত্রিংশৎ পদার্থের সমষ্টিকে অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্পন্দকে "তুরীয় তত্ত্ব" বা চতুর্থ তত্ত্ব বলা হয় (২৪)।

শক্তিবিরহিত শিব কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারেন না এবং সেই অবস্থায় শিব জ্ঞানের বিষয়ও নহেন;—শক্ত্যা বিনা শিবে সূক্ষ্মে নাম ধাম ন বিদ্যতে।

(২১) সা সৃষ্টির্দ্বেধাঽর্থময়ী শব্দময়ী চেতি। চক্রময়ী দেহময়ী চেতি সৃষ্টিদ্বয়ং তু ....অর্থসৃষ্টাবেবান্তর্গতম্, ন পুনরত্যন্তং ভিদ্যতে।—বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ২।৬৬।৬৮

(২২) সা চ দ্বিবিধাপি সৃষ্টিঃ সমকালীনোৎপত্তিকা সমকালীনাভিবৃদ্ধিশালিনী চ, যথা বীজাদঙ্কুরতচ্ছায়ে।—বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ২।৬৭-৬৮

(২৩) বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

রঘুবংশ ১।১

কালিদাসের এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে জগতের জনকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; কালিদাসও সম্মিলিত শিব এবং শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে,—এই কথাই বলিয়াছেন,—আমরা এরূপ মনে করিলে বোধ হয় অনুচিত হইবে না।

(২৪) মায়ান্তমাত্মতত্ত্বং বিদ্যাতত্ত্বং সদাশিবান্তং স্যাৎ।
শক্তিশিবৌ শিবতত্ত্বং তুরীয়তত্ত্বং সমষ্টিরেতেষাম্।—
সৌভাগ্যভাস্কর, ২১৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা।

(এই শ্লোকটি বামকেশ্বরতন্ত্রের অন্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণবের ভাস্কররায়কৃত 'সেতুবন্ধ' টীকাতেও উদ্ধৃত আছে।)

বিমর্শশক্তির বহির্মুখরূপে সংকুচিতভাবে যে বিকাশ,—তাহার ফলে পরম শিবেরই জীবরূপে পরিণতি ঘটিয়াছে, ইহা শাক্তমতে স্বীকৃত হইয়াছে। একই শক্তি (২৫) অন্তর্মুখরূপে বিকশিত হইয়া বিদ্যা, ঈশ্বর এবং সদাশিবরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে ; সেই শক্তিই বহির্মুখরূপে সঙ্কুচিতভাবে প্রকাশিত হইয়া মায়া প্রভৃতি তত্ত্বরূপে পরিণত হয়। মায়া বিপরীত দৃষ্টি এবং কালের দ্বারা পরিচ্ছেদের (পরিমাণের) প্রতি কারণ ; কালতত্ত্ব মায়া হইতে উৎপন্ন হয় ; দেশ, কাল, কর্ম্ম এবং তাহার ফল প্রভৃতির নিয়মনের হেতু যে ঈশ্বরেচ্ছা, তাহাই নিয়তিতত্ত্ব ; পশু অর্থাৎ জীবের সংকুচিত স্বল্প-কর্তৃত্বশক্তির নাম কলা। এই জীবের অল্পজ্ঞতাশক্তির নাম অশুদ্ধ বিদ্যা। জীব নিজের মধ্যে যে একটি অপূর্ণতা (অতৃপ্তি) অনুভব করে, তাহাই রাগতত্ত্ব (২৬)।

মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, অশুদ্ধবিদ্যা এবং রাগ—এই ছয়টির সহিত সংযুক্ত হইয়া পরম শিব জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এই জীবই পুরুষতত্ত্ব (২৭)। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোধান এবং অনুগ্রহ,—এই পাঁচটি কৃত্য শক্তির সহায়তায় শিব নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর নিজের স্বরূপকে আচ্ছাদন করিয়া জীবরূপে পরিণত হইয়াছেন,—ইহা তিরোধান ; তিনি

পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ; সেই পরব্রহ্ম হইতে প্রকটিত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের মধ্যে শিব ও শক্তিতে ব্রহ্মের আনন্দাংশ অনাবৃত আছে—এই জন্ম শক্তি এবং শিবস্বরূপ শিবতত্ত্বকে 'আনন্দতত্ত্ব' নামে অভিহিত করা হয় ; 'শিবতত্ত্ব' শব্দের অন্তর্গত শিব শব্দের অর্থ আনন্দ। বিদ্যাতত্ত্ব শব্দের অন্তর্গত বিদ্যাশব্দের অর্থ জ্ঞান অর্থাৎ চিৎ (= চৈতন্য) ; সদাশিব, ঈশ্বর এবং শুদ্ধ বিদ্যা—এই তিনটিতে ব্রহ্মের চিদংশ অর্থাৎ জ্ঞানাংশ আবৃত হয় নাই ; এই জন্য বিদ্যাতত্ত্বের অপর নাম চিত্তত্ত্ব (=জ্ঞান-তত্ত্ব=চৈতন্য-তত্ত্ব)। মায়া হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত একত্রিশটি তত্ত্বে ব্রহ্মের আনন্দ ও চৈতন্যাংশ আবৃত হইয়া গিয়াছে, কেবল সত্তা অংশ অনাবৃত আছে ; এই জন্য এই একত্রিশটি তত্ত্বকে সত্তত্ত্ব বা সত্তাতত্ত্ব বলিতে পারা যায়। আত্মতত্ত্ব শব্দের অন্তর্গত 'আত্ম' শব্দটি সত্তার বাচক ; যেমন সত্তাপ্রাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত 'আত্মলাভ' শব্দের অন্তর্গত আত্মশব্দের অর্থ সত্তা, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব শব্দের অন্তর্গত 'আত্ম' শব্দটিও সত্তা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখানে ইহা প্রণিধান-যোগ্য যে, শিবতত্ত্বে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ; বিদ্যাতত্ত্বে সৎ ও চিৎ—এই দুই অংশ অনাবৃত হইলেও আনন্দাংশ অল্প পরিমাণে আবৃত আছে ; আত্মতত্ত্বে চৈতন্য (= জ্ঞান) এ ং আনন্দাংশ সম্পূর্ণভাবে আবৃত আছে, কেবল সৎ (= সত্তা) অংশ অনাবৃত।

প্রপঞ্চ-সারের আচার্য্য পদ্মপাদ-বিরচিত বিবরণে এই বিষয় একটু অন্যভাবে বিবৃত হইয়াছে। যে অবস্থায় শক্তি ও শিবকে ভাস্কর রায় পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, আচার্য্য পদ্মপাদ শক্তি এবং শিবকে সেই পরম সূক্ষ্ম অবস্থায় অনাহত (নিঃস্পন্দ) শক্তি ও অনাহত (নিঃস্পন্দ) শিব শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এই অনাহত শক্তি সাক্ষিস্বরূপ এবং অনাহত শিব অধিষ্ঠান। সামরস্যসম্বন্ধে সম্মিলিত শক্তিশিবাত্মক ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকালে শিব ও শক্তির ঈষৎ স্থূলরূপে আবির্ভাব হয় এবং তাহার পরে অবশিষ্ট ৩৪টি তত্ত্বের প্রকাশ হইয়া থাকে,—ইহা ভাস্কর রায়ের মত। আচার্য্য পদ্মপাদের মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে অনাহত শিব ও অনাহত শক্তি ঈষৎ স্থূল অবস্থায় পরিণত হইয়া আহত (স্পন্দিত) শিব ও আহত (স্পন্দিত) শক্তি নামে অভিহিত হয় ; এই অবস্থায় শক্তিকে 'বিন্দু' বলা হয়। ইহা হইতে অবশিষ্ট তত্ত্বগুলি উৎপন্ন হয়। একই আহত শক্তির অন্তর্মুখভাবে ও বহির্মুখভাবে বিকাশ হইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রকাশিত হইয়াছে। শক্তির অন্তর্মুখভাবে যে বিকাশ, তাহাই সদাশিব, ঈশ্বর এবং শুদ্ধ বিদ্যাতত্ত্ব ; শক্তির বহির্মুখভাবে যে বিকাশ, তাহাই মায়া প্রভৃতি একত্রিশটি তত্ত্ব। আচার্য্য পদ্মপাদ প্রমেয়, প্রমাণ (জ্ঞান) এবং প্রমাতৃরূপে এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিভাগ করিয়াছেন। মায়া হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত একত্রিশটি তত্ত্ব প্রমেয়বর্গের অন্তর্গত,—এই একত্রিশটি তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ; সদাশিব, ঈশ্বর এবং শুদ্ধ বিদ্যা, এই তিনটি জ্ঞানরূপ বলিয়া বিদ্যাতত্ত্ব ; আহত শিব ও আহত শক্তি প্রমাতৃস্বরূপ হওয়ায় শিব-তত্ত্ব। (দ্রষ্টব্য—প্রপঞ্চসার-বিবরণ ১।৪১ এবং ৬০)।

পূর্ব্বোদ্ধৃত-শ্লোকে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের সমষ্টিকে তুরীয় তত্ত্ব, বলা হইয়াছে। আচার্য্য পদ্মপাদ "তুরীয়তত্ত্ব" নামে কোন তত্ত্ব স্বীকার করেন নাই ; তিনি এই ত্রিবিধ তত্ত্ব ব্যতীত 'সর্ব্বতত্ত্ব, নামক একটি তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন ; যিনি জগতের অধিষ্ঠান, সেই পরমশিব এই সর্ব্বতত্ত্ব—ইহাও বলিয়াছেন (দ্রষ্টব্য—প্রপঞ্চসার-বিবরণ ১।৬০)।

(২৫) কেবল শক্তির পরিণাম হয় না, যে স্থলে কেবল শক্তির পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, সেস্থলে শিব-সহিত শক্তির পরিণাম হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে এখানে ইহাও বক্তব্য যে, ভাস্কর রায়ের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া এরূপ কথা বলা হইয়াছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলেও বস্তুস্থিতি সেই রূপই পর্য্যবসিত হইবে। যেহেতু, শিব ও শক্তি কোন অবস্থাতেই একক পরিত্যাগ করিয়া অপরে থাকিতে পারে না ; বিশেষতঃ শক্তি বস্তুটি ধর্ম্ম, সে কোন ধর্ম্মীকে অবলম্বন করিয়াই থাকিতে পারে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহাও সত্য যে, শক্তি এবং শিবের মধ্যে কোন ভেদ নাই।

(২৬) (১) মায়া বিক্ষেপে কালপরিচ্ছেদে হেতুঃ (২) কালতত্ত্বং তত এব। (৩) দেশকালকর্ম্মফলাদিনিয়তহেতুঃ ঈশ্বরেচ্ছা এব নিয়তিতত্ত্বম্। (৪) কলা ত্বেবংপরিচ্ছিন্নস্য পশোঃ কিঞ্চিৎকর্তৃত্বশক্তিঃ। (৫) তস্যৈব কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বশক্তিঃ অশুদ্ধবিদ্যা। (৬) তস্যা পূর্ণম্মন্যতা রাগতত্ত্বম্।—প্রপঞ্চসারবিবরণ ১।৫৯ ;

(২৭) এতৎষট্‌কবিশিষ্টঃ পরমশিবো জীবঃ। স পুরুষতত্ত্বম্। প্রপঞ্চসারবিবরণ ১।৫৯

যে বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে—জড়রূপে—প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহাও তিরোধান। শিবের এই স্বেচ্ছা-পরিগৃহীত জীব-ভাব এবং সেই জীব-ভাবে অবস্থিত হইয়া নিজ-সৃষ্ট বিশ্বপ্রপঞ্চের আশ্রয়ে ভোগোন্মুখতা, এইটিই বন্ধ। অতএব এই বন্ধ তিরোধানেরই অন্তর্ভূত।

এই সঙ্কুচিত জীব অবস্থা হইতে শিবভাবে উপনীত হইতে হইলে দীক্ষাগ্রহণ-পূর্ব্বক সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনার স্বরূপ বিচার করিয়া উপাসককে অধম, মধ্যম এবং উত্তম,—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে; এই তিন প্রকার উপাসক যথাক্রমে অশুদ্ধ, মিশ্র এবং শুদ্ধ—এই তিনটি শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়; ইহাদের আরও তিনটি নাম আছে—সকল (অধম), প্রলয়াকল (মধ্যম), এবং বিজ্ঞানকেবল (উত্তম)। যাহাদের ভেদদৃষ্টি দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান, শিবের সহিত নিজের অভেদ ভাবনা যাহাদের নাই, যাহারা কেবল কর্ম্মেই আসক্ত—(অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞানমার্গে ঈষন্মাত্রও গতি নাই) তাহারা অধম উপাসক। যাহাদের আণবমল, কার্ম্মণমল এবং মায়ীয়মল এই ত্রিবিধ মল এবং কর্ম্ম পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞান-মার্গ—এই উভয় মার্গই এক সঙ্গে আশ্রয় করিয়া আছে, অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞানমার্গে প্রবেশ ঘটিলেও কর্ম্ম-মার্গ পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহারা মধ্যম উপাসক। যাহাদের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে—যাহাদের দৃষ্টিতে সর্ব্বত্র একমাত্র শিবই প্রতিভাত হয়—অতএব যাহারা জ্ঞানমার্গে অধিষ্ঠিত, তাহারা উত্তম উপাসক (২৮)। এই ত্রিবিধ উপাসককে আগমশাস্ত্রে "বীর" শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। যাহারা নিজের পরাক্রমে অর্থাৎ সাধনাবলে "অহং" পদার্থ পরব্রহ্মে "ইদং" পদার্থ জগৎকে বিলীন করিয়া সকল দুঃখের অতীত নিজের আত্মরূপে বিদ্যমান সেই "অহং"কে উপভোগ করিতে পারে, তাহারাই বীর; পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপাসক সাধনার পরিপক্ক অবস্থায় এই অধিকার অর্জ্জন করিতে পারে, এই জন্য এই সকল উপাসক "বীর" শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য (২৯)।

পরব্রহ্ম পরমশিব এক অদ্বিতীয়—সর্ব্বভেদবর্জ্জিত; সেই পরম শিবের সহিত নিজগুরুর কোন ভেদ নাই; এই গুরুর কৃপায় উপাসকের সহিত ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ হয়,—শিবের সহিত জীব যে অভিন্ন—সেই অভিন্নতার প্রতীতি হয়। এই অদ্বৈতবুদ্ধি হইতে জীব তাহার নিজের সঙ্কুচিত স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক শিবভাব প্রাপ্ত হয়; শিব, গুরু এবং উপাসক—এই তিনের যে অভেদজ্ঞান—এই জ্ঞানই জীবের শিবে মিলিত হইবার উপায়; এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত শিব, গুরু এবং জীবের ঐক্যকে আগমশাস্ত্রে "নিগর্ভার্থ" নামে অভিহিত করা হয় (৩০)।

উপাস্য দেবতা, মন্ত্র, পূজার যন্ত্র, গুরু এবং উপাসকের মধ্যে পরস্পর অভেদ বিদ্যমান আছে; এই অভেদকে "কৌলিকার্থ" অর্থাৎ কৌলিক বস্তু বলা হয়। এই পাঁচটি বস্তু ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় একজাতীয়; কুল শব্দের অর্থ সজাতীয়ের সমুদায়; এই পাঁচটি

(২৮) বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ২।৭৭

এখানে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে;—আগমশাস্ত্রে ত্রিবিধ পাশ কথিত হইয়াছে;—অণু, ভেদ এবং কর্ম্ম; এই ত্রিবিধ পাশ আবার ত্রিবিধ মলরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অজ্ঞানের নাম অণু; এই অজ্ঞান দুই প্রকার,—চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে আত্মবুদ্ধির অভাব এবং দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি। এই উভয় প্রকার অজ্ঞানের নাম আণব মল।

এক অদ্বিতীয় আত্মাতে নানাত্বপ্রতীতির নাম ভেদ; এই ভেদের মূল কারণ মায়া এবং এই মায়া হইতে উৎপন্ন 'কলা' হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্রিশটি তত্ত্ব—সর্ব্বসমেত এই একত্রিশটি তত্ত্ব (যাহাকে 'আত্মতত্ত্ব' শব্দের দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রে আখ্যাত করা হয়) 'মায়ীয় মল' নামে অভিহিত হয়।

পুণ্য এবং পাপ এই দুইটি কার্ম্মণ মল। এই ত্রিবিধ পাশের মধ্যে একটি, দুইটি অথবা তিনটি পাশের দ্বারা বদ্ধ জীবকে আগম শাস্ত্রে 'পশু' শব্দে অভিহিত করা হয়। যে সকল উপাসক তিনটি পাশের দ্বারা আবদ্ধ, তাহারা 'সকল' (অধম); যাহারা কেবল আণব মল ও কার্ম্মণ মল—এই দুইটি পাশের দ্বারা আবদ্ধ, সেই সকল উপাসকের নাম 'প্রলয়াকল'—ইহারা মধ্যম উপাসক। যাহারা কেবল 'আণব' মলের দ্বারা বদ্ধ, তাহাদের নাম বিজ্ঞানকেবল; ইহারা উত্তম উপাসক। দ্রষ্টব্য—সৌভাগ্যভাস্কর ১২৯ শ্লোকব্যাখ্যা

(২৯) সকলাদিনামকাস্ত্রিবিধা উপাসকা বীরশব্দেনোচ্যন্তে—
অহমি প্রলয়ং কুর্ব্বন্নিদমঃ প্রতিযোগিনঃ।
পরাক্রমপরো ভুঙ্‌ক্তে স্বাত্মানমশিবাপহম্‌॥

ইত্যাদিনা পরাপঞ্চাশিকায়ামন্তত্র চ বীরপদস্য সাধকপরত্বে-নৈব নির্ব্বচনাৎ।—বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ২।৬৪—৬৫

(৩০) পরমশিবে নিষ্কলতা তদভিন্নত্বং স্বদেশিকেন্দ্রস্য।
তৎকরুণাতঃ স্বস্মিন্নপি তদভেদো নিগর্ভার্থঃ॥
বরিবস্যারহস্য ২।৮২

বস্তু সমানজাতীয় বলিয়া ইহাদের সমুদায়কে "কৌলিকার্থ" বলা হয় (৩১)।

পূর্ব্বে এ কথা বলা হইয়াছে,—শাক্তগণ পরিণামবাদী; ইঁহারা মনে করেন,—শ্রুতিতে এবং বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদই সমর্থিত হইয়াছে।

শাক্তগণ পরিণামবাদী হইলেও সাংখ্য এবং পাতঞ্জলদর্শনের ন্যায় ইঁহাদের দর্শনে দ্বৈতবাদের সমর্থন করা হয় নাই, ইঁহারা অদ্বৈতবাদী; এই মতে শিব-শক্তি-সামরস্যরূপ যে পরব্রহ্ম, তাহার পরিণাম এই বিশ্বপ্রপঞ্চ কল্পিত নহে,—পারমার্থিক; তবে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম হইতে বাস্তবপক্ষে অভিন্ন হইলেও ইহাতে যে দ্বৈত অর্থাৎ ভেদের প্রতীতি হইতেছে, এই ভেদটিই কল্পিত; "নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রতীয়মান ভেদেরই নিষেধ করা হইয়াছে,—প্রপঞ্চের নিষেধ করা হয় নাই। আচার্য্য শঙ্করের মতে জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ উভয়ই ব্রহ্ম; শাক্তগণও পরব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়রূপেই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু শাঙ্কর-সিদ্ধান্ত হইতে এই শাক্ত-সিদ্ধান্তে বৈলক্ষণ্য আছে। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মকে জগতের বিবর্ত্তোপাদান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মকে পরিণামী উপাদানরূপে স্বীকার করেন নাই; তাঁহার মতে অবিদ্যারূপ ব্রহ্মশক্তিই জগতের পরিণামী উপাদান,—ব্রহ্ম পরিণামী উপাদান নহেন। এই অবিদ্যা আচার্য্য শঙ্করের মতে কল্পিত বস্তু, পারমার্থিক বস্তু নয়। মোক্ষ অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা এই কল্পিত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শাক্তগণ শক্তিকে পারমার্থিক বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন। এই শক্তি অথবা শক্তিবিশিষ্ট শিব (পরব্রহ্ম) জগতের পরিণামী উপাদান; শক্তি পারমার্থিক বস্তু হওয়ায় মোক্ষ অবস্থায় শক্তির নিবৃত্তি হয় না, সে অবস্থাতেও শক্তি বিদ্যমান থাকে। এখানে সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আচার্য্য শঙ্করের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ শাক্ত-সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই; শঙ্করের মতে জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই; শাক্তগণের মতে জ্ঞানস্বরূপ শিবে বিমর্শশক্তি বিদ্যমান আছে; কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানের ঐক্যবশতঃ অদ্বৈতবাদেই শাক্ত সিদ্ধান্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে (৩২)।

---

(৩১) পরদেবতায়া বিদ্যায়াশ্চক্ররাজস্য শ্রীগুরোরাত্মনশ্চৈক্যং কৌলিকার্থ ইত্যুচ্যতে, সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাভেদেন সজাতীয়ত্বাৎ, সজাতীয়যূথস্য কুলপদবাচ্যত্বাৎ, "সজাতীয়ৈঃ কুলং যূথম্" ইত্যমরোক্তেঃ।—বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ২।৮৩ শ্লোকের অবতরণিকা।

এখানে একটি প্রণিধান-যোগ্য বিষয় আছে,—এই মতে সকল বস্তুই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই জন্য প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে যে কোন বস্তুর সমুদায়কেই "কৌলিকার্থ" বলা যাইতে পারে; কিন্তু এই শাক্ত-সম্প্রদায়ে উক্ত পাঁচটি বস্তুর সমুদায়কেই কৌলিকার্থ বলা হয়; যে কোন বস্তুর সমুদায়কে কৌলিকার্থ বলা হয় না। এই জন্য এখানে মনে রাখিতে হইবে,—এই কৌলিকার্থ শব্দটি পাচক শব্দের ন্যায় কেবল যৌগিক নহে, কিন্তু পঙ্কজ শব্দের মত যোগ-রূঢ় অর্থাৎ এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ থাকিলেও, কেবল সেই ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থকে অবলম্বন করিয়া এই শব্দটির প্রয়োগ হয় না; পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট উক্ত পাঁচটি বস্তুর সমুদায়কে বুঝাইবার উদ্দেশেই ইহার ব্যবহার হয়।

এই প্রসঙ্গে এখানে আরও বক্তব্য এই যে, তন্ত্রশাস্ত্রে 'কুল' শব্দের অন্য অর্থও নির্দ্দিষ্ট আছে;—'কুল' শব্দের অর্থ শক্তি, 'অকুল' শব্দের অর্থ শিব; এই শিব ও শক্তির 'সামরস্য' নামক যে সম্বন্ধ,—তাহার নাম 'কৌল';—

'কুলং শক্তিরিতি প্রোক্তমকুলং শিব উচ্যতে।
কুলেঽকুলস্য সম্বন্ধঃ কৌলমিত্যভিধীয়তে॥'
—(সৌভাগ্যভাস্কর, ৮৮ শ্লোক)

(৩২) সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৬) ইতি শ্রুতিশ্চ। 'অকাময়ত' ইতি নিমিত্ততায়া 'বহু স্যামি'তি পরিণাম্যুপাদানতায়াশ্চ প্রতীতেঃ। 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদ্—(ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৩) ইত্যধিকরণে "আত্মকৃতেঃ "পরিণামাদ্" (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৬) ইতি ব্রহ্মসূত্রে চ। সৌভাগ্য ভাস্কর—প্রথম শতকের উপক্রম।

সর্ব্বপ্রমাণমূর্দ্ধন্যয়া শ্রুত্যা তদনুসারিতন্ত্রৈশ্চাদ্বৈতে কথিতে তদ্বিরুদ্ধত্বেন ভাসমানঃ কার্য্যকারণয়োর্ভেদাংশ এব কল্পিত আস্তাং ন পুনঃ সর্ব্বোঽপি প্রপঞ্চঃ। "নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯ কঠোপনিষদ ৪।১১) ইত্যাদিশ্রুতিষ্বপি ভেদাংশস্যৈব নিষেধো ন প্রপঞ্চস্য। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।২।১) ইত্যাদৌ শ্রূয়মাণো ভেদবৎপ্রপঞ্চাভাবোঽপি বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত এব···১।৩

ভগবতা ব্যাসেনাপি "প্রকৃতিশ্চ 'প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদ্ (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৩) ইত্যস্মিন্নধিকরণে একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।১৩) মৃদ্‌ঘটনখনিকৃন্তনাদিদৃষ্টান্তং (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।১।৪-৬) বহু স্যাং প্রজায়েয় (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৬) ইত্যভিধ্যোপদেশাদিকং চানুসন্দধানেন পরিণামবাদ এবাভিপ্রেতঃ কণ্ঠরবেণোক্তশ্চ "আত্মকৃতেঃ পরিণামাদ্" (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৬) ইতি সূত্রে। ভাষ্যকারৈরপি (—শঙ্করাচার্য্যৈরপি) তত্র বিবর্ত্তবাদানুসারেণ ব্যাচক্ষাণৈরপি সৌন্দর্য্যলহর্য্যাং "মনস্ত্বং ব্যোমত্বম্" (৩৫) ইতি শ্লোকে "ত্বয়ি পরিণতায়াম্"ইতি স্বাভিমতঃ পরিণামবাদ এব স্ফুটীকৃতঃ।—বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ১।৩

গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুর উপদেশ অনুসারে উপাসনা করিলে অভীপ্সিত পুরুষার্থের লাভ হয়; যাহারা কোন গুরুর উপদেশ না লইয়া স্বয়ং শাস্ত্রপাঠ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের গুরু-পরম্পরাগত আচারপদ্ধতি না থাকায় সিদ্ধিলাভ হয় না, অনিষ্টের প্রাপ্তি ঘটে (৩৩)। কেবলমাত্র দীক্ষাগ্রহণ করিলেই ঐহিক এবং পারত্রিক পুরুষার্থের লাভ হয় না, দীক্ষাগ্রহণ করিয়া মন্ত্রের সাধনা করিলেই পুরুষার্থ লাভ হয় (৩৪)।

দীক্ষা শব্দের সাধারণতঃ তিনটি অর্থ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; (১) যাহার দ্বারা জ্ঞান-প্রাপ্তি ঘটে, তাহার নাম দীক্ষা; (২) গুরু কৃপাপরবশ হইয়া যে অনুষ্ঠানের দ্বারা শিষ্যকে মন্ত্রদান করিয়া তাহার পাপ নষ্ট করিয়া দেন,—তাহার নাম দীক্ষা (৩৫); (৩) যাহা হইতে দিব্যভাবের প্রাপ্তি হয় এবং পাপ ক্ষয় হয়, তাহার নাম দীক্ষা; এই দীক্ষা হইতেই মন্ত্র-সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে (৩৬)। যদিও পাণিনির মতে দীক্ষা শব্দের অনুরূপ অর্থ হইতে পারে, তথাপি সে অর্থ তন্ত্রশাস্ত্রে আদৃত হয় নাই।

আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত বেদান্তমতে উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেও সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না; যে সকল শ্রুতিবাক্যে কেবল জীব কিংবা কেবল ব্রহ্মের স্বরূপের উপদেশ আছে, তাহাদের নাম 'অবান্তর বাক্য'; যে সকল শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপদেশ আছে, তাহাদের নাম 'মহাবাক্য'। আচার্য্য শঙ্করের প্রচারিত বেদান্তসিদ্ধান্তে এই মহাবাক্যের শ্রবণ-মনন পূর্ব্বক যে নিদিধ্যাসন, তাহা হইতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া জীবের ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি হয়; ইহাই মোক্ষ—ইহাই পরমপুরুষার্থ। আমরা দেখিতে পাইতেছি, শাক্ত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রেও আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত হইতে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে; শাক্ত আচার্য্যগণ উপাসনাকেই ভোগ ও মোক্ষের প্রত্যাসন্ন সাধনরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

(৩৩) পারম্পর্য্যবিহীনা যে জ্ঞানমাত্রেন গর্ব্বিতাঃ।
তেষাং সময়লোপেন বিকুর্ব্বন্তি মরীচয়ঃ॥
বরিবস্যারহস্যপ্রকাশে (২।১৬৫) উদ্ধৃত আগমবাক্য। মরীচয়ঃ—ডাকিন্যাদয়ঃ। বিকুর্ব্বন্তি—ধাতুবিকারপ্রাপণেন মারয়ন্তীত্যর্থঃ। বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ২।১৬৫

(৩৪) ন কেবলং দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ ঐহিকামুষ্মিকপুরুষার্থলাভঃ কিন্তু তৎপূর্ব্বকমন্ত্রসাধনাদেব।—প্রপঞ্চসারবিবরণ ৫।

(৩৫) দিব্যং জ্ঞানং ক্ষিণোতি প্রাপয়তীতি দীক্ষা। "অথাতো দীক্ষা কস্মাদ্দীক্ষেতোদীক্ষিত ইত্যাচক্ষতে" ইত্যারভ্য "তং বা এতং দীক্ষিতং সন্তং দীক্ষিত ইত্যাচক্ষতে" ইত্যন্তাথর্ব্বণব্রাহ্মণাৎ। শিষ্যেভ্যো মন্ত্রদানেন পাপং ক্ষপয়তীতি বা। 'দীয়তে কৃপয়া শিষ্যে ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ। তেন দীক্ষেতি কথিতা'—ইতি পরমানন্দতন্ত্রাৎ।—সৌভাগ্যভাস্কর—১৮৭

(৩৬) দদ্যাচ্চ দিব্যভাবং ক্ষিণুয়াদ্দুরিতান্ততো দীক্ষা।—প্রপঞ্চসার ৫।২ দীক্ষাশব্দনির্ব্বচনেন দীক্ষায়াঃ সিদ্ধিদানসামর্থ্যং দর্শয়তি—দদ্যাদিতি।—প্রপঞ্চসারবিবরণ।

কঠিন কৌতুক

মোটরে চড়িয়া পথে যবে চলি কেহ তো দেখে না চেয়ে,
পায়ে ছেঁড়া চটি বাহিরাই যেই বন্ধুরা আসে ছেয়ে!
লজ্জা যতই ঢেকে দিতে চাই,
গরীবের লাজ ঢাকে না তো ভাই,
কাপড়ে জামায় তালি ও সেলাই উড়ে ওঠে হাওয়া পেয়ে!
মোটরে চড়িয়া পথে যবে চলি কেহ তো দেখে না চেয়ে!

হঠাৎ কখনো কাবুলীর কাছে টাকা যদি ধার করি
হল্লা সে এমন, আকাশ-বাতাস সংবাদে ওঠে ভরি'।
এধারে এত যে দান ক'রে যাই,
জগতে সেখানে অন্ধ সবাই,
ভালো কাজে কভু সাক্ষী মেলে না মন্দে ডুবিয়া মরি।
হঠাৎ কখনো কাবুলীর কাছে টাকা যদি ধার করি।

বাহিরে চুরুট কখন্ টেনেছি তাতেও রক্ষা নাই,
যত গুরুজন যেখানে যে থাক্ সবে টের পায় ভাই!
আফিসের কাজে খাটি যবে যত,
মালিক তাহার দেখে না তো তত,
জিরুতে গেলেই—"ফাঁকিবাজ ক'তো" হায় রে আখ্যা পাই!
বাহিরেতে পাপ কখনো ক'রেছি তাতেও রক্ষা নাই!

দেবতা, তুমি যে এমন রসিক কে জানিত হায় শেষে,
মড়ার উপরে খাঁড়া চালাইতে দুঃখ নেই—ওঠো হেসে;
ছিদ্র যদি বা ঢেকে রাখি হায়,
তুমি খুলে দাও কৌতুক-বায়,
দুর্ব্বলতা যে হ'ল অসহায় আঁধারেও যায় ফেঁসে।
দেবতা, তুমি যে এমন রসিক কে জানিত হায় শেষে!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

অভিনেত্রী

(গল্প)

সিনেমার রূপালী পর্দ্দায় মঞ্জু দেবীকে দেখে অনেকেই করতালি দিয়েছেন।—তাকে না জানেন, তার রূপ ও অভিনয় দেখে মুগ্ধ না হ'য়েছেন, নাট্যরসজ্ঞদের মধ্যে এমন লোক বাঙ্গালা দেশে কম। তার শাড়ী-পরিধানের বৈশিষ্ট্য, কেশচর্চ্চার অপরূপ ভঙ্গি আজ বাঙ্গালার প্রগতি-বাদিনী মহিলাগণের অনুকরণীয়। কিন্তু তার হৃদয়ের গোপন রহস্যের সহিত পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়নি;—বলতে বাধা নেই, এ বিষয়ে আমি ভাগ্যবান।

মঞ্জুর বংশ-পরিচয়, জন্ম-পরিচয় না দিলে রসচর্চ্চার কোন ত্রুটির আশঙ্কা নেই; এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, প্রয়োজনে হোক, বা অপ্রয়োজনেই হোক্, অথবা খ্যাতির মোহেই হোক্, কি এ পড়তে-পড়তে হঠাৎ সে অভিনেত্রী হ'য়ে পড়ে। খ্যাতি সে অর্জ্জন ক'রেছে খুব আকস্মিক ভাবেই, অর্থও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত; কাজেই অপব্যয় ক'রতেও কোন দিন কুণ্ঠা বোধ করেনি।

একদিন তার বাড়ীতে চা-পার্টির উৎসবান্তে সে নিভৃতে আমার প্রশ্নের উত্তরে ব'লেছিল, -আমি কেন চা-পার্টি দিয়ে হৈ-চৈ বাধাই? কারণ, সাহিত্যিকদের আমার বড্ড ভাল লাগে,-- লেখা প'ড়ে মনে হয়, যারা মানুষের অন্তরকে এমনি ক'রে বিচার ক'রবে, তারা নিশ্চয়ই আমাকেও বুঝবে, তাই আপনার ব'লে মনে হয়। এজন্য মাঝে মাঝে ডেকে এনে তৃপ্তি পাই—আপনারা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাতেই আমার আনন্দ, সেই আমার লাভ।

আমি হেসে ব'লেছিলাম,—যখন আমরা লিখি তখন আমরা পরের অন্তরকে বুঝি, যখন চাকুরী করি তখন স্বার্থকে বুঝি—তোমার এই পার্টি তাই পণ্ডশ্রম।

মঞ্জু চুপ ক'রেই রইল, হয় ত কি একটা কথা ভাবছিল। আমি প্রশ্ন ক'রলাম,—তোমার এত অর্থ—এত খ্যাতি; পর্দ্দায় তোমাকে দেখে দর্শকদল চঞ্চল হ'য়ে কলরব ক'রে ওঠে, তোমার নাম সকলের মুখে মুখে; কত লোক তোমাকে ঘিরে স্বপ্নের কুহক-জাল রচনা করে! তবুও কি বল্‌তে চাও – তুমি সুখী নও? যে আয়ত নেত্রের চঞ্চল কটাক্ষের আঘাতে সমগ্র দেশ রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে, সেই নলিন নেত্রের বিলোল কটাক্ষ আমার মুখের উপর নিক্ষেপ ক'রে মঞ্জু শান্ত কণ্ঠে ব'ল্‌ল,—হ্যাঁ, সত্যিই সুখী নই আমি। আশ্চর্য্য হবেন হয় ত, কিন্তু মনে মনে আমি বড্ড একা, তাই অশান্তি আমার নিত্য সঙ্গী।

আশ্চর্য্য হ'য়েছিলাম; ব'ল্‌লাম,—তোমার একটু কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে কত লোক আসে; তোমার একবিন্দু ভালবাসা পেলে যারা ধন্য হয়—

মঞ্জু ব্যথিত কণ্ঠে ব'লল,—না, তারা আমার ভালবাসাও চায় না, আমাকে ভালও বাসে না; কয়েক দিনের জন্যে তারা পানানন্দের বিহ্বলতা পেতে চায় মাত্র।

—এত লোক তোমার দিকে লুব্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে, তোমার গুণগান করে, তোমাকে কল্পনা ক'রে তারা পুলকে রোমাঞ্চিত, এতে তুমি মনে মনে গর্ব্ব অনুভব কর না?

মঞ্জু তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল, আগে ক'রতাম, এখন ওতে ঘেন্না ধ'রে গেছে।

আমি ব'ল্‌লাম, –আমি সস্ত্রীক দু'চার দিন বেরিয়েছি; কোনও ব্যক্তি লোলুপ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালে তিনি কি বলেন, জানো?—লোকগুলো কি অসভ্য; এমনি ক'রে তাকায়, যেন গিল্‌তে চায়!—তিনি হয় ত অস্বস্তি বোধ করেন।

মঞ্জু উত্তর দিল,—হ্যাঁ, স্বাভাবিক বটে।

—কিন্তু কোন মহিলা আমাদের দিকে তাকালে আমরা গর্ব্ব অর্থাৎ গৌরব অনুভব করি।

মঞ্জু ব'লল,– সেটাও স্বাভাবিক; আপনাদের মনের সঙ্গে আমাদের মনের তফাৎই ঐখানে।

বার বার সে কেমন অসংলগ্নভাবে আমার কথার জবাব দিতে লাগ্‌লো, তাই বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মঞ্জুর বয়স এখন প্রায় তিরিশের কোঠায় পৌঁছেছে, দেহে এখনও সযত্নসঞ্চিত যৌবন। তার বয়স যখন বাইশ বৎসর, তখন সবে তার নাম জাহির হ'তে চ'লেছে। সাহিত্যিক গোপাল বাবুর লেখা তার খুব ভাল লাগ্‌তো—গোপাল বাবুর বয়স তখন মাত্র আটাশ বৎসর। গোপাল-বাবুর ভাষা তীব্র, ও তাঁর রচিত প্রত্যেক চিত্রে সে যেন নিজের প্রতিচ্ছবিই প্রতিফলিত দেখ্‌ত।

ষ্টুডিওতে এসে তাঁর সঙ্গে মঞ্জুর পরিচয় হয়, সে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসে। গোপাল বাবু তখন ভবঘুরে, চাকুরী নেই। এমনি ক'রে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়; কিন্তু মঞ্জু তাঁকে ভালবেসেছিল।

মঞ্জু তার নিভৃত কক্ষে প্রসাধনে রত ছিল, গোপাল বাবু পর্দার ফাঁকে ব'ল্‌লেন—আস্‌তে পারি?

—আসুন।

গোপাল বাবু দ্বিধা না ক'রেই ব'ল্‌লেন,—আমাকে একটা টাকা দিতে পারেন? খাইনি, তা' ছাড়া একটু অন্যত্র যেতে হবে।

মঞ্জু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে একটু চুপ ক'রে থেকে তাঁকে গোটা-চারেক টাকা দিল। গোপাল বাবু বাকি কয়টা ফেলে-রেখে একটি মাত্র টাকা নিয়ে, ধন্যবাদ না জানিয়েই বেরিয়ে পড়লেন।

মঞ্জুর মন করুণা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হ'য়েছিল। গোপাল বাবুকে এই সাহায্যটুকু ক'রে সে অপূর্ব্ব আত্ম-প্রসাদ অনুভব ক'রেছিল।

গোপাল বাবুর সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো। গোপাল বাবু দারুণ ভবঘুরে, তাঁকে যত্ন ক'রে মঞ্জু তৃপ্তি লাভ ক'রতো। গোপাল বাবুও নিশ্চিন্ত হ'য়ে মঞ্জুর আশ্রয় গ্রহণ ক'রলেন। গোপাল বাবু লিখতেন, মঞ্জু তাঁকে উৎসাহ দিত, পরম আগ্রহে তাঁর লেখা শুনতো; এমনি ক'রে দু'টি বৎসরে তাঁদের হৃদয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিল।

গোপাল বাবু ব'ল্‌তেন,—এ জগতে সমাজ, নীতি, এগুলো মানুষের সৃষ্টি, প্রয়োজনবোধে নিজের সুবিধা-মত তারা সেটা গ'ড়ে-তুলেছে, তাই এর মূল্য খুব কম। আমি কাউকে গ্রাহ্য করিনে; এই যে তোমার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি, এর মাঝে হয় ত লোকের দৃষ্টিকটু অনেক কিছু আছে, হয় ত আড়ালে ব্যঙ্গও তারা করে; কিন্তু আমাদের হৃদয়ের পরিচয়ই কি সবচেয়ে বড় নয়?

জ্যোৎস্না রাতে খোলা ছাতে ব'সে মঞ্জু মাথা নেড়ে ব'ল্‌তো,—নিশ্চয়ই। সমাজ আমাদের পিছু আস্‌বে, আমাদের অন্তর অনুযায়ী গ'ড়ে উঠ্‌বে। সমাজের যূপকাষ্ঠে আমরা গলা বাড়িয়ে দিয়ে বলি হ'তে চাইনে।

গোপাল বাবু ব'ল্‌তেন,—এই যে আমি, আমার অর্থ নেই, বিত্ত নেই। তোমার পক্ষে আমাকে ভালবাসা সম্ভব নয়; কিন্তু তবুও তোমার এই যে ভালবাসা—এ কি মিথ্যা? সমাজের উপরে এর দাবী।

মঞ্জু মাথা নেড়ে ব'ল্‌ত,—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

তখন যদি কোন বন্ধু মঞ্জুকে গোপাল বাবুর প্রসঙ্গ নিয়ে বিদ্রূপ বা পরিহাস ক'রত, মঞ্জু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিত, সমাজের পরিচয়ই মানুষের পরিচয় নয়, তার হৃদয়ের পরিচয়ই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। সমাজের কটূক্তি ও পরিহাসকে তাই আমি কোন মূল্যই দিতে পারিনে, সে জন্যে আমায় ক্ষমা ক'রো।

অনেকে হাস্‌তো, অনেকে মনে ক'রতো, ইহা মঞ্জুর গর্ব্ব, অহঙ্কার। কেহ বা সহানুভূতি ভরে মনে ক'রতো, ও যদি গোপাল বাবুকে বিবাহ ক'রে সুখী হ'তে চায় ত হোক্।

গোপাল বাবু দু'চার দিন না এলে, মঞ্জু ব্যস্ত হ'ত। এদিক ওদিকে টেলিফোন ক'রে সংবাদ নেওয়ার চেষ্টা ক'রতো। ষ্টুডিও থেকে ফিরে ক্লান্ত দেহে তাঁর প্রতীক্ষা ক'রতো।

গোপাল বাবু এলে সে অভিযোগ ক'রতো; যদি এদিক ওদিক যাওয়ার দরকার হয়, ব'লে গেলেই হয়, আমি বৃথা ভেবে মরিনে।

গোপাল বাবু হেসে ব'ল্‌তেন,—ওটা দরকার। আর আমার অনুপস্থিতির জন্যে আমার দায়িত্ব খুবই কম। অর্থাৎ নানান কাজে আসা হয় না।

মঞ্জু বিশ্বাস ক'রে তাঁর আজ্ঞামত গান ক'রলে গোপাল বাবু শুনে তারিফ ক'রতেন।

হঠাৎ গোপাল বাবুর আসা-যাওয়ার ব্যবধান বাড়তে আরম্ভ হ'ল। মঞ্জু অভিযোগ ক'রলেও সে ব্যবধান কম্‌তো না। অকস্মাৎ মাসাবধি আর গোপাল বাবুর দেখা নাই।

মঞ্জু তাঁর অসুস্থতা অনুমান ক'রে কত সম্ভব অসম্ভব ভবিষ্যৎ কল্পনায় ভয়ে দুঃখে নানা প্রকার অস্বস্তি অনুভব ক'রতো।

একদিন সে সংবাদ পেল, গোপাল বাবুর বিবাহ হ'য়েছে, এবং তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘর-সংসার ক'রছেন। গোপাল বাবুর স্ত্রীও কুশলেই আছেন।

মঞ্জু হয় ত সে রাত্রে দু' ফোঁটা অশ্রু ত্যাগ ক'রে নিজের লাঞ্ছনাকে নীরবে সহ্য ক'রেছিল। জীবনের সেই পৃষ্ঠাটি উল্টে ফেলে নতুন ক'রে আবার জীবনের পথে অগ্রসর হ'য়েছিল।

তারপরে মঞ্জুর জীবনে এসেছিলেন আর একজন,—বিখ্যাত নট অধীর বসু।

অধীর বাবু ব'লতেন,—'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' যে দেহ দু'দিন বাদে ছাই হ'য়ে যাবে, তাকে অত সমীহ করা চলে না। যে ক'দিন বেঁচে থাকি, আনন্দে থাকি; যখন বুঝবো, দুঃখ-দারিদ্র্য অনিবার্য্য, সেদিন দেহটাকে ধ্বংস ক'রলেই সব চুকে যাবে। সমাজকে মান্‌লে সুনাম, যা আমার সঙ্গে যাবে না, তার জন্যে জীবনের, যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনক'টিকে দুঃখময় ক'রে তোলা নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মঞ্জুও ভাবতো, বৃথা নীতি ও সংস্কারের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনকে পঙ্গু ক'রে কি লাভ! আনন্দের খরস্রোতে জীবন-তরীকে ভাসিয়ে দেবে সে উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন ভাবে—অর্থের অপ্রাচুর্য্য যখন তার নেই। ভগবান যা দিয়েছেন তা ভোগ করাই প্রয়োজন।

অধীর বাবুর আদেশে মঞ্জু গান ক'রতো, অত্যন্ত সরল ভোগলালসাপূর্ণ গান। অধীর বাবু তা শুনে অধীর হ'য়ে উঠতেন, দ্রব্যগুণে কত কি প্রলাপ ব'লে যেতেন; মঞ্জু শু'নে হাস্‌তো, আর তাঁর সেই বন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে মানসিক শক্তি আখ্যা দিয়ে তার তারিফ ক'রতো।

বন্ধুদের প্রশ্নের জবাবে সে ব'লতো,—দীর্ঘকাল বেঁচে থাক্‌তে আমি চাইনে, যে ক'দিন বেঁচে থাকি সুখে থাক্‌তে চাই। আর আজ আমি অখ্যাতি কুখ্যাতির বাইরে।

তারা ব'ল্‌তো,—কুকাজ করা বা কুখ্যাতি অর্জ্জন করার মধ্যে পৌরুষ বা মহানুভবতার কোনটাই নেই। মঞ্জু হেসে ব'ল্‌তো,—আনন্দ ত আছে, সেই যথেষ্ট।

অধীর বাবু গোপাল বাবুর মতই অনুপস্থিত হ'লেন।

কিছুকাল পরে মঞ্জু জান্‌ল—অধীর বাবুর স্ত্রী তাঁকে বাসায় বন্দী ক'রে রেখেছেন। সে বন্ধন উপেক্ষা ক'রে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং' পান ক'রবার সাহস তাঁর নেই।

মঞ্জু আবার দু' ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রে নীরবে তাঁর উপেক্ষাও মার্জ্জনা ক'রল। জীবনের এ পৃষ্ঠাটিও অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্মৃতি-গহ্বরে সমাহিত হ'ল।

এমনি ক'রে আরও অনেকেই মঞ্জুর জীবনের মেঘ-রৌদ্রে লীলাচঞ্চল সঙ্কীর্ণ নেপথ্যে দু'দিনের জন্যে উৎসব ক'রে গেছে। উৎসবান্তের অবসাদে ও উচ্ছিষ্ট আবর্জ্জনায় সেই প্রাঙ্গণ আজ পরিপূর্ণ; বিবাহ অন্তে ক'নের বাড়ীর শূন্যতার হাহাকারে আজ তার অন্তর দিশেহারা।

আমার বইটার যখন মহলা চ'ল্‌ছিল ও সুটিংএর জোগাড় হচ্ছিল, সেই সময় মঞ্জু এক দিন আমার পাশে সোফায় ব'সেছিল। প্রগল্‌ভতা ও হাস্যরসের যথেষ্ট পরিচয়ই সে দিয়েছিল: আমি ব'সেই ছিলাম। মঞ্জু মৃদুস্বরে আমায় ব'লল,—আপনার অনেক লেখা আমি প'ড়েছি—

—বটে! কেমন লাগে? ভাল না নিশ্চয়ই।

—আপনার 'ধরিত্রী' বইখানা আমার এত ভাল লাগে—বইখান চোখের জলে ভিজে গেছে কতবার, তা আপনি কিরূপে বুঝবেন?

আমি ব'ললাম,—বুঝতে না পারা আমার দুর্ভাগ্য। তোমাদের বই পড়বার সময় আছে, বা কাঁদবারও অবসর পাও তোমরা—এমন ধারণা আমার নেই।

মঞ্জু জবাব দিল না। চুপ ক'রে ব'সে রইল।

কার্য্যসমাপনান্তে সে আমাকে প্রশ্ন ক'রল,—আপনার বাসা ত ঝামাপুকুর?

—হ্যাঁ।

—চলুন, আমার গাড়ীতে। আমি পৌঁছে দিয়ে যাবো।

—চলো।—ট্রামের পয়সা ক'টা বেঁচে গেল—এ কথা মুহূর্ত্তের জন্য মনে প'ড়েছিল।

মঞ্জু গাড়ীতে উঠে ব'ল্‌ল,—আপনি অন্যের অন্তরকে বুঝ্‌তে পারেন, তাকে উপযুক্ত মূল্য দিতে পারেন ব'লে আমার বিশ্বাস। আপনি অন্ততঃ আমাকে ব্যঙ্গ ক'রবেন না।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললাম,—আমি ব্যঙ্গ ত করিনি। তোমাকে—মানে তুমি অভিনেত্রী ব'লে আমি ব্যঙ্গ করিনি, বড়লোকদের পক্ষে হৃদয়হীন হওয়া স্বাভাবিক, এই কথাই ব'লতে চেয়েছি।

মঞ্জু হেসে ব'ল্‌ল,—আমি কি বড়লোক?

গম্ভীর মুখে ব'ললাম,—এ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দরজার কাছে এসে গাড়ী থাম্‌লো।

বাধ্য হ'য়ে ব'ললাম,—যদি কিছু মনে না কর, গরীবের বাড়ীতে একবার—

মঞ্জু হেসে ব'ল্‌ল,—আমাকে কটূক্তি করার লোভ কিছুতেই সম্বরণ ক'রতে পারেন না?

বৈঠকখানা ঘরে পুত্রটি একখানা ছেঁড়া ঘুড়ীর সর্ব্বাঙ্গে তালি লাগাচ্ছিল। আমার আঠার পাত্রটি নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে, এবং খোকার দেহের বহু স্থানেও তালির কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান!

—ওরে বোকা, সবখানি আঠা নষ্ট ক'রেছিস্? সারা গায়ে মেখেছিস্?

খোকার বয়স বছর পাঁচেক। গম্ভীর স্বরে সে জবাব দিল,—ঘুড়ী মেরামত ক'রচি কি না!

গৃহিণীকে চা'য়ের জন্যে ব'ল্‌তে যাবো, শুন্‌লাম, খোকা মঞ্জুকে ব'ল্‌ছে,—কাল পাঁচখানা ঘুড়ী কেটেছি, তা মা বকে।

মঞ্জুর গান শুনে, অভিনয় দেখে গৃহিণী বহু প্রশংসা ক'রেছেন; কিন্তু আজ সেই মঞ্জু স্বয়ং আমার অতিথি, এবং আমার সঙ্গেই এসেছে জেনে তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রসন্না হ'লেন। একটু বিরক্তির সঙ্গে চা'এর কেৎলীটা সশব্দে উনুনের উপর বসিয়ে দিলেন।

ফিরে দেখি, আঠা ও তালি অবলুপ্ত খোকা ছিন্ন ঘুড়ীর সূতা ধ'রে মঞ্জুর কোলে ব'সে, কোন্ দোকানের ঘুড়ী ভাল ও সস্তা সে বিষয়ে তার অভিমত জানাচ্ছে, এবং অকুণ্ঠিতভাবে পিতার ঘুড়ী সম্বন্ধীয় উদাসীনতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রছে।

মঞ্জু হেসে ব'লল,—আপনি ঘুড়ী সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই প্রকাশ করেন না, এটা সত্যিই অন্যায়।

আমি ব'ললাম,—তার চেয়েও বেশী অন্যায় আঠা লাগিয়ে দামী কাপড়টা নষ্ট করা। খোকা, যা এখান থেকে, নোংরা ভূত কোথাকার—

খোকা নাম্‌তে উদ্যত হ'য়েছিল। মঞ্জু ব'ল্‌ল,—থাক্ না। কি সুন্দর ছেলে!

খোকা আমার পুত্র হ'লেও চেহারাটা মন্দ নয়; মঞ্জুর প্রশংসায় মনে মনে খুসীই হয়েছিলাম। গৃহিণী চা নিয়ে এলেন। মঞ্জু নমস্কার ক'রলে গৃহিণী জবাব দিলেন,—আপনার অভিনয় কত দেখেছি। আমার খুব ভাল লাগে।

মঞ্জু হেসে ব'ল্‌ল—সত্যি!

আলাপটাকে অগ্রসর হ'তে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা ছিল না, তাই ছুতা ক'রে তিনি বেরিয়ে গেলেন। মঞ্জু খোকাকে ব'ল্‌ল,—তোমার ক'টা খেলনা আছে।

খোকা ঝুপ্ ক'রে তার কোল থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ব'ল্‌ল,—দেখবে?

—হুঁ।

সগর্ব্বে সে তার সিগারেটের কৌটার সুটকেশ বের ক'রে দেখালে,—দু'টি কন্ধকাটা চিনেমাটির পুতুল, একটা চ্যাপ্টা আলুর পুতুল—

খোকা ব'ল্‌ল,—নাম জানো?

মঞ্জু ব'ল্‌ল—না।

—এটা কন্ধকাটা, এটা ব্রহ্মদৈত্য, এটা পেত্নী—

—এসব নাম তুমি রেখেছ।

খোকা সগর্ব্বে ব'লল,—"বাবা রেখেছে ওসব নাম।"

মঞ্জু হো হো ক'রে হেসে ব'লল,—ছেলেকে এমনি ক'রে ভুলোতে হয়!

আমি ব'ললাম,—জীবিত কালে ওদের নাম অন্যরূপ ছিল; এখন পারলৌকিক জীবনে ওদের নাম ওই—ওদের লীলা-জীবনের নাম এখনও রেখে-দেওয়া ঠিক নয়।

মঞ্জু আমার কথায় প্রগল্‌ভের মত খানিক হাসি

উদ্গিরণ ক'রে খোকাকে ব'লল,—তোমার ডিগবাজী খাওয়া পুতুল নেই ?

—বাবা দেয় না।

আমি যদি দেই তুমি আমায় কি দেবে ?

খোকা অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা কন্ধকাটা পুতুল দেখিয়ে ব'লল,—এইটে।

আমার কাছে আস্‌বে।

—হুঁ। কবে দেবে ?

—কালই দেব।

—ঘুড়ী দেবে ?

—হুঁ—কিন্তু তুমি ছাতে ওড়াতে যেতে পারবে না।

খোকা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সর্ত্তে রাজি হ'ল।

মঞ্জু ব'লল,—আমার সঙ্গে যাবে।

—না। মা ব'কবে—

পরদিন স্যুটিং শেষে মঞ্জু ব'ল্‌ল,—চলুন যাই।

তার গাড়ীতে উঠে ব'সলাম।

গাড়ীখানা চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে হঠাৎ থাম্‌লো। মঞ্জু দু'খানা ঘুড়ী ও কিছু খেলনা কিন্‌ল।

আমি ব'ল্‌লাম,—তুমি সেই কথা মনে ক'রে রেখেছ—

মঞ্জু ব'লল,—বেশ! খোকা হয় ত কত আশা ক'রে অপেক্ষা করছে।

আমি হেসে ব'ল্‌লাম,—বহুক্ষণ সে কথা সে ভুলে গেছে—তা না হ'লে রোজ কত কি দেব প্রতিজ্ঞা করি, তা যদি সবই দিতে হ'ত তবে ত আমি ফতুর—

—তা হোক্‌!

ঘরে ফিরে দেখা গেল, খোকা দোয়াতের কালির প্রায় সবখানিই নিজ অঙ্গে মেখে ধরা-পড়া চোরের মত আমার লেখার টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

মঞ্জু ব'লল,—এ কি ক'রেছ খোকা ?

খোকা নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে ভীত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। বুঝলুম, একটা কিছু অন্যায় সে ক'রেছেই—

মঞ্জু খোকাকে কোলে ক'রে নামাতেই দেখা গেল —মঞ্জুরই ছবিওয়ালা একখানা ক্যালেণ্ডার দেয়ালে ঝুল্‌তো, সেটাতে আজ অকস্মাৎ একটি বেমানান গোঁফের আবির্ভাব হ'য়েছে।

ব'ল্‌লাম,—মঞ্জু, দেখ তোমার দুর্গতি।

মঞ্জু হেসে উঠ্‌ল। ব'ল্‌ল,—খোকা, এ ছবি কার ?

খোকা কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে ব'ল্‌ল,—বাবার।

মঞ্জু আবার হেসে ব'ল্‌ল,—ওই মেয়েটার চেহারা আমার মত নয় ?

খোকা অশ্রুপূর্ণ চোখ রগড়ে দু'ফোঁটা অশ্রু মুছে বল্‌ল, —হেঁ।

—তবে গোঁফ দিলে কেন ? আমার কি গোঁফ আছে ?

সভয় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে খোকা মঞ্জুর বুকের মাঝে মাথা লুকাল। মঞ্জু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্‌ল,—যাক্‌গে,—গোঁফ না হয় থাক্‌, তুমি ঘুড়ী দেখবে না ?

খোকা মাথা তুলে বল্‌ল,—কই ?

মঞ্জু তাকে ঘুড়ী ও খেলনা দিয়ে বল্‌ল,—এই দেখ, খোকা কেমন ডিগবাজী খাবে।

সে দম্‌ দিয়ে ছেড়ে দিল; সেলুলয়েডের খোকা অবিশ্রান্ত ডিগবাজী খেতে লাগ্‌ল আর সেই সঙ্গে আমার খোকাও আনন্দে নাচতে আরম্ভ ক'রল।

মঞ্জু এইবার প্রশ্ন ক'রল,—ওর গোঁফ এঁকে দিলে কেন ?

খোকা সেদিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়েই ব'ল্‌ল—বাবার গোঁফ আছে যে!

আমি ব'ললাম,—অর্থাৎ যেহেতু ওর বাবার গোঁফ আছে, সেই হেতুই স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই গোঁফ থাকতে হবে।

মঞ্জু হোঃ হোঃ ক'রে হেসে-উঠে খোকাকে কোলে টেনে নিল। দু'টি চুমায় তাকে আদর ক'রে ব'ল্‌ল,—তা গোঁফ না হয় থাক্‌। তুমি যাবে আমার সঙ্গে, গাড়ীতে ক'রে গড়ের মাঠে নিয়ে যাবো—

খোকা ব'ল্‌ল,—গাড়ী কই ?

উন্মুক্ত দরজার ফাঁক্‌ দিয়ে মঞ্জু তার গাড়ী দেখিয়ে ব'ল্‌ল,—ওই যে।

—আমায় চড়তে দেবে ?

—দেব বই কি।

—মা যে বকে।

—তাঁর কাছে শুনেই যাবে, নইলে কি আমিই নিয়ে যেতে পারি?

—শুনে আস্‌বো?

মঞ্জু ব'ল্‌ল,—আজ নয়, তুমি শুনে রেখো, আর একদিন নিয়ে যাবো। আজ কাজ আছে।

খোকার সঙ্গে মঞ্জুর ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হ'য়ে উঠ্‌লো। মঞ্জু আস্‌তো, আমার অপেক্ষা না-ক'রেই খোকাকে নিয়ে খেলা ক'রতো, এবং খোকাও তারই কাছে তার যাবতীয় আব্দার পেশ ক'রতে আরম্ভ ক'রেছিল।

মঞ্জুর খেলনায় ঘর ভরে গেছে, খোকা সেগুলোকে ভেঙ্গেও শেস্ ক'রতে পারছে না এমনি তার স্বাচ্ছল্য।

একদিন মঞ্জুকে চা দিয়ে ব'ললাম,—মঞ্জু, আর খেলনা কিনে অর্থের অপচয় ক'রো না। যথেষ্টই ত দিয়েছ, ওগুলো আগে ভেঙ্গে সাবাড় করুক—

—অপচয় ত অনেকই করি।

—কিন্তু এতে ক্ষতি আছে। তুমি আর দিও না।

মঞ্জু বিস্মিত হ'য়ে ব'লল,—আপনি অসন্তুষ্ট হন?

—না, তোমার মত একজন মহিলা আমার ছেলেকে আদর করে, এ আমার গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু ও দরিদ্রের ঘরে জন্মেছে, ভবিষ্যতে দুঃখ, কষ্ট ও অতৃপ্তি ওকে পেতেই হবে, তাই এখন থেকেই ওর মনকে ব্যর্থতার জন্যে প্রস্তুত হ'তে দাও।

মঞ্জু ব'ল্‌ল, এই! যে কয়দিন তৃপ্তি পায় সে-ই লাভের; ভবিষ্যতে যে ও দরিদ্রই থাক্‌বে তার কি প্রমাণ আছে? ও বড় হবে—

আমি ব'ললাম,—এখনকার ওই পরিতৃপ্তি ভবিষ্যতে ওর অতৃপ্তিকে দ্বিগুণ ক'রে ফিরিয়ে দেবে, তখন্ হয় ত সে দুঃখকে বইবার সাধ্য ওর হবে না।

মঞ্জু হেসে ব'ল্‌ল,—আচ্ছা।

খোকা গৃহপালিত বিড়ালটির কাণ ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে এনে ব'লল,—এই যে মিনি।

মঞ্জু কুদর্শন বিড়ালটিকে হাতে নিয়ে ব'ল্‌ল,—খোকা যাবে না আজ বেড়াতে?

খোকা ব্যথিত ভাবে ব'লল,—না।

মঞ্জু ভাব্‌ল, তার কোনও আব্দার হয় ত আছে, তাই সে ব'ল্‌ল,—কি দিলে তুমি যাবে বল ত? গাড়ীতে যাবে না।

খোকা আবার ব'ল্‌ল—না।

খোকাকে কোলে টেনে নিয়ে সে ব'ল্‌ল,—তবে কি চাই?

খোকা ব'ল্‌ল,—তুলোর কুকুর, ল্যাজ টিপ্‌লে কুঁই-কুঁই ক'রে—তাই দেবে?

মঞ্জু ব'ল্‌ল,—নিশ্চয়ই, কাল পার্টি আছে আমার বাড়ীতে, তুমিও যাবে তোমার বাবার সঙ্গে। গিয়ে এত-বড় একটা কুকুর নিয়ে আস্‌বে—কেমন? না, আমিই গাড়ী নিয়ে আস্‌বো?

খোকা হাত দিয়ে কুকুরের আয়তনটা দেখিয়ে ব'লল,—এত বড়?

—হ্যাঁ, অত বড়।

আমাকে মঞ্জু ব'ল্‌ল,—কাল ওকে নিয়ে যাবেন পার্টিতে। ···খোকাকে ব'ল্‌ল,—আচ্ছা খোকা, আমি না এলে তোমার দুঃখ হয়?

—হুঁ!

—আমার কথা মনে পড়ে?

—হুঁ। তিনখানা ঘুড়ী ধ'রেছি কাল, দেখ্‌বে?

আমি হাস্‌ছিলাম, কেউ না এলে দুঃখ বোধ করা, বা কারও কথা মনে পড়ে কি না সেকথা নির্ণয় ক'রবার শক্তি খোকার আজও হয়নি। মঞ্জু তা জানে না।

মঞ্জু প্রশ্ন ক'রল,—হাস্‌ছেন যে?

—খোকার বিরহ বুঝবার বয়স হ'য়নি তাই।

মঞ্জু হেসে ব'ল্‌ল,—বেশ, আপনিই ত ব'ল্‌লেন সেদিন, আমি আসিনি ব'লে খোকা আমার কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছে।

—তোমার জন্যে নয়, খেলনার প্রলোভনে।

মঞ্জু ব'ল্‌ল,—আমার বিশ্বাস, ওদেরও অন্তরে প্রবৃত্তিগত খানিক ভালবাসা আছে।

মঞ্জুকে বিমুখ ক'রবো না মনে ক'রে ব'ললাম,—হবে।

সেদিন ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ উঠে দেখি, পার্টিতে যাওয়ার সময় আসন্ন। খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হ'তে হবে। তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে, কাপড়-জামা পরতে সুরু ক'রে

দিলাম। গৃহিণীকে ব'ললাম,—খোকাকে একটু সাজিয়ে দাও।

এ সম্বন্ধে গৃহিণীর কোন উৎসাহই নেই। ধুলা-বালি-অবলুপ্ত স্খলিত-পেণ্ট্‌লুন খোকা তখনও তার নানাবিধ ভাঙ্গা ও গোটা খেলনার স্তূপে সমাধিস্থ। বিরক্তির সঙ্গে ব'ললাম, খোকাকে তৈয়েরী ক'রে দাও। ওকেও যে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে মঞ্জু—

খোকাকে ব'ললাম,—খোকা, কুকুর আন্‌তে যাবিনে?

খোকা হৃষ্ট মনে উঠে-দাঁড়িয়ে বল্‌ল,—হুঁ।

গৃহিণী অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে ব'ললেন,—না, ওকে যেতে হবে না।

—তার মানে?

—খোকা যাবে না।

—মঞ্জু কত আদর ক'রে ওকে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে, আর তুমি ব'লছো—

গৃহিণী ঝাঁঝাল স্বরে ব'ল্‌লেন,—তুমি যাচ্ছ যাও, খোকাকে আমি ও-সব মায়াবিনীর কাছে নিয়ে যেতে দেব না! ওদের হাসিতে মধু ঝরে, কিন্তু নিশ্বাসে সব শুকিয়ে যায়—

আশ্চর্য্য হ'য়েছিলাম! গৃহিণীর অনেক দিনের সঞ্চিত ক্ষোভ আজ প্রকাশ লাভ ক'রেছে। আমি ব'ললাম,—মঞ্জু ওকে নেড়ে-চেড়ে একটু আনন্দ পেতে চায়, সেটুকু দেওয়ার মত উদারতা তোমার থাকা উচিত; আছে ব'লেই বিশ্বাস ছিল—

গৃহিণী রুক্ষ স্বরে ব'ললেন,—তোমার বেলায় সে উদারতা আমি যথেষ্টই ত দেখাচ্ছি, খোকার বেলায় পারবো না।

—তার মানে?

—তার মানে এই যে, আজ চক্ষু-লজ্জায়, নেহাৎ দয়া ক'রে রাত্রে বাড়ী ফিরচ। খোকা বড় হ'লে সে কষ্ট-টুকুও তোমাকে ক'রতে হবে না।

ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলাম, ব'ললাম,—তুমি ব'ল্‌তে চাও, মঞ্জু আর আমার সম্পর্ক রুচিকর নয়?

গৃহিণী ব্যঙ্গোক্তি ক'রলেন,—অবশ্যই। তোমাদের নিকট তা খুবই রুচিকর।

গৃহিণী কোন উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে খোকার হাত ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে টান্‌তে টান্‌তে পর্দ্দার আড়ালে অদৃশ্য হ'লেন।

উত্তেজিত হ'য়েছিলাম। জুতার ফিতাটি সজোরে বেঁধে বেগের সঙ্গেই দরজাটা খুলে ফেল্‌লাম। দেখি, সাম্‌নে কে যেন দাঁড়িয়ে, তাই থেমে গেলাম।

অত্যন্ত অপরাধীর মত আমারই গৃহদ্বারে মঞ্জু তুলোর কুকুর হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তার সর্ব্বাঙ্গে অস্তায়-মান তপনের লোহিত কিরণ বর্ষিত হ'য়ে তাকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। মঞ্জুর চোখ দু'টিতে দু'ফোঁটা অশ্রু টল্‌-টল্‌ ক'রছে।

কিছু ব'লবার পূর্ব্বেই আমার হাতের উপর কুকুরটা ফেলে-দিয়ে নিঃশব্দে সে মোটরে গিয়ে উঠ্‌ল, এবং আমি মোটরের নিকটবর্ত্তী হওয়ার পূর্ব্বেই মোটর গলির মোড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল—

আমাদের বাদানুবাদ মঞ্জুর কাণে না গিয়েছে এমন নয়; আজ সেই কটূক্তির ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে তার ভিখারী হৃদয় চিরদিনের মত অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। মঞ্জুর দেওয়া উপহার হাতে ক'রে এক-পা দু'পা ক'রে ঘরে ফিরে এলাম।

পরে একদিন গৃহিণীর কটূক্তির জন্যে আমি মঞ্জুর কাছে তাঁর হ'য়ে ক্ষমা চেয়েছিলাম। মঞ্জু জবাব দিয়েছিল, —আমার প্রাপ্য আমি পেয়েছি, তার জন্যে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই।

প্রশ্ন ক'রেছিল,—কুকুরটা খোকাকে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—খুব খুশী হ'য়েছে ত?

—হ্যাঁ।

তার পরে মঞ্জু আর কখন আমার বাড়ীতে আসেনি।

অভিনয়ের মাঝামাঝি এ ভাবে যবনিকা পড়বে, তা পূর্ব্বে ভাবতে পারিনি। মনে হ'ল ট্রাজিডিটা বড় সকরুণ।

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম-এ)।

বাঙ্গালা কাব্যে মানবতার রূপ

(রবীন্দ্র-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে)

মানব-জীবনের ও মানব-মনের সূক্ষ্মতম পরিবর্ত্তনও অনুভূতিশীল কাব্যসাহিত্যে ধরা পড়ে, কারণ জীবনকে ঘিরিয়াই কাব্য। কোন কবির কল্পনায় মানুষের হৃদয়ের কোন বিশেষ রূপ ঘনীভূত হইয়া আপন অনন্ত বৈচিত্র্যের একটা অপরূপ প্রকাশ সৌন্দর্য্যের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিল, তাহাই কাব্য-সমালোচনায় বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। কবির উপমা ভালো, বা ভাষা সরস, অথবা বর্ণনা সুন্দর হইলেই যথেষ্ট হইল না। কাব্যে মানব হৃদয়ের একটা বিশেষ রূপ বাঁধা পড়ে; কবির কল্পনা যেন সুস্পষ্ট কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া মানুষের মনোলোকের কোন্ অব্যক্তকে একটা বিশেষ সৌন্দর্য্যে ব্যক্ত করে, কাব্যবিচারের তাহাই লক্ষ্য। ম্যাথ্যু আরনল্ড বলিয়াছেন, "Poetry is the criticism of life." পৃথিবীর সকল কাব্য ও মহাকাব্যই মানবজীবনের গতিধারার পর্য্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ দ্বারা রচিত। সুতরাং বলা যাইতে পারে—যে যুগে মানুষ মনুষ্যত্বের বিরাট মহিমাবোধকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, সেই যুগেই কাব্যকলার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতির সম্ভাবনা। যখনই কাব্যের অন্তর্দ্দেশ ঘিরিয়া মানবতার বিরাট মহিমাবোধ রূপায়িত হইয়া উঠে, তখনই তাহার চরম সার্থকতা। য়ুরোপীয় কাব্যসাহিত্যেও তাই দেখা যায়। 'পুনরুত্থান' যুগের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মানবতাতেই কাব্য প্রাণবন্ত। যদিও শেলীর পক্ষে প্রকৃতি মানবজীবন অপেক্ষাও উন্নত, এবং জীবন এই সৃষ্টির মধ্যে মসীবিন্দু মাত্র ("a blot on the creation") যদিও তাঁহার মতে,—

Life like a dome of many-coloured glass
Stains the white radience of Eternity."

তথাপি "Prometheus Unbound"এর কবিহিসাবে তিনি মানব-বিগ্রহেরই পূজারী। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যেও এই একটা মানবতার রাগিণীর (music of Humanity) অস্তিত্ব দেখা যায়। কাউপার প্রকৃতির সঙ্গীত গাহিলেন; তিনি মানুষের মধ্যে প্রকৃতির শুধু রূপ দেখিলেন না, প্রকৃতির মধ্যে মানবতারও বিকাশ লক্ষ্য করিলেন। ব্রাউনিঙ-এর কাব্যে প্রকৃতিকে পটভূমি হিসাবে পিছনে রাখিয়া যে মানবধর্ম্মের যৌবন-সমুচ্ছ্বসিত রূপ জাগিয়াছে তাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি হেমচন্দ্রের এই সাধনা সার্থক হইয়াছে, যখন তিনি গাহিয়াছেন,—

"হায় রে প্রকৃতি সনে
মানবের মন বাঁধা আছে কি বন্ধনে।"

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, কাব্য প্রকৃতপক্ষে মানব-মনের বিচিত্র আলোছায়াবিলসিত একখানি আলেখ্য এবং মানব-জীবনের গভীরতম অনুভূতি যাহা প্রেম নামে অভিহিত, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের সাহিত্য, স্থাপত্য, চারুকলাসমূহ যুগে যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রেমের, তথা মানব-জীবনের এই বিরাট প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই;—প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য মানুষের কামনা, বেদনা, সুখ, দুঃখের বিচিত্র অনুভূতি সমূহের কোন মূল্যই নির্দ্দেশ করে নাই। মনুষ্যত্বের এই অসীম মহিমাবোধ—তাহার বাষ্পটুকু পর্য্যন্ত পূর্ব্বে বাঙ্গালা কাব্যের আকাশে স্থান পায় নাই। তখন বাঙ্গালীর মনোভূমিতে ভালোবাসা অপেক্ষা ভয় ও ভক্তির আসন ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ভীতিকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার যে বৃহত্তম সাহিত্য-শাখার উদ্ভব হইল, তাহাই সাধারণতঃ 'মঙ্গল-কাব্যশাখা' নামে অভিহিত। সামাজিক ও আধিদৈবিক—এই দ্বিবিধ সন্ত্রাস হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বাঙ্গালার হিন্দুসাধারণকে নানা দেব-দেবীর পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বহিরাঘাত হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই দৈব-মহিমা বা দেবানুগ্রহ নতশিরে সর্ব্বান্তঃকরণে মানিয়া লইবার দুরপনেয় কলঙ্ক সমগ্র জাতিকে হীন করিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়াই অনেকের ধারণা। চণ্ডিকা, বিষহরী, শীতলা, অন্নদা, এমন কি, ধর্ম্ম ও শিব পর্য্যন্ত—দেব-দেবীর জন্মস্থান প্রায়ই পুরাণ বা তথাকথিত পুরাণ হইলেও কর্ম্মক্ষেত্র কিন্তু এই বাঙ্গালা দেশ ও ধর্ম্মভীরু বাঙ্গালীর মনোরাজ্য। মঙ্গলকাব্যে মানুষের ইচ্ছা-শক্তি দেবতার করতলগত—তাহাদের জীবনধারা একান্ত যন্ত্রবদ্ধ—অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতাশালী দেবতার অঙ্গুলি সঙ্কেতমাত্র কত কি ওলট-পালট হইয়া যায়,—এমন কি, সদাগরের সপ্তডিঙ্গা সমুদ্রের অতলে তলাইয়া গিয়াও ভাসিয়া উঠে! মানুষ দুঃখ পাইলে কেন তাহা পাইল, তাহার আলোচনায় মাথা ঘামায় না; পরিত্রাণেরও কোন চেষ্টা কোথাও দেখা যায় না। বলির-পশুর মত অবলীলায় নিয়তির তীক্ষ্ণ খড়্গের নীচে নিজেই আগাইয়া যায়। মুক্তি যখন আসে, তাহাও চেষ্টালব্ধ বা স্বোপার্জ্জিত নহে, দেবতার বররূপে তাহার আবির্ভাব। তাই এক দিকে যেমন তাহারা এই পাওয়াকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, অপর দিকে ঠিক তেমনি অস্বীকার করিতেও দ্বিধা বোধ করে। সেকস্পীয়ার যেন তাহাদেরই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"As flies to wanton boys, are we to the gods
They kill us for their sport."

মানুষের সেখানে করণীয় কিছুই নাই। বহুবিবাহের দেশে সপত্নীর পীড়ন হেতু খুল্লনা বনে বনে ছাগল চরায়, মাটীর গর্ত্তে ফুল্লরা 'আমানি' খায়—"কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণি"—বলিয়া অপরিসীম বেদনায় অশ্রুপাত করে। অব্যাহতি যদি পায় তবে তাহা একমাত্র চণ্ডিকার অনুকম্পার ফল। সদ্যবিবাহিত বিধবা বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ বুকে চাপিয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে দৈবকৃপাতেই স্বামীর পুনর্জ্জীবন লাভ করে। দারিদ্র্য যখন গ্রাস করে, তখন দেবী-আরাধনার ফলে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ ঘটে; এমন কি, বিদ্যার অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের ক্ষেত্রেও মা-কালীর অনুকম্পা ব্যতীত

সমস্যার সমাধান হওয়া দুর্ঘট। অর্থাৎ এক কথায়, মানুষের ব্যক্তিত্ব বা তাহার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব বলিয়া কোন বস্তুই এই কাব্য-নিচয়ে স্বীকৃত হয় নাই; মনুষ্যত্বের এমন অবমাননা আর বিশ্বের কোন সাহিত্যেই এরূপ সুলভ নহে।

মাতৃপূজার এই সনাতন ঐতিহ্যের মোহ কাটাইয়া—আসিল বৈষ্ণব-যুগ। বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম যে সান্ত্বনা, যে আনন্দ দান করিতে পারে নাই, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগেও শঙ্করের অদ্বৈতবাদাশ্রয়ী শৈব-ধর্ম্ম তাহা পারিল না; পারিল এই কিশোর-লীলার মন্দাকিনী-প্রবাহ। এইখানে আসিয়া দেবতার সহিত মানুষের একটা সম্বন্ধের খবর পাওয়া গেল—ভাবের নয়, প্রেমের। মানুষ স্বর্গের দেবতাকে, দূরের দেবতাকে পাইল একান্ত নিকটে,—প্রিয়তমরূপে, সখারূপে, পুত্ররূপে ও ব্যথার ব্যথীরূপে। কিন্তু এখানেও আধ্যাত্মিকতার নামে অনেকে মাতিয়া উঠেন। তাঁহাদের মতে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, শ্রীরাধা জীবাত্মার প্রতীক। "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—সেই ভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারই স্বয়ম্প্রকাশেচ্ছা মানব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া নরনারীর ভিতর আপনাকে চির-প্রকাশিত রাখিয়াছেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বার্থসাধিকা, হ্লাদিনী প্রেমরূপিণী সঙ্গিনী। রাধার হৃদয়ের অতলে অবগাহন করিয়াই ভগবান কমললোচন কৃষ্ণ আপনার অনন্ত প্রেমসম্ভাবনাকে আস্বাদন করিলেন; তাই যন্মাত্র পুরুষ গোলোক হইতে নামিয়া আসিলেন সৃষ্টির বৃন্দাবনের মধ্যে—এইখানেই চলিয়াছে তাঁহার অনন্ত আত্মরতির নিত্যলীলা।

এই ধরণের বিশ্লেষণ দিতে গিয়া এই আধ্যাত্মবাদীর দল বৈষ্ণব-কবিতার মানবীয় প্রেমের মাধুর্য্যটুকু হইতে আমাদের বঞ্চিত করিতে চাহেন। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—ইহাই ত প্রেমের উপনিষদ; পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে রূপরাগ-বিভোর মিথিলায় বসিয়া সাধক কবি বিদ্যাপতি যখন বিলাস-কলাময়ী ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা রূপলাবণ্যবতী রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিতে বলিলেন,—

"থির নয়ন অথির কিছু ভেল"

অথবা, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ যখন বলেন,—

"চলে নীল সাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর"

তখন মনে হয়, নীলবসনা রূপসী বিনোদিনীর প্রত্যেক ভঙ্গীতে, প্রত্যেক চরণপাতে যেন বাসনার অরবিন্দ ফুটিয়া উঠিতেছে। "রূপোচ্চয়েন মনসাবিধিনা কৃতানু"—শকুন্তলা সম্বন্ধে প্রযুক্ত কালিদাসের এই উক্তিটি রাধার পক্ষে একান্ত সত্য; রাধাকে বিধাতার সৃষ্টি বলিলে বোধ করি ঠিক বলা হয় না, রাধা অর্দ্ধেক মানবী ও অর্দ্ধেক কল্পনা। রাধা বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের মানস-প্রতিমা; কবি তাই বলিয়াছেন,—

"সেদিনকার রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন
মুখচোরা সেই মেয়ে
চোখে কাজলপরা
তিনশো বছর আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালী-মেয়ে—"

যে-মেয়ে মেঘ-মেদুর বর্ষণঘন শ্রাবণনিশায় তাহার প্রিয়দয়িতকে স্বপ্ন দেখিয়া বলিয়াছিল,—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলা বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

অথবা— "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

ভাদ্রমাসের ভরা বাদলে শূন্য ঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে; যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল অমনি সকলেরই অনেক দিনের সেই কথাটি মূর্ত্তি ধরিয়া বসিল। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন,—

"সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা হ'তে পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি?"

এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই সুন্দরভাবে দিয়াছেন,—

"এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তারে কেহ বঁধুর গলায়
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে; প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
দিই তাই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"

রাধা কৃষ্ণলীলাকে মানবীয় প্রেমচ্ছবি হিসাবে না দেখিতে পারিলে তাহার সমগ্র রসরূপটিই ব্যর্থ হইবে। রাধা অতুলনীয়া রূপসী—পদকর্ত্তৃগণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া প্রকৃতির পটভূমির সম্মুখে সমসাময়িক সৌন্দর্য্যবোধের দৃষ্টি লইয়া আপন মনের বিচিত্রতর বর্ণ-সংযোগে তাঁহাকে রূপ দিয়াছেন—ইহাতে তাঁহাদের ভালোলাগার স্পর্শ আছে, রূপানুভূতির তীব্রতাও আছে প্রচুর। রাধার প্রণয়ের প্রগতি স্তরে স্তরে প্রতিরূপে, প্রতি ভঙ্গিমায় নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। পদাবলীসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণকে একান্ত মানব-মানবী হিসাবে ধরিয়া-লইলে তাঁহাদের প্রতি সুবিচারই করা হইবে। কবিগণ এই রূপজ প্রেমকে স্থানে স্থানে অরূপজ প্রেমের মণি-কোঠায় লইয়া গিয়াছেন।

বৈষ্ণব বড় পৌত্তলিক; দেহ-বিগ্রহের পূজারী। বৃন্দাবনের এই আদর্শের মধ্যেও লৌকিক জগতের সকল সত্যকার প্রেমলীলা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাহা না হইলে বৈষ্ণবপদাবলী গুহ্য সাধন কাহিনীতেই পর্য্যবসিত হইত, উৎকৃষ্ট কাব্যরূপে রসজ্ঞ পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারিত না। নরনারীর মিলন-প্রবৃত্তি চিরন্তনের—তাহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াই ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয়; কারণ, ইহাও মানুষের সহজাত ধর্ম্ম। সৃষ্টির ই আদি ও শাশ্বত রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা না করাই মূঢ়তা। ইহাতে মানবাত্মার পরাজয়ের গ্লানি নাই; কারণ, শাস্ত্র ও সমাজ যাহাকে পাপ বলে, যদি তাহাতে মনুষ্যধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে সাহিত্যের পক্ষে তাহা আদৌ কুপথ্য নহে। কারণ, সাহিত্য সমগ্র জীবনের প্রতিবিম্ব, এবং জীবনের প্রথম স্থূলতম কথাই হইতেছে ভোগাকাঙ্ক্ষা। যাহার ভোগাকাঙ্ক্ষা যতখানি সত্য, তাহার জীবনও ঠিক ততখানিই সত্য। তাই জীবনের মধু-নেশায় মন

কখনচিত্ত ভরপুর হইয়া উঠে, তখনই তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠে,—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিত লাগি থির নাহি বান্ধে।"

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম যে শাশ্বত, তাহা যে মানব-মনের চিরন্তন বিকাশ, তাহা রবীন্দ্রনাথের বাণী হইতেও উপলব্ধি করা যায়,—

"আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গান বনে উপবনে।
এখনো সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা সারাদিন সারাবেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।"

কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, এখানেও মানুষের প্রতি মানুষের গভীর অশ্রদ্ধা; তখনও পর্য্যন্ত মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, মানুষের জীবনের মাহাত্ম্য কত বৃহৎ, কত অসীম, জীবনের রহস্য কত অতলস্পর্শ। মানুষের সঙ্গে মানুষের, তথা বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে সত্যকার সম্বন্ধ তাহারই সুবিপুল রহস্য তখনও কাব্যের ভিতর দিয়া হৃদয়ের গোচর হয় নাই। ভারতীয় চিন্তায় মানুষকে প্রকৃতির পরিবেশ হইতে দূরে সরাইয়া তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৈষ্ণব-কবিতায় ও সহজধর্ম্মে প্রাণের আকুতি রাধাকৃষ্ণের প্রতীকের সাহায্য-ভিন্ন ব্যক্ত হইতে পারে নাই—তাহাতেও জগৎ এবং জীবনকে বিশেষ কোন আমল দেওয়া হয় নাই। এই কাব্য ভরিয়া আছে—শুধু রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দীর্ঘশ্বাস। জীবধর্ম্মী প্রাণ পুরুষের যে সার্ব্বজনীন রূপ আছে, তাহার ছায়া যখন কাব্যের মায়াদর্পণে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়, তখনই সাহিত্যের শুষ্কশাখা সহসা প্রাণের আবেগে পুনরায় মুঞ্জরিত হইয়া উঠে।" কদাচিৎ দুই এক স্থলে প্রাণধর্ম্মের এই সার্ব্বজনীনত্ব বৈষ্ণব কবিতায় দেখা যায়—যাহা মানবতার দিক্ হইতে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির এই পদটি তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ,—

"জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

তৎপরে পল্লীকবি-বিরচিত গীতিকথার মধ্যে আসিয়া মানবধর্ম্মের ও মানবপ্রেমের যে নির্ভীক বিকাশটুকু লক্ষ্য করি, তাহা সত্যই প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে সুলভ নহে। এ প্রেম অপ্রাকৃত ভাব-লোকের নহে; ধূলার ধরণীর বুকের'পরে ইহা শতদল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভালোবাসার আকর্ষণ অয়স্কান্তের আকর্ষণের ন্যায় প্রবল। তাই "সোতের সেওলা-"সম মহুয়া প্রেমের নিগড়ে ধরা পড়িয়া নদেরচাঁদের জন্য বুকের আঙ্গিনায় আলিপনা রচনা করিয়াছে, মনের মধুচক্রে যৌবন-মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মের আবরণ নাই; আধ্যাত্মিকতার কৈফিয়ৎও নাই। নববিরহী মহুয়া একান্ত নিভৃতে অন্তরের অন্তস্তলে যে আসনখানি প্রেমের জন্য পাতিয়াছিল, পালঙ্ক-সইএর কাছে তাহা সে গোপন করে নাই। প্রতিকূল আবেষ্টনীর বিপুল সাহারার মধ্যে এখানে সে একটুমাত্র শ্যামলছায়াবিতানের সন্ধান পাইয়াছিল, তাই বলিয়াছে,—

"চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী সই, সাক্ষী হইও তুমি।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী।"

জীবনকে ফুলে-ফলে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে মানস-দেউলের প্রেম-বিগ্রহটির মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন—কাঙ্ক্ষিত ধনকে একান্ত করিয়া পাওয়া আবশ্যক। মহুয়ারও প্রেম-বল্লরী তমাল তরুর ন্যায় নদেরচাঁদকে জড়াইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই বীর্য্যবান প্রেম বিধি নিষেধের সঙ্কীর্ণ সীমানাকে বহু দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে। "চান্দসুরুজ"-এর তুল্য তাহার অন্তরের নিধিকে সে মন দিয়া আকর্ষণ করিয়াছে, দেহ দিয়া সেবা করিয়াছে, এমন কি, প্রেমের বেদীমূলে প্রাণকে অর্ঘ্য দিয়াছে। লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্মবোধকে খাটো করিয়া প্রাণ-ধর্ম্মের জয়-ঘোষণায় মানুষের প্রেম এখানে সার্থক।

মলুয়া বাঙ্গালী-বধূর পরিপূর্ণ ছবি। চান্দবিনোদকে একাকী সন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে অসহায়ের মত শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কোমলহৃদয়া বাঙ্গালী বধূর প্রাণে যে বেদনা ও সহানুভূতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, কবির কাহিনীতে তাহারই একান্ত স্বাভাবিক চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। সে একবার ভাবিতেছে, নিদ্রাগত এই পর-পুরুষকে জাগাইয়া তাহার পিত্রালয়ের পথ দেখাইয়া দেয়, কিন্তু "পন্থহারা ভিনপুরুষের দুঃখ" তাহার কাছে যতই বড় হৌক না কেন, কুল-মানের ভয় তাহাকে আরও ব্যথিত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। এই চিত্রের মধ্যে একটি সেবাপরায়ণ খাঁটি বাঙ্গালী-প্রাণেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

নিজের অনবধানতায় অন্তরের বিকচ-কুসুমের মালাখানি কৈশোরের সাথী দয়ানন্দকে পরাইয়া-দিয়া তাহার কাছে চন্দ্রাবতী নিজেকে নিবেদন করিয়া দিয়াছিল। জীবন-সঙ্গী নিৰ্ব্বাচনে সে ভুল করিয়াছিল কিনা তাহা লইয়া বিতর্ক করা চলে না; কিন্তু তাহার এমন গভীর প্রেম সংযমের জন্য ব্যর্থ হইয়াছে—এইখানেই ত জীবনের ট্র্যাজিডি। যাহাকে পাইলে সে সার্থক হইতে পারিত, তাহাকেই দেহলি হইতে বিদায় দিতে হইল, ইহারই বেদনা সমগ্র কাব্যখানিকে আপ্লুত করিয়াছে। চন্দ্রাবতীর অন্তর ইহার ফলে বিক্ষুব্ধ ও আবিল হইয়াছে; কিন্তু প্রেম, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মসংযমের এই দ্বন্দ্বই ত মানব-জীবনের সত্যকার সম্পদ; পশুজীবন হইতে মানুষ এইখানেই উচ্চস্তরের। এই সংঘাত না থাকিলে মানুষ মানুষ না হইয়া দেবতা অথবা দানব হইয়া উঠিত। এই ঘূর্ণীর মাঝখানে আবর্ত্তিত আমরা তাহাকে রক্তমাংসে গড়া মানুষ হিসাবে পাই—সে ত দেবানুগৃহীত ক্রীড়নক মাত্র নহে। পুষ্পবনের গোপন অনঙ্গ মানুষের অন্তর এক দিকে কেমন করিয়া তোলে অপর দিকে বৃহত্তর অন্তরায় সেই প্রেমের সর্ব্বস্বধনটিকে দূরে রাখিতে বাধ্য করায়—ইহাই ত মানুষের জীবনের শাশ্বত বেদনা। দুঃখবাদী সোফেনহাওয়ার বলেন, মানুষের জীবনের সারসত্য এই দুঃখ। মানুষ যখন কোন-রকমে পুষ্পিত হইতে চাহে, তখনই তাহাকে ঘিরিয়া ধরে দুঃখ। যৌবনের প্রেম-মধুকে বুকে চাপিয়া বর্ণে গন্ধে অনবদ্য হইয়া এই যে শুভ্র পুষ্পটি ধরণীর একপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল, তাহার সৌরভ যে ব্যর্থ হইল তাহা কি অপরাধে ও কাহার অপরাধে?

এই সংসারের আইন-কানুনের নীচে কত অসহায় নিরীহ প্রাণ নিরন্তর পিষিয়া মরিতেছে—তাহার এই দুর্ভোগের জন্য সে নিজে কতটুকু দায়ী? এই যে মানুষের জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, নিবিড় দরদবোধ—এইখানেই কবিচিত্তের পরিচয়। এই মানবতার দৃষ্টিটুকুই পরবর্তী কবিদের কাব্যে রূপ পাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের যে মোহিনী শক্তি মানুষের প্রাণে প্রেম নামক মহাপিপাসার উদ্রেক করে, তাহাই কবিওয়ালাদের গানে একটি বাঙ্ময় রূপ পাইয়াছে। অনেকের মতে কবির গান কামগন্ধী, কিন্তু এই একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে, ইহাদের মধ্যে, চণ্ডীমঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, অথবা রাধাকৃষ্ণের বৈচিত্র্যবিহীন গতানুগতিকতাকে ছাড়াইয়া-উঠিবার একটা চেষ্টা আছে। প্রাচীনের অতিরিক্ত নিয়মানুবর্ত্তিতা যখন বাঙ্গালা কাব্যকে সূত্রসার করিয়া ফেলিল, তখন সকল দিক হইতেই একটা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা লক্ষিত হইল। পুরোগামী ঐ সকল অন্ধ অনুকরণ একটা জাতীর রসতৃষ্ণাকে কতকাল তৃপ্ত রাখিতে পারে? তাই কবিগানগায়করা নিজের মনের গহনে ডুব দিয়া সেখানকার সুখ-দুঃখ, কামনা-বেদনা, জয়-পরাজয়ের বৈচিত্র্যময় অনুভূতিকে বর্ণোজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, তাহা Objective বা বিষয়ধর্ম্মী, কিন্তু কবি-গানের মধ্যে Subjectivisim বা মনোধর্ম্মের প্রথম পরিচয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু মনোভাবকে রূপান্বিত করিবার মত ভাষা তাঁহাদের ছিল না; অধিকন্তু, তাঁহারা ছিলেন মুখ্যতঃ জনসাধারণের কবি, বিদগ্ধজনের নয়। যখন তাঁহাদের বলিতে শুনি,—

"নয়নেরে দোষ কেন,
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন-মিলন?"

অথবা— "না হতে পতন তরু দহন হইল আগে।
আমার এ অনুরাগ তারে যেন নাহি লাগে।
চিতে চিতা সাজাইয়ে তাহে দুখ-তৃণ দিয়ে
আপনি হইব দগ্ধ আপনারি অনুরাগে।"

তখন বেশ বুঝিতে পারি, ইহা একান্ত মনের কথা। গীতিকবিতা বা লিরিক-এর প্রধান ধর্ম্মই হইতেছে যে, তাহা একরকম আত্মগত হওয়া প্রয়োজন। জীবনের বেদনা, তিক্ততা ও প্রেমের বিফলতা এই জাতীয় কবিতা বা পাঁচালীগুলিতে অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে; যথা,—

"আমার মনোবেদনা কভু জানাও না তায়।
শুনিলে আমার দুঃখ সে পাছে বেদনা পায়।
না বাসে না বাসে ভালো ভালো থাকে সেই ভালো
শুনিলে মঙ্গল তার তবুও প্রাণ জুড়ায়।"

মানুষ হিসাবেই মানুষের মনুষ্যত্ব। অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন, "য়ুরোপীয় সাহিত্যে হোমার হইতে সেক্‌সপীয়ার এবং সেক্‌সপীয়ার হইতে গেটে পর্য্যন্ত কাব্যকেই মানুষের জীবন-বেদরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের এমন স্বাভাবিক সহজ আত্মীয়তাবোধ ফুটিয়া উঠে, জগৎ ও জীবনের এমন একটা দিক্ উদ্‌ঘাটিত হয় যে, সে সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়বান জাতিমাত্রেরই মানুষ হইয়া মানুষের মত করিয়া এই দেহাধিষ্ঠিত আত্মার বিচিত্র লীলা-রস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা জাগে —বাঙ্গালীরও এই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল।

পশ্চিমের প্রবল সংঘাতের ফলে আমাদের কাব্য-সাহিত্যে ও প্রাণের মর্ম্মমূলে যে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলে আমরা আমাদের প্রাণের অস্থিরতাকে সর্ব্বত্র কাব্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালীর খাঁটি বাঙ্গালী-প্রাণ এই পাশ্চাত্য-সংস্পর্শের ফলে মহাকাব্যের গীতোচ্ছ্বাসে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। মেঘনাদ-বধের কবিই বাঙ্গালা কাব্যে সর্ব্ববিধ সংস্কার উপেক্ষা করিয়া মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়-সংবেদনাকে কাব্যে স্থান দিলেন। মেঘনাদ-বধ কাব্যের বীরত্বের উপর স্থান পাইয়াছে—মানবতা; বীরত্বের সহিত মানবজীবনের সূক্ষ্মতম অনুভূতিসমূহ এমন ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাতে মহাকাব্যের আদর্শ ক্ষুন্ন হইলেও কাব্যের মর্য্যাদা বিলক্ষণ বাড়িয়াই গিয়াছে। অল্পকথায় বলিতে গেলে, বস্তুতঃ মাইকেল মহাকাব্যের সৌধ গড়িতে গিয়া গীতিকাব্যের মনোহর কুসুমোদ্যানই রচনা করিয়াছেন।

কবি অন্তরের কোমলতম মর্ম্মকোষে তাঁহার কাব্যের নায়ককে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার প্রতি তিনি যতখানি সহানুভূতিশীল, তাহার অনেকখানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কবির একান্ত নিজের কথার ছদ্মবেশে। বীরপুত্র দেশের জন্য মৃত্যু-বরণ করিয়াছে, তাহাতে এক দিকে রাজা রাবণের বীরহৃদয় যেমন পুত্র-গৌরবে গর্ব্বিত হইয়াছে, অন্য দিকে তাঁহার শোকাকুল পিতৃহৃদয়ের সকরুণ আর্ত্তনাদও তেমনই এই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে,—

"তবু বৎস যে হৃদয় মুগ্ধ মোহ-মদে
কোমল সে ফুলসম; এ বজ্র আঘাতে
কত যে কাতর সে তা জানেন সে জন—
অন্তর্যামী যিনি।"

রাবণের দুর্দ্দমনীয় বীর্য্যের অন্তরালে একখানি অশ্রুকোমল পিতৃহৃদয় তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুতে যে কতখানি আঘাত পাইয়াছে, তাহারই পরিচয় পাই তাঁহার এই সকরুণ ও মর্ম্মন্তুদ শোকাকুল আর্ত্তনাদে। প্রকৃত পক্ষে, বীর মাত্র একটি দম-দেওয়া কলের পুতুল নহে, তাহার মধ্যেও মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্খলন-পতন আছে, এবং তাহারই স্বাভাবিক ছবি মেঘনাদ-বধের কবি দেখাইয়া শেষে বলিয়াছেন, "Ravana is a grand fellow"—তাঁহার সকল গুণ থাকা-সত্ত্বেও যখন দেখি, তিনি নিয়তির অন্ধ ক্রীড়নক মাত্র, তখনই তাঁহার প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা অনুভব করি। সমগ্র শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লবাদি-বিহীন একটি সমুচ্চ বনস্পতির ন্যায় উন্নতশীর্ষ যে রাবণ, তাঁহাকে সখেদে বলিতে শুনি,—

"বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল দেখ করিছে আমারে
নিরন্তর।"

অথবা— "হৃদয়-বৃন্তে ফোটে যে কুসুম
তাহারে ছিঁড়িলে কাল বিকল হৃদয়
ডোবে শোকসাগরে, মৃণাল যথা জলে
যবে কুবলয়-ধন লয় কেহ হরি।"

চতুর্থ সর্গটি মূল কাহিনীর সহিত খুব বেশী সংশ্লিষ্ট না হইলেও ইহার মধ্যে যে একখানি চিত্র পাই, কাব্যের দিক্ হইতে এবং মানবতার স্পর্শের দিক্ হ'তে তাহার মূল্যনিরূপণ করা সহজ নহে। সীতার দুঃখের সমবেদনায় সাগরের ঊর্ম্মিমালা তটরেখায় আছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রেমের এই পবিত্র নিষ্ঠা আমাদিগকে 'ক্যাসাণ্ড্রার' কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবতা ও দানবের মহাসমরে সীতা সামান্য নিরপরাধ নিষ্কলুষ অর্ঘ্যমাত্র। নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া 'রুথ'-এর মন যে বেদনায় আলোড়িত হইয়াছিল, রাক্ষসাধিকৃত এই অশোক-কাননে সাধ্বী সরমার কাছে সীতা তাঁহার সেই মর্ম্মবেদনা জানাইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন—এই subjective element ঠিক মহাকাব্যোচিত না হইলেও এই অংশের গীতিধর্ম্মটুকু সার্থক হইয়াছে। "মাইকেলের কবিকল্পনায় দেবতা ও দেবানুগৃহীত মানুষ অপেক্ষা রাক্ষস নামে ভাগ্যবিড়ম্বিত প্রবৃত্তি ও পুরুষকার-সম্বল পাপ-তাপ-মৃত্যু-মনোহর মানুষের জীবন এক নূতন মহিমায় মণ্ডিত হইল।" ইংরেজীতে ইহাকেই বলে Humanity বা মানবতা। মেঘনাদ-বধ-কাব্যকাহিনীর ঘনঘটার ফাঁকে ফাঁকে বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মী মাতা ও বধূর যে মনোরম আলেখ্য আমরা পাই—বাঙ্গালীর গৃহ-সংসারের সেই পুণ্যদীপ্তি আমাদের মনোহরণ করে। সোমকে সম্বোধন করিয়া গুরুপত্নী তারা লিখিয়াছে,—"তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি"; কিম্বা ফাল্গুনীকে পাঞ্চালী যখন বলিতেছে যে, তাহার মত রমণীর জীবনই বৃথা, "তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কাণে প্রেমের রহস্য-কথা"; অথবা লক্ষণের প্রতি সূর্পনখা প্রেম-নিবেদন করিয়া যখন বলিতেছে,—

> "আইস ভ্রমররূপে; না জোগায় যদি
> মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
> গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে—"

তখন স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারি, এ কথা সমগ্র জগতের প্রেমিক-প্রেমিকার কথা; এ আকুতি মানবজাতির বেদনাজাত। ইহাদের প্রেম লোকচক্ষুতে কলুষিত, কিন্তু মানবতার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহাকে অতখানি ছোট করা চলে না। এই মানবধর্ম্মের প্রতিই জাগে সহানুভূতি, জাগে করুণা; এই যে মানুষের জীবনের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা, নিবিড় দরদ-বোধ—এইখানেই তাঁহার প্রকৃত কবিচিত্তের পরিচয়।

এই যে মনুষ্যত্বের বিরাট মহিমা, নবীনচন্দ্রের কাব্যে ইহারই অপূর্ব্ব প্রকাশ। হেমচন্দ্রের কাব্যে আমরা খাঁটি বাঙ্গালী প্রাণেরই পরিচয় পাই; কিন্তু সে প্রাণ অলস, কর্ম্মের প্রেরণা তাহাতে নাই। নবীনচন্দ্রের কাব্যে মানুষের জীবনমাহাত্ম্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের দেবতা নহেন, তিনি মানবতার বা মানবধর্ম্মের পূর্ণাদর্শ। মানুষের মধ্যে "সোঽহং"-বাদ নবীনচন্দ্রের কাব্যের আদর্শ। তাই শ্রীকৃষ্ণ সেখানে মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি। তাঁহার মানবতার মাহাত্ম্যই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। মানবতার উদার দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় যে, ভগবান মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করেন; নিজের বিকাশ-সাধন করেন। কিন্তু ইহা ব্যতীত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নারায়ণের অংশ বর্ত্তমান—যাহা তাহাকে পূর্ণতার পথে সর্ব্বদা একটা প্রেরণা দিয়া আগাইয়া দিতেছে। তখন তিনি আমাদের সম্মুখে নরোত্তম বা গীতার মহামানব হইয়া দেখা দেন; মহাভারতের কৃষ্ণকে আমরা ধ্যানযোগী হিসাবে পাই না, তাঁহার কর্ম্মময় বিরাট মানবীয় সত্তার সন্ধান পাই। কাব্যের প্রথমেই তাই নবীনচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, যদিও উভয়েই মূলতঃ সমপর্য্যায়ভুক্ত, তবে কেন পৃথিবীর ধূলিপুঞ্জ অপেক্ষা নীহারিকা-মণ্ডলের সূর্য্য আমাদের অধিক শ্রদ্ধার অধিকারী। এইখানেই কবির পৃথিবীর ও তত্রস্থ মানবমণ্ডলীর উপর জাগিয়া উঠিয়াছে গভীর মমতাবোধ ও অপরিসীম সহানুভূতি। ঠিক সেই একই যুক্তিতে তিনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, সমাজের উচ্চশীর্ষে অবস্থিত ব্রাহ্মণ কেন অবহেলিত, অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর উপর এমন আধিপত্য করিবে। অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই আলোচনা সূচনাতেই কাব্যের মূল সুরটিকে জমাইয়া তুলিতেছে,—

> "মানব চেতনাযুক্ত, স্বাধীন
> জড় ঐ সূর্য্য হ'তে কত শ্রেষ্ঠতর।
> মানব! উৎকৃষ্ট সৃষ্টি যে অনন্ত জ্ঞানে
> সৃষ্টিও চালিত এই বিশ্বচরাচরে
> পড়েছে সে জ্ঞানছায়া হৃদয়ে যাহার,
> ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শকতি,
> কেন সে পূজিবে অন্ধ জড় প্রভাকর?"

এখানে প্রাচীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে নূতনের অভিযান। সুভদ্রা ও শৈলজা অর্জ্জুনের মানবসত্তাকে রূপ দান করিয়াছে, যার ফলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি এক জন "Paste-Board Hero" নহেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জরৎকারুর তীব্র অনুরাগ দুর্ব্বাসার কূট-রাজনীতি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে; মনুষ্যত্বের কাছে, প্রেমের কাছে রাজনীতি পরাভব মানিয়াছে।

অমিতাভের মধ্যেও নবীনচন্দ্র ভগবান বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনার সকল কলরোল যেখানে নীরব হইয়া গিয়াছে—তাঁহার সেই ধ্যান-শান্ত মূর্ত্তিই কবি আঁকিয়াছেন। কৈফিয়ৎ স্বরূপ কবি নিজেই লিখিয়াছেন,—

"সকলেই বুদ্ধকে অল্পাধিক অতিমানুষ-ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতিলাভ করে; তাঁহাদিগকে অধিক আপনার বলিয়া বোধ হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র।
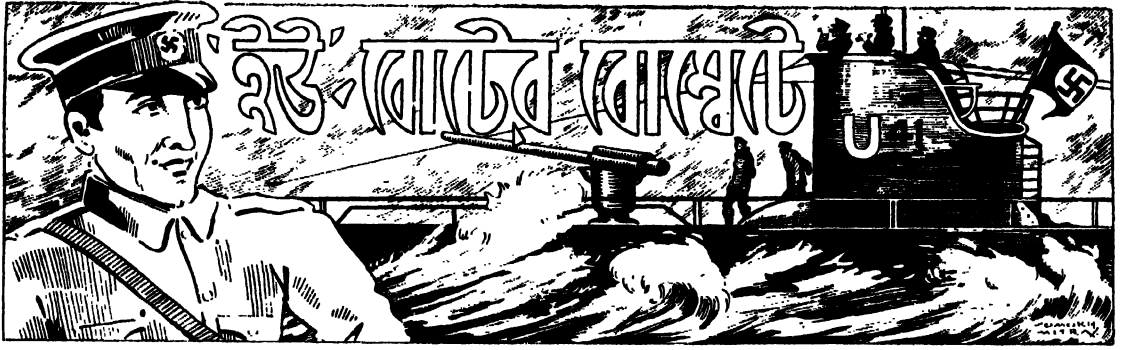
সপ্তম পর্ব্ব

ঢাকীসমেত বিসর্জ্জন !

(পিটারের উক্তি)

চেয়ারখানা পশ্চাতে ঠেলিয়া-ফেলিয়া আমস্ অধীরভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর কাপ্তেন পিউজেলকে বলিল, "আমার সকল কথাই তুমি শুনিয়াছ কাপ্তেন, আর সময় নষ্ট না করিয়া এখন কাযে হাত দিবে ? বলিয়াছি ত, বিপদ কেবল আমার নয়, ডাইনী-বুড়ী মুখ খুলিলে তোমাদেরও সর্ব্বনাশ হইবে।"

অতঃপর আমস্ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে পিটার !"

কাপ্তেন পিউজেল তাহার কথা শুনিয়া বলিল, "না, ও ছোকরাকে আমরা সঙ্গে লইতে চাহি না।"

আমস্ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমার প্রস্তাবে আপত্তি করিও না কাপ্তেন ! বিশেষ কারণে আমি পিটারকে সঙ্গে লইতে চাহিতেছি। কিছু দিন হইতে উহাকে আমি চোখে চোখে রাখিয়াছি। আমার এইরূপ সতর্কতার কারণ জানিবার জন্য তুমি আগ্রহ প্রকাশ করিও না ; এইমাত্র শুনিয়া রাখ যে, সে কারণ গোপনীয়, ব্যক্তিগতও বটে।"

পিউজেল বিরক্তিভরে বলিল, "অল্ রাইট, তুমি যাহা ভাল বোঝ, কর। কিন্তু উহাকে সঙ্গে লইতে আমার আপত্তি ছিল।"

আমস্ আর কোন কথা বলিল না। আমরা তিন জনে পাকশালা ত্যাগ করিলাম, এবং সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া একখানি ডিঙ্গী নৌকায় উঠিয়া বসিলাম। অনন্তর পিউজেলের আদেশে ডিঙ্গীখান 'ইউ'বোটের নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। 'ইউ'বোট হইতে এক জন জার্ম্মাণ নাবিককে আমাদের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় সমুদ্রতীরে প্রেরণ করা হইল। অতঃপর সবমেরিণখানা কিছু দূরে লইয়া গিয়া স্কাই দ্বীপের অভিমুখে পরিচালিত করা হইল। আমস্ ক্রোবি 'ইউ'-বোটের টাওয়ারের উপর পিউজেলের পার্শ্বে বসিয়া রহিল। নৈশ অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রে ইউবোট চালাইবার সময় কাপ্তেন পিউজেল ও 'ইউ'বোটের প্রধান প্রহরী চক্ষুর সম্মুখে দূরবীণ ধরিয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল ; তাহারা মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু হইতে দূরবীণ নামাইল না।

তাহাদের এইরূপ সতর্কতার কারণ বুঝিতে পারিলাম। তাহারা অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন সমুদ্রে চলিতে আরম্ভ করিলেও বিপদের আশঙ্কা ছিল। তাহারা জানিত, যে-কোন মুহূর্ত্তে কোন বৃটিশ মানোয়ারী জাহাজ বা 'প্যাট্রল-বোটের' সার্চ্চ-লাইট সেই নিবিড় নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া উজ্জ্বল আলোকে সমুদ্র-বক্ষ উদ্ভাসিত করিতে পারে ; সেই আলোকে 'ইউ'বোট তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র কামান-সমূহ গর্জ্জন করিয়া উঠিবে, এবং মুষলধারে গোলা বর্ষিত হইয়া 'ইউ'-বোটখানিকে চূর্ণ করিয়া ডুবাইয়া দিবে।

'ইউ'বোট স্কাই দ্বীপ অভিমুখে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল ; এজন্য সমুদ্রের তরঙ্গরাশি সবেগে আলোড়িত হইল না। আত্মরক্ষায় অসমর্থা একটি বৃদ্ধাকে হত্যা করিবার জন্য এরূপ আয়োজন নিতান্ত বাহুল্য বলিয়াই আমার মনে হইল ; বৃদ্ধার পরিণাম চিন্তা করিয়া আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইলাম। আমি ইহাদিগকে হিংস্র পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না।

আমি সেই নিরুপায় নিরাশ্রয় বৃদ্ধার শোচনীয় পরিণামের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম, সেই ডাইনী-বুড়ীকে রাক্ষসী বলিলে অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু সে দুর্ব্বল বৃদ্ধা, তাহাকে হত্যা করিবার জন্য এই ষড়যন্ত্র, অত্যন্ত ইতরের কার্য্য বলিয়াই আমার ধারণা হইল।

আমি তাহার জীবন-রক্ষার কোন উপায় দেখিলাম না; কেবল একটিমাত্র উপায় ছিল; যদি কোন বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ এই 'ইউ'-বোট দেখিতে পাইয়া গোলাবর্ষণে ইহাকে সমুদ্রে ডুবাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলেই বৃদ্ধার জীবন রক্ষা হইত; কিন্তু কোন বৃটিশ রণপোত কর্ত্তৃক ইহার আক্রান্ত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখিলাম না।

কিছুকাল পরে আমরা নির্ব্বিঘ্নে স্কাই দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলাম। সমুদ্র-বেলার কিছু দূরে থাকিতে 'ইউ' বোট থামিল। সেই দিন অপরাহ্ণে আমি আমসের সহিত যে স্থানে নামিয়াছিলাম, আমস্ কাপ্তেন পিউজেল ও চারি জন জার্ম্মাণ নাবিক সঙ্গে লইয়া সেই স্থানেই অবতরণ করিবে স্থির করিল।

তাহাদিগকে 'ইউ'-বোট হইতে নামিতে দেখিয়া আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু আমস্ আমাকে বলিল, "তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে না; তুমি এখানেই থাক।"

কিন্তু 'ইউ'-বোটে আমার থাকিবার ইচ্ছা ছিল না; আমস্ সদলে পাতলা ডিঙ্গীতে উঠিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইবামাত্র আমি 'ইউ'-বোটের টাওয়ারের বাহিরের দিকের লৌহ-সোপানের সাহায্যে লোহার ডেকে নামিয়া পড়িলাম, এবং পরমুহূর্ত্তে আমার জ্যাকেট খুলিয়া-ফেলিয়া তুষার-শীতল জলে লাফাইয়া পড়িলাম; তাহার পর সমুদ্র-তট লক্ষ্য করিয়া সাঁতার দিতে লাগিলাম। সেই নৈশ-সমুদ্রের শীতল জলে আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

আমি সম্মুখ দিকে 'ইউ'-বোটের ডিঙ্গীর চারিখানি দাঁড়ের ঝুপ্-ঝুপ্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি স্থির করিলাম, উহাদের ডিঙ্গী দ্বীপের যে স্থানে ভিড়িবে, তাহার কিছু দূরে আমাকে আগেই উঠিতে হইবে; এজন্য আমি দেহের সকল শক্তি প্রয়োগে তীর লক্ষ্য করিয়া হাত-পা চালাইতে লাগিলাম।

আমার ইচ্ছা ছিল, আমি আমসের দলের অগ্রেই দ্বীপে উঠিয়া দ্রুতবেগে বৃদ্ধার কুটীরে উপস্থিত হইব, এবং তাহার বিপদের সংবাদ জানাইয়া তাহাকে সতর্ক করিব। যদিও সে কয়েক মিনিট মাত্র পলায়নের সুযোগ পাইবে, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট বলিয়া আমার মনে হইল। কারণ, সে তাড়াতাড়ি তাহার কুটীরের বাহিরে গিয়া নৈশ অন্ধকারে কোথাও অদৃশ্য হইলে আততায়ীরা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। সেই পার্ব্বত্য দ্বীপে লুকাইবার স্থানের অভাব ছিল না। আমি বৃদ্ধাকে সতর্ক করিয়া তাড়াতাড়ি 'ইউ-বোটে ফিরিয়া যাইব, এবং বৃদ্ধার কুটীরে আমার উপস্থিতির কথা আমস্কে জানিতে দিব না। যদি সে জানিতে পারে, বৃদ্ধা আমার নিকট তাহার আসন্ন বিপদের সংবাদ পাইয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহা হইলে ক্রোবি প্রহারে আমার অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ করিবে, সে রাগিলে তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে 'ইউ'-বোটে ফিরিয়া-গিয়া আমার ভিজা পরিচ্ছদ দেখিয়া আমাকে জেরা করিলে আমি বলিব—'ইউ'-বোট হইতে হঠাৎ সমুদ্রে পড়িয়া যাওয়ায় ভিজিয়া গিয়াছি।

সমুদ্রবেলার যে স্থানে 'ইউ'-বোটের ডিঙ্গী ভিড়িল, আমি তাহার প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে জল হইতে উঠিয়া পড়িলাম, এবং এক রকম গুঁড়ি মারিয়াই বৃদ্ধার কুটীর লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম।

বৃদ্ধার কুটীরের নিকট উপস্থিত হইয়া আমি অল্প দূরে আমস্ ও কাপ্তেন পিউজেলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তাহারা আর কয়েক মিনিটের মধ্যে কুটীরে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধাকে হত্যা করিবে; এই জন্য আমি দ্রুতবেগে বৃদ্ধার কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইলাম, এবং কুটীরে প্রবেশের জন্য তাহার অনুমতি প্রার্থনা না করিয়াই অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটীরে প্রবেশ করিলাম।

বৃদ্ধা তাহার প্রকাণ্ড কালো বিড়ালটাকে পাশে লইয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট তাহার জীর্ণ টুলখানার উপরে বসিয়া বিড়-বিড় করিয়া কি বকিতেছিল। আমরা সেই দিন বৈকালে তাহাকে ঠিক সেই ভাবেই টুলের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। আমি ব্যগ্রভাবে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই বৃদ্ধা মুখ তুলিয়া তাহার কোটরগত নিষ্প্রভ নেত্রের দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিল।

আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলাম, "বুড়ী, তুমি পালাও, এই মুহূর্ত্তেই তোমার কুটীর হইতে সরিয়া পড়। আমস্ ক্রোবি ও কয়েক জন জার্ম্মাণ তোমাকে খুন করিতে আসিতেছে। তাহারা স্থির করিয়াছে—এখনই তোমাকে হত্যা করিবে।"

বৃদ্ধা আমার কথা শুনিয়া নড়িল না, উঠিবারও চেষ্টা

করিল না; স্থিরভাবে বসিয়া নির্নিমেষ নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল!

তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া, তাহার অস্থিচর্ম্মসার শিরাবহুল শীর্ণ হাতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলাম, "আমার কথা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি এই মুহূর্ত্তেই পলায়ন কর। উহারা দুই-এক মিনিটের মধ্যেই তোমার সম্মুখে আসিয়া পড়িবে;—তখন তোমার পলায়ন করা—"

বৃদ্ধা আমার কথায় বাধা দিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "কিন্তু বাছা, তুমি বৃথা আমাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছ; আর আমার পলায়নের সুযোগ নাই, তাহারা আমার কুটীরের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। তুমি কি তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছ না? আমি বুড়া হইয়াছি, মৃত্যু আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে; পলাইয়া কি তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইব?"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, আর তাহার প্রাণ-রক্ষার আশা নাই। আমি হতাশ ভাবে কুটীরের দ্বারের দিকে ফিরিলাম; কিন্তু দ্বারের চৌকাঠের বাহিরেই আমসের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, কুটীরের বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিলেই আমাকে ধরা পড়িতে হইবে! আমি দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া, কোথায় লুকাইব তাহাই ভাবিতেছিলাম, সেই সময় আমস্ ক্রোবি, কাপ্তেন পিউজেল ও জার্ম্মাণ নাবিক চতুষ্টয়সহ কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি আর লুকাইবার সুযোগ পাইলাম না, আমস্‌কে আমার ঠিক সম্মুখে যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান দেখিলাম!

আমস্ আমাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুই এখানে? ওরে পাজী, শূয়ার, বদ্‌মায়েস! আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এখানে তুই কেন আসিয়াছিস্?"

আমি তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই আমস্ দৃঢ়মুষ্টিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া আমার ঘাড়ে এমন এক ঘুসি মারিল যে, সেই আঘাতে আমি ঘুরিয়া পড়িলাম; আমার চেতনা লোপের উপক্রম হইল। কিন্তু আমি আত্মসংবরণ করিয়া অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

কাপ্তেন পিউজেল আমার অবস্থা দেখিয়া আমার প্রতি কিঞ্চিৎ সমবেদনা প্রকাশ করিয়া আমস্‌কে বলিল, "আহা, ছেলেমানুষ, কেন উহাকে ঘুসাইতেছ? ও বোধ হয় মজা দেখিতে এখানে আসিয়াছে। উহাকে বাড়ী রাখিয়া আসিলেই পারিতে।"

আমস্ ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া সবেগে মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "না কাপ্তেন! ও এখানে আসিয়াছে—ঐ বুড়ীকে সতর্ক করিতে। আমি কি উহাকে চিনি না? আমি উহাকে অনাথ, অসহায় দেখিয়া খাইতে পরিতে দিয়া মানুষ করিয়া তুলিলাম; আর হতভাগা, পাজী, রাস্কেল ক্রমাগত আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করিতেছে! কখন্ আমার কি ক্ষতি করে, এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা উহাকে চোখে-চোখে রাখিতে হয়; তথাপি সুযোগ পাইলেই এই ভাবে আমার চোখে ধূলা দেওয়ার চেষ্টা করে।"

এই কথা বলিয়া আমস্ আমার গালে প্রচণ্ডবেগে চপেটাঘাত করিল; তাহার পর বিকৃত স্বরে বলিল, "আগে বাড়ী ফিরিয়া যাই, তাহার পর উহাকে ঘরের থামে বাঁধিয়া উহার শরীরের চামড়া ছাড়াইয়া লইব। নিত্য জুতা-লাথি খাইয়াও উহার শিক্ষা হইল না।"

বৃদ্ধা নীরবে আমসের সকল কথা শুনিতেছিল; সে আমস্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমস্ ক্রোবি, তুমি বড় বেশী কথা বল, ভয়ঙ্কর বাচাল তুমি! ঐটুকু ছেলেকে ঐভাবে নির্য্যাতন করিতে তোমার মত আধবুড়ো মিন্‌সের লজ্জা হয় না? তোমার এক বিন্দু দয়া-মায়া নাই।"

আমস্ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাক্ বুড়ী! আমরা কি জন্য এখানে আসিয়াছি, তা জানিলে নিজের কথা চিন্তা না করিয়া পরের কথার আলোচনা করিতে তোর প্রবৃত্তি হইত না।"

বৃদ্ধা কঠোর স্বরে বলিল, "তোমরা কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ, তাহা আমার জানা আছে, আমস্ ক্রোবি! তোমাদের লোহার বোট অন্ধকার ভেদ করিয়া স্কাই দ্বীপের দিকে আসিতেছিল, তাহা আমি এখানে বসিয়া-থাকিয়াই দেখিতে পাইয়াছিলাম। তোমরা কি মতলবে এখানে আসিতেছিলে, তাহা সেই সময়েই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর দূরাগত

...-গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আজ বৈকালে তোমাকে কি বলিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই, আমস্ ক্রোবি? আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি কখন আমাকে হত্যা করিতে পারিবে না; ঐ কাজ করিতে একজন মানুষের মত মানুষের দরকার। তোমার মত অস্পৃশ্য, ঘৃণিত, বিশ্বাসঘাতক কুকুরের উহা সাধ্য নহে।"

কাপ্তেন পিউজেল এবার সরোষে গর্জ্জন করিল, "চুপ কর্ বুড়ী!"—তাহার পর সে আমস্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এই স্ত্রীলোকটারই কথা বলিয়াছিলে?"

আমস্ বলিল, "হাঁ, ঐ বুড়ীর জন্যই ত এত কষ্ট করিয়া আমাদের এখানে আসা!"

এ কথা শুনিয়া হাঁড়িমুখো নাজী কাপ্তেনটা দুই এক পা-অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহার পর মাথা উঁচু করিয়া বুক ফুলাইয়া কঠোর স্বরে বলিল, "শোন বুড়ী, হার ক্রোবি আমাকে বলিয়াছে—আমাদের ইউ'বোটগুলির রসদ যোগাইবার জন্য সে তাহার এলাকায় যে আড্ডা স্থাপন করিয়াছে, সেই আড্ডার সংবাদ সমুদ্রোপকূলের ইংরেজ প্রহরিগণের নিকট প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া তুমি উহার নিকট দফায় দফায় ঘুস্ আদায় করিয়াছ; তাহার এ কথা কি সত্য?"

বৃদ্ধা তাহার ক্ষুদ্র মিট্‌মিটে চক্ষুর চঞ্চল দৃষ্টি নাজী কাপ্তেনটার মুখের উপর স্থাপন করিয়া নীরস স্বরে বলিল, "আমি বলিতেছি, উহা মিথ্যা কথা। ইংরেজ জাতির কলঙ্ক, ঐ বিশ্বাসঘাতক, ইতর মিথ্যাবাদীটা ছলে কৌশলে তোমাদের নিকট হইতে আরও বেশী টাকা আদায়ের মতলবে ঐ কথা বলিয়া তোমাকে ধাপ্পা দিয়াছে।"

আমস্ ক্রোবি বৃদ্ধার কথা শুনিয়া সক্রোধে লাফাইয়া উঠিল, এবং তাহার মুখের উপর অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ... স্বরে বলিল, "তুমি জান, আমার কথা সত্য; তবু মিথ্যা ...য় এখন তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছ! আমি ...াণদিগকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিবার পর হইতে ... আমাকে বিপদে ফেলিবার ভয় দেখাইয়া দফায় দফায় ...া আদায় করিয়াছ, আর আজ তাহা অস্বীকার করিয়া ...মাকেই মিথ্যাবাদী বলিতেছ! কিন্তু আমার কথা সত্য, ...হার প্রমাণ আছে।"

আমস্ তৎক্ষণাৎ সেই কুটীরের এক কোণে গমন করিয়া মেঝে হইতে আল্‌গা পাথরের একটা দলা সরাইয়া ফেলিল। তাহার নীচে একটি গহ্বর ছিল; সেই গহ্বরে হাত পুরিয়া সে একটি কৃষ্ণবর্ণ মোজা টানিয়া তুলিল, তাহা এক রাশি নোটে পূর্ণ ছিল। সেই নোটগুলি মোজা হইতে বাহির করা হইলে আমি দেখিতে পাইলাম, সেগুলি বৃটিশ-নোট। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে জার্ম্মাণরা সেই সকল নোট সংগ্রহ করিয়াছিল বলিয়াই আমার ধারণা হইল।

কাপ্তেন পিউজেল সেই নোটগুলি পরীক্ষা করিয়া আমসের হাতে প্রত্যর্পণ করিলে আমস্ বৃদ্ধার মুখের উপর সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নোটগুলি তৎক্ষণাৎ কোটের পকেটে পুরিল।

বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া বলিল, "চোর! রাখ্ আমার নোট, ও আমার বহু দিনের সঞ্চয়।"

কিন্তু আমস্ বা কাপ্তেন তাহার প্রতিবাদে কর্ণপাত করিল না। কাপ্তেন পিউজেল তাহার অনুচর নাবিক-চতুষ্টয়কে আদেশ করিল, "ঐ বুড়ীটাকে ধরিয়া-লইয়া বাহিরে চল।"

'ইউ'-বোটের নাবিক-চতুষ্টয় বৃদ্ধাকে আক্রমণ করিল, এবং তাহাকে টানিতে টানিতে কুটীরের দ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইল।

বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া তোমরা কি করিবে? আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

আমস্ বলিল, "আমরা তোমাকে পাহাড়ের মাথায় লইয়া গিয়া নীচে ফেলিয়া দিব। যদি কেহ সেখানে তোমার মৃতদেহ দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে মনে করিবে, তুমি পাহাড়ের মাথা হইতে হঠাৎ পা-ফস্‌কাইয়া নীচে পড়িয়াছ, এবং সেই আঘাতে অক্কালাভ করিয়াছ।—শীঘ্র উহাকে পাহাড়ের উপর লইয়া চল।"

আমস্ নৈশ অন্ধকারে স্কাই দ্বীপের গিরিশ্রেণীর অভিমুখে ধাবিত হইল। নাবিক চতুষ্টয় বৃদ্ধাকে টানিতে টানিতে তাহার পশ্চাতে চলিতে লাগিল। আমরা তাহাদের অনুসরণ করিলাম। সেই পাহাড়ের উচ্চ চূড়ার বহু নিম্নে পাহাড়ের পাদভূমি; তাহা ঢালু হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল।

নাবিক-চতুষ্টয়ের কবলে বৃদ্ধা কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মুক্তি লাভের জন্য তাহাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার দেহ জীর্ণ, দুর্ব্বল; সে চারি জন বলিষ্ঠ নাবিকের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

বৃদ্ধার জীবনের আশা ছিল না, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত; ইহা জানিয়াও মনুষ্যত্ববর্জ্জিত, নিষ্ঠুর আমস্ তখনও তাহাকে বিদ্রূপ করিতে ও কঠোর ভাষায় গালি দিতে লাগিল! তাহার পৈশাচিক ব্যবহারে আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমার মনে হইল, আমস্ ও কাপ্তেন কি উপায়ে বৃদ্ধাকে হত্যা করিবে, নৌকায় আসিবার সময় যুক্তি পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করিয়াছিল।

নাবিকগণ বৃদ্ধাকে যে গিরিশৃঙ্গের উচ্চ চূড়ায় উত্তোলন করিল, তাহার পাদমূলে উদ্বেলিত, শুভ্র ফেনপুঞ্জমুকুটিত সমুদ্রতরঙ্গ পুনঃ পুনঃ সবেগে প্রতিহত হইতেছিল। গিরিচূড়া হইতে সেই স্থানে দৃষ্টিপাত করিলে মাথা ঘুরিয়া যায়! নাবিকরা বৃদ্ধাকে সেই গিরিচূড়ার প্রান্তভাগে ধরিয়া রাখিলে আমস্ তাহাকে কর্কশস্বরে বলিল, "নীচে একবার চাহিয়া দেখ্ বুড়ী, কোথায় পড়িয়া এখনই তোর সকল কষ্টের অবসান হইবে।"

বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমারও মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই আমস্ ক্রোবি! আমি আরও বলিতেছি যে, আমাকে হত্যা করিবার জন্য তুমি যাহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছ, তাহাকেও কাল প্রভাত পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া সূর্য্যের মুখ দেখিতে হইবে না।"

কাপ্তেন পিউজেল তখন সেই গিরিশিখরে বৃদ্ধার অদূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বৃদ্ধার ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "আমার ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তোকে চিন্তিত হইতে হইবে না বুড়ী! মৃত্যুর পূর্ব্বে তুই পরমেশ্বরের নাম স্মরণ কর।"

অনন্তর সে নাবিক-চতুষ্টয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমরা সকলে প্রস্তুত? তবে—এক দুই—তিন।"

কাপ্তেনের মুখ হইতে 'তিন' উচ্চারিত হইবামাত্র বৃদ্ধা এক ধাক্কায় সেই গিরিশৃঙ্গ হইতে শত শত গজ নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইল। আমার মনে হইল, ছেঁড়া ন্যাকড়ার একটা বাণ্ডিল সবেগে নিম্নে পড়িতেছিল! বৃদ্ধার হৃদয়ভেদী কাতর আর্ত্তনাদ মুহূর্ত্তমধ্যে শূন্যে বিলীন হইল। নীচে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা তাহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত সমুদ্র মুহূর্ত্তে তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল।

কাপ্তেন পিউজেল মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "দৃশ্যটা মনোহর না হইলেও ইহা পরিহার করিবার উপায় ছিল না।"

কাপ্তেন গিরিশৃঙ্গের কিনারায় ঘুরিয়া-দাঁড়াইয়া রুমাল দ্বারা ললাটের ঘর্ম্মধারা অপসারিত করিল। আমি তাহার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমি আমার পদপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিতেই অন্ধকারে একজোড়া সুগোল চক্ষু দেখিতে পাইলাম; অন্ধকারে তাহা জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় জ্বল্-জ্বল্ করিতেছিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে আমি বুঝিতে পারিলাম, বৃদ্ধার সেই প্রকাণ্ড কালো বিড়ালটা বৃদ্ধার অনুসরণ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিল। কাপ্তেন পিউজেল তাহার পদপ্রান্তস্থ গভীর গহ্বরের নিকট হইতে নিরাপদ স্থানে সরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই সেই বিড়ালটা সবেগে কাপ্তেনের বুকের উপর লাফাইয়া-উঠিয়া, তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ দন্তশ্রেণী দ্বারা তাহার নাসিকা কামড়াইয়া ধরিল!

কাপ্তেন সেই ক্রুদ্ধ ভীষণ জানোয়ার কর্ত্তৃক এই ভাবে আক্রান্ত হওয়ায় প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া ব্যাকুলভাবে পশ্চাতে হটিয়া যাইতেই পদস্খলন হইয়া বৃদ্ধা যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহার কয়েক ফুট দূরে সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া অদৃশ্য হইল। উদ্বেলিত সমুদ্রতরঙ্গ যেন শত বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকেও মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রাস করিল!

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আমস্ ক্রোবি ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া সেই গিরিশৃঙ্গ হইতে দূরে পলায়ন করিল। তাহার দুই চক্ষু ভয়ে কপালে উঠিয়াছিল; তাহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ।

আমস্ বিকৃত স্বরে বলিল "ডাইনী-বুড়ীর প্রেতাত্মা এই ভাবে প্রতিহিংসা গ্রহণ করিল! উহার ভবিষ্যদ্বাণী সঙ্গে সঙ্গে ফলিয়া গেল! তাহার প্রেতাত্মা আমাদিগকেও আক্রমণ করিতে আসিতেছে; যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তবে সকলে শীঘ্র পলায়ন কর।"

আমস্ দৌড়াইতে দৌড়াইতে সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া, ডিঙ্গী নৌকায় উঠিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। নাবিকগণও দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। আমিও তাড়াতাড়ি ডিঙ্গীতে উঠিয়া আমসের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। আমস্ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পুনঃ পুনঃ সেই গিরিশৃঙ্গের দিকে চাহিতে লাগিল।

'ইউ'-বোটের নাবিকরা 'ইউ'-বোটে প্রবেশ করিয়া কাপ্তেন পিউজেলের সহকারী লেফ্‌টেনাণ্ট ফাল্‌কেকে কাপ্তেনের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিল। লেফ্‌টেনাণ্ট ফাল্‌কে প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে আমস্ তাহাকে সকল কথা সঙ্ক্ষেপে বুঝাইয়া দিল। লেফ্‌টেনাণ্ট ফাল্‌কে গম্ভীর ভাবে কয়েক মিনিট চিন্তার পর কাপ্তেন পিউজেলের মৃতদেহ সংগ্রহ করিবার আশায় একখানি ডিঙ্গী লইয়া গিরিপাদমূলস্থ সেই ভয়াবহ স্থানে গমনের প্রস্তাব করিল।

ফাল্‌কের প্রস্তাব শুনিয়া আমস্ সভয়ে বলিল, "না না, তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া কাপ্তেনের মৃতদেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে না। সেই স্থানে জলের ভিতর যে সকল মগ্ন-শৈল আছে, তাহাতে ধাক্কা লাগিয়া ডিঙ্গীখান সমুদ্রগর্ভে মুহূর্ত্তে তলাইয়া যাইবে; ডিঙ্গীর কোন আরোহীর প্রাণরক্ষা হইবে না।"

আমসের কথাগুলি সঙ্গত মনে করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট ফাল্‌কে কাপ্তেনের মৃতদেহ উদ্ধারের আশা ত্যাগ করিল। কয়েক মিনিট পরে সে 'ইউ'-বোটের ইন্ধন সংগ্রহের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিল।

আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সমুদ্রকূলে নামিবামাত্র আমস্‌কে পশ্চাতে ফেলিয়া আমি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমাদের পাকশালায় প্রবেশ করিলাম। মেরী সেখানে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমি তাড়াতাড়ি ভিজা পোষাক খুলিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট নিক্ষেপ করিয়া মেরীকে ব্যগ্রভাবে সকল কথাই বলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমস্ আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। সে তখনও ভয়ে কাঁপিতেছিল। সে টেবলের নিকট বসিয়া পাথরের জগ হইতে টিনের মগে মদ ঢালিয়া এক নিঃশ্বাসে মগটা খালি করিল। তাহার পর মগটা কম্পিত-হস্তে নামাইয়া রাখিয়া স্খলিত স্বরে মেরীকে বলিল, "আমি পিউজেলকে বলিয়াছিলাম, এ-কাজে বিপদের আশঙ্কা আছে, কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। সে ত মরিলই, ইহার পর আরও যে কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে? আজ বৈকালে সেই ডাইনী-বুড়ী ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল; সে কথা স্মরণ হইলে হৃৎকম্প হয়। টাকার লোভে কেনই বা আমি জার্ম্মাণদের সাহায্য করিবার ভার লইয়াছিলাম!"

আমস্ উঠিয়া অস্থিরভাবে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার পর আরও খানিক মদ গিলিল। অবশেষে সে মেরীর সম্মুখে আসিয়া কি যেন কথা বলিবার উপক্রম করিল; কিন্তু তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

মেরী কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই ডাইনী-বুড়ী আজ বৈকালে তোমাকে এমন কি ভয়ঙ্কর কথা বলিয়াছিল যে, তুমি ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছ?"

আমস্ বিচলিত স্বরে বলিল, "সে বলিয়াছিল, আমার চোখ বাঁধিয়া আমাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে। তাহার এ কথা মিথ্যা নহে; যদি ইংরেজরা জানিতে পারে, আমি জার্ম্মাণগণকে সাহায্য করিতেছি, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চিতই আমাকে গুলী করিয়া মারিবে।"

ক্ষণকাল সে নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "আমি পলায়ন করিব। হাঁ, আমাকে এই দ্বীপ ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে হইবে; নতুবা আমার প্রাণ রক্ষার আশা নাই।—কোন আশা নাই, নাই!"—সে ব্যাকুলভাবে উভয় হস্ত পরস্পর নিষ্পেষিত করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে আমস্ দোতালার কক্ষে প্রস্থান করিল। আমি ও মেরী পাকশালায় বসিয়া রহিলাম। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল। আমরা উভয়ে টেবলের কাছে বসিয়া নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম; শেষে লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনের কথা উঠিল। হ্যাগেন কত দিন পরে আমাদের দ্বীপে আসিয়া মেরীকে ও আমাকে দেশান্তরে লইয়া যাইবে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমরা কত নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিব—এই সকল কথার আলোচনায় বর্ত্তমানের দুঃখ-কষ্ট বিস্মৃত হইলাম। অবশেষে আমি বিচিলী বিছাইয়া সেই কক্ষের এক প্রান্তে শয়ন করিলাম। শয়নমাত্র আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। মেরী তখনও বসিয়া ছিল। সে পাকশালার এক প্রান্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া সেই

স্থানে শয়ন করিল। ফার্গসের হত্যাকাণ্ডের পর সে কোন দিন দোতালার কোন কক্ষে শয়ন করে নাই। ফার্গসের মৃত্যুকালের দৃশ্য স্মরণ হইলে তখনও ভয়ে তাহার হৃৎকম্প হইত।

পরদিন প্রত্যূষে আমি নিদ্রাভঙ্গে, সমুদ্রের অদূরবর্ত্তী খাঁড়িতে সেরেস্তায় মাছ পড়িয়াছে কি না তাহা দেখিতে চলিলাম। কারণ, তাহার উপর আমাদের আহার নির্ভর করিতেছিল। সেই স্থান হইতে আমি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রবক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। সহসা কিছু দূরে বাদামী পাল-সংযুক্ত একখান মেছো-নৌকা দেখিতে পাইলাম; পাল তুলিয়া তাহা আমাদের দ্বীপের দিকেই আসিতেছিল।

কাহারা সেই নৌকার আরোহী? ঐরূপ বোটে আরোহণ করিয়া বাহিরের কোনও লোক কোন দিন আমাদের দ্বীপে আসিত না। উহা ইংরেজের কোন গোয়েন্দার নৌকা নহে ত? নানা দুশ্চিন্তায়, ভয়ে আমার বুক ধড়-ফড় করিতে লাগিল; আমার নিশ্বাস-রোধের উপক্রম হইল! আমি সেই নৌকার দিকে চাহিয়া ভয়ে ঘামিতে লাগিলাম।

অষ্টম পর্ব্ব

ফার্গসের ভগিনীর আবির্ভাব

আমস্ ক্রোবি পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিয়াছিল, বাহিরের কোন লোক কোন দিক হইতে আমাদের দ্বীপে উপস্থিত হইলে আমাদের বিপদের আশঙ্কা আছে।—সেজন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। আলেন্ ফার্গস্ আমাদের জার্ম্মাণ অতিথি লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনের গুলীতে নিহত হইবার পর আমাদের বিপদের আশঙ্কা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল।

এই জন্যই সেই দিন প্রভাতে বাদামী-রঙের পাল উড়াইয়া সেই মেছো নৌকাখানাকে সমুদ্র-তরঙ্গ ভেদ করিয়া আমাদের দ্বীপের অভিমুখে আসিতে দেখিয়া, ভয় ও দুশ্চিন্তায় আমি ব্যাকুল হইয়াছিলাম; এবং সেই নৌকায় কাহারা আসিতেছিল—তাহা জানিবার জন্য সমুদ্র-বেলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুকাল পরে বোটখানি তীরে ভিড়িলে তাহার আরোহীদিগকে দেখিয়া আমার আতঙ্ক দূর হইল, আমি স্বস্তি বোধ করিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, সেই বোটের আরোহীদিগের কোন দুরভিসন্ধি থাকিতে পারে না; আমস্ ক্রোবির উপর তাহাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; এবং স্বদেশদ্রোহী আমস্ যে জার্ম্মাণগণকে সাহায্য করিবার জন্য এই দ্বীপের 'ডেভিল্‌স্ কেভে' 'ইউ'-বোটের পরিচালনোপযোগী তেল, পেট্রল প্রভৃতি লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহাও তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

আগন্তুকগণ বড় দেশ হইতে আগত মৎস্যজীবী ডোনাল্ডসন পরিবারের লোক। বোটে সেই পরিবারের তিন জন লোক ছিল। এক জন বৃদ্ধ ড্যান ডোনাল্ডসন,—প্রকাণ্ড দেহ, রোদপোড়া মুখের বর্ণ লোহিতাভ, মাথার চুলগুলি সমস্তই পাকিয়া সাদা হইয়াছিল; কিন্তু বৃদ্ধ হইলেও তাহার দেহ বক্র হয় নাই, তাহা সরল, সবল ও কার্য্যক্ষম; বার্দ্ধক্যের জড়তাও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার ভ্রাতা ম্যাল্‌কম; তাহারও দেহ ড্যানের দেহের অনুরূপ, তবে সেরূপ দীর্ঘ নহে। তৃতীয় ব্যক্তি ড্যানের পুত্র—যক্, প্রায় কুড়ি-একুশ বৎসর বয়স বৃষস্কন্ধ বলবান যুবক, মুখের বর্ণ ঈষৎ বাদামী।

তাহারা পূর্ব্বেও আমাদের দ্বীপে আসিয়াছিল; এবং আমি জানিতাম, মেরী পূর্ব্বে কখন কখন আমসের সহিত বড় দেশে গমন করিয়া এই পরিবারেরই আতিথ্য গ্রহণ করিত। তাহারা নৌকার পাল নামাইয়া এবং নীচে নঙ্গর ফেলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া আসিলে তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি সাগর-বেলায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ ড্যান হাতের কাজ শেষ করিয়া আমার সম্মুখে আসিল, এবং আমার কাঁধে হাত রাখিয়া উৎসাহভরে বলিল, "ওয়েল্ ল্যাড্ডি, তুমি আছ কেমন? আর আমস্? আমরা তাহাকে এবং তাহার মেয়েটিকে বহুদিন দেখি নাই। মেরী কেমন আছে, তাহা জানিবার জন্য যক্ বাবাজীর আগ্রহের সীমা নাই! কি বল যক্?"

বাপের কথায় যক্ লজ্জায় মুখ রাঙ্গা করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "হাঁ, বাবা, ও কথা সত্য।"

আমি বলিলাম, "মেরী বেশ ভাল আছে, আমসও ভালই আছে।"

অতঃপর আমরা সকলেই বাড়ীর দিকে চলিলাম। চলিতে চলিতে বৃদ্ধ জেলে ড্যান্ বলিল, "আমি যক্কে বলিতেছিলাম—মিষ্টার ফার্গস্ যত দিন পর্য্যন্ত সুন্দরী মেরীর মনোরঞ্জনের জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইবে—তত দিন তোমার বাপু, কোনই আশা ভরসা নাই। আর সত্য কথা বলিতে কি, যদি কোন কুমারী কোন ধনবান্ চাষীর ছেলেকে বিবাহ করিতে পায়—তাহা হইলে সে কি জাল-বওয়া জেলের ছেলের দিকে ফিরিয়া তাকায়?—হা—হা—হা।" বৃদ্ধের উচ্চ হাস্যে সুবিস্তীর্ণ সমুদ্র-তট প্রতিধ্বনিত হইল।

ড্যানের ভাই ম্যাল্কমও সেই হাস্যে যোগদান করিল। কিন্তু আমি হাসিতে পারিলাম না। ফার্গস্ জীবিত আছে ও মেরীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিতেছে ভাবিয়া বৃদ্ধ যে রসিকতা করিতেছিল, তাহাতে যোগদান করা দূরের কথা—প্রকৃত ব্যাপার যদি সে কোন উপায়ে জানিতে পারে, তাহা হইলে কি বিপদ ঘটিবে ভাবিয়া ভয়ে আমার মুখ শুকাইয়া গেল, বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল।

কিন্তু বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে না চাহিয়া উৎসাহভরে বলিতে লাগিল, "কিন্তু ঐ মেয়েটিকে যকের বড়ই মনে ধরিয়াছে। যক্ সৈন্যদলে যোগ দিতে আগামী সপ্তাহে সহরে যাইতেছে; সে প্রবাস-যাত্রার পূর্ব্বে মেরীকে একবার দেখিবার জন্য আমাদের সঙ্গে এখানে আসিল। মেরী আমাদের সঙ্গে বড় দেশে গিয়া আমাদের বাড়ীতে কয়েক দিন বাস করে, এজন্য আমরা আমস্কে অনুরোধ করিতে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ ড্যানের কথা শুনিয়া তাহাদের আসিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম। আরও জানিতে পারিলাম—মিসেস্ ড্যান ডোনাল্ডসনও মেরীকে অত্যন্ত স্নেহ করে; মেরীকে পুত্রবধূ করিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ। তাহার পুত্র যক্ সৈন্যদলে যোগদান করিতে যাইবার পূর্ব্বে মেরীকে নিমন্ত্রণ করিয়া একবার নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য সেই বৃদ্ধাই ইহাদিগকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে।

মেরীর মনের কথা আমি জানিতাম, সেখানে তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সে সম্ভবতঃ এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবে না। এই প্রস্তাবে যে আমসের আপত্তি হইবে না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। মেরীর ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, তাহাকে কয়েক দিনের জন্য স্থানান্তরে পাঠাইতে আমসের প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল, এইরূপই আমি অনুমান করিয়াছিলাম।

আমার এই অনুমান মিথ্যা হইল না; আমসের নিকট বৃদ্ধ ড্যান এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে আমস্ মেরীকে বলিল, "উহারা তোমাকে লইতে আসিয়াছে, তুমি উহাদের সঙ্গে যাও মেরী! আমি পিটারের সাহায্যে সংসারের সকল কাজের ব্যবস্থা করিতে পারিব। তুমি বড় দেশে যাইলে তোমার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইবে; তদ্ভিন্ন, সেখানে যে সকল সঙ্গী পাইবে, এখানে ত সেরূপ সঙ্গী পাও না। তোমার সেখানে অযত্ন হইবে না; আহারটাও ভালই চলিবে, এজন্য তুমি উহাদের সঙ্গে যাও—ইহাই আমার ইচ্ছা; তুমি উহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিও না মেরী!"

মেরী অগত্যা তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিল। সে তাহার নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র গুছাইয়া লইলে, যক্ তাহার মোট ঘাড়ে তুলিয়া লইল ও তাহা তাহাদের নৌকায় লইয়া চলিল। মেরী তাহার সঙ্গে গমন করায় যক্কে অত্যন্ত উৎফুল্ল দেখিলাম।

যক্ মেরীর সঙ্গে প্রস্থান করিলে ড্যান ও তাহার ভ্রাতা ম্যাল্কম আমাদের পাকশালায় বসিয়া মদ্য পান করিতে করিতে আমসের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। ড্যান আমস্কে বলিল, "যক্ প্রফুল্লচিত্তেই যুদ্ধে যাইতে পারিবে জ্রোবি! ফার্গস্ যকের প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া যক্ ফার্গসের হিংসা করে। ইহা স্বাভাবিক। বেচারার বড় দুঃখ!"

আমস্ এ-কথা শুনিয়া মনের ভাব গোপন করিবার জন্য কাসিতে লাগিল; তখন তাহার হাতে মদের গ্লাস ছিল। আমি দেখিলাম, তাহার হাত কাঁপিতেছিল।

ম্যাল্কম আমস্কে বলিল, "ফার্গস্কে কি এখানে আসিতে দেখিয়াছিলে? সে কি মেরীকে দেখিতে আসিয়াছিল?"

আমস্ ভগ্ন স্বরে বলিল, "আমি? না, আমি তাহাকে নিশ্চয়ই দেখি নাই। কিরূপে তাহাকে দেখিব? সে ত এখানে কোন দিন আসে নাই।"

ম্যাল্কম বলিল, "সেই কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম; কারণ, কয়েক দিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, সে তাহার বোট লইয়া সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিল।"

আমস্ বলিল, "সে কি বলিয়াছিল—এ—এখানেই সে আসিবে ?" তাহার কণ্ঠস্বর যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

ম্যাল্‌কম বলিল, "তাহা জানি না ; শুনিয়াছি, সে তাহার বোটে এই দিকেই আসিয়াছিল।—চুলোয় যাক্ ও-সব কথা, ড্যান, চল আমরা বোটে যাই। মেরী ও যক্ আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে।"

অতঃপর আমস্ তাহাদিগকে বিদায়দান করিতে আমাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রতটে উপস্থিত হইল। মেরী পূর্ব্বেই ড্যানের নৌকায় উঠিয়া বসিয়াছিল ; তাহারা পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলে আমি রুমাল উড়াইয়া মেরীকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলাম।

নৌকা সমুদ্রতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে অকূলে ভাসিল। তখন আমস্ দৃঢ়-মুষ্টিতে আমার হাত ধরিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আলেন্ ফার্গস্‌কে লইয়া বিষম ফ্যাসাদেই পড়িতে হইবে ! তাহার আত্মীয়-স্বজনরা নিশ্চিতই তাহার সন্ধানে বাহির হইবে। কেহ না কেহ তাহার সন্ধানে এখানে আসিবে, এ কথা আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। কেহ এখানে আসিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কিছুই জান না বলিবে।—বলিবে, ফার্গস্ কোন দিন এখানে আসে নাই, তাহাকে তুমি কখন দেখ নাই।—আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

আমি সকলই বুঝিয়াছিলাম ; আমসের আশ্রয়ে বাস করিয়া তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই, তাহাও জানিতাম। মেরী চলিয়া যাওয়ায় 'ব্ল্যাক-গল ফার্ম্ম' অত্যন্ত নির্জ্জন মনে হইতে লাগিল ; তবে এই ভাবিয়া আমি সান্ত্বনা লাভ করিলাম যে, মেরী দুই-তিন দিন পরেই ফিরিয়া আসিবে। সে ডোনাল্ডসনদের বাড়ীতে সুখে থাকিবে ভাবিয়া আমার আনন্দই হইল।

বাহির হইতে কোন লোক ফার্গসের সন্ধানে আসিতে পারে ভাবিয়া সমস্ত দিন আমাদের বড় উৎকণ্ঠায় কাটিল। কিন্তু কেহই সে-দিন ফার্গসের সন্ধান লইতে আসিল না। রাত্রিকালে আমস্ পাকশালার অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসিয়া তাহার জ্যাকেটের পকেট হইতে কাপ্তেন লড্‌উইগ ভন রথভেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত সোনার ঘড়ি, চেন ও অঙ্গুরী বাহির করিয়া লইল। আমি পাকশালার এক কোণে বসিয়া তাহার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিলাম।

আমস্ সেগুলি তাহার অপরিচ্ছন্ন করতলে লইয়া লোলুপদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপন-মনে বলিতে লাগিল, "এ সকল যাহার জিনিস, সে ত দেশে ফিরিবার সময় ইংলিশ চ্যানেলেই ডুবিয়া মরিয়াছে ; তাহার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ যাহাকে এগুলি সে দিতে বলিয়া গিয়াছে, সে-ও শীঘ্রই ডুবিয়া মরিবে ; তবে আর কি জন্য এগুলো হাতছাড়া করিব ? এমনই করিয়াই ত পরের জিনিস কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া ভাগ্যবান্ ব্যক্তির ভোগে লাগে, হা—হা।"

তাহাকে হাসিতে দেখিয়া আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। আমস্ বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আমার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; তাহার পর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিল। সেই পত্রখানি তাহার হাতে দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম—লড্‌উইগ ভন রথভেন যে পত্রখানি লিখিয়া তাহার ভাই লেফ্‌টেনাণ্ট কার্ল রথভেনকে দেওয়ার জন্য আমসের নিকট রাখিয়া গিয়াছিল—উহা সেই পত্র। আমস্ পত্রখানি সরু করিয়া পাকাইয়া তদ্দারা একটি পলিতা প্রস্তুত করিল, এবং সেই পলিতার ডগা অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিতে স্পর্শ করিল ; তাহা দীপ-শিখার ন্যায় জ্বলিয়া-উঠিলে সে তদ্দারা তাহার মুখ-সংলগ্ন পাইপের তামাক ধরাইয়া লইল ; তাহার পর অর্দ্ধদগ্ধ পলিতাটি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইল। তাহা দেখিয়া সে আবার হাসিয়া উঠিল !—বিশ্বাসঘাতক !

এই কার্য্য শেষ হইলে আমস্ মুখের পাইপ নামাইয়া আমাকে তীব্র স্বরে বলিল, "মেরীকে আমি ডোনাল্ডসনদের সঙ্গে দেশান্তরে পাঠাইলাম কেন, তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কি ? কার্ল রথভেন 'ইউ'-বোট লইয়া পূর্ব্বেও কয়েকবার এখানে আসায় মেরীর সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহা ত জান। কার্লের ভাই লড্‌উইগ সে-দিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল, কার্ল তিন দিন পরে আসিবে, সেই সময় আমার নিকট গচ্ছিত তাহার পত্র ও ঘড়ি, চেন, অঙ্গুরী তাহাকে দিতে হইবে। আজই এক সময় কার্ল এখানে আসিয়া পড়িবে। মেরী এখানে থাকিলে কথায় কথায় কার্লের নিকট ঐ সকল কথা প্রকাশ করিত, এবং

কার্ল তাহা শুনিয়া আমার নিকট ঐ সকল জিনিসের দাবী করিত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই মেরীকে তাহার চক্ষুর আড়ালে পাঠাইলাম। কার্ল 'ইউ'-বোটের খোরাক সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই চলিয়া যাইবে; তাহার পর মেরী এখানে ফিরিয়া আসিলে আমার কোন ক্ষতি হইবে না। এই সকল মূল্যবান সামগ্রী আমি কার্লকে—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পাকশালার বাহিরে কাহারও পায়ের ভারী বুটের শব্দ শুনিতে পাইলাম। মুহূর্ত্ত পরেই পাকশালার দ্বার খুলিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট কার্ল ভন রথভেন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল!

কার্লকে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে পাকশালায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমস্ তাড়াতাড়ি তাহার হাতের ঘড়ি, চেন প্রভৃতি পকেটে ফেলিল। সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই লেফ্‌টেনাণ্ট কার্ল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হাল্লো ক্লোবি, আমাদিগকে সাঙ্কেতিক আলো দেখাইবার জন্য তুমি সমুদ্র-তীরে হাজির থাক নাই কেন? ইহা অত্যন্ত অন্যায়।"

আমস্ বলিল, "সমুদ্রতীর হইতে অল্পকাল পূর্ব্বেই ত বাড়ী আসিয়াছি; তখন তোমরা কোথায় ছিলে? আমি পিটারের সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া-আসিয়া এই ত ধূমপান করিতে বসিলাম।"

লেফ্‌টেনাণ্ট কার্ল গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি কিন্তু অন্যরূপ ভাবিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম—বৃটিশ সৈন্যদল এই দ্বীপ অধিকার করিয়াছে। কতখানি ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়া আমি তীরে উঠিয়াছি, তাহা তোমার বুঝিবার শক্তি নাই।"

আমস্ বলিল, "হাঁ, এখন তোমাদিগকে ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়াই সর্ব্বদা সকল কাজ করিতে হইবে। এ কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করা বৃথা! আমার অথবা পিটারের নিকট হইতে সঙ্কেত না পাইলে তোমাদের কোন 'ইউ'-বোটের কাপ্তেনেরই এই দ্বীপে অবতরণ করা উচিত নহে, এ কথা স্মরণ রাখিবে।"

লেফ্‌টেনাণ্ট কার্ল বলিল, "ও সকল কথা আমার জানা আছে; কিন্তু এবার আমরা আসিয়া সাগরতট হইতে তোমাদের সাড়া পাই নাই।"

আমস্ বিরক্তিভরে বলিল, "কিন্তু তোমাদের প্রতীক্ষায় আমরা ত সারা রাত্রি সমুদ্রবেলায় বসিয়া থাকিতে পারি না। তুমিই বল, আমাদের পক্ষে তাহা কি সম্ভব?"

লেফ্‌টেনাণ্ট কার্ল এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমস্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগেন এখনও এখানে আছে কি?"

আমস্ বিকৃত স্বরে বলিল, "না, নাই; দুই রাত্রি পূর্ব্বে সে তোমার ভ্রাতার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।"

কার্ল আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ভাই—লড্‌-উইগ কি এখানে আসিয়াছিল? সে কি দেশে ফিরিয়াছে? কোন কথা তোমাকে বলিয়া গিয়াছে?"

আমস্ বলিল, "হাঁ, দেশেই ফিরিয়াছে।—যদি তোমার কথা শেষ হইয়া থাকে ত চল, তোমার 'ইউ'-বোটের খোরাক দিয়া আসি; তাহা লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়। কে কখন্ এখানে আসিয়া পড়ে, তোমার আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়।"

দেখিলাম, লেফ্‌টেনাণ্ট কার্লকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার জন্য আমস্ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, আমস্ তাহার নিকট গচ্ছিত লড্‌উইগের দ্রব্যগুলির প্রসঙ্গে কার্লকে কোন কথাই বলিল না।

নৈশ অন্ধকারে সমুদ্রতটে গমন করিবার সময় আমস্ মৃদুস্বরে আমাকে বলিল, "উহার ভাই আমার নিকট যে সকল দ্রব্য গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন কথা যদি উহার নিকট প্রকাশ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে খুন করিয়া ফেলিব।"

সে যে সত্যই আমাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না, ইহা আমি জানিতাম; কোন দুষ্কর্ম্ম তাহার অসাধ্য ছিল না, ইহার বহু পরিচয়ই পাইয়াছিলাম। এজন্য আমি কোন কথা বলিলাম না, নির্ব্বাক্ রহিলাম।

লেফ্‌টেনাণ্ট কার্ল ভন রথভেন প্রস্থান করিলেও আমি রাত্রির অবশিষ্টকাল অন্য 'ইউ'-বোটের প্রতীক্ষায় সমুদ্র-বেলায় স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু সেই রাত্রিতে অন্য কোন 'ইউ'-বোট আসিল না। প্রত্যূষে আমি উঠিয়া ঘরে চলিলাম, এবং পাকশালায় প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমার বিচিলীর শয্যা প্রসারিত করিলাম। সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছি; আমি শয়ন মাত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

আমি কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, তাহা জানিতে পারি

নাই। সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমি চাহিয়া দেখি, আমস্ আমার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া জুতা দিয়া আমার মাথা গুঁতাইতেছে!

তাহার এই ব্যবহারে আমার বিস্ময়ের কারণ ছিল না; তাহার জুতার আঘাতে আমার দেহের অনেক স্থলে কড়া পড়িয়াছিল। আমি নিরুপায়, তাহার আশ্রিত; কারণে অকারণে যখন-তখন আমাকে জুতাপেটা করিবার তাহার অধিকার ছিল। এইরূপ নির্য্যাতনে আমি আর কষ্টবোধ করিতাম না; অভিমানই বা কাহার উপর করিব?

জুতার গুঁতার-চোটে আমার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। আমসের মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়াছিল, এবং আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল; মুহূর্ত্ত পরেই ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম। নিহত আলেন ফার্গসের ভগিনী হানা ফার্গস্ ঝড়ের ন্যায় বেগে পাকশালায় প্রবেশ করিল, এবং নীল পরিচ্ছদধারী দুই জন প্রৌঢ় অনুচর তাহার অনুসরণ করিল। আমস্ সেই তিন মূর্ত্তিকে পূর্ব্বেই তাহার গৃহাভিমুখে আসিতে দেখিয়াছিল, এবং এই জন্যই ঐরূপ আতঙ্কাভিভূত হইয়াছিল।

আমি হানা ফার্গসের মুখের দিকে চাহিলাম। স্ত্রীলোকটা যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কি ভীষণ কদাকার তাহার মুখ! যেন একটা গোলাকার লাল হাঁড়ি। মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাঁত, অধরোষ্ঠে তাহা ঢাকা পড়ে না। বিস্তীর্ণ ললাট যেন মাঠ, তাহাতে দড়ার মত স্থূল শিরা ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল; গভীর অক্ষি-কোটরের ভিতর প্রবিষ্ট সুগোল ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি মিট্‌মিট্ করিতেছিল; সেই চক্ষুতে ধূর্ত্ততা ও কপটতা প্রতিফলিত।

তাহার চাপা ওষ্ঠে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ব্যক্ত হইতেছিল।

হানা ফার্গস্ যেন হাঁড়ার ভিতর হইতে আওয়াজ বাহির করিয়া, কর্কশ মেঠো সুরে আমস্‌কে বলিল, "আমার ভাই এখানে আছে?"

আমস্ ক্ষীণস্বরে বলিল, "না, মা'ম্, সে এখানে নাই।"

হানা বলিল, "সে কখন এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে?"

আমস্ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বাধ-বাধ স্বরে বলিল, "কখন্ চলিয়া গিয়াছে—তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? যে এখানে কোন দিনও আসে নাই, সে কখন্ চলিয়া গিয়াছে—এরূপ প্রশ্নের মাথা-মুণ্ড কিছু মানে আছে কি? সে এখানে আদৌ আসে নাই, সুতরাং কখন চলিয়া গিয়াছে—এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।"

হানা সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ও তোমার মিথ্যা কথা! সে চারি দিন পূর্ব্বে বড় দেশ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছিল; আসিয়াছিল—তোমার সেই রূপসী মেয়েটাকে দেখিবার জন্য। শীঘ্র বল—সে কোথায়?"

আমস্ এবার দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সে এখানে আসে নাই; এখানে তাহাকে কোন দিনও দেখি নাই। আর তুমি বলিতেছ—আমার এ কথা মিথ্যা! ইহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে সত্য কি, তাহা আমার জানা নাই।"

হানা ফার্গস্ দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া-ধরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমসের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। তাহার মিট্‌মিটে চক্ষুতে অবিশ্বাস ফুটিয়া উঠিল।

ক্ষণকাল পরে হানা আমসের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তুমি অতি অদ্ভুত কথা বলিতেছ! সে এখানে আসিবে বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। ভাল, তোমার সেই মেয়ে—মেরী কোথায়?"

আমস্ ঢোক গিলিয়া বলিল, "সে,—ইয়ে কি বলে—সে সাগরপারে তোমাদেরই বড় দেশে গিয়াছে।"

হানা ফার্গস্ এবার উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, "হুম্, তবে যে কথাটা উড়াইয়া দিতেছিলে? সে আমার ভাইএর বোটে যায় নাই—এই কথা কি তুমি বলিতে চাও?"

আমস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বলিয়াছি ত, তোমার ভাই আদৌ এখানে আসে নাই; তবে মেরী তাহারই বোটে গিয়াছে—তোমার এই অনুমান কিরূপে সত্য হইতে পারে? যাহার মাথা নাই, তাহার মাথা ব্যথা? মেরী বড় দেশে গিয়াছে বটে, কিন্তু সে ড্যান ডোনাল্ডসনদের সঙ্গে গিয়াছে; সুতরাং এই প্রসঙ্গে তোমার ভাই বা তাহার নৌকার কথা উঠিতেই পারে না। বাজে কথা লইয়া তুমি তর্ক করিও না চাষার বেটী!"

আমসের এই অশিষ্ট মন্তব্যে হানার চক্ষু কঠিন হইয়া উঠিল; সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিল, তোমা

মেয়ে মেরীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিবে—এই মতলবেই তাহার এখানে আসা। তাহার সে কথা মিথ্যা হইতে পারে না। ঐ একই কথা যদি সে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ না বলিত, তাহা হইলে তোমার কথা সত্য বলিয়া ধারণা হইতেও পারিত; হয় ত তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিতাম।"

আমস্ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "মর্ মাগী, যা মুখে আসিতেছে, তাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছিস্! আমি তোকে সতর্ক করিতেছি—মুখ সামলাইয়া কথা বলিস্। পরের বাড়ী আসিয়া ও-রকম মেজাজ দেখান চলিবে না।"

হানা ফার্গস্ গর্জ্জন করিল, "মুখ বুঁজিয়া থাক্, বেটা শয়তানের বাচ্চা!"

তাহার সেই হুঙ্কারে আমসের মুখে আর কথা সরিল না! আমার মনে হইল, আমস্ তাহার সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিলে তখনই হানার বজ্রবৎ কঠিন হস্তের চপেটাঘাতের রসাস্বাদন করিত। সে রস অত্যন্ত দুষ্পাচ্য!

হানা অতঃপর তাহার অনুচরদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার ভাই যেদিন এখানে আসিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, সেদিন আকাশের অবস্থা কিরূপ ছিল? বেশ ভাল ছিল না কি?"

এক জন অনুচর অধীরভাবে পাকশালার মেঝেতে পা ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "আকাশ সেদিন খাসা পরিষ্কার ছিল, মেঘ-ঝড়ের চিহ্নমাত্র ছিল না।"

হানা পুনর্ব্বার বলিল, "আমার ভাই হাল ধরিয়া একা নৌকা চালাইয়া আসিয়াছিল; সে কি পাকা মাঝি নয়?"

অন্য অনুচর মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "আলবৎ পাকা, একদম্ ঝুনো!"

হানা বলিল, "তাহা হইলে তাহার এখানে পৌঁছাইতে পথে যে কোন রকম বিঘ্ন ঘটিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না?"

এক জন অনুচর বলিল, "এখানে আসিবে বলিয়া সে যখন নৌকা লইয়া বাহির হইয়াছিল, তখন সেই দিনই সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বে সে এখানে পৌঁছাইয়াছিল, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ও-সব বাজে ধাপ্পা!"

দ্বিতীয় অনুচর তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, "একবিন্দুও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ও ধাপ্পাবাজি!"

হানা পুনর্ব্বার আমসের মুখের দিকে আরক্ত নেত্রে চাহিয়া স্পর্দ্ধাভরে বলিল, "আমার ভাই তোমার মেয়েটিকে তাহার নৌকায় তুলিয়া-লইয়া হয় কোন দিকে ভাসিয়া পড়িয়াছে, না হয়, তাহার ভাগ্যে কোন অঘটন ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু ব্যাপার যাহাই হউক, আর সমস্যা যতই জটিল হউক; আমি তাহা আবিষ্কার করিয়া, এই জটিল সমস্যার সমাধান করিব, এ কথা তোমাকে বলিয়া যাইতেছি। যদি তাহার কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বোটখানা-পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া যাইবে, ইহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। সে বোট হইতে নামিয়া যাইবার পর কোন কারণে কোথাও ফেরার হইয়াছে কি না, তাহা আমাকে আবিষ্কার করিতেই হইবে। তুমি আবার আমার দেখা পাইবে আমস্ ক্রোবি! এক ছোঁড়া তোমার তল্পিদারী করে, তাহাকেও জেরা করিতে চাই।"

এই সকল কথায় আমস্কে ভয় প্রদর্শন করিয়া রুক্ষ-ভাষিণী, বলদর্পিতা হানা ফার্গস্ সদম্ভে অনুচরদ্বয়সহ পাক-শালা ত্যাগ করিল, এবং সমুদ্রতটে তাহার বোটে ফিরিয়া চলিল।

প্রভাতে এই সকল কাণ্ড ঘটিবার পর আমস্ ভয় ও দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া সমস্ত দিন ঘরে-বাহিরে দাপাইয়া বেড়াইল, এবং ভবিষ্যতে হানা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিলে আমি যদি তাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করি—তাহা হইলে আমাকে হত্যা করিবে বলিয়া পুনঃ পুনঃ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যা অতীত হইলে আমি তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়া বাঁচিলাম। রাত্রিকালে যদি কোন 'ইউ'-বোট আসে, তাহা হইলে তাহাকে সাঙ্কেতিক আলোক দেখাইতে হইবে বলিয়া সমুদ্র-কূলে গমন করিলাম।

মোম-জামার পুরাতন কোটে দেহ আবৃত করিয়া, এবং হারিকেন লণ্ঠনটি পাশে লইয়া পাহাড়ের পাদদেশে বালুকা-স্তূপের উপর আমি বসিয়া রহিলাম। আমার স্নেহময়ী সঙ্গিনী মেরীকে কয়েক দিন দেখি নাই; সেই নির্জ্জন সাগর-বেলায় নিবিড় নৈশ অন্ধকারে একাকী বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল।

সহসা সমুদ্র-বক্ষের গাঢ় অন্ধকাররাশি বিদীর্ণ করিয়া

কিছু দূরস্থ রক্ত-লোহিত আলোকের সুতীব্র প্রভা আমার নয়ন-যুগলে প্রতিভাত হইল। তাহা দেখিবামাত্র আমি বুঝিতে পারিলাম, কোন 'ইউ'-বোট তাহার খোরাক সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে।

সেই 'ইউ'-বোট হইতে উপর্য্যুপরি তিনবার সাঙ্কেতিক লোহিতালোক প্রদর্শিত হইলে আমি আমার পার্শ্বস্থ হারিকেন লণ্ঠনটা জ্বালিয়া উর্দ্ধে তুলিলাম, এবং যথানিয়মে আন্দোলিত করিয়া 'ইউ'-বোটকে সাড়া দিলাম।

কয়েক মিনিট পরে 'ইউ'-বোটের একখানি ডিঙ্গীর দাঁড়ের ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ডিঙ্গীখান সমুদ্রকূলে ভিড়িলে এক জন দীর্ঘদেহ আরোহী ডিঙ্গী হইতে নামিয়া আসিল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম।

কাপ্তেন রডল্ফ ভন্ জাওয়ার্জ আমাকে দেখিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "গুড্ ইভ্নিং পিটার, খবর সব ভাল ত?"

আমি কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম, "হাঁ মহাশয়, সব ভাল।"

'ইউ'-বোটের যতগুলি কাপ্তেনের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কাপ্তেন রডল্ফ জাওয়ার্জকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিতাম। তাহার তুল্য রাশভারী সুদক্ষ জার্ম্মাণ নৌ-যোদ্ধা আমি আর এক জনও দেখি নাই।

লোকটি বিশালদেহ জোয়ান, মুখের বর্ণ ঈষৎ মলিন, চক্ষু দু'টি একটু বসা; কিন্তু সেই চক্ষুর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী; মুখখানি গোল, অধরোষ্ঠ পাতলা, চুয়াল-জোড়া প্রশস্ত; তাহার মুখের দিকে চাহিলেই মনে হইত—তাহার দেহের শক্তি অসাধারণ।

শুনিতাম, নৌ-বিভায় এই কাপ্তেনের অসামান্য অভিজ্ঞতা ছিল। আমি অন্যান্য 'ইউ'-বোটের কাপ্তেনের নিকট শুনিয়াছিলাম, কাপ্তেন রডল্ফ জাওয়ার্জের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া হার হিট্লার তাহাকে জার্ম্মাণ নৌ-বিভাগের কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু কাপ্তেন রডল্ফ 'ইউ'-বোট-পরিচালনের সঙ্কটসঙ্কুল কার্য্যভার ত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই। এই বিপজ্জনক কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করাই তাহার একমাত্র কামনা ছিল।

ইংলণ্ডের প্রতি দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নির্ভীক নাৎসী কাপ্তেনের যেন সহজাতসংস্কার! এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেন তাহার শিরায় শিরায় শোণিত-স্রোতের সহিত প্রবাহিত হইতেছিল; এবং তাহা এতই প্রবল ছিল যে, সে যে-সকল বৃটিশ জাহাজ আক্রমণ করিয়া টর্পেডোর আঘাতে ডুবাইয়া দিত, সেই সকল জাহাজের কোনও মগ্নোন্মুখ, বিপন্ন আরোহীর প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিত না; সে তাহাদিগকে কীটের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিত। নরহত্যায় তাহার সেই আনন্দ পৈশাচিক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শুনিয়াছি, 'ইউ'-বোটের এই কাপ্তেনের ন্যায় উগ্রপ্রকৃতি, অত্যুৎসাহী, দাম্ভিক নাৎসী, জার্ম্মাণীতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে না কি নাৎসীর আদর্শ বলিয়া মনে করা হইত। তাহার ধারণা, বৃটেনের নিকট বাধা না পাইলে জার্ম্মাণীই এ যুগে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু এই দুর্দ্ধর্ষ, নিষ্ঠুর কাপ্তেন, কি কারণে বলিতে পারি না, আমার প্রতি কিঞ্চিৎ সদয় ছিল; এবং যখনই আমাদের দ্বীপে আসিত, মিষ্ট কথায় আমাকে খুসী করিবার চেষ্টা করিত।

কাপ্তেন রডল্ফ এক দিন আমাকে বলিয়াছিল, "দেশে আমার একটি পুত্র আছে, সে দেখিতে প্রায় তোমারই মত; তোমাকে দেখিলেই তাহার কথা আমার মনে পড়ে। কত দিন তাহাকে দেখি নাই!"—কথাটা বলিয়া এই নিষ্ঠুর, নরহন্তা নাৎসীও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল। বোধ হয়, এই পুত্রস্নেহই তাহার হৃদয়ের একমাত্র দুর্ব্বলতা! তাহার পুত্রের একখান ফটো সে সর্ব্বদা নিজের কাছে রাখিত; এক দিন সে সেই ফটো আমাকে দেখিতে দিয়াছিল। হয় ত আমার মুখের সহিত সেই মুখের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ছিল।

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিল, "ক্রোবি কোথায়?"

আমি বলিলাম, "আমাকে আপনাদের নিকট সংবাদ দিতে পাঠাইয়া ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছে।"

কাপ্তেন কঠোর স্বরে বলিল, "স্কাউন্ড্রেল! এই ছোট ছেলেটাকে রাত্রির অন্ধকারে একা পাহারায় পাঠাইয়া ঘরে শুইয়া ঘুমাইতে তাহার লজ্জা হয় না? শার

তাহাকে ডাকিয়া আনো; কাজ শেষ করিয়া এখনই আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে।"

আমি আমস্‌কে সংবাদ দিতে চলিলাম। আমার ডাকা-ডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিলে সে উঠিয়া বসিল, এবং কাপ্তেন রডল্‌ফকে গালি দিতে লাগিল। কিন্তু কাপ্তেন রডলফ্‌কে সে-ও অত্যন্ত ভয় করিত; সুতরাং গালাগালি বন্ধ করিয়া অবিলম্বে তাহাকে সমুদ্রতীরে আসিতে হইল।

'ইউ'-বোটের জন্য পেট্রল, তেল প্রভৃতি লওয়া হইলে কাপ্তেন রডল্‌ফ ডিঙ্গীতে উঠিতে যাইবে, সেই সময় আমস্‌ অত্যন্ত বিনীতভাবে তাহাকে বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার দুই-একটা কথা ছিল কাপ্তেন, আপনার কি তাহা শুনিবার সুযোগ হইবে?"

কাপ্তেন ডিঙ্গীর অদূরে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি কথা, বল।"

আমস্‌ নরম সুরে বলিল, "কথা—আপনাদের এখানকার এই আড্ডা সম্বন্ধে। লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন সম্বন্ধেও আমার কিছু বলিবার আছে। সে কয়েক রাত্রি পূর্ব্বে আমারই ঘরে একটা লোককে গুলী করিয়া মারিয়া স্বদেশগামী একখান 'ইউ' বোটে চাপিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। যদি আপনি দয়া করিয়া আমার বাড়ী-পর্য্যন্ত যাইতে পারেন, তাহা হইলে সকল কথা আপনাকে বলিতে পারি।"

কাপ্তেন রডল্‌ফ ভন জাওয়ার্জ বলিল, "এখানে বলিতে তোমার আপত্তি কি?"

আমস্‌ মাথা চুলকাইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আপত্তি বিশেষ-কিছু নাই; তবে সে অনেক কথা, বলিতে একটু সময় লাগিবে কি না, এখানে দাঁড়াইয়া বলিবার সুবিধা হইবে না; আর আমার বাড়ীও ত অধিক দূরে নহে। আপনার অধিক সময় নষ্ট হইবে না।"

কাপ্তেন রডল্‌ফ দুই-এক মিনিট কি ভাবিল; তাহার পর সেই ডিঙ্গীর মাঝিকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমসের সঙ্গে তাহার বাড়ীর দিকে চলিল।

আমি তাহাদের অনুসরণ করিলাম; কারণ, আমস্‌ কাপ্তেনকে কি বলে তাহা শুনিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা পাকশালায় প্রবেশ করিলে আমস্‌ কাপ্তেনকে চেয়ারে বসাইয়া নিজে তাহার অদূরে বসিল, এবং লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন কি ভাবে ফার্গস্‌কে গুলী করিয়া মারিয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিতে লাগিল। সে কাপ্তেনের নিকট কোন কোন কথা গোপন করিল। ফার্গস্‌ মেরীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, মেরী সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত কোন কথা সে প্রকাশ করিল না; লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনের সহিত মেরীর ঘনিষ্ঠতার কথাটাও চাপিয়া গেল। কাপ্তেন রডল্‌ফ নির্ব্বাকভাবে তাহার সকল কথা শুনিল। আমস্‌ এ কথা শেষ করিবার সময় বলিল, "ফার্গস্‌কে গুলী করিয়া হত্যা করা ভিন্ন লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনের অন্য কোন উপায় ছিল না। হ্যাগেন তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা না করিলে ফার্গস্‌ দেখিতে পাইত, আমার ঘরে যে লোকটি আশ্রয় লইয়াছিল—সে ইংরেজের মহাশত্রু জার্ম্মাণ আফিসার। সে উহা জানিতে পারিবার পর নির্ব্বিঘ্নে আমার গৃহ ত্যাগ করিবার সুযোগ পাইলে তাহার কি ফল হইত, তাহা আপনাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।"

কাপ্তেন রডল্‌ফ বলিল, "আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন যাহা করিয়াছিল, প্রত্যেক জার্ম্মাণ আফিসার ঐ অবস্থায় ঠিক ঐরূপ কার্য্যই করিত। তবে কথা এই যে, লোকটা যখন মরিয়া গিয়াছে, এবং গোপনে তাহার মৃতদেহেরও সদ্গতি করিয়াছ, তখন আর তোমার দুশ্চিন্তার কি কারণ থাকিতে পারে?"

আমস্‌ বলিল, "সে মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার একটা দজ্জাল ভগিনী আছে, সে মাগী পুরুষের বাবা! সে ভারী ফ্যাসাদ বাধাইবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছে!"

হানা ফার্গস্‌ সেই দিন প্রভাতে আমসের বাড়ীতে আসিয়া কিরূপ চোট্‌পাট্‌ করিয়াছিল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত সে কাপ্তেনের গোচর করিল; তাহার পর বলিল, "সেই মাগী আবার এখানে তদন্ত করিতে আসিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া গিয়াছে! যদি সে আসে, তাহা হইলে পিটারকে জেরা করিয়া গুপ্ত-কথা কিছু কিছু বাহির করিয়া লইবে বলিয়াই আমার আশঙ্কা। আমি উহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছি বটে, কিন্তু সেই মাগীর জটিল ফন্দী-ফিকিরে উহাকে জড়াইয়া পড়িতেই হইবে। তাহার চালাকি বা চাল বুঝিবার শক্তি উহার নাই! সুতরাং আমার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। আপনাদের এই আড্ডাটি নষ্ট হইবে, এবং ইংরেজ সৈন্যরা আমার চোখ বাঁধিয়া আমাকে কুকুরের মত গুলী

করিয়া মারিবে! আপনাদের টাকাগুলি আমার আর ভোগে লাগিবে না।"—সে জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিয়া তাহার ভাল চোখটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি- কাপ্তেনের মুখের উপর স্থাপন করিল, যেন কাপ্তেনের উত্তরের উপর তাহার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ভর করিতেছিল।

কাপ্তেন রুডল্ফ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "টাকাগুলি ভোগে লাগাইবার জন্য এখন তুমি কি করিতে চাও?"

আমস্ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আমি—আমি ঐ ছোঁড়াকে এখান হইতে কিছু দিনের জন্য সরাইয়া দিতে চাই। এ অঞ্চলেই উহাকে রাখিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

কাপ্তেন বলিল, "উহাকে বড় দেশে কিছু দিনের জন্য নির্ব্বাসনে পাঠাও।"

আমস্ হতাশ ভাবে বলিল, "আপনি বেশ কথা বলিলেন; এ যেন ডাইনীর হাতে ছেলে সঁপিয়া দিবার উপদেশ! হানা ফার্গস সেখান হইতে তাহার নিরুদ্দিষ্ট ভাইএর সন্ধান লইতে এখানে আসিত, কিন্তু আর তাহাকে আসিতে হইবে না, দেশে বসিয়াই পিটারের মুখ হইতে সকল সংবাদ বাহির করিয়া লইতে পারিবে।"

কাপ্তেন বলিল, "তাহা হইলে কোন-একটা উপায় স্থির করিয়াছ?"

আমস্ মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল, "আমি ভাবিতে-ছিলাম, অর্থাৎ আমার মনে হইতেছিল যে—"

তাহার মুখের কথা শেষ হইল না; সে হতাশ ভাবে দুই হাতে ঘাড় চুল্‌কাইতে লাগিল। অত্যন্ত অসহায় অবস্থা!

কাপ্তেন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তোমার কি মনে হইতেছিল, তাহা মুখ দিয়া বাহির করিতে গিয়া বোবা সাজিলে কেন?"

আমস্ এবার তাড়াতাড়ি এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আমার মনে হইতেছিল, আপনি যদি কয়েক দিনের জন্য পিটারকে সঙ্গে লইয়া যান, তাহা হইলে ও নিরাপদ থাকিতে পারে, আমিও নিশ্চিন্ত হই।"

আমসের প্রস্তাব শুনিয়া আতঙ্কে আমার বুকের ভিতর যেন লোহার হাতুড়ী পড়িতে লাগিল। নিরাপদ! কাপ্তেন রুডল্ফ ভন জাওয়ার্জের সঙ্গে তাহার 'ইউ'-বোটে আশ্রয় লইয়া আমি নিরাপদ হইব! 'ইউ'-বোটের যে সকল কর্ম্মচারী বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজের গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত ও 'ইউ'-বোটের সহিত সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হইয়া নিরাপদ হইয়াছে, আমিও সেইরূপই নিরাপদ হইব! এই চির-বৈচিত্র্যময়ী, রূপ-রস-গন্ধভরা, মাধুর্য্যপূর্ণ বসুন্ধরার বক্ষে আর আমাকে পদবিক্ষেপ করিতে হইবে না। কিন্তু আক্ষেপ বৃথা! আমসের প্রস্তাব শুনিয়া কাপ্তেন রুডল্ফ কি মন্তব্য প্রকাশ করে তাহা শুনিবার জন্য আমি উৎকর্ণ হইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে, রুদ্ধনিশ্বাসে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কাপ্তেন রুডল্ফ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "ক্রোবি, তুমি যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছ, হয় ত সেই আশঙ্কা অমূলক।"

আমস্ ব্যাকুল ভাবে বলিল, "না মিষ্টার, আমার বিশ্বাস, এই বিপদের আশঙ্কা অকারণ নহে। হানা ফার্গস্ অতি ভয়ানক মেয়ে-মানুষ! সে পিটারকে হাতে পাইলে আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। আট দশ দিন উহাকে দূরে রাখিতেই হইবে। উহার অজ্ঞাতবাসই আমার নিষ্কৃতি-লাভের একমাত্র উপায়।"

কাপ্তেন রুডল্ফ চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিল, "বেশ, পিটারকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। আমি ঘুরিতে ঘুরিতে আট্‌ল্যান্টিকের অন্য প্রান্তে যাইব; সেখানে আমার দিন-দশেক বিলম্ব হইতে পারে। যদি না মরি, তাহার পর এ দিকে ফিরিলে উহাকে এই দ্বীপে নামাইয়া দিয়া যাইব।"

কিন্তু আর এখানে ফিরিতে পারিব কি?

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিজ্ঞানের দান

নল খাগড়ায় কাগজ

কথায় বলে, অভাবই আবিষ্ক্রিয়ার মূল। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় পাটের অভাবে জার্ম্মাণী কাগজে থলিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাই ব্যবহার করিয়াছিল। এ বার প্রথমে সাবমেরিণের উপদ্রবে, তাহার পর জার্ম্মাণীর নরওয়ে অধিকারে কাগজের উপাদান কাঠের মণ্ড দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। সেই জন্য বিলাতে এক নূতন শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ডের যে অংশ ইষ্ট-অ্যাংলিয়া নামে পরিচিত, সেই অংশে নরফোক ও সাফোকে জলা-ভূমিতে বিস্তৃত স্থানে নল খাগড়া দেখা যায়। এতদিন উহা গৃহের চাল নির্ম্মাণের জন্যই ব্যবহৃত হইত; এখন উহা হইতে কাগজের উপকরণ মণ্ড প্রস্তুত করা হইতেছে। যদিও এই মণ্ড উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের মণ্ডের মত নহে, তথাপি বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহা এস্‌পার্টো নামক ঘাস হইতে প্রস্তুত মণ্ড অপেক্ষা হীন নহে। বৃটেনে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ টন এই ঘাস আমদানী হয়। নল খাগড়া উৎপাদন শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রার্থনার বিষয় বিবেচিত হইতেছে। এই পরীক্ষা সফল হইলে বহু পতিত জমিতে লাভজনক কৃষিকার্য্য হইতে পারিবে।

সেলের মূল্য ও ব্যয়সঙ্কোচ

গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বিস্ফোরকপূর্ণ সেলের যে দাম ছিল, এ বার তাহা অনেক বাড়িয়াছে। তাহার কারণ, কামান হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা দূরে সেল নিক্ষিপ্ত হইতেছে। বিমান আক্রমণজন্য যে সব কামান ব্যবহৃত হয়, সে সকল হইতে প্রক্ষিপ্ত সেল ৩০ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে যায়। সেই জন্য মূল্যবান উপকরণ কর্ডাইট অধিক ব্যবহার করিতে হয়। এই ব্যয়বৃদ্ধিহেতু অন্য দিকে ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইতেছে। পূর্ব্বে কাষ্ঠের বাক্সে সমর-সরঞ্জাম লওয়া হইত; এখন সেই কার্য্যে কয় প্রকার স্থূল কার্ডবোর্ড ব্যবহৃত হইতেছে। কাষ্ঠের তুলনায় কার্ডবোর্ডের মূল্য অল্প এবং দেখা গিয়াছে, নলের আকারে ব্যবহৃত হইলে কার্ডবোর্ড কাষ্ঠেরই মত দৃঢ় হয়।

"সেল শক"

গত জার্ম্মাণ যুদ্ধে প্রায় ৪ বৎসরে বহু লোক বিস্ফোরক সেলের বিস্ফোরণে বিকৃত-ইন্দ্রিয় হইয়াছিল। এই "সেল শক" বলিতে নানারূপ বিকৃতি বুঝায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যাহারা "সেল শকে" কাতর হয়, তাহাদিগের মধ্যে শতকরা মাত্র ১০ জন বিস্ফোরণের ফলে বিকৃত-ইন্দ্রিয় হয়। শতকরা প্রায় আর ১০ জন দীর্ঘকালব্যাপী শ্রমে স্নায়বিক ও মানসিক শ্রান্তিতে কাতর হইয়াছিল। অবশিষ্ট শতকরা প্রায় ৮০ জন [illegible] অনভ্যস্ত ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ও আশঙ্কায় অর্থাৎ ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতায় কাতর হয়। এ সবই "সেল শক" বলিয়া বর্ণিত [illegible]।

তুষার-সঞ্চয়

রুশ-বাহিনী যখন ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল, তখন [illegible] তাহাদিগের অভিযান যত বিব্রত হইয়াছিল, [illegible]দিগের বাধায় তত হয় নাই। তখন তাহারা এই প্রাকৃতিক বাধায় বিরক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রুশ রাজ্যের কোন কোন অংশে প্রবল তুষারপাত দেবতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং উত্তর ভারতে যেমন শীতকালে বৃষ্টিপাত না হইলে দুর্ভিক্ষে লোক বিপন্ন হয়, তেমনই সে সব অঞ্চলে প্রবল তুষারপাত না হইলে লোকের কষ্টের অবধি থাকে না। উরাল প্রদেশের কোন কোন স্থানের অধিবাসীরা গ্রীষ্মে পানীয় জলের জন্য শীতকালে সঞ্চিত তুষারের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। আবার আলাস্‌কা প্রভৃতি কোন কোন স্থানে লোক মেরুর দীর্ঘ শীতকালে পানীয়ের জন্য তুষার সঞ্চয় করিয়া থাকে। এ দেশে শিমলা প্রভৃতি স্থানে অধিবাসীরা গ্রীষ্মকালে ব্যবহার জন্য গর্ত্তে তুষার সঞ্চয় করিয়া রাখে।

আপেলের গ্যাস

আজকাল যুদ্ধে বিষবাষ্প দিয়া শত্রুকে বিপন্ন করা—লোকক্ষয় করা প্রথা হইয়াছে। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধে প্রথম গ্যাসের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর আবিসিনিয়া অধিকার-কালে ইটালীয়ানরা ব্যাপক ভাবে বিষবাষ্পের ব্যবহার করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধেও কখন্ উহার ব্যবহার আরম্ভ হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই গ্যাসরোধক মুখোসের প্রচলন হইতেছে। জার্ম্মাণী জেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের সময় হইতেই বৃটিশ সরকার বিমান-বাহিনী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস-মাস্‌ক বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না, আপেল হইতে যে গ্যাস স্বভাবতঃ বাহির হয়, তাহা গোলাপের পাতার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। সেই জন্য গোলাপ গাছ পত্রহীন করিতে হইলে কতকগুলি আপেল ও গাছগুলি এক ঘরে রাখিয়া উহার দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ঘরের তাপ একটু অধিক হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে ৪ দিনে গোলাপ গাছের সব পাতা ঝরিয়া পড়ে। একটি একটি করিয়া পাতা ছিঁড়িবার সময় ও শ্রম হইতে এইরূপে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

পথের উপকরণ—লবণ

এ দেশে শর্করা শিল্পের বিস্তৃতি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিটা-গুড়ের ব্যবহার-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, রাস্তার উপকরণরূপে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। চিটাগুড় একরূপ বিনামূল্যেই পাওয়া যাইতে পারে—সুতরাং তাহা ব্যবহার করিলে রাস্তা রচনার ব্যয়ও অল্প হয়। সংপ্রতি কানাডা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তথায় রাস্তা-প্রস্তুতের কার্য্যে লবণ ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। কাদার সহিত লবণ মিশাইয়া রাস্তায় ব্যবহার করা হইতেছে এবং তাহাতে রাস্তা দৃঢ় হইতেছে। বিমান-বন্দর প্রভৃতি যে সব স্থানে রাস্তার দৃঢ়তা অধিক প্রয়োজন, সে সব স্থানে লবণ-মিশ্রিত কর্দ্দম ব্যবহারে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইতেছে। ট্রান্স-কানাডা বিমান-বন্দরগুলিতে এই উপকরণের ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার পর সাধারণ রাজপথ রচনায়ও এই উপকরণ ব্যবহৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। লবণের মূল্য নামমাত্র—শুল্কের জন্যই উহার মূল্য বর্দ্ধিত হয়।

বিবিধ শিল্পে দুগ্ধের প্রয়োগ

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে আহার গ্রহণ করে অথবা করিতে পারে, সকলেই জানেন, তাহা দুগ্ধ। সকল স্তন্যপায়ী জীবের পক্ষেই ইহা সাধারণ সত্য। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীব কিছুদিন পরে দুগ্ধ পান ত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষার উপযোগী আমিষ বা নিরামিষ খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করিতে অভ্যস্ত হয়। মানব কিন্তু বহুবিধ আহার্য্য দ্রব্যে ক্ষুন্নিবারণ করিতে পারিলেও দুগ্ধপানে সম্পূর্ণরূপে বিরত হয় না। মানব-শিশু মাতৃদুগ্ধ অধিক দিন পায় না বটে, কিন্তু সভ্যতার আদি যুগ হইতে মানবগণ পশুপালন-বিদ্যা আয়ত্ত করায় বিভিন্ন জাতীয় স্তন্যপায়ী পশুর দুগ্ধ সংগ্রহ করা তাহাদের সহজসাধ্য হইয়াছে। এই সকল প্রাণীর মধ্যে গো এবং মহিষ প্রধান; কিন্তু অন্যান্য বহু প্রাণী—যথা গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ, উষ্ট্র, এমন কি, বন্য হরিণ (যেমন Rein deer অর্থাৎ 'বল্‌গা হরিণ') দেশবিশেষে মনুষ্যকে দুগ্ধদানে পরিপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, দুগ্ধ এত কাল ধরিয়া আহার্য্যদ্রব্য বলিয়াই পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে, এবং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য—খাদ্যসমূহের মধ্যে একান্ত বিরল।

বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির সহিত এক দিকে যেমন কৃত্রিম উপায়ে স্বভাবজ দ্রব্যের অনুরূপ বা পরিবর্ত্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, অন্য দিকে সেইরূপ অনেক স্বভাবজ দ্রব্যের নব নব ব্যবহার-প্রণালীও আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং এখনও এই আবিষ্কারের বিরাম নাই। দুগ্ধের সার্থকতা এখন কেবল বিভিন্ন আহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনেই নির্ভর করিতেছে না; অধিকন্তু ইহা কয়েক প্রকার শিল্পের উপাদানেও পরিণত হইয়াছে। বিগত ২৫ বৎসরের মধ্যে মানবের অনেক প্রয়োজনীয় ও সৌখিন দ্রব্যও রূপান্তরিত দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ঐরূপ দ্রব্যের সংখ্যাও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুগ্ধের এইরূপ নব নব প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

কেসিন প্রস্তুত-প্রণালী

সকল প্রকার দুগ্ধেরই উপাদান বিশ্লেষণ করিলে প্রধানতঃ প্রতীদ, বসা, শর্করা, লবণ ও জলই পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রতীদ বা নাইট্রোজেনমূলক অংশই বর্ত্তমানকালে সমধিক মাত্রায় বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োগ করা হইতেছে। বিশেষভাবে প্রস্তুত দুগ্ধ-প্রতীদের নাম 'কেসিন্' (Casein); কিন্তু ইহা ছানারই রূপান্তর মাত্র। মাঠা-তোলা দুধ ও ঘোল হইতে ইহা প্রস্তুত করা হয়, এবং উক্ত পদার্থদ্বয় হইতে মোটের উপর শতকরা ৩ ভাগ কেসিন্ পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে 'সেন্‌ট্রিফুগাল' (Centriphugal) যন্ত্রের সাহায্যে দুগ্ধ হইতে বসা অর্থাৎ মাখন বাহির করিয়া লওয়া হয়। দুগ্ধের সেই মাঠা-বর্জ্জিত অংশ 'মাঠা-তোলা দুধ' বা Skimmed milk নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করিয়া মন্থন-দণ্ডের সাহায্যে সেই দধি হইতে মাখন তুলিয়া লওয়া হইলে যে তরল পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই যে ঘোল, ইহা সকলেরই সুবিদিত; ইনি ইংরেজের ভাষায় Butter milk নামে ধন্য হইয়াছেন। এই উভয় প্রকার বসাবর্জ্জিত দুগ্ধ হইতেই কেসিন পাওয়া যায়। দুই প্রণালীতে কেসিন প্রস্তুত হইয়া থাকে; একটি প্রণালী অম্ল-সংযোগমূলক, অন্যটি রেণেট-সংযোগমূলক এবং উক্ত উভয় প্রণালীতে প্রস্তুত কেসিনকে যথাক্রমে Acid Casein এবং Rennet Casein আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

অম্ল-কেসিন প্রস্তুতে প্রথমে মাঠাতোলা দুগ্ধ বা ঘোলকে ৯৪-৯৬° ডিগ্রি ফারেণহিট পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে ১ ভাগে ৭ ভাগ জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিন বা সলফিউরিক অম্ল সংযোগ করা হয়। ইহার ফলে কেসিন পৃথক্ হইয়া অধঃস্থ হয়।

উক্ত অধঃপাতিত কেসিনকে জলে ধৌত করিয়া উহা হইতে Maltosh অংশ নিঃসারিত করা হইলে পুনর্ব্বার উহাকে সোডা-কার্ব্বনেট দ্রাবণে গলাইয়া লওয়া হয়। ল্যাক্টিক-অম্ল সহযোগে পূর্ব্বোক্ত দ্রাবণ হইতে আবার কেসিনকে পৃথক্ করিয়া উহা জলে ধৌত করিবার পরে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিলেই সাধারণ বা অম্ল-কেসিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুভ্র চূর্ণাকারে সাধারণতঃ ইহা বাজারে আমদানী হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট কেসিনের বর্ণ মলিন এবং পীতাভ শুভ্র।

রেণেট-কেসিন-প্রস্তুতের প্রণালী কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। যে উৎসেচক পদার্থ দুগ্ধে সংযোজিত করিলে পনীর উৎপন্ন হয়, তাহাই রেণেট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মাঠা-তোলা উক্ত দুগ্ধের প্রতি শত গ্যালনে দেড় আউন্স মাত্রায় রেণেট মিশ্রিত করিয়া উহাকে কিছুকাল অবিচলিত অবস্থায় রাখিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে সবটুকু কোসন চাপ বাঁধিয়া তলায় পড়িয়া যায়। তখন তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। উহা কাটিবার জন্য লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য ধাতুর বা কাঠের ছুরী ব্যবহার করিতে হয়। খণ্ড খণ্ড ভাবে সংগৃহীত কেসিন অতঃপর ধৌত করিয়া চাপ দিয়া তাহা হইতে জল বাহির করিয়া ফেলিয়া শুষ্ক করা হয়।

সাধারণতঃ, এক মণ মাঠাতোলা দুধ বা ঘোল হইতে আধ সের পরিমাণ শুষ্ক কেসিন পাওয়া যায়। ইহার প্রস্তুতকারকগণ আজকাল নানা স্থানে বিভিন্ন প্রণালীতে কেসিন প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু এই সকল প্রণালী পূর্ব্বোক্ত মূল প্রণালীরই প্রকার-ভেদ মাত্র।

ক্ষারেট ও অম্ল-কেসিনের গুণেরও পার্থক্য আছে, এবং উহারা বিভিন্ন প্রকার শিল্প-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর কেসিন স্থূল দানাযুক্ত, সোডা দ্রাবণে অদ্রবণীয়, এবং অল্প পরিমাণ সোহাগা কিম্বা অ্যামোনিয়া-জলে দ্রবণীয়। প্লাষ্টিক-প্রস্তুতে ইহারই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। শিল্পকার্য্যে প্রয়োগের জন্য সাধারণতঃ কেসিনের যে বিশেষ গুণের সুযোগ গ্রহণ করা হয়, তাহা উহার অম্ল-ধর্ম্ম। এই গুণেই ইহা অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার 'Caseirate' উৎপাদন করে। কাচকড়া (celluloid) বা কাষ্ঠসার (cellulose) জমির (base) সহিত এইরূপ কেসিনেট মিশ্রিত করিয়া 'প্লাষ্টিক' শ্রেণীর দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান কালে প্লাষ্টিকের সাহায্যে শিল্পজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কতিপয় শিল্প—কাচ, চিনামাটি, ধাতু, কাঠ বা অন্যান্য স্বভাবজ উপাদানের পরিবর্ত্তে প্লাষ্টিক ব্যবহৃত হইতেছে। কেসিন-মূলক প্লাষ্টিক কল হইতে চাদর বা দণ্ডের (rod) আকারে বাহির হইয়া থাকে। ঐ সমুদয় সহজেই করাত দিয়া কাটা বা রেঁদা দিয়া চাঁছা-ছোলা করা যায়, এবং অন্যান্য উপায়ে উহা যে কোন আকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অধিকন্তু, ইহা কাঁচ-কড়ার ন্যায় সহজদাহ্য (inflammable) নহে। যে প্লাষ্টিকে যত অধিক পরিমাণে caseinate থাকে, সহসা তাহাতে আগুন ধরিবার সম্ভাবনা তত অল্প। এই সকল কারণেই বিভিন্ন শিল্পে কেসিনের ব্যবহার দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ সন্নিবিষ্ট করিতেছি।

রং, বার্নিস ও আঠা

আজকাল অনেক স্থলে রং ও বার্নিসে কেসিন ব্যবহৃত হইতেছে। কোন জিনিষের ভিতর ও বাহির, উভয় দিকেই এতদ্বারা রং করা চলে। ভিতরের রং চূণ ও অ্যামোনিয়া সহযোগে প্রস্তুত হয়। বহির্ভাগের রঙের জন্য কেসিনের সহিত চূণ ও ডিম্বের শ্বেতাংশের মিশ্রণই প্রশস্ত। ইহাতে অল্প পরিমাণ formaldehyde মিশাইলে রং আবহাওয়াসহ হয়; আবার তিসি বা টুং তৈল ও Titanium oxide এর সংমিশ্রণ-ফলে দীর্ঘকালেও বর্ণের বিকৃতি ঘটে না।

খুব শক্ত আঠা, সিরিষ, সিমেণ্ট ইত্যাদি প্রস্তুতেও কেসিনের ব্যবহার অল্প নহে। Plywood নামক যোড়া দেওয়া কাঠ এখন আসবাব-পত্র ও আধারাদি নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে; অধিকাংশ স্থলেই উহা কেসিনের আঠা দ্বারা গ্রথিত। কেসিন ব্যতীত অ্যামোনিয়া ও সোহাগা এইরূপ আঠার অন্যান্য উপাদান। কেসিনের সহিত বালি ও চূণ মিশ্রিত করিয়া যে সিমেণ্ট প্রস্তুত করা হয়, তাহা অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে।

কাগজ, কাপড় ইত্যাদি

নানা প্রকার সুরঞ্জিত সৌখীন ও আর্টপেপার, বিশেষতঃ যাহাতে উৎকৃষ্ট ছবি বা ফটো ছাপা হয়, সেগুলি প্রধানতঃ কেসিন হইতে প্রস্তুত। আর্ট-বোর্ড ও আইভরি-কার্ড মসৃণ ও চকচকে করিবার জন্য কেসিনের প্রয়োগ অপরিহার্য্য। শেষোক্ত প্রকারের জন্য কেসিনের সহিত কর্কের গুঁড়া মিশ্রিত করা হয়। কেসিন-জাত কাগজ সহজে ছেঁড়ে না, এবং উহা সাধারণ কাগজের অপেক্ষা জল ও অগ্নির প্রভাব অধিক সহ্য করিতে পারে। কাগজের উপর ফরম্যাল্ডি-হাইডযুক্ত পর্দ্দা দ্বারা নকল চামড়ার ন্যায় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্লাষ্টিক

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—কেসিনজাত প্লাষ্টিক বহুবিধ শিল্প-দ্রব্যের উপযোগী। সেলুলয়েডের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলেই কেসিন ব্যবহৃত হয়। নকল শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত এবং তাহা হইতে সংগঠিত দ্রব্যাদিরও মূল উপাদান কেসিন। বোতাম, পেনসিল, এমন কি, নকল বহুমূল্য প্রস্তর যথা amber jade প্রভৃতিও এখন কেসিন হইতেই প্রস্তুত হইতেছে। মোটর-গাড়ী ও বিমানের কোন কোন অংশ নির্ম্মাণেও কেসিনের উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেসিনে উচ্চাঙ্গের পালিশ সম্ভবপর, এবং ইহা যে কোন বর্ণে সহজে রঞ্জিত হইতে পারে। নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুতে কেসিন প্রয়োগে এইরূপ সুবিধা হইয়া থাকে।

কৃত্রিম পশম

কৃত্রিম পশম উৎপাদনের উপাদানরূপেই এখন কেসিনের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কিন্তু দ্রুত-বৃদ্ধিশীল ব্যবহার। ইটালী দেশীয় কোন রাসায়নিক ইহা প্রথমে আবিষ্কার করেন। ৪।৫ বৎসর মাত্র ইহা ব্যবসায়িক মাত্রায় উৎপাদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই এই Synthetic wool বা Lanital যে ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহাতে অনুমান হয়, কৃত্রিম রেশমের ন্যায় ইহাও অদূরভবিষ্যতে তন্তুজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদির বাজারে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের Burnen of Dairy Industryতেও ইহা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কেসিন-প্রস্তুত ও কয়েক প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা উহা শোধন করিয়া একরূপ ঘন চট্‌চটে কেসিন-দ্রাবণ প্রস্তুত করা হয়। উক্ত দ্রাবণ রেয়ন বা কৃত্রিম রেশমদ্রাবণের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে চালাইয়া তন্তু বা সূতা তৈয়ারী করা হয়। ফলতঃ, দ্রাবণ প্রস্তুতের পর হইতে কৃত্রিম রেশম ও পশম প্রস্তুতের এত অধিক সাদৃশ্য বর্ত্তমান যে, একই কলে উভয় বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে।

স্বভাবজ পশমের ন্যায় কৃত্রিম পশমও কোমল এবং গরম। ইহার উপাদানের মধ্যে সামান্য পরিমাণে গন্ধক থাকায় ইহার তাপ-সংরক্ষণের শক্তি বরং কিছু অধিক। স্বভাবজ পশমের সঙ্গে ইহার প্রভেদ এই যে, ইহা ঐরূপ খরখরে (kinky) নহে। খরখরে কৃত্রিম পশমও অবশ্য প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু মসৃণ পশমের মত উহা উচ্চ গুণসম্পন্ন হয় না। বস্তুতঃ, কৃত্রিম পশমের কয়েকটি বিশিষ্ট গুণ আছে, স্বভাবজ পশমে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রথমতঃ, গায়ে কুটকুট করে না বলিয়া কৃত্রিম পশমজাত পরিচ্ছদ খালি-গায়ে (next to skin) ব্যবহার করিতে অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কাচিলে সাধারণ পশমের মত সঙ্কুচিত হইয়া ইহার আয়তন হ্রাস হয় না; তৃতীয় সুবিধা এই যে, নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুতের উপযোগী করিবার জন্য ইহার তন্তু হ্রস্ব দীর্ঘ বা সরু মোটা করিয়া লওয়া যায়।

খাদ্য, ঔষধ ও প্রসাধন-দ্রব্যাদি

দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ছানা অত্যন্ত পুষ্টিকর পদার্থ; কেসিনও তদ্রূপ খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। বিশেষ প্রণালীতে শোধন করিয়া এবং ইহার শরীর-পোষক গুণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাকে সহজপাচ্য খাদ্যে পরিণত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে যে সকল বলকারক পেটেন্ট খাদ্য প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাদিগের অধিকাংশেরই প্রধান উপাদান কেসিন। রৌপ্য, খটিক, বিস্মাথ ইত্যাদির কেসিনেট সমূহ এখন ঔষধে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রসাধন-দ্রব্যাদি প্রস্তুতেও কেসিনের ব্যবহার অল্প নহে। অনেক বহু-বিজ্ঞাপিত নর-নারীর অঙ্গরাগ-প্রসাধন চূর্ণ (Powder) এবং লেপ (cream, snow) মূলতঃ কেসিন হইতেই প্রস্তুত থাকে। Stearic acid-ঘটিত সম-প্রকারের দ্রব্য অপেক্ষা কেসিনজাত প্রয়োগরূপ-সমূহ (preparations) চর্ম্মের পক্ষে অধিক উপকারী বলিয়া উহাদের প্রস্তুতকারকগণ দাবী করিয়া থাকেন। তাহা যে সম্পূর্ণ অহেতুক, একথা বলা যায় না। কারণ, পূর্ব্বে দুগ্ধ ও নবনী চর্ম্মের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইত, এবং এখনও সম্ভ্রান্ত হিন্দুর গৃহে ও বহু জাতির মধ্যে সে প্রথা বর্ত্তমান।

দুগ্ধজাত শিল্প-উপাদানের ভবিষ্যৎ

প্রকৃত আহার্য্য দ্রব্য ব্যতীত দুগ্ধ হইতে Lactic acid, Sugar of milk প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যও প্রস্তুত হয়। কিন্তু এস্থলে কেসিনের উপরই আমাদিগের বিশেষ লক্ষ্য প্রদানের কারণ এই যে, ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক শিল্পে ইহার ব্যবহার বিস্তার লাভ করিতেছে, এবং ভারতে ইহা ব্যাপক ভাবে উৎপাদনের অনেক সুবিধা আছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় এদেশে কেসিন প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছিল এবং এখনও সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, এবং তাহার গুণও নিকৃষ্ট। চেষ্টা করিলে সুলভে বিলাতী কেসিনের তুল্য কেসিন উৎপাদন করা অসম্ভব নহে।

কিছু দিন পূর্ব্বে সরকারের অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা ত্রিশ কোটির কম নহে। ইহা পাশ্চাত্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পশু-সম্পদশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশু-সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। খাদ্যাভাবে শীর্ণ-দেহ দেশীয় গরু অতি অল্প দুগ্ধ প্রদান করে; তথাপি বিশেষজ্ঞ Dr. Wright অনুমান করেন যে, ভারতে বার্ষিক ৭০ হইতে ৮০ কোটি মণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। গ্রেট বৃটেন ও ডেনমার্কের তুলনায় ইহা যথাক্রমে ৪ গুণ ও ৫ গুণ অধিক। ভারতোৎপন্ন এই বিপুল পরিমাণ দুগ্ধের শতকরা ৯৮½ ভাগ দেশীয় প্রথায় অর্থাৎ পানীয় দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, ঘোল ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হয়। বিলাতী প্রথায় মাখন তোলা হয় না বলিয়া Skimmed milk এদেশে অল্প। কিন্তু দধি হইতে মাখন তুলিয়া ঘৃত প্রস্তুতের ব্যবস্থা এদেশে অত্যন্ত সাধারণ, এজন্য ঘোলের অভাব নাই, এবং তাহা সুলভ। এদেশের বহু পল্লী অঞ্চলে ক্রেতার অভাবে গৃহস্থের অতিরিক্ত ঘোল অকারণে নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং ঘৃত প্রস্তুতের আনুসঙ্গিক কার্য্যরূপে কেসিন প্রস্তুত একটি গ্রাম্য-শিল্পরূপে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই পুষ্টিলাভ করিতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এখন বৎসরে প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড কেসিন প্রস্তুত হইতেছে। জগতের অন্যান্য সুসভ্য দেশও এ বিষয়ে ঔদাসীন্য নাই। এদেশে দুগ্ধ উৎপাদনের মাত্রা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা ভরসা দিতেছেন। সেই পরিকল্পনার মধ্যে কেসিন উৎপাদন স্থান পাইলে একটি প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। দেশ-বাসিগণও ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারেন; কারণ, ঘোল হইতে কেসিন প্রস্তুতের ব্যবস্থা বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে, এবং উৎপাদিত কেসিনকে ভিত্তি করিয়া এদেশে কয়েকটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিবারও অবকাশ আছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

সন্ধান

আপন দীনতা-ভারে যেবা
সঙ্কুচিত আপনার কাছে,
সদা চাহে লুকায়ে থাকিতে
কেহ তারে দেখে ফেলে পাছে!

দু'নয়নে ক্লান্তিভরা দিঠি
কণ্ঠস্বরে ক্রন্দন জড়ানো,
অপরের নয়নের পানে
চাহে আঁখি সরম-মাখানো!

ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস বহে
কারণ শুধালে নাহি কয়,
জেনো তারই জীবনের রণে
হইয়াছে ঘোর পরাজয়।

শ্রীনিভা দেবী

জীবন-বীণা

বিয়ের পর থেকেই সংসার সম্বন্ধে প্রণতির ধারণাটা একটু একটু ক'রে বদ্‌লাতে লাগলো। এত দিন যে স্বপ্ন ও কল্পনার রাজ্যে সে বাস ক'রে এসেছে, সেটা যে সংসারের আসল মূর্ত্তি নয়, এ সত্য অনেকখানি আঘাত-বেদনার ভিতর দিয়েই তার উপলব্ধি হ'লো। যে বাড়ীতে প্রণতির বিয়ে হয়েছিল সেই বৃহৎ পরিবারে এসে নিজের কথা তাকে ভুলে যেতে হ'লো; সংসারে আরও পাঁচ জনের প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে, সে-কথাটা মুহূর্ত্তের জন্যও সেখানে তার বিস্মৃত হ'বার উপায় ছিল না। পিতার সংসার ছোট না হ'লেও তার তুলনায় এ যেন হাট! শ্বশুর, ভাশুর, স্বামী, দেবর, ননদ, ভাগ্‌নে, ভাগ্‌নী ও অন্যান্য পোষ্য তো আছেই, তা' ছাড়া গরু বাছুর, হাঁস, কুকুর, বিড়াল, ময়না, শালিক প্রভৃতি পালিত পশু-পক্ষীরও অভাব নাই। এজন্য সমস্ত বাড়ীটাতে যেন শ্বাস গ্রহণের মত পর্য্যাপ্ত স্থানের অভাবও সে প্রথম প্রথম অনুভব করতো।

তার পিতা পশ্চিমের কোন সহরে সরকারী কাজ করেন। বদলীর চাকরী, দু'পাঁচ মাস পরেই ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে অন্য জায়গায় সংসার পাততে হয়; এজন্য সুযোগের অভাবে একটু বেশী বয়সেই প্রণতির বিয়ে হ'য়েছিল। কিন্তু স্বামীর বয়স তার চেয়ে দেড়গুণ বেশী। গৃহিনীশূন্য সংসারের জন্য বয়স্থা মেয়েই খুঁজছিলেন, এজন্য প্রণতিকে পেয়ে সকলেই খুসী হলেন। খোট্টার দেশের খোট্টা ঝি চাকর ও অবাঙ্গালী প্রতিবেশীদের দেখে দেখে প্রণতিদের বাড়ীর সকলে বাঙ্গালীর মুখ একরকম ভুলেই গিয়েছিল; তাই বাঙ্গালা দেশে আসতে পেরে সে খুসী হ'লো। কিন্তু সে পশ্চিমে থাকায় এত সব গাড়ী, ঘোড়া, জনসমাগম দেখতে পেতো না। এত কাল আপন-ভোলা বাপের কাছে থেকে, পৃথিবীর সকল লোককে সে তার বাবার মত সদাশিব ব'লেই ধারণা ক'রে রেখেছিল। ক্রমশঃ তার ভুল ভাঙ্গতে লাগলো।

গান-বাজনার সখ ছিল ব'লে বিয়ের আগে প্রণতি ওস্তাদের কাছে নানা রকম বাজনা শিখেছিল ও গীতবাদ্যের চর্চ্চাতেই বেশী সময় কাটিয়ে দিত। শ্বশুরবাড়ী এসে সে-সব শিক্ষা তার কোন কাজেই লাগলো না! এত বড় সংসারের ছোট বড় সকল কর্ত্তব্য শেষ ক'রে নিজের জীবনের কথা ভাবতে বসলে এক এক সময় প্রণতির মন দুঃখে খুবই অভিভূত হ'তো; কিন্তু সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবতো, মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছার আর মূল্য কি? তবে এই ভেবে সে সান্ত্বনা লাভ ক'রতো যে, সাংসারিক লোকের হিসাবে মোটামুটি সে সুখেই আছে। মার কথা তার প্রায়ই মনে পড়ে। মা ব'লতেন, মেয়েরা তো যন্ত্র, যেখানে যে হাতে তাকে যেমন-ক'রে বাজাবে, সেইখানে তাকে তেমনি-ক'রেই বাজ্‌তে হবে। অবশ্য, এরকম সান্ত্বনায় মন যে খুব শান্ত হ'তো তা নয়, তবে এ ছাড়া ত উপায় ছিল না। আর প্রত্যেক মেয়েকেই যে তার জীবন নূতন-ক'রে গড়ে' নিতে হয় এ তো তার জানাই আছে।

প্রণতি যে কল্পনার স্বর্গ রচনা ক'রে রেখেছিল, সংসারে ক্রমাগত আঘাত পেয়ে দেখলো, বাস্তবের সঙ্গে তার একটুও মিল নেই! চিন্তা করবার অবসরও তার বেশী ছিল না; ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত এক মিনিটও তার একলা থাকবার সুবিধে

নেই। এ বলে, "বৌদি' আমার তোয়ালেটা একটু খুঁজে দাও তো।" ও বলে, "মামীমা, ঠাকুরকে একটু তাড়া দাও না, আমার কলেজের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে যে।" কেউ বলে, "কাকীমা, খাবার-টাবার যা হয় আনিয়ে রেখো, কিন্তু সাড়ে-চারটার মধ্যেই আমার চা চাই।" শাশুড়ী নেই। খুড়ীমা, পিসীমার অভাব না থাকলেও নূতন জায়গায় সঙ্কোচ কাটতে-না কাটতেই নানান ঝঞ্ঝাট তাকে ঘাড়ে নিতে হয়েছে। সকলের নানা রকম অনুযোগ অভিযোগও শুনতে হয়।

প্রথম প্রথম অনভ্যস্ত হাতে সকলের ফরমাস খাটতে গিয়ে পদে পদে তাকে হোঁচট খেতে হ'তো। পিস্‌শাশুড়ী মুখ বাঁকিয়ে বললেন, "ওমা ওকি বউ! তাম্রবর্ণ বেলপাতায় যে পূজো হয় না, হিঁদুর মেয়ে-হ'য়ে এ কথা কি কক্ষনো শোননি? কি লজ্জার কথা! তোমার মা তোমায় এ-সব পূজো-আচ্চার কাজ শেখানোর দরকার নেই ভেবেছিল বুঝি? তা' তাই যদি তার মনে ছিল, তা' হ'লে কোন ব্রহ্মজ্ঞানীর ঘরে তোমাকে পার কল্লেই তো পারতো।" প্রণতি কোন-রকমে নিজের ত্রুটি শুধরে নিয়ে বললো, "আমার ভুল হ'য়ে গেছে, পিসীমা! আমি এক্ষুণি বদলে এনে দিচ্ছি।" কোন দিন হয় ত দেওরদের সেক্সপীয়রের কবিতার আবৃত্তি চল্‌ছে, সে সেই কবিত্ব উপভোগ করছে;—আড়াল থেকে তা লক্ষ্য ক'রে খুড়ী-শাশুড়ীর সুতীক্ষ্ণ কটু মন্তব্য ভেসে আসতো, "মাগো, বৌ যেন একেবারে ধিঙ্গী! লজ্জা সরমের বালাই নেই, দিবে-রাত্তির কেবল পুঁথি-ঘাঁটা! মর বেটী, কেতাব নিয়েই যদি দিন কাটাবি ত ঐ সব নিয়ে পণ্ডিত বাপের কাছে থাকলেই পারতিস্। এ সংসারে এসেছিস কেন ম'রতে?"

প্রণতি অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ ক'রে স'রে আসতো। আবার কোনো দিন হয়তো ভাগ্‌নী বা ননদের পীড়াপীড়িতে সেতারটার ধূলো ঝেড়ে নিয়ে তা বাগিয়ে ধ'রে একটুখানি বাজাতে সুরু করেছে, খুড়ী শাশুড়ী, পিস্‌-শাশুড়ীর দল অমনি মুখ-বেঁকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "মাগো, কি ঘেন্না! গেরস্ত-ঘরের বউ-ঝির আবার গান বাজনার সখ! তখনই তো বলেছিলাম—একে খোট্টার দেশের মেয়ে, তাতে পাকা বাঁশ, এ তো কাঁচা কঞ্চি নয় যে, ইচ্ছেমত নুইয়ে নোবো, তা কারো কোন কথাই তো শুনলেন না।"

প্রণতি তাড়াতাড়ি উঠে এলো। মেয়ের দল অপ্রতিভ হয়েছিল অবশ্য সবাই, কিন্তু লজ্জায় প্রণতির যেন একেবারে মাথা কাটা গেলো। তার পর থেকে আবার নিয়মিত ভাবে সেতারের সর্ব্বাঙ্গে ধুলো জমতে লাগলো এবং বেহালাটা অযত্নে ঘরের কোণে প'ড়ে-থেকে আবর্জ্জনার স্তূপ বাড়িয়ে তুললো। নিজের ঘরে ফিরে এসে প্রণতি চোখ মুছে ভাবলো, সত্যি তারই তো অন্যায়, তবু ও যে তা'র আজন্মের অভ্যাস। আর দেওর ননদদের সঙ্গে ভাই বোনদের মতো ব্যবহার ক'রতেই তো মা তাকে ব'লে দিয়েছিলেন; এখানে যে লজ্জা ক'রতে হয় তা তো কেউ তাকে শিখিয়ে দেয়-নি! ভাগ্যবিড়ম্বনায় তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ—তাই কি সকলের কাছে প্রতিপন্ন হ'তে থাকবে বারংবার? প্রণতির শ্বশুরের কাণেও যায় এসব কথা। সন্ধ্যাবেলা প্রণতিকে নিজের ঘরে ডেকে তিনি বলেন, "গৃহস্থালী করাই হিন্দুর মেয়েদের আসল ধর্ম্ম। তোমার বাবা-মা হিন্দুঘরেই তোমার বিয়ে দেবেন ব'লে যখন ঠিক ক'রেছিলেন, তখন মিছি-মিছি লেখাপড়ায় আর গান-বাজনায় অযথা তোমার সময় নষ্ট ক'রে সুবিবেচনার পরিচয় দেন্‌নি। আমার ইচ্ছে—এখন থেকে এদিকে মন দিয়ে এতদিনকার সব ত্রুটি সংশোধন ক'রে নেবে তুমি, বৌমা!"

প্রণতি নিরুত্তর হ'য়ে নতমুখে ফিরে গেলো। তার বাপ-মা অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন, এই জন্যই ছেলেমেয়েদেরও শিক্ষার কোনো ত্রুটি ঘটতে দেননি; কিন্তু এ বাড়ীতে এসে মেয়েদের জীবনে বিদ্যার যে কোনো প্রয়োজনই নেই, প্রায় প্রত্যেককেই তার জীবন যে অপরের ইচ্ছা-নুসারে পরিচালিত ক'রতে হয়, এবং নিজেদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার যে কোন মূল্যই নেই, এই সত্যটা সে যেন প্রত্যহ নতুন ক'রে অনুভব ক'রতে লাগলো। বিয়ের পর সে ভেবেছিল, লেখাপড়ার চর্চ্চাটা একেবারেই ছেড়ে না দিয়ে অন্ততঃ অবসর সময়টুকু ওটার সদ্ব্যবহার ক'রবে। কিন্তু ক্রমশঃ সে বুঝতে পারলো, এ শুধু অসম্ভবই নয়, এ বাড়ীতে ওটা অমার্জ্জনীয় অপরাধও বটে! বাবার ওপর অভিমান হওয়ায় প্রণতির চোখে জল এলো।

পড়াশুনার ইচ্ছা যে তার বরাবরই ছিল, তা তিনি তো জানতেন। বিয়ের আগে আরো কিছু-দূর পড়বার আকিঞ্চন সে-ও জানিয়েছিল। তখন প্রণতিকে তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন "মা, পড়াশোনাটা র‍্যাডিসনাল। প্রত্যেক মেয়েকেই একদিন সংসার ক'রতে হয়; তুমিও আমাদের অবাধ্য হবে না, এইটুকুই আমরা তোমার কাছে আশা করি। তা'ছাড়া তোমার এবং আমাদের ইচ্ছানুসারে কিছুদূর তো এগিয়েছ, বাকীটুকু তুমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সবই যে আকাশকুসুমের মত শূন্যে মিলিয়ে যাবে, তখন কি সে তা জানতো? প্রণতির অভিমানী চিত্ত নিজের দুঃখ চাপা দিয়ে রাখতেই চিরদিন অভ্যস্ত ছিল; তাই এ সমস্ত নিয়ে বাপ-মার কাছে কখনো সে কোনো অভিযোগ ক'রবে না ঠিক ক'রেছিল। এখানে আস্‌বার সময় যে সব বই সে সঙ্গে এনেছিল, একদিন আবার সেগুলি বাক্সের ভেতর সমস্ত কাপড়-জামার নীচে চাপা দিয়ে রেখে, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—ভেবেছিল নিজেকে সে সংসারের ভেতর একেবারে ডুবিয়ে দিতে পারবে না কেন?

শ্বশুরের আদেশ নীরবে মেনে-নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে প্রণতি আর একবার মনে মনে সেই প্রতিজ্ঞাই করলো। এর পর অনেক রাতে, সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, কত দিন সে বিছানা থেকে আস্তে আস্তে উঠে আসতো। তার পর বইগুলি বের ক'রে-নিয়ে টেবলের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে, ভোর হওয়ার আগেই সেগুলি আবার যথাস্থানে লুকিয়ে রাখতো। হঠাৎ এক দিন প্রণতির মায়ের মৃত্যুসংবাদ এলো, এবং প্রণতির বাবা এই নিদারুণ শোকে সব ছেলে-মেয়েদের এক জায়গায় ক'রবেন ভেবে তাকেও নিতে পাঠালেন; কিন্তু প্রণতির শ্বশুর তাকে পাঠাতে কোনমতে রাজী হলেন না; ব'লে দিলেন, "মা থাকতেই মেয়ে কোনো রকম শিক্ষা পায়নি; গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে বই এবং বীণা হাতে পেয়েই খুসী! এখন বৌমাকে আমাদের সংসারের উপযুক্ত ক'রে গড়ে নিতে হ'লে বাপের বাড়ী পাঠানো একেবারেই অসম্ভব।"

প্রণতির বাবা মেয়েকে লিখে পাঠালেন, "শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হ'লাম, মা! বিয়ের আগেও তোমাকে বলেছি, এখনো বলছি—সব বিষয়েই সীমার মধ্যে থাকা ভালো। ধারণা ছিল, তুমি বুদ্ধিমতী; আশা করি, নিজেকে এমন ভাবে পরিচালিত ক'রবে, যেন আমাকে আর কখনো মনে কষ্ট পেতে না হয়।"

প্রণতি চোখের জল মুছে ভাবলো, মা থাকলে হয় তো ঠিক এ কথাটি বলতেন না। তাঁর অশিক্ষিত জীবনে স্বামী এবং স্বজন-বন্ধুদের কাছে যে দুর্ভোগটা ভুগতে হ'য়েছিল, তার বেদনা আর' সকলে ভুলে গেলেও তিনি ভুলতে পারেন-নি ব'লেই—মেয়ের জীবনে তার পুনরভিনয় না হয়, সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছিলেন সকল রকম সুযোগ এবং সুবিধা দিয়ে। কিন্তু সংসারের যে আরও একটা রূপ আছে, তাঁর বেদনার্ত্ত হৃদয় হয় ত সে কথা কোন দিনও ভাবতে পারেনি। প্রণতির স্বামী ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ। পারিবারিক কোনো ব্যবস্থায় হাত দেওয়া সম্বন্ধে তাঁর অভ্যাস এবং প্রবৃত্তি দু'য়েরই অভাব ছিল। দিনের অধিকাংশ সময় কাজ-কর্ম্মে বাইরে কাটিয়ে এসে এ সকল অভিযোগ অনুযোগ শুনতে রাজী ছিলেন না ব'লেই বুদ্ধিমানের মত সকলকেই তিনি এড়িয়ে চলতেন। তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি লোক; এজন্য এ সব কথা কেউ তাঁর কাণেও তুলত না। আর প্রণতির মত মেয়েরা যে কাউকে কোন অভিযোগ জানাবে না, সকলেই এ কথা জানতো। রাত্রিকালে সকলের অগোচরে লুকিয়ে লেখাপড়ার চর্চ্চাও তার বেশী দিন চললো না। প্রণতির স্বামী হঠাৎ একদিন তার পাঠানুরাগের কথা জানতে পারলেন। সংসারের কাজ শেষ ক'রে যথাসময়ে সে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ ক'রলে সেই পতি-দেবতাটি প্রণতিকে শুনিয়ে দিলেন, "এ বাড়ীতে যখন এ-সব চলবেই না, তখন অকারণে সকলের সহানুভূতিতে বঞ্চিত হওয়া আমি ভাল মনে করি-নে। আর অত বাড়াবাড়ি ক'রেই-বা লাভটা কি?"—স্বামীর এই কঠোর মন্তব্যের কোন প্রতিবাদ না ক'রে প্রণতি পরদিন থেকেই লেখাপড়ার অভ্যাস ত্যাগ ক'রল। স্বামীর আদেশ তো বটেই, তাছাড়া সারাদিন সংসারের পরিশ্রমের পর রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তিতে শরীরও ক্রমশঃ অচল হ'য়ে উঠেছিল।

আগে মাঝে-মাঝে গভীর রাত্রিতে যখন কি একটা অব্যক্ত বেদনায় প্রণতি বিছানায় প'ড়ে ছট্‌-ফট্‌ ক'রতো তখন সে শয়ন-কক্ষ ত্যাগ ক'রে, তার অনাদৃত ধূলিধূসর সেতারটি সযত্নে হাতে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে ছাতে গিয়ে ব'স্‌তো। নিস্তব্ধ রাত্রির সুগভীর প্রশান্তির মধ্যে তার

সেতারের সুর কি এক অপূর্ব্ব ছন্দে বেজে উঠতো, এবং তার মধুর ধ্বনি দূর-দূরান্তে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে নৈশ স্তব্ধতায় বিলীন হতো। অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তব্ধ আকাশের দিগন্তবিস্তৃত নীলিমার পানে অপলক নেত্রে চেয়ে থেকে যখন সে গোপন হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত ক'রত, তখন সে বুঝতে পারতো, তার অতীত জীবনের অব্যক্ত বেদনা সেই নৈশ প্রশান্তির মধ্যে প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে; কিন্তু লেখা-পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে এই অভ্যাসও ত্যাগ ক'রল। তার সঙ্কল্প হ'লো, নিজের জীবন ভেঙ্গে সে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলবে—যেন তার আজন্মের এ নিত্য-পরিচিত জীবনকে আর কখনো খুঁজে না পাওয়া যায়! এই ভাবে কিছুদিন কাটাবার পর সে সংসারের ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে সত্যই কোথায় একেবারে তলিয়ে গেল!

বছর-চারেক পরে একদিন প্রণতির বাবা মেয়েকে দেখ্‌তে তার শ্বশুরবাড়ীতে উপস্থিত হ'লেন। আসবার সময় প্রণতিকে উপহার দেবার জন্য তিনি কয়েকখানা ভাল বই কিনে এনেছেন দেখে প্রণতি ম্লান হাসিতে ওষ্ঠ রঞ্জিত ক'রে ব'ল্‌ল, "আমি কি এখনও সেই আগেকার মতন ছেলে-মানুষটি আছি, বাবা! দেখছ না, এতো বড় সংসার, শ্বশুর, ভাশুর, তাঁদের সেবাতেই আমি ব্যস্ত; ওসব পড়বার আর আমার সময় কোথায়?"—কথাগুলি সে অত্যন্ত হাল্কা ভাবে বলবার চেষ্টা ক'রলেও কথা শেষ করবার সময় যেন তার কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে উঠলো; তা দমন করা তার অসাধ্য হলো। গলাটা তার কেমন-যেন হঠাৎ ভারী হ'য়ে উঠলো, এবং চক্ষু-দু'টিও অশ্রুভারে যেন ছল‌ছল ক'রতে লাগলো; সেই উচ্ছ্বসিত অশ্রু দমন করা তার পক্ষে কঠিন হ'লো। প্রণতির বাবা তার এই বিচলিতভাব লক্ষ্য ক'রলেন না; তার ব্যথিত হৃদয়ের অভিমানটুকুও ধ'রতে পারলেন না। তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ-হাস্যে ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে ব'সে-থেকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তাহ'লে বেশ সুখেই তো সংসার করচিস্ মা?" প্রণতি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে যেতে ব'লল, "হ্যাঁ বাবা, সুখেই আছি।" সুখে আছি—এ ছাড়া আর কি বল্‌বার আছে? বইগুলি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রতে ক'রতে সে ভাবলো, মিথ্যে মায়ায় এগুলোকে আর জড়িয়ে লাভ কি? তখনি দেওর ননদদের ডেকে সেগুলি বিতরণ ক'রে যেন সে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো; তার পর সংসারের কাজে যোগ দিতে চ'ল্‌লো। দু'-এক দিন পরে প্রণতির বাবা কন্যার নিকট বিদায় নিয়ে নিজের কাজে চ'লে গেলেন। তিনি তাঁর অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির সংসারাসক্তির পরিচয় পেয়ে খুসী হ'লেন বটে, কিন্তু তাঁর মেয়ের এই পরিবর্ত্তন তাঁর এতই অস্বাভাবিক মনে হ'ল যে, বুকের ভিতর তিনি কি যেন একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব ক'রতে লাগলেন; অথচ তার ঠিক কারণটি তিনি আবিষ্কার ক'রতে পারলেন না।

প্রণতি তার সংসারের কাজে ডুবে রইল, আর সংসার তার আবাল্য ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত জীবন হ'তে তার সকল বৈচিত্র্য মুছে ফেলবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হ'ল।

* * * *

পঁচিশ বছর পরের কথা।

এই দীর্ঘকালে প্রণতির সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন হওয়াই স্বাভাবিক, এবং হ'য়েছেও তাই। তার শ্বশুর, এবং গুরুজনদের আরও কেউ কেউ অনেক দিন আগেই সংসারের খেলা শেষ ক'রে পরপারে যাত্রা ক'রেছিলেন। আর যারা সেই সংসারে ছিল, তারাও জীবন-নদীর কূলে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রণতির স্বামী সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তিনিও বছর-দুই আগে প্রণতির হাতের নোয়া ও সিঁথির সিঁদুর ঘুচিয়ে দিয়ে নিত্যধামে চ'লে গেছেন। প্রণতির দুটি ছেলে। ছোটটি এখনো কলেজ ছাড়েনি। বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। অনেক টাকা তার বেতন। গাড়ী, বাড়ী, ধনাঢ্য গৃহস্থের কোন আড়ম্বরেরই অভাব নেই। ইঞ্জিনিয়ার তার মা-বাবাকে প্রায় বছর-পাঁচেক আগে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। প্রণতির মেয়ে একটি; মাস-চারেক আগে কলকাতাতেই তার বিয়ে হ'য়ে গেছে। এতদিন মেয়েটি মায়ের কাছেই ছিল, দিন-কয়েক আগে সে শ্বশুরবাড়ী গেছে। ছেলে-মেয়েরা অত্যন্ত মাতৃভক্ত। মায়ের আদেশ পালনে তাদের বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। প্রণতিও প্রাণপণে ছেলে-মেয়েদের আদর-যত্ন করে। কিন্তু সংসারে কোন অভাব না থাকলেও প্রণতি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল—তার মেয়ে পরাগকে কখনো গান শিখ্‌তে দেবে না। তার সেই অটল প্রতিজ্ঞা কোন দিন ভঙ্গ হয়নি। স্কুল-কলেজে তার শিক্ষাদানেও প্রণতির দারুণ আপত্তি ছিল। পরাগের

চোখের জলেও মায়ের সঙ্কল্প টলেনি। ছেলেরা বিস্তর অনুনয় বিনয় ক'রেও মায়ের অনুমতি না পেয়ে তাঁর অমতেই পরাগকে স্কুলের ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্য্যন্ত রেখেছিল; শেষে তার স্কুলের শিক্ষা শেষ হবার পূর্ব্বেই মায়ের পীড়াপীড়িতে তারা তার বিয়ে দিতে বাধ্য হ'লো। মায়ের এ-রকম অকারণ বিরোধিতায় দুঃখিত হ'য়ে তারা তাঁর এই অদ্ভুত গোঁড়ামীর কারণ জানতে আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছিল, কিন্তু প্রণতি স্পষ্ট কিছু ব'লতো না, কেবল ব'লতো তোদের আর কোনো ইচ্ছাতেই তো আমি বাধা দিইনি, কিন্তু মেয়েকে ভবিষ্যতে যেন আমার মত ভুগতে না হয়, তারই ব্যবস্থা আমি গোড়া থেকে ক'রে রাখতে চাই।

পরাগের সংস্কারগত সুর-জ্ঞান ছিল, এজন্য ভায়েরা বহু-বার মাকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রেছে, সঙ্গীত-চর্চ্চার সুযোগ পেল না ব'লে পরাগ নিজেও বহু অনুযোগ অভিযোগের সঙ্গে এ যুগের মেয়েদের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে; কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হ'য়েছিল। ছেলেরা মায়ের অমতে একটা ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে অন্যটার ওপর আর জোর দিতে সাহস করেনি। পরাগের এক বান্ধবী চমৎকার সেতার বাজাতে পারতো। স্কুলের জয়ন্তী-উৎসবে গীত-বাদ্যের আসরে সে সেতার বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ ক'রেছে দেখে পরাগের সুপ্ত পিপাসা আবার প্রবল হ'য়ে উঠলো। পরদিন থেকে সে স্কুলের ছুটীর পর বান্ধবীর কাছে সেতার শিখ্‌তে লাগলো। মায়ের হাতের গুণ যেন সংস্কার-বশে সে লাভ ক'রেছিল। দুই এক দিনের সাধনায় তার পরিচয় পেয়ে পরাগের বান্ধবী খুশী হ'য়ে ব'ললো,"আমার চেয়েও তোমার হাত মিষ্টি, ভাই! আগামীবার স্কুলের বার্ষিক উৎসবে তোমা-কেই বাজাতে হবে।"—পরাগ বাজাবে কি না ভাবছে, এমন সময় প্রণতি কথাটা জানতে পেরে অত্যন্ত ব্যথিত হ'লো। তার আপত্তি বুঝতে পেরে পরাগ সেতার-বাজানো ছেড়ে দিল; কিন্তু মায়ের ব্যথা কোথায়, তা সে জানতে পারল না। আরও কয়েক মাস পরে বনিয়াদী ঘরের সুপাত্রের সঙ্গে পরাগের বিয়ে হ'য়ে গেলো। বিয়ের পর পরাগ মায়ের কাছে মাস-চারেক ছিল, তার সেই অবসরে স্বামীর অনুমতি নিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা সে দিয়ে ফেললো। শ্বশুর-বাড়ীর মত আছে শু'নে প্রণতিও বিশেষ আপত্তি ক'রলো না। ফল বেরুলে দেখা গেল, পরাগ বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছে। আরো দিন কয়েক থেকে তাকে শ্বশুর-বাড়ী চ'লে যেতে হ'লো। প্রণতি ব্যাকুল হৃদয়ে তাকে নানা রকম উপদেশ দান ক'রলো। নিজের জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতা স্মরণ হওয়ায় তার মন আশঙ্কা ও উদ্বেগে বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। পরাগ মাকে নিশ্চিন্ত থাকতে ব'লে নানা রকমে সান্ত্বনা দিয়ে গেল। কিন্তু বিধাতার বিধান মানব-বুদ্ধির অগোচর! পরাগের পায়ের ধুলো তার শ্বশুরবাড়ীতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার হাওয়াও যেন বদলে গেল!

এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রণতি বারান্দায় ব'সে শুপুরি কাটছিল; জামাই অমিতাভ তার সম্মুখে এসে হাসিমুখে প্রণাম ক'রে সলজ্জ ভাবে বললো, "পত্নীকে বাবা আজ কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে, ও আরো কিছু-দূর পড়ুক।"—প্রণতি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল; বিধাতা সত্যই কৌতুকময়! যাবার সময় অমিতাভ প্রণতিকে তাদের বাড়ীতে যাবার জন্য তার মায়ের পক্ষ থেকে বারংবার অনুরোধ জানালো।

দিন-দশেক পরে প্রণতি ছোট ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে পরাগের শ্বশুরবাড়ী বেড়াতে গেল। তখন সন্ধ্যা অতীত-প্রায়। প্রণতি অন্দরমহলে প্রবেশ ক'রতেই সেতারের সুমিষ্ট সুর তার কাণে যেন মধু-বর্ষণ ক'রলো। সেতার শু'নে সে একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়লো। দোতলায় সিঁড়িতে উঠে সে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। এক পাশে তার ছোট ছেলে, অন্য পাশে অমিতাভ রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়ে সেই পরম তৃপ্তিকর সুর-মাধুর্য্য কাণ পেতে উপভোগ ক'রতে লাগ্‌লো। ঘরের দরজায় গাঢ় বেগুনী-রঙের পর্দ্দা বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে। মাঝখানে একটা ইজি-চেয়ারের ওপর পরাগের শ্বশুর চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন। এক পাশে পরাগের শাশুড়ী একটা বেতের মোড়ায় উপবিষ্ট; পাশে তাঁর ছেলেমেয়েরা কার্পেটের ওপর এখানে-ওখানে আনন্দোদ্ভাসিত মুখে স্থির ভাবে ব'সে আছে। পরাগ শ্বশুরের পায়ের কাছে ছোট একটা গালিচার আসনে ব'সে নিবিষ্টচিত্তে সেতারে ঝঙ্কার দিচ্ছে। তার অনবগুণ্ঠিত মুখে, সুদীর্ঘ মুক্ত কেশদামে টেবিলস্থিত নীল আলোর উজ্জ্বল রশ্মি প্রতিফলিত হচ্ছে। বাজনা থামতেই পরাগের শ্বশুর আবেগ-বিহ্বল স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন, "মা, তোমার বুড়ো ছেলের

অনুরোধ, এই গানটি তুমি আর একবার বাজাও। তোমার হাতের মিষ্টি বাজনা আমি ত আর কোন দিন শুনিনি। অমিতের কাছে শুনেছি, তোমার মাও কোনো দিন শোনেন নি। এ শুনলে তিনি হয় ত ভারী খুশী হবেন।" পরাগের সেতার আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। প্রণতির মনে হ'ল, সে যেন তার অতীতকালের তরুণ জীবনে ফিরে গেছে। ঘরে ব'সে যে সেতার বাজাচ্ছে—ও যেন পরাগ নয়, ও যেন পঁচিশ বছর আগেকার সেই বঞ্চিতা, ক্ষুধিতা, আশাহতা, অভিমানিনী প্রণতি! ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট ঐ সৌম্য শান্ত বৃদ্ধের অকুণ্ঠ আশীর্ব্বচন যে মেয়েটির জীবনে আলোকের স্রোত প্রবাহিত ক'রেছে, সেও যেন তার আদরিণী পরাগ নয়। প্রণতি অমিতাভের মাথায় নীরবে হাত বুলাতে লাগলো। পরাগের সেতার তখন কল-কাকলীতে মুখর হ'য়ে উঠেছে, যেন তা দেবসভার কোন নৃত্যকুশলা নর্ত্তকীর অশ্রান্ত নূপুর-ধ্বনি।

বর্ষার আতটজলপূর্ণ প্রবাহিনীর বীচিবিক্ষোভ-চঞ্চল তরঙ্গের ন্যায় সেই সুর-লহরীতে ভেসে আসছিল কেবলই সেই ধ্বনি—"জাগো সুন্দর, জাগো সুন্দর, জাগো হে জীবন-দেবতা, রিক্ত তবু ভরিয়া-উঠে তব নীরব ব্যাকুলতা।" প্রণতির ঠোঁট কাঁপছে, চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এসেছে। সে মনে মনে বার বার বলছে, "জীবন-দেবতা জাগো! পঁচিশ বছর আগে এক অভাগা মেয়ের যে অর্ঘ্য ধূলায় মিশে ম্লান হ'য়েছিল, আজ আবার তার মেয়ের নন্দিনীর হাত থেকে সেই অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ ক'রে তাকে সুখী কর, তৃপ্ত কর, ধন্য কর।" প্রণতির ছোট ছেলে দুই হাতে মায়ের হাত ধ'রে উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লল, "চলো মা, আজ আমরা এখান থেকেই বাড়ী ফিরে যাই।"

প্রণতি পূর্ণ হৃদয়ে আবেগকম্পিত বক্ষে অন্যের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলো। সে জীবনে কোনও দিন এ আশা ক'রতে পারেনি যে, তার অন্তর্দেবতা তার অন্তরের কামনায় কর্ণপাত ক'রেছিলেন।

শ্রীআশা রায়।

বিস্‌মার্কের স্মৃতি-ফলক

[বিস্‌মার্কের সমাধি-শিলায় ক্ষোদিত]

গুণী সম্রাট উইলহেমের ভৃত্য ছিলাম আমি,
বন্ধু ছিলাম, পুত্র ছিলাম, জানেন অন্তর্য্যামী।
জার্ম্মাণী হ'ল মহিমান্বিত নামের সঙ্গে তাঁরি,
একতা আসিয়া করিল জাতিরে মর্য্যাদা অধিকারী।
ভুবন ভরিয়া সুযশ আসিল, হেথা বাহুল্য বলা,
নূতন জীবন, নব সাহিত্য, নবীন শিল্পকলা।
বিদায়ের কালে মহামনা তাঁর পুণ্য মুরতি স্মরি,
আমি যে তাঁহার ভৃত্য ছিলাম সেই গৌরব করি।

আমার মূল্য তুমি কি বুঝিবে? ধ্বংসের পথে ধাও—
পূজ্য পূজার ব্যতিক্রমেই গূঢ় আনন্দ পাও।
তোমার দম্ভ, আস্ফালন, আর তোমার প্রগল্‌ভতা,
জীবনেও হায় দিয়াছে তাঁহারে মরণ অধিক ব্যথা,
বসুধারে ভালবাসিতে যে হয় জাতিরে করিতে বড়,
নীতিজ্ঞ নয় কপট যে শুধু কলহ বাধাতে দড়।
তুমি ত কেবল কর্ণেতে দেখ, বেষ্টিত চাটুকারে,
কামনা এবং কামান্ কখনো বড় কি করিতে পারে?

সমাধির এই পাষাণ-ফলক বলিছে জাতিরে ডাকি,
করেছি যে কাজ বিচার করিও, অনেক রহিল বাকি।
গড়িয়া তুলেছি বিরাট সৌধ ধন্য নিজেকে মানি,
দিয়াছি জাতিরে নব আদর্শ অভয় আশার বাণী।
অধিক সবল বৃহৎ উজল হউক মোদের ভূমি,
জীবন যেথায় আমি আনিয়াছি, মরণ এনো না তুমি
সমাধির লিপি সজল নয়নে চাহিতেছে বার বার,
আমার দীনতা এ জেনো তোমায় বিধির তিরস্কার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বৈষ্ণবমত-বিবেক

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব

শ্রীবৃন্দাবন তখন ভক্তগণের সমাগমে প্রেমভক্তির মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রধান শাসনকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত বৈরাগ্যের মূর্ত্তি লোকনাথ ও ভূগর্ভ শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য গোবর্দ্ধনের শ্রীগোপালের সেবাইত দুই জন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, সুবিখ্যাত শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী, ইহাদের অন্য এক জ্ঞাতি-ভ্রাতুষ্পুত্র রাজেন্দ্র, ভক্তপ্রবর মধু পণ্ডিত—ইহারাই বৃন্দাবনের মূল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার পর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাদেশপ্রাপ্ত শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। মহাপ্রভুর লীলা-সম্বরণের পর বৈরাগ্য ও ভজন-নিষ্ঠার জীবন্ত প্রতীক স্বরূপ গোস্বামীর প্রিয়তম শিষ্য "গৌড়কায়স্থ-কুলভাস্কর" পরমভাগবত * শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীও তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত; শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, দ্বিজ হরিদাস, উদ্ধবদাস, মাধবাচার্য্য, যাদবাচার্য্য গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য চৈতন্যদাস, গোপালদাস, নারায়ণদাস, পণ্ডিত হরিদাস, কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য গোবিন্দ গোস্বামী, মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস, পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, রাঘব গোস্বামী প্রমুখ প্রভাবী ভক্তবৃন্দ তখন শ্রীবৃন্দাবনধামের অলঙ্কারস্বরূপ বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনধামরূপ শ্রীরাধিকার অন্তঃপুরের দ্বারপালরূপে বৃদ্ধ বর্ষীয়ান্ সুবুদ্ধি রায় তখন মথুরাধামে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীবল্লভ ভট্ট ও তাঁহার গুণবান্ ভক্তপুত্র শ্রীবিঠ্ঠলনাথ গোবর্দ্ধনপর্ব্বত সমীপে গাঠুলিগ্রামে আশ্রম স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। † বিঠ্ঠলনাথ শ্রীচৈতন্যদেবকে নিরতিশয় ভক্তি করিতেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রতিও তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তখনও গৌড়ীয় সম্প্রদায়, বল্লভ-সম্প্রদায়, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধন-ভজন প্রণালীর পার্থক্য ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বা স্বার্থবুদ্ধি পরিলক্ষিত হইত না। মহাপ্রভুর পরমপ্রিয়পাত্র বেঙ্কট ভট্টের সহোদর ভ্রাতা শ্রীসম্প্রদায়ে লব্ধদীক্ষ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গুরু ও পিতৃব্য শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীও ঐ সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন। ইনি উত্তরকালে "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত" "শ্রীবৃন্দাবনশতকং" "শ্রীরাধারসসুধানিধি" প্রমুখ গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ও তৎপ্রদর্শিত সাধনবর্ত্মে তাঁহার অসীম অনুরাগ প্রদর্শন করেন।

যখন শ্রীবৃন্দাবনের গৌরবশ্রী এইরূপ সুপরিস্ফুট, যখন গোবর্দ্ধন-নাথ শ্রীগোপালদেব, শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোপীনাথ ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য প্রকট হইয়া শ্রীবৃন্দাবনকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যখন এই ভক্তিসাম্রাজ্যের অধীশ্বর অনুপমকীর্ত্তি শ্রীরূপ সনাতন প্রেমভক্তি রস ও সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—সেই শুভ সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রকটলীলা সম্বরণ করিয়া তাঁহার অপ্রকট নিত্যলীলায় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন। তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা শ্রীসনাতনকে এই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন; যথা—

> "আমিও আসিতেছি—কহিও সনাতনে।
> আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে।
> —চৈঃ চঃ অন্ত্য। ১৩ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট লীলার কথা না বলিয়া ইহার দ্বারা অপ্রকট লীলা প্রসঙ্গেরই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন এইজন্যই পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের কথা শুনিয়াও ধীর প্রশান্ত হৃদয়ে মহাপ্রভুর আদেশানুযায়ী শ্রীবৃন্দাবনে শাস্ত্রপ্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার প্রমুখ বিবিধ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীশ্রীপুরীধামে মহাপ্রভু লীলাগোপন করিলে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীরূপ সনাতনকে দর্শনের পর শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে ভৃগুপাতের দ্বারা প্রাণত্যাগের সঙ্কল্পেই শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন; সেই দাসগোস্বামীকে শ্রীরূপ সনাতন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল মহাপ্রভুর অপ্রকট নিত্যলীলা উপলব্ধি করাইয়া সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অপ্রকট নিত্যলীলার স্বরূপ কি, তাহা মর্ম্মী ভক্তগণেরই অনুভবগম্য এবং সাধকগণের অনুমান-সাধ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিয়োগব্যথায় শ্রীজীব অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত-হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার পিতৃব্যদ্বয়ের শ্রীচরণে সমাগত হইলেন। পরম দয়ালু শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ তাঁহার গভীর দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি শ্রীজীবের এই প্রকার অসাধারণ ভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পরম প্রীতি-ভরে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলার কথা, এবং সেই লীলা যে বস্তুতঃ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলারই নিগূঢ় রহস্যে পরিপূর্ণ, ইহাও বুঝাইতে লাগিলেন; এবং এই সকল উপদেশ ফলপ্রসূ করিবার উদ্দেশ্যে অতঃপর শ্রীল সনাতনের আদেশে শ্রীরূপ গোস্বামী শুভক্ষণে শ্রীজীবকে 'মন্ত্ররাজ' দীক্ষাদান করিলেন। দীক্ষাদানের পর সাধনাঙ্গ ভক্তির

---

* শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাসের 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকায় ১ম বিলাসের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলভাস্করঃ পরমভাগবতঃ পরমভাগবতঃ"।

† শ্রীবিঠ্ঠলনাথ বা বিঠ্ঠলেশ্বর গাঠুলিগ্রাম শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে যখন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম রাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীব্রজমণ্ডলদর্শনে বহির্গত হন, তখন গাঠুলিগ্রামে তাঁহারা এই বিগ্রহ দর্শন করেন।

আবির্ভাবে শ্রীজীব অচিরকাল মধ্যে অভীষ্টলাভে সমর্থ হইলেন। এইরূপে তিনি শ্রীরূপের নিকট আবার সমগ্র শ্রুতি স্মৃতি এই নূতন অভিজ্ঞতার আলোকে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেই শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনের সকল ভক্তের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপক শ্রীভাগবতমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাদেশে যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীভাগবতকে জীবনের একমাত্র সম্বলরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন—নীলাচলে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর যিনি প্রিয় ছাত্র—সেই শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর নিকট শ্রীজীব সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতে লাগিলেন। কাশীধামে শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সভায় যেভাবে স্বয়ং ভগবান জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেব ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যারূপে শ্রীভাগবত-দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাহা শুনিয়াছিলেন। শ্রুতিধর কুমার ব্রহ্মচারী শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর নিকট শ্রীজীব সেই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন ও সেই ব্যাখ্যার আলোকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন—এবং যিনি স্বপ্নে শ্রীভাগবত প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইতে অনবরত শ্রীভাগবতালোচনায় তদ্গতপ্রাণ তোষণী টীকা বিরচনে ব্যাপৃত, সেই জ্যেষ্ঠতাত শ্রীরূপের গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকটও সেই রসতত্ত্ব ও ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা আস্বাদন করিয়া তোষণী টীকা রচনার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য বা টীকা রচনা করিয়াছিলেন, শ্রীজীব ইঁহাদের নিকট তাহারও আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের টীকাকারগণ শ্রীমদ্ভাগবতের যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও এই সঙ্গে আলোচনা চলিতে লাগিল। এদিকে শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী একযোগে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ ও তাহার টীকা রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, লেখক প্রধানতঃ এই দুই জন হইলেও সকল গোস্বামীর সমবেত আলোচনার ফলেই এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ তোষণী টীকা * রচনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থ (যাহা সাধারণতঃ 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' নামে খ্যাত) এই সময়ে এই প্রকারে রচিত হইতেছিল। এই সময়ে শ্রীজীবকেই অধিকাংশ সময়ে লিখিবার ভার গ্রহণ করিতে হইত এবং অনেক সময়ে গোস্বামিগণের আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইত, শ্রীজীবকেই তাহার ভাষা যোগাইতে হইত। তন্ময় অবস্থায় ইঁহারা কোনও বিশেষ বিষয় ভুলিয়া গেলে শ্রীজীবই ইঁহাদিগকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেন। "ক্রান্ত বুৎক্রান্ত" ও খণ্ডিত বিষয়গুলিকে শ্রীজীবই পর্য্যায়বদ্ধ করিতেন। এইরূপে শ্রীজীব যুগপৎ পাঁচ গোস্বামীর সেবায় ব্যাপৃত রহিলেন।

ফলতঃ শ্রীজীবের অসীম কার্য্যক্ষমতা ও অনলস সেবানুরক্তি তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বশ্রেণীর বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট বিস্ময়ের বস্তুরূপে পরিণত করিয়াছিল। শ্রীরূপসনাতন যখন শাস্ত্ররচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া বাহ্যস্মৃতি হারাইয়া ফেলিতেন, তখন শ্রীজীবই তাঁহাদের সর্ব্ব-বিষয়ে সমাধান করিতেন।

সাধনায় শাস্ত্র-দর্শন

অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, জনশূন্য অরণ্যে শ্রীরূপসনাতন শ্রীল গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস প্রমুখ গোস্বামিগণ যে গ্রন্থাবলী লিখিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা তাৎকালিক শ্রীবৃন্দাবনের বনে কি প্রকারে তাহার প্রমাণস্থানীয় প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন? এই কথার উত্তর দান করিতে গেলে শাস্ত্র-দর্শনের একটি গূঢ় তথ্য সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। ইদানীং শিক্ষিত জগতে এইরূপ একটি অলৌকিক বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি (Theosophical society) নামক সুবিখ্যাত সমিতির মূল স্থাপয়িত্রী ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি এক জন রুষদেশীয়া বিদুষী মহিলা যে ভাবে তাঁহার Secret Doctrine নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন—তিনি নিজেই তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণের দ্বারা জানা যায় যে, যখন কোনও বহু পুরাতন গ্রন্থের প্রমাণের আবশ্যক হইত, তখন ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও গুরুস্থানীয় মহাত্মাগণের কৃপায় তাঁহার নিকটে মানসজগতে ঐ সকল গ্রন্থের যে যে স্থানের প্রমাণের প্রয়োজন, সেই সেই স্থানের মানস-প্রত্যক্ষ ঘটিত। ঐ অবস্থায় তাহা দর্শন করিয়াই এই সাধিকা মহিলা তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত প্রমাণাবলী সংগ্রহ করিতেন। সুতরাং তাঁহার এই গ্রন্থরচনায় কোনও পুস্তকাগারের প্রয়োজন হয় নাই। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের নিত্যধামগত সাধু সন্তদাস বাবাজী (যিনি পূর্ব্বাশ্রমে হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল তারাকিশোর চৌধুরী নামে পরিচিত ছিলেন) মহারাজ তাঁহার গুরু শ্রীল রামদাস কাঠিয়াবাবার জীবনচরিত লিখিবার সময়ে লিখিয়াছেন যে, সিদ্ধিলাভের পর তাঁহার গুরুদেবেরও শাস্ত্রগ্রন্থরাজির ঐ ভাবে মানস-প্রত্যক্ষ ঘটিত। বিজন বনে ঋষিগণ এইরূপ মানস-প্রত্যক্ষ দ্বারা শাস্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন করিতেন। এই মানস-প্রত্যক্ষ দ্বারাই বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ মন্ত্রদর্শন করিতেন। অনাদি অপৌরুষেয় বেদের বা শ্রুতি-মন্ত্রের এইভাবে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই, ঋষিগণ তাহা জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঋষিপ্রকাশিত শাস্ত্রের বহু স্থানেই এইরূপে শাস্ত্রজ্ঞানের উৎপত্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়। নির্জ্জন শ্বাপদসঙ্কুল বৃন্দাবনের বনে অবস্থান করিয়া এই ভাবেই শ্রীরূপ ও শ্রীপাদ সনাতন তাঁহাদের গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

ব্যবহারিক জগতে অবস্থিত জীববৃন্দকে আধ্যাত্মিক জগতের উপযোগী করিবার জন্যই শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। ব্যবহারিক জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ সাধারণ জীবের নিকট স্বতন্ত্র। এই প্রতীয়মান স্বতন্ত্র জগৎদ্বয়ের সম্মিলনের সেতু শাস্ত্র। ব্যবহারিক জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক জগতে উপনীত হইবার জন্যই এই সেতু শ্রীভগবান

* শ্রীল সনাতন গোস্বামীর "তোষণী" টীকার প্রারম্ভ তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনবাসের পরই হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া ইহার রচনা ও আলোচনা চলিয়াছিল; অবশেষে ১৪৭৬ শকাব্দায় উহার শেষাংশ সমাপ্ত হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস, শ্রীরূপ ও রঘুনাথ ভট্ট এই গোস্বামিগণের সহিত আলোচনায় ও আস্বাদনের ফলে এই টীকার উদ্ভব হইয়াছিল। শ্রীল সনাতন শেষ বয়সে এই সুবিস্তৃত টীকা শেষ করিয়া শ্রীজীবের উপর উহা সংক্ষেপ করিবার ভার প্রদান করেন।

কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং ব্যবহারিক জগৎ হইতে আত্মানাত্ম বিচার বা চিজ্জড় বিচার অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়-সম্পর্কে জ্ঞাত জ্ঞান হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। শাস্ত্র এই বিচারের পথ-নির্দ্দেশক। এইজন্য অধোক্ষজ জ্ঞানভাণ্ডার সাধারণ অক্ষজ জ্ঞান-পরায়ণ জীবের নিকট উন্মুক্ত করিতে হইলে অচিন্ত্য জ্ঞানকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। সুতরাং জগৎ-ব্যাপারের বিচার হইতেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়) জগতের মূলীভূত জগদীশ্বরের জ্ঞান আরম্ভ হইয়া থাকে। এই কারণেই ব্যবহারিক জগতের লোককে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন। অচিন্ত্য বা অলৌকিক জ্ঞানকে সাধারণ বাদ-বিবাদের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করাও এইজন্যই উচিত নহে। পরবর্ত্তী-কালে শ্রীজীব যখন শ্রীবৃন্দাবনের প্রেম-ভক্তি রাজ্যের সম্রাট হইলেন, তিনি তখন বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পিতৃব্যদ্বয়ের লিখিত পুস্তকের প্রমাণাবলীর মূল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু লীলানুভবের অনেক রহস্য শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে শ্রীভগবৎ-কৃপায় প্রত্যক্ষ করিয়াই লিখিতে হইয়াছিল। অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটিত যে, একে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন, অপরের তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইত; তখন তিনি আবার উহার সত্য, প্রত্যক্ষানুভবের দ্বারা বুঝিয়া, সন্দেহ ভঞ্জন করিতেন।*

সুতরাং কেবল কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়মীমাংসাদির জ্ঞান থাকিলে চলে না। উহার অতিগ যে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান—আর্য্যভূমি ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণের ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণের তাহা ছিল। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপামৃতে অভিষিক্ত হইয়া এই জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ত্যাগ ও সাধনা-প্রভাবে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীও এই নিত্যসিদ্ধ অধ্যাত্ম জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীজীবও যাহাতে বহিরাবেশ ত্যাগ করিয়া এইভাবে বিভাবিত হইতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীরূপ ও সনাতন তাঁহাতে শক্তি সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীজীবকে বৈষ্ণবতার পরাকাষ্ঠা শিক্ষা-দানের জন্য শ্রীরূপের ন্যায় হিতৈষী, কোমলস্বভাব ও করুণহৃদয় বৈষ্ণব মহাজনকেও সময়ে সময়ে কিরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, শ্রীজীবের জীবনে তাহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শ্রীরূপ যখন "ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত, তখন শ্রীজীবের সহিত ও শ্রীপাদ সনাতনের সহিত বিচার করিয়া অল্পে অল্পে করচাকারে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। কখনও নিজে লিখিতেছেন, কখনও বা নিজে বলিতেছেন শ্রীজীব লিখিতেছেন। দিবারাত্রি ভজনের অবসরে এই কার্য্য চলিতেছে; কখনও বা ভজনের পরিবর্ত্তে ভজনাঙ্গরূপে অবিরত এই কার্য্যই চলিতেছে। ঐ সময়ে একদা শ্রীবল্লভ ভট্ট * শ্রীরূপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে গ্রন্থ লিখিতে দেখিতে পাইলেন। প্রয়াগে শ্রীরূপ যখন শ্রীচৈতন্যদেবের পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তখন বল্লভ ভট্ট এক দিন শ্রীচৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া গঙ্গার অপর পারবর্ত্তী স্বীয় বাসস্থান আড়াইল গ্রামে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলায় ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীরূপও ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে বল্লভ ভট্টের নিকেতনে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্যের উপর বল্লভ ভট্টের শ্রদ্ধা ও বল্লভ ভট্টের উপর শ্রীচৈতন্যদেবের সশ্রদ্ধ স্নেহভাব দেখিয়াছিলেন। যাজ্ঞিক ও কুলীন হইয়াও বল্লভ ভট্ট শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাময়ী ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন; এই জন্য শ্রীরূপ বল্লভ-ভট্টকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। রূপ কি গ্রন্থ লিখিতেছেন, বল্লভ ভট্ট তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীরূপ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামে যে গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, তাহা দেখাইলেন। এ সময়ে শ্রীরূপ যে শ্লোকটি লিখিতেছিলেন, তাহা এই—

> ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
> তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
>
> ভঃ রঃ সিঃ—পূর্ব্ব, ২য় লহরী।

অনুবাদ—

ভোগস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহারূপা পিশাচী যতক্ষণ হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ কি প্রকারে সেই হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় (আবির্ভাব?) হইবে?

শ্রীরূপ এই শ্লোকটি দেখাইলে শ্রীবল্লভ ভট্ট এই শ্লোকটিতে আপত্তি করিয়া বলিলেন—"পূর্ব্বাচার্য্যগণ সকলেই ভক্তিকে মুক্তির সাধিকা বলিয়া গিয়াছেন, এবং মুক্তি যে চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, তাহাও তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রুতিশিরঃ উপনিষদাদিতে নানাভাবে এই মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে মুক্তি বা মোক্ষই জীবের একমাত্র কাম্য পদার্থরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মুক্তির মধ্যে সালোক্য ও সামীপ্য—এই দুইটি সেবার জন্যও প্রয়োজন। পার্ষদাদি-দেহলাভে সেবার অভিলাষ পূর্ণ হয়; তাহাও এই মুক্তির অন্তর্গত। অতএব, পূর্ব্বাচার্য্যগণের মর্য্যাদা ও শাস্ত্রকারগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে মুক্তিস্পৃহাকে পিশাচীরূপে বর্ণনা করা কোনও ক্রমে উচিত হয় নাই। ভুক্তির পক্ষেও কিছু বলা যাইতে পারে—কারণ বৈধভোগ সর্ব্বশাস্ত্রেরই অনুমোদিত। তথাপি ভোগে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া ভোগ সাধারণতঃ নিন্দনীয় বিবেচিত হইলেও হইতে

---

* 'ভক্তিরত্নাকরে' বর্ণিত আছে যে, একদা শ্রীরূপ গোস্বামী তন্ময় চিত্তে শ্রীমতী রাধিকাকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপ বর্ণনা করিয়া "শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি" নামে একটি স্তব রচনা করেন। উহাতে শ্রীরাধার বেণীর বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—"মণিস্তবকবিদ্যোতিবেণী ব্যালাঙ্গনাফণাং।" ভুজঙ্গিনীর ফণার সহিত শ্রীরাধার বেণীর তুলনা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর অশোভন মনে হইয়াছিল। ঐ বিষয়ে সন্দেহাকুল চিত্তে অবস্থান করিবার সময় শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীগণ শ্রীরাধাকুণ্ডের সন্নিহিত কোনও স্থানে তাঁহাকে দর্শন দান করিয়া, স্বীয় বেণী দেখাইয়া তাঁহার সন্দেহের নিরসন করেন। কথিত আছে, এইরূপ ঘটনা আরও অনেকবার ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবনে ঘটিয়াছিল।

* ইনি ১৪০১ শকে আবির্ভূত হইয়া বিষ্ণুস্বামি-প্রবর্ত্তিত মতবাদ কিয়দংশে গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া সম্প্রদায় বন্ধন এবং বৈষ্ণবমত প্রচার করেন। ইহার মতবাদ "মর্য্যাদা-মার্গ" ও "পুষ্টিমার্গ" এই দুই ভাগে বিভক্ত। বর্ত্তমানে মথুরা, রাজপুতানা ও বোম্বাই অঞ্চলে ইঁহার সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রবল।

পারে। কিন্তু মুক্তির এইরূপ নিন্দা করা কোনও ক্রমেই উচিত নহে। অতএব তুমি ঐ 'পিশাচী' কথাটি পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও কথা এরূপভাবে ব্যবহার কর—যাহাতে মুক্তিকামী ভক্তদিগের মনে ব্যথার উদ্রেক না হয়।"

শ্রীরূপ শ্রীমদ্বল্লভ ভট্টের আজ্ঞার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া অতি বিনয়সহকারে তাহা গুরুর আজ্ঞার ন্যায় অবিচারিতভাবে শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, এবং শ্লোকটিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন না করিয়া তৎক্ষণাৎ এইভাবে পাঠ পরিবর্ত্তন করিলেন ; যথা—

ব্যাপ্নোতি হৃদয়ং যাবদ্ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহাগ্রহঃ।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ—যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহারূপ গ্রহ হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই হৃদয়ে কি প্রকারে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইবে ? *

বল্লভ ভট্ট পূর্ব্বপাঠ অপেক্ষা এই পাঠ উৎকৃষ্ট ভাবিয়া অগত্যা এই পাঠেই সম্মতিদান করিলেন। তখন শ্রীরূপ ও বল্লভ ভট্ট 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করিলেন, এবং গ্রন্থ লিখিত হইলে শ্রীমদ্বল্লভ ভট্ট অন্যান্য স্থলও সংশোধন করিয়া দিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহার পরেই আচার্য্য বল্লভ ভট্ট যমুনা-স্নানে গমন করিলেন ; শ্রীজীবও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। যমুনাকূলে আসিয়া তিনি আচার্য্য বল্লভ ভট্টকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট দুই একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। বল্লভ ভট্ট হৃষ্টচিত্তে এই প্রিয়দর্শন সুকুমার তেজস্বী অথচ বিনয়ী যুবককে শাস্ত্রবিষয়ে প্রশ্ন করিবার অনুমতি দান করিলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, এবং তাঁহার কৃপায় অন্তরে প্রেরণা অনুভব করিয়াই "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; এবং তিনি স্বয়ং একথা ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোকে স্বীকার করিয়াছেন ; যথা—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥
ভঃ রঃ সিঃ—পূর্ব্ব ১ম লহরী, ২য় শ্লোক।

* শ্রীরূপের সহিত আচার্য্য বল্লভ ভট্টের যে এই শ্লোক লইয়াই মতভেদ হইয়াছিল, ঐতিহ্য ভিন্ন তাহার প্রমাণ নাই। আমরা শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিকট ও আমার শ্রীভাগবত অধ্যয়নের অন্যতম আচার্য্য যিনি অন্যূন ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন—সেই হুগলী দীপার শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ পুরীর পাটের সুপণ্ডিত শ্রীপাদ বেণীমাধব গোস্বামীর নিকট এই উপাখ্যান শুনিয়াছি। তিনি ইহা কালনার নিত্যধামগত প্রসিদ্ধ শ্রীপাদ ভগবানদাস বাবাজীর নিকট শুনিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' দুর্গম সঙ্গমনী নাম্নী টীকায় শ্রীজীব নিজেই এই পাঠান্তর দিয়াছেন যথা—

ব্যাপ্নোতি হৃদয়ং যাবদ্ ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাগ্রহ ইতি পাঠান্তরন্তু সুমিষ্টং।

বিশেষতঃ, শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত যে বল্লভাচার্য্যের বিচার হইয়াছিল, বল্লভ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে ইহার প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

অর্থাৎ—আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইলেও হৃদয়ে যাঁহার সাক্ষাৎ প্রেরণা অনুভব করিয়া এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব হরির পদকমলকে আমি বন্দনা করিতেছি। একথা যে কত দূর সত্য শ্রীজীব তাহা জানিতেন, এবং সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবই শ্রীরূপ গোস্বামীকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। অতএব এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি শ্লোক, বাক্য ও অক্ষরকে তিনি বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত মনে করিতেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট আসিয়া শ্রীরূপের গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট সেই শ্লোকের পরিবর্ত্তন সাধনের আদেশ করায় তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীগুরু শ্রীরূপের সাক্ষাতে তিনি শ্রীমদ্বল্লভ ভট্টকে এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই ; এখন শ্রীমদ্বল্লভ ভট্টকে নির্জ্জনে পাওয়ায় তিনি ঐ বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনায় অগ্রসর হইয়া, বল্লভ ভট্ট কি কারণে ঐ শ্লোকটিকে দোষাবহ বলিয়া উহার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাই সর্ব্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য বল্লভ বলিলেন যে, ঐ শ্লোকটিতে সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদিত ও সর্ব্বাচার্য্যসম্মত মুক্তির নিন্দা করা হইয়াছে, এইজন্যই তিনি ঐ শ্লোকটি আপত্তিজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন।

শ্রীজীব কহিলেন, যাঁহারা ভক্তিলাভে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে মুক্তি কি নিন্দনীয় নহে ? শ্রীভগবান জীবমাত্রেরই, বিশেষতঃ ভক্তিলাভেচ্ছুগণের একমাত্র উপাস্য। ভগবানের আরাধনা করিয়া সর্ব্বসাধনের সার তাঁহাকেই না চাহিয়া অন্য বস্তুর অভিলাষ করা কি কপটতা নহে ? এই জন্যই শ্রীনৃসিংহদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকায় পরম ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ শ্লোকে ঐ ধর্ম্মের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত "প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"প্রকর্ষেণ উজ্‌ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি লক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" (অর্থাৎ "প্রকৃষ্টরূপে ফলাভিসন্ধি লক্ষণ কপটতা বা কৈতব যাহাতে অপগত হইয়াছে, সেইরূপ ধর্ম্ম ; বিশেষতঃ "প্র" এই শব্দ দ্বারা মোক্ষের অভিসন্ধিকেও নিরস্ত করা হইয়াছে।) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা দ্বারা সালোক্যাদি সর্ব্বপ্রকার মোক্ষের অভিসন্ধিকেও নিরাকৃত করা হইয়াছে। শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীকপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন যে—

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত॥
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিকঃ উদাহৃতঃ॥

অর্থাৎ—হে মাতঃ! যাঁহারা আমাতে অন্য বস্তুর অভিলাষশূন্য ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিরূপ ব্যবধান-রহিত মনের গতিরূপা ভক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই ভক্তগণের আমার সন্নিধানে অন্য কোনও ফলানুসন্ধান দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে সালোক্য অর্থাৎ আমার সহিত একলোকে বাস, আমার সমান ঐশ্বর্য্য, আমার সামীপ্য, আমার সমানরূপত্ব, অথবা সাযুজ্য, অর্থাৎ আমার সহিত ঐক্যরূপ মোক্ষ বস্তু দিতে চাহিলেও তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন না ; কেবল আমার সেবাকেই পরম পুরুষার্থ জানিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন—ইহাকেই

ঐকান্তিক ভক্তিযোগ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।" এই প্রকার ভক্তির নিকট মোক্ষ অতি তুচ্ছ।* নারদপঞ্চরাত্রেও বলা হইয়াছে যে, যেমন চেটিকা অর্থাৎ দাসীসকল ভীতচিত্তে রাজমহিষীর অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ ভুক্তি-মুক্তি প্রভৃতি অদ্ভুত সিদ্ধিসকল হরিভক্তি মহাদেবীর অনুগামিনী হইয়া থাকে।† অতএব যাঁহারা বিশুদ্ধা অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদি দ্বারা অস্পৃষ্টা ভগবদ্ভক্তি কামনা করিয়া থাকেন, মুক্তি ও ভোগকে তাঁহারা এই ভক্তিপথের বাধা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

বল্লভাচার্য্য কহিলেন, এই সকল কথা শাস্ত্রসিদ্ধ, কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণের মর্য্যাদা রক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য, এ অবস্থায় মুক্তিকে যখন তাঁহারা বহুমানন করিয়াছেন, তখন মুক্তিকে কিছুতেই "পিশাচী" বলা উচিত নহে।

শ্রীজীব কহিলেন, ঐ শ্লোকে মুক্তিকে "পিশাচী" বলা হয় নাই, ভুক্তিমুক্তি স্পৃহাকেই পিশাচী বলা হইয়াছে। বাস্তবিক নিষ্কাম চিত্তে বৈধভোগ ভক্তির পরিপন্থী নহে, কিন্তু ভোগের জন্য যে ঐকান্তিক আগ্রহ—আকুলতা, উহা সমগ্র হৃদয় এমন ভাবে অধিকার করে যে, সেই হৃদয়ে আর ভগবানের স্থান থাকে না। মুক্তির আগ্রহ তদপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর, উহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে আর কিছুই ভাল লাগে না—ভগবৎকথা বা নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তির পক্ষে উহা প্রবল বাধা। ফলতঃ, মুক্ত ব্যক্তিরই অনেক সময় ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়া থাকে—ভক্ত না চাহিলেও ভোগ ও মুক্তি অনেক সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু যতক্ষণ মুক্তি লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ কিছুতেই ভক্তি-মহাদেবীর কৃপা হয় না। এই জন্যই ব্রহ্মসূত্রের নিরপেক্ষ ভাষ্যরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে সূত্রকার ব্যাসদেব নিজেই ভক্তির মহিমার নিকট মুক্তিকে তুচ্ছ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক, মুক্তিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিশাচী বলা হয় নাই, মুক্তির স্পৃহাকেই এই শ্লোকে পিশাচী বলা হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তকেও কোনওরূপে নিন্দা করা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় ঐ শ্লোকটি কি দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? আপনি পরম পণ্ডিত, আমার গুরুদেবের নিকটও গৌরবের পাত্র—আপনি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া যাহা সঙ্গত হয়, তাহারই ব্যবস্থা করুন।

বল্লভাচার্য্য প্রীত হইয়া শ্রীজীবকে কহিলেন, "তোমার কথাগুলি অতিশয় যুক্তিযুক্ত ও মধুর। ভাবে বুঝিতেছি, শাস্ত্রাদিও তুমি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছ। আমি তোমার কথা শুনিয়া বিচার করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, যে গ্রন্থে নিরপেক্ষভাবে নিষ্কাম ভক্তির আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে মুক্তির ইচ্ছাকে পিশাচী বলিয়া বর্ণনা করায় দোষ হয় নাই। পরন্তু মুক্তিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিন্দা না করায় পূর্ব্বাচার্য্যগণের মর্য্যাদা নহে, ইহা করা হয় নাই। সুতরাং দেখিতেছি, আমারই ভ্রম হ... অতএব ঐ শ্লোকটি ঐ স্থানে সুসঙ্গতই হইয়াছিল, কিন্তু আমার বু... পরিণত ভুলেই আমি শ্রীরূপকে ঐ শ্লোক পরিবর্ত্তন করিবার অ...রে। আদেশ করিয়াছি। শ্রীমান্ শ্রীরূপ আমাকে অতিশয় সম্মা... করেন বলিয়াই তিনি কোনওরূপ বিচার না করিয়াই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। ঐরূপ বিনয় সত্যই বৈষ্ণবোচিত; কিন্তু আমার ব্যবহার তদ্রূপ হয় নাই। আমি নিজে না বুঝিয়াই—শ্রীরূপের সাধু অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারিয়া ঐ শ্লোকটিকে দোষাবহ স্থির করিয়াছিলাম। পরন্তু, আমি মুক্তিস্পৃহাকে পিশাচী বলায় মুক্তিকেই পিশাচী বলা হইয়াছে মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি যে, মুক্তির স্পৃহা বাস্তবিকই নিন্দনীয়। অতএব তুমি আমার ভ্রান্তিনিরাস করিয়া যথার্থই আমার উপকার করিলে।"

ইহার কিয়ৎকাল পরেই যমুনাস্নান শেষ করিয়া শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীরূপের নিকট পুনরায় আগমন করিলেন। তাঁহার আগমন মাত্রেই শ্রীরূপ অভিবাদন পূর্ব্বক আসন দান করিয়া প্রণত হইলে বল্লভাচার্য্য বলিলেন,—"রূপ! বিচারের ফলে দেখা গেল যে, আমি তোমার পূর্ব্বশ্লোকটিতে যে দোষ দিয়াছিলাম তাহা সঙ্গত হয় নাই—তোমার ঐ শ্লোকটির পূর্ব্বপাঠই সুসঙ্গত ছিল; তুমি ভুক্তি মুক্তির স্পৃহাকে মাত্র পিশাচী বলিয়াছ, সাক্ষাৎভাবে মুক্তির নিন্দা কর নাই; সুতরাং ইহাতে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মর্য্যাদাহানিও হয় নাই। তুমি পুঁথিতে যে পরিবর্ত্তন করিয়াছ তাহা না করিয়া পূর্ব্বে যে শ্লোকটি লিখিয়াছিলে তাহাই রাখিয়া দাও।"

শ্রীরূপ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ পুঁথিখানি আনিয়া তাহাতে পুনরায় পূর্ব্বশ্লোকটি লিখিয়া শ্রীমদ্বল্লভ ভট্টের আদেশ প্রতিপালন করিলেন। তখন বল্লভ ভট্ট শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রূপ! তোমার নিকট যে সুদর্শন যুবকটি অবস্থান করেন ইনি কে?" শ্রীরূপ বলিলেন—"ঐ বালকটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব। আপনি উঁহার পিতা অনুপমকে আমার সহিত প্রয়াগে ও আড়ৈলে দেখিয়াছিলেন। অনুপম আমার কনিষ্ঠ ছিলেন; গৌড়দেশে তাঁহার ৺গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। ভাগ্যবান্ অনুপমের শ্রীরামচন্দ্রে নিষ্ঠাময়ী শুদ্ধা ভক্তি ছিল। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীজীবও বিশুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হইতে পারে।"—এই বলিয়া শ্রীরূপ অদূরবর্ত্তী শ্রীজীবকে আহ্বান করিয়া শ্রীমদ্বল্লভ ভট্টকে প্রণাম করিতে বলিলেন। শ্রীজীব বল্লভ ভট্টকে প্রণাম করিলে তিনি শ্রীজীবকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বল্লভ ভট্ট শ্রীরূপকে বলিলেন—"ইহার সহিত আমার পূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছে। বালকটি বেশ প্রতিভাবান ও পণ্ডিত। তোমার পুঁথির যে শ্লোকটি আমি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম, ইনি তাহা লইয়া আমার সহিত বিচার করায় আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। ইহার আচরণে ও বিদ্যাবত্তায় বুঝিতে পারিলাম যে, এ বালক উত্তরকালে এক জন অসাধারণ পণ্ডিত হইবে।" শ্রীরূপ এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"আপনার ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়স্ক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই বালক অতীব দম্ভের পরিচয় দিয়াছে—আপনি এই অর্ব্বাচীন অভিমানী বালকের অপরাধ ক্ষমা করুন।" শ্রীরূপের এই কথায় তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ

---

* যথা ভাবার্থদীপিকায়াং—
ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তঃ মহামুদঃ
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্।

অর্থাৎ— তোমার কথামৃতরূপ অমৃত সাগরে বিহরণশীল পুণ্যবান জনগণ মহানন্দ অনুভব করিয়া চতুর্ব্বর্গকেও তৃণতুল্য তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন।

† হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ।

পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। হইতে উত্তোলন করিয়া বলিলেন— নাই। শাস্ত্র সম্বন্ধে নিরপেক্ষ এই বলিয়া ভট্টপাদ স্বীয় আশ্রমে ন ত্যাগ করিলেন—শ্রীরূপও তাঁহার প্রত্যুদ্গমন াহাকে অভিবাদন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীমদ্বল্লভ ভট্টের প্রস্থানের পর শ্রীরূপ শ্রীজীবকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"দেখ শ্রীজীব! বুঝিলাম, তুমি পরম পূজ্যপাদ যাজ্ঞিকাগ্রগণ্য সম্প্রদায়াচার্য্য সুপ্রবীণ শ্রীমদ্বল্লভ ভট্টের সহিত বিচার করিয়া দম্ভের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ। দম্ভ, জিগীষা ইত্যাদি প্রাকৃত রজস্তমোগুণময় ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া তুমি শ্রীধামের নিকট অপরাধী হইতেছ—অতএব যত দিন তোমার হৃদয় হইতে এই সকল প্রাকৃতভাব অন্তর্হিত না হইতেছে, তত দিন পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে থাক—পরে মন স্থির হইলে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিও।"

শাস্ত্রানুসারে শ্রীগুরুর মর্য্যাদাহানি শিষ্যের পক্ষে অসহনীয়; এই জন্যই শ্রীগুরু শ্রীরূপের ও তাঁহাতে আবিষ্ট শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মর্য্যাদারক্ষার আগ্রহেই শ্রীজীব শ্রীমদ্বল্লভ ভট্টের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন শ্রীরূপ গোস্বামীর এই শাসনবাক্যে বুঝিতে পারিলেন যে, নিশ্চয় গুরুদেবের মর্য্যাদারক্ষাপ্রবৃত্তির অন্তরালে তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল, এই জন্যই অসীম করুণাময় শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহাকে শাসন করিতেছেন। এই ভাবিয়া, শ্রীরূপের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীজীব গুরুপদে দণ্ডবৎ প্রণতি পুরঃসর অশ্রুপূর্ণ লোচনে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং শ্রীগুরুর চরণ স্মরণ করিয়া মন স্থির করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন —এইরূপে অভীষ্টদেবের স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইবার পরেই তাঁহার মন স্থির হইল। তখন তিনি সেই স্থল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশানুযায়ী শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু শ্রীরূপের নিকটে যাইবার অনুমতি না পাওয়ায়—তিনি নন্দঘাটে আসিয়া রাখালদিগের রচিত একখানি পর্ণকুটীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তিনি দিবারাত্রি স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তনে ব্যাপৃত থাকিয়া, অযাচিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, গ্রামবাসিগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত কিঞ্চিৎ যব ও গোধূমচূর্ণ জলে মিশাইয়া ভোজনে প্রাণ ধারণ করিয়া নিজের অপরাধের কথা ভাবিতে লাগিলেন, এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। অল্প দিনেই শ্রীজীবের শরীর শীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তথাপি তাঁহার সঙ্কল্প শিথিল হইল না। এদিকে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঐ অঞ্চলে আগমন করিলেন। সনাতন শ্রীবৃন্দাবনের আবালবৃদ্ধবনিতার এতই প্রিয় ছিলেন যে, যখন তিনি যে গ্রামে আসিতেন, তখন সে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইত, সকলেই তাঁহাকে লইয়া নানা প্রসঙ্গে পরমানন্দে কালযাপন করিত। গ্রামের গৃহস্থগণের সকলেই তাঁহার নিকট নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় পারিবারিক গোপনীয় কথা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া দ্বিধাশূন্য চিত্তে পরামর্শ লইত। তিনি সেবাবুদ্ধিতে যাহাতে জীবমাত্রেরই কল্যাণ হয়, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।

শ্রীপাদ সনাতন নন্দঘাটের অঞ্চলে আসিলেই তত্রত্য সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিল, এবং তাহাদের গ্রামে প্রান্তে যে একটি অতি সুন্দর নবীন যুবক তপস্বী আসিয়া অবস্থান করিতেছেন, সে সংবাদ দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিল না। শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"অলপ বয়স এক তপস্বী সুন্দর।
কথোদিন হৈল রহে এ বন ভিতর॥
ভুঞ্জাইতে যত্ন করি অনেক প্রকার।
কভু ফল মূল ভুঞ্জে কভু নিরাহার॥
বহু যত্নে কিঞ্চিৎ গোধূম চূর্ণ লৈয়া।
করয়ে ভক্ষণ তাহা জলে মিশাইয়া॥
৫ম তরঙ্গ—২৭৩ পৃঃ।

সনাতন গোস্বামী শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ স্থানে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ঐ নবীন তপস্বী আর কেহ নহে—তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরূপের প্রিয় শিষ্য শ্রীজীব। শ্রীজীব জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যদেবকে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। শ্রীজীবকে সান্ত্বনাদান পূর্ব্বক তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বুঝিলেন যে, উদার-হৃদয় পরমধীর শ্রীরূপ নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় উদ্দেশ্যে এবং পরম স্নেহের পাত্র শ্রীজীবের কোনও মঙ্গল সাধনের অভিপ্রায়েই শ্রীজীবের প্রতি এই শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন ইহা বুঝিয়াই শ্রীজীবকে সঙ্গে না লইয়া একাকী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপের নিকট গমন করিলেন। শ্রীপাদ সনাতন জানিতেন যে, গ্রন্থ-রচনায় শ্রীজীবই শ্রীরূপের অদ্বিতীয় সহায়। তিনি লেখনী হইতে পুঁথির জন্য তালপত্র বা ভূর্জ্জপত্র পর্য্যন্ত সংগ্রহ করেন। তিনিই পুঁথির আবরণ-কাষ্ঠ সংগ্রহ করেন, এবং ডুরি দিয়া বাঁধিয়া রাখেন। শ্রীজীব যখন বলিয়া যাইতে থাকেন তখন তিনিই লিখিতে থাকেন—কখনও বা তর্কিত বিষয়ে শ্রীজীবের সহিত আলোচনায় সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া শ্রীরূপ শ্রীজীবকে তাহা ভাষা সম্বন্ধ করিয়া লিখিতে বলেন, কখনও বা স্বকীয় মুক্তাপংক্তিসদৃশ অক্ষরাবলীতে স্বয়ং সেই পুঁথি সমলঙ্কৃত করেন। শ্রীজীবের হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর ছিল,—শ্রীপাদ সনাতন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া শ্রীরূপগোস্বামীও অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন। উভয়ে মিলিত হইলে শ্রীপাদ সনাতন শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থ শেষ হইয়াছে কি না? শ্রীরূপ বলিলেন—"গ্রন্থখানি প্রায় শেষ হইয়াছে, কিন্তু এখনও সংশোধন হয় নাই; শ্রীজীব এখানে থাকিলে এত দিনে উহা সংশোধিত হইত।" তখন প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল সনাতন শ্রীজীবের শরীর কি প্রকার শীর্ণ হইয়াছে এবং আর কিছু দিন এইভাবে কাটিলে তাঁহাদিগকে শ্রীজীবের জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে—ইহা শ্রীরূপকে তিনি জানাইয়া দিলেন। শ্রীরূপ শ্রীজীবের অবস্থা শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিতচিত্তে তখনই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া শ্রীজীবকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং যথাযোগ্য ভাবে তাঁহার সেবাশুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া, অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। এই প্রকারে শ্রীজীবকে সম্পূর্ণ রূপে নির্ম্মল ও শুদ্ধ করিয়া শ্রীরূপ সনাতনাদি তাঁহার উপরেই গ্রন্থ-সংক্রান্ত সকল ভার অর্পণ করিলেন।

"প্রেমবিলাস" নামক অনতিপ্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থের ত্রয়োবিংশতি বিলাসের শেষভাগে এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে। তাহাতে বিবৃত হইয়াছে যে, কোনও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনে দিগ্বিজয়ে আসিয়া শ্রীরূপ সনাতনের নিকট হইতে জয়-পত্র লইয়া যাইলে শ্রীজীব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিচারে পরাভূত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শ্রীরূপ সনাতন-প্রদত্ত জয়পত্রগুলি ফিরাইয়া লইলেন। তাহাতে সেই পণ্ডিত বিষণ্ণচিত্তে শ্রীরূপের নিকট প্রত্যাগমন করিলে শ্রীরূপ তাঁহাকে পুনরায় জয়পত্র লিখিয়া দিলেন, এবং শ্রীজীবকে ডাকিয়া বলিলেন—

"অকালে বৈরাগ্য-বেশ ধরিলে মূঢ়মতি।
ক্রোধের উপরে ক্রোধ না হইল তোমার।
তে কারণে তোর মুখ না দেখিব আর।
গুরুবর্জ্জ্য হঞা জীব সুবিষণ্ন মনে।
প্রবেশ করিলা যাঞা নির্জ্জন কাননে।
তথি সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থ বিরচিলা।
গুরু রূপ-সনাতনের নাম না লিখিলা॥"

ইহার পরে শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীজীবকে দেখিয়া-আসিয়া ভক্তিরত্নাকরের উপাখ্যানে যেভাবে শ্রীরূপের সহিত মিলন করাইয়া দেন, প্রায় সেই ভাবেই মিলন করাইয়া দিলেন। প্রভেদ এই যে, ভক্তিরত্নাকরে আছে শ্রীপাদ সনাতন শ্রীরূপকে "শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থ শেষ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করায় শ্রীজীবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু "প্রেমবিলাসে" আছে—

"সনাতন গিয়া রূপে কহে এক কথা,
জীবের কর্ত্তব্য মোরে বলহ সর্ব্বথা॥
রূপ বোলে গোসাঞি তুমি সব জান।
জীবে দয়া নামে রুচি তাহা তুমি মান॥
সনাতন বলে দয়া কেন বা না হয়।
হাসিয়া গোসাঞি বোলে তুমি দয়াময়॥
রূপগোসাঞি বোলে যবে তোমার দয়া হৈল।
অপরাধ নাঞি আমি তাঁরে কৃপা কৈল।
এত বলি শ্রীজীবে আনিয়া তখন।
তাঁর মাথে ছুঁহে ধরিল শ্রীচরণ।
কৃপা পাইয়া জীব ক্রমসন্দর্ভাদি গ্রন্থ।
রচনা করিল মনের আনন্দে একান্ত॥"

শ্রীজীব যে বল্লভ ভট্টের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, প্রেম-বিলাসের বর্ণনায় তাহার আভাস নাই; পরন্তু যখন জয়পত্র দেওয়ার কথা আছে, এবং যখন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র রূপনারায়ণের সঙ্গে শ্রীজীবের বিচারের পর এই বিচার হইয়াছিল, এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোক লইয়া যে এই বিচার হইয়াছিল প্রেম-বিলাসে এমন কোনও কথা যখন নাই—তখন এই বিচার যে বল্লভ ভট্টের সহিত নহে, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। বিশেষতঃ, এই বিচারের পর যখন শ্রীরূপ শ্রীজীবকে বর্জ্জন করেন, তখন সেই অবসরে শ্রীজীব "সর্ব্বসম্বাদিনী" গ্রন্থ রচনা করেন, এই কথার উল্লেখ আছে। "সর্ব্বসম্বাদিনী" গ্রন্থখানি মূল গ্রন্থ নহে, ইহা শ্রীজীবের ছয়টি সন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত চারিটির অনুব্যাখ্যা। অতএব এই গ্রন্থ যে শ্রীজীবের ষট্‌সন্দর্ভাদি গ্রন্থের পরে—তাঁহার পরিণত বয়সেই লিখিত হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ ইহাই শ্রীজীবের সর্ব্বশেষ গ্রন্থ।

শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের "শ্রীআচার্য্যজী নিজ-বার্ত্তা"—"ঘরুবার্ত্তা" তথা "চৌরাশী বৈঠকলে চরিত্রাদি" নামক প্রাচীন হিন্দী ভাষায় লিখিত কয়েকখানি পুস্তক পাওয়া যায়। ১৯৫৯ সম্বতে (১৯০৩ খৃষ্টাব্দে) এই পুস্তক কয়খানি বোম্বাইয়ের 'তত্ত্ববিবেচক' মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুরাতন পুস্তক এখন অত্যন্ত দুর্লভ। এই পুঁথিগুলির নিজবার্ত্তার ৩১ বার্ত্তায় আছে—"এক সমৈ শ্রীআচার্য্যজী মহাপ্রভু চাতুর্ম্মাস্য বর্ষা ঋতু করিবেকোঁ সংবৎ ১৫৪৮ ফাল্গুন শুদ্ধ ৬ রবীবারকোঁ শ্রীবৃন্দাবন পধারে। তহাঁ আপ ৪ মহিনাঁ বিরাজে। তহাঁ কৃষ্ণ চৈতন্যকো সমাগম ভয়ো। বিনকোঁ শ্রীভাগবতকী সুবোধিনী টিকাকী ব্যাখ্যা করী সুনাই। তহাঁ ভাণ্ডির বটকী কুঞ্জমেঁ রূপ সনাতন ঔর কৃষ্ণচৈতন্যকে শিষ্য জীব গোস্বামীকে সংগ ভগবৎচর্চ্চা ভই। বামেঁ জীব গোস্বামীনেঁ আপসোঁ বাদ কিয়ো। সো সুনকেঁ কৃষ্ণচৈতন্যনেঁ বাকো ত্যাগ কিয়ো। তব বানেঁ শ্রীজমুনাজীকে তীরপে জায় দিন দোয় মুঠিভরি ভক্ষণ করি। অনশনব্রত নে বৈঠ্যো। সো সুনিকেঁ শ্রীআচার্য্যজী আপ বর্হাঁ কৃষ্ণচৈতন্যকোঁ সংগ লে কেঁ পধারেঁ। তব বিনকোঁ তথা গুরুকোঁ দেখি জীব গোস্বামীনেঁ অপনে অপরাধকী ক্ষমা মাঁগী। তব আপ শ্রীআচার্য্যজীনেঁ বাকোঁ কৃষ্ণচৈতন্যকে সংগ করি দিয়ো।"

এই বিবরণে ১৫৪৮ সংবৎ অর্থাৎ ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীবৃন্দাবনের ভাণ্ডীর বটের কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব, শ্রীরূপসনাতনের ও শ্রীজীবের অবস্থানের বিবরণ অনৈতিহাসিক। কারণ ১৫৪২ সংবতে (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৫৪৮ সংবতে বা ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বয়স মাত্র ৬ বা ৭ বৎসর। ঐ সময়ে তাঁহার সহিত শ্রীরূপসনাতনের বা শ্রীজীবের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব। বল্লভাচার্য্যের বয়সও ঐ সময়ে চৌদ্দ বৎসরের অধিক হয় নাই। শ্রীবৃন্দাবনে চৈতন্যদেবের সহিত শ্রীরূপ সনাতনের বা শ্রীজীবের সাক্ষাতের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। অনেকের মতে শ্রীজীবের অতি শৈশবকালে রামকেলীতে ভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎই হয় নাই। মনে হয়, পরবর্ত্তীকালে "শ্রীজীবের সহিত বল্লভাচার্য্যের বিচার হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য শ্রীজীবের গুরু তাঁহাকে ত্যাগ করেন।"—এই ঐতিহ্যের পরেই ঐ কাল্পনিক উপাখ্যান রচিত হইয়া বল্লভ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বল্লভাচার্য্যের ও গোপাল-ভট্টের সাক্ষাৎ শ্রীবল্লভাচার্য্যের কৃপায় শ্রীরাধারমণজীর প্রাকট্য, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর বল্লভাচার্য্যের নিকট হইতে দীক্ষা লইবার আগ্রহ, এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিষ্য বলিয়া গোপালভট্ট গোস্বামীকে বল্লভাচার্য্যের দীক্ষাদানে অস্বীকৃতি, শ্রীগোবর্দ্ধন-নাথ গোপালের সেবাপ্রাপ্তি, সেবা-রক্ষণ, ও বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগকে সেবা হইতে বিতাড়ন—ইত্যাদি নানা ব্যাপারে এই পুঁথি কয়েক-খানিতে অনেক পরবর্ত্তী কালে রচিত উপাখ্যান স্থান পাইয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

মুক্তির মূল্য

১৮

ট্যাক্সীতে আরোহণকালে কাশেমের মনে হইয়াছিল, সে সম্মুখের আসনে—চালকের পার্শ্বে বসিবে, কিন্তু তাহা হয় নাই—চালকের এক জন সঙ্গী ছিল। অনিচ্ছায় তাহাকে মধ্যস্থ আসনে বসিতে হইয়াছিল। রসুলান প্রথমেই উঠিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া নেজমাকে ডাকিয়া পার্শ্বে বসাইয়াছিল—কাশেম অপর পার্শ্বে বসিয়াছিল। কাশেম যত দিন নেজমাকে পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তত দিন সে কিছুতেই তাহাকে লাভ করিতে পারে নাই—সে দরিদ্র কাশেমের বাসনা-সীমার বহির্ভূত না থাকিলেও তাহার পক্ষে অনধিগম্য ছিল। আর আজ যখন সে নেজমার নিকট হইতে দূরে যাইবার জন্য আগ্রহশীল, তখন সে তাহার নিকট হইতে যাইতে পারিতেছে না। কাশেম ভাবিতে লাগিল, অদৃষ্টের এ কি উপহাস!

সে কেবলই রসুলানের কথা ভাবিতে লাগিল—সে কাশেমের পত্নী না হইয়া যদি কোন উপন্যাসের নায়িকা হইত, তবে তাহাই তাহার উপযুক্ত হইত। কি সাহস! স্বামীর প্রতি কি অবিচলিত বিশ্বাস! আত্মশক্তিতে কি প্রত্যয়! কি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! বেগম-মহল হইতে বাহির হইবার সময় সে অনায়াসে যে ভাবে সেই শঙ্কাকুল পুরীর বিপদের জাল হাসিতে হাসিতে—অথচ নিপুণভাবে ছিন্ন—বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনি বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং নেজমাকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছে, তাহা উপন্যাসেই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সে পিচ্ছিল পথে বিস্ময়কর ভাবে ভার-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়াছে—গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছে, শ্রান্ত হয় নাই, ক্লান্ত হয় নাই, বিরক্ত হয় নাই। অথচ স্বামীর তুষ্টি সাধন ব্যতীত তাহার কাযের কোন উদ্দেশ্যই ছিল না!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—গন্তব্য স্থান কোথায়—তাহা এখনও কত দূরে? সে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। ফিরিয়া যাইবার পথে অন্তরায় একাধিক। দিল্লীতে নবাবের লোক তাহার ও তাহাদিগের সন্ধান লইবে এবং সন্ধান পাইলে কি হইতে পারে, তাহা সে অনুমান করিতে পারে। অথচ তাহার পিতামাতা দিল্লীতে। তবে কি তাঁহাদিগের সহিত তাহার আর কখন সাক্ষাৎ হইবে না? দিল্লীতে ফিরিবার আরও প্রবল অন্তরায় আছে। মাদক দ্রব্য সেবন-ফলে যে উত্তেজনার উদ্ভব হয়, তাহার বশে মানুষ যে কায করিতে পারে, স্বাভাবিক অবস্থায়—বিচার-বিবেচনা না হারাইলে যেমন সে সব কায করিতে পারে না—তেমনই তাহার নেজমার উদ্ধার সাধনের যে আগ্রহ রসুলানের প্ররোচনায় উত্তেজনায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার বশে কায করিবার সময় সে আর একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারে নাই—নেজমাকে লইয়া সে কি করিবে? সে দরিদ্র—দরিদ্রের পক্ষে একটি ক্ষুদ্র সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করাই দুঃসাধ্য; যে দরিদ্র, সে তাহার পুত্রকন্যাদিগকে ইচ্ছানুরূপ ভাবে পালন করিতে পারে না—তাহাদিগকে যে সব জিনিষ দিতে স্বভাবতঃ তাহার ইচ্ছা হয়, সে সে সবও দিতে পারে না—যেরূপ স্থানে তাহাদিগকে রাখিতে ইচ্ছা করে, সেরূপ স্থানে রাখিতে পারে না, আপনার স্নেহের সম্বল পুত্রকন্যাও সময় সময় দরিদ্রের পক্ষে ভার বলিয়া মনে হয়। সে কিরূপে নেজমার অতিরিক্ত ভার বহন করিবে? কি ভাবে সে সেই ভার বহন করিবে? বিবাহ? সে রসুলানকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। আর বিবাহ করিলেও সে কখন নেজমার পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের অপ্রীতি ও শত্রুতা ব্যতীত আর কিছুই পাইবে

না। তাহার পিতামাতা সে সুখী হইবে মনে করিয়াই তাহাকে নবাবের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও আর্থিক হিসাবে লাভবান হইয়াছিলেন। তাহার পিতামাতা যে তাহার সহিত নেজমার বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন না, তাহার কারণ—সে দরিদ্র, নেজমার রূপের মূল্য দিতে পারে না—সে তাহা লাভ করিবার উপযুক্ত নহে। দরিদ্রের সুখ ও সৌভাগ্য সম্বন্ধে ধারণায় স্বাতন্ত্র্য থাকে। সে পার্থক্য তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়। যে উদয়াস্ত শ্রম করিয়াও সকল সময় গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় অর্জ্জন করিতে পারে না, সে যদি অর্থকে পরমার্থ বিবেচনা করে, তবে কি সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায়? সে কোথায় যাইবে? সে কি করিবে?

চিন্তা অনেক সময় তরকারীর ক্ষেত্রে ছাগের মত ব্যবহার করে। যদি ক্ষেত্রের দ্বার রুদ্ধ কর, সে বেড়ার মধ্য দিয়া ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়—যদি বেড়া নূতন করিয়া বাঁধ, সে বেড়া লাফাইয়া আইসে। এই সব চিন্তা তেমনই কাশেমের মনে আসিতে লাগিল—সে কিছুতেই তাহাদিগকে দূর করিতে পারিল না।

সে আজ নেজমাকে পাইয়াছে—কিন্তু—? গল্প আছে—রাজার মাহুতরা প্রভাতে যখন হস্তীগুলিকে "পালা" অর্থাৎ বৃক্ষপত্র ও শাখা আহার্য্য দিবার জন্য বাজারের মধ্য দিয়া নগরের বাহিরে লইয়া যাইতেছিল, তখন বাজারে মদ্যের দোকানের সম্মুখে মদ্যপানরত এক ব্যক্তি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হাতী বেচিবে?" মাহুতরা তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া হাসিয়া হাতী লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। অপরাহ্ণে তাহারা যখন হাতী লইয়া ফিরিতেছিল, তখনও সে সেই স্থানে উপবিষ্ট—কিন্তু আর মত্ত নহে। মাহুতরা তাহাকে "হাতী কিনিবে?" জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিয়াছিল, "যে হাতী কিনিতে চাহিয়াছিল, সে চলিয়া গিয়াছে—" অর্থাৎ তাহার মত্ততা দূর হইয়াছে।

কিন্তু নেজমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা কি সে নির্ম্মূল করিতে পারিয়াছিল—সে কি সে আকাঙ্ক্ষার মত্ততা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল? আজ যখন কল্পনাতীত বিপদের মধ্য হইতে সে নেজমাকে পাইয়াছে, তখন—তাহার কেশ ও দেহ হইতে নির্গত গন্ধদ্রব্যের সৌরভ তাহাকে অভিভূত করিয়া মত্ততা দিতেছিল কেন? তাহার পার্শ্বে উপবিষ্টার দেহের তাপ সে তাহার দেহে অনুভব করিতেছিল কেন?

কাশেম ভাবিল, এ কি? সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল—সে এত দুর্ব্বল! আর সে কখন যাহা হয় নাই তাহাই হইল—রসুলানের উপর বিরক্ত হইল। রসুলানই আপনার অনাবিল প্রেমে তাহার নেজমালাভে অক্ষমতার ক্ষত প্রক্ষালিত করিয়াছে—সে ক্ষত দূর করিয়াছে। কিন্তু সে কেন আবার সেই ক্ষতের কারণ হইয়াছে? আজ রসুলানের অসাধারণ সাহস ও কৌশল ব্যতীত নেজমা কখন বেগম-মহল হইতে ছদ্মবেশে আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইতে পারিত না। রসুলানই আজ তাহার প্রলোভনের উপাদান সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। সে কেন তাহার এই শত্রুতা করিল?

কিন্তু রসুলান কাহার অধিক শত্রুতা সাধন করিয়াছে—তাহার, না আপনার? সে স্বামীর তুষ্টি সাধনের জন্য আপনার কি বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে! কাশেম রসুলানের উপর যত রুষ্ট হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তত শ্রদ্ধার ও প্রশংসার সম্মিলিত জলোচ্ছ্বাস সেই রোষ ধৌত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তাহার ভালবাসা অসাধারণ—কাশেমের কল্পনাতীত—কাশেমের অভিজ্ঞতা তাহার সীমার সন্ধান পায় না। যে সমাজে সে জাত ও বর্দ্ধিত, সে সমাজে এইরূপ ত্যাগের দৃষ্টান্ত কবিকল্পনার বিষয় হইলেও বাস্তবের অতীত।

কাশেম কেবলই ভাবিতে লাগিল—এখন সে কি করিবে? নবোদ্গত যৌবন হইতে সে যাহাকে অমূল্য সম্পদ বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছে—যাহাকে লাভ করা সকল বাসনার তৃপ্তি বলিয়া মনে করিয়াছে, আজ সে তাহাকে পাইয়াছে—নানা বিপদের মধ্য দিয়া তাহাকে যখন সে পাইয়াছে, তখন সে যেন আপদ বলিয়াই মনে হইতেছে। হায় মানুষের মন! যত দিন তাহাকে পাইবার আগ্রহই প্রবল ছিল, তত দিন তাহাকে পাইলে সে কি করিবে তাহা চিন্তা করিবার অবসর তাহার মনে হয় নাই! আজ যখন সে অবসর আসিয়াছে, তখন সে ভাবিতেছে—সে এ কি করিয়াছে!

"দূরে যে কেবলই আলো তা'রে দূরে রাখা ভাল,
কাছে এলে মনে হ'বে হেথা হোথা—
অন্ধকার।"

কিন্তু অন্ধকার নহে—এ যে "কাল বৈশাখীর" প্রবল ঝঞ্ঝা—ইহাতে জীবনের সব ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তখনও কাশেম কেবল ভাবিতেছিল—মানুষ দুর্ব্বল, সে সকল সময় লোভ প্রহত করিতে পারে না। কি জানি, যদি তাহার মন আবার নেজমার প্রতি আকৃষ্ট হয়! রসুলানকে লইয়া সে যে সংসার রচনা করিয়াছে, তাহা সুখসুন্দর। কে বলিতে পারে—নেজমার আগমনে তাহার সুখ ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে না? যে দরিদ্র সে যখন বহু কষ্টে—বহু যত্নে তাহার কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া মনে করে, সে তাহার প্রিয়জনদিগকে লইয়া সুখে তাহাতে বাস করিবে, তখন যদি বৈশাখের ঝড়ে তাহা নষ্ট হয়, তবে তাহার অবস্থা কিরূপ হয়? যদি তেমনই হয়! এ কথা কি সে কল্পনা করিতেও পারে নাই? সে কি এমনই মূঢ়?

তাহার পর সে নেজমার কথা ভাবিতে লাগিল। নেজমার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন তাহাকে যে পাত্রে প্রদান করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছিলেন, যে পাত্র সে যত অপাত্রই কেন বিবেচনা করুক না—কোন্ অধিকারে সে তাহাকে তাহার অধিকারচ্যুত করে? সে নেজমার কে? কাহারও মূল্যবান দ্রব্যে চোরের যে অধিকার, নেজমায় তাহার সেই অধিকার। চোরের শাস্তি হয়—তাহারও শাস্তি হইতে পারে—আইনের বিচারে তাহাই হয়।

কিন্তু সে যে কেবল এই অতি মূল্যবান দ্রব্য আনিয়াছে তাহাই নহে। ইহা লইয়া সে কি করিবে—ইহা সে কোথায় রাখিবে? সে কথা সে ভাবে নাই? সে দরিদ্র—তাহাকে সংসার প্রতিপালনের জন্য পরিশ্রম করিয়া অর্থার্জ্জন করিতে হয়। সে যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার পরিমাণ কত হইতে পারে তাহা সে জানিয়াছে। সে অর্থে একটি ক্ষুদ্র দরিদ্র সংসারের অনিবার্য্য ব্যয় কোনরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে—এই মাত্র। সে উপার্জ্জনে সংসারের ব্যয়ে কোনরূপ বাহুল্য থাকিতে পারে না। সেই অর্থও সে কিরূপে অপরিচিত স্থানে উপার্জ্জন করিতে পারিবে, তাহাও সে জানে না। দিল্লীতে ফিরিবার উপায় তাহার নাই। সে যে বিদ্যার্জ্জনে আবশ্যক মনোযোগ দেয় নাই, সে জন্য সে পূর্ব্বে কখন অনুতপ্ত হয় নাই; কিন্তু আজ তাহাই হইল—তাহার মনে হইল, সে যদি আবশ্যক মনোযোগ সহকারে বিদ্যার্জ্জন করিত, তবে সে দিল্লী ব্যতীত অন্য স্থানেও অর্থার্জ্জন করিতে পারিত। ব্যবসায়েও সে মনোযোগ দেয় নাই—তাহাও শিক্ষাসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আর শিক্ষার সময় নাই। এখন তাহাকে অর্থার্জ্জন করিতে হইবে—সংসারে তিনটি লোক—সে, রসুলান ও নেজমা। সে কিরূপে সংসার প্রতিপালন করিবে?

এইরূপ চিন্তা হইতে কাশেম কিছুতেই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছিল না।

সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিবার পূর্ব্বেই ট্যাক্সী রেল ষ্টেশনে আসিল। কাশেম আপনি যান হইতে অবতরণ করিয়া নেজমাকে ও রসুলানকে নামাইল।

তখনও ট্রেণ আসিতে বিলম্ব ছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশের দ্বার বন্ধ ছিল—ষ্টেশনও অন্ধকার। তাহাদিগকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইল। এতক্ষণ কেহই কথা বলে নাই—আশঙ্কার পরিবেষ্টন যেন শ্বাস রোধ করিতেছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় চুপ করিয়া থাকা রসুলানের প্রকৃতির বিরুদ্ধ—তাই সে সর্ব্বপ্রথম কথা বলিল—"ট্রেণ কখন্ আসিবে?"

কাশেম বলিল, "বোধ হয়, আর অধিক বিলম্ব নাই।"

"কখন্ ট্রেণ হইতে নামিতে হইবে?"

"শেষ রাত্রিতে।"

তাহার পর সুপ্ত ষ্টেশনে জাগরণের চিহ্ন লক্ষিত হইল; ষ্টেশন মাষ্টারের কণ্ঠ শুনা গেল,—এক জন লোক আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিল, যে গবাক্ষ হইতে যাত্রীদিগকে টিকিট দেওয়া হয় তাহা মুক্ত হইল এবং তথায় একটি ল্যাম্প আলোক উদ্গীরণ করিতে লাগিল। কাশেম গবাক্ষ পার্শ্বে যাইয়া তিন জনের টিকিট কিনিল। তাহার পর তিন জন প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল।

কাশেম পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল, সে রসুলানকে ও নেজমাকে স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র কামরায় দিবে না। কারণ, সে জানিত, যেমন বেগম-মহল হইতে বাহির হইলে সৌরভে তাহাদিগের বিপদ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, তেমনই একান্ত অপ্রত্যাশিত কারণে বিপদ ঘটিতে পারে। ট্রেণ আসিলে সে একটি কামরায় উঠিয়া তাহাদিগকে সেই কামরায় তুলিল। কামরায় যে স্থানাভাব ছিল,

তাহা নহে; তবুও অন্য যাত্রীদিগের মধ্যে দুই এক জন বলিল, "মেয়ে গাড়ীতে কি স্থান নাই যে, মেয়েদেরও পুরুষের গাড়ীতে তুলিতে হইবে?" কাশেম সে কথার কোন উত্তর দিল না।

ট্রেণ ছাড়িল। তাহার যাত্রা নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য। কাশেমের মনে হইল, তাহার যাত্রার কোন উদ্দিষ্ট স্থান নাই। অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল। ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে যাত্রী নামাইয়া ও যাত্রী লইয়া রাত্রিশেষে ট্রেণ একটি বৃহৎ ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইলে কাশেম ট্রেণ হইতে নামিয়া সঙ্গী দুই জনকে নামাইল। সে যখন টিকিট কিনিয়াছিল তখন রসুলান শুনিয়াছিল, সে বোম্বাইএর টিকিট চাহিয়াছিল। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি বোম্বাই?"

কাশেম বলিল, "না। আজ এই সহরে বিশ্রাম করিয়া আবার যাত্রা করিব।"

ষ্টেশনে কি জনতা, কি গোলমাল!

টিকিট দেখাইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেই যান-চালকদিগের চীৎকার।

কাশেম একখানি ট্যাক্‌সী লইয়া তাহাকে বড় মুসাফের-খানায় যাইতে নির্দ্দেশ দিল।

ষ্টেশনের নিকটেই বড় মুশাফেরখানা। ট্যাক্‌সী যখন তাহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। মুশাফেরখানার কর্ম্মচারী খাটিয়ায় ঘুমাইতেছিলেন। ভৃত্যদিগের ডাকাডাকির পর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি একটু বিরক্ত ভাবেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়টি ঘর লওয়া হইবে?"

কাশেম বলিল, "একটি।"

তিনি খাতা বাহির করিয়া কাশেমকে তাহাতে স্বাক্ষর দিতে বলিলেন এবং তাহার পর আর একখানি খাতা দেখিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "তিন তলে—ছাপ্পান্ন নম্বর কামরা। এক 'সাহেব', দুই বিবি।" ঘর যখন একটি লওয়া হইল তখন তিনি মনে করিলেন—দুই জনই "সাহেবের" বিবি।

কাশেম কথাটিতে চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে আর এক চিন্তা আরম্ভ হইল—নেজমাকে সে কি বলিয়া পরিচয় দিবে?

চিন্তার পর চিন্তা যেন তাহাকে বিশ্রাম দিতেছিল না। এক দল শিকারী কুকুর যেমন হরিণকে ধরিবার জন্য দ্রুত ধাবমান হয়, বহু চিন্তা তেমনই তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল।

ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া তিন জন ত্রিতলে ছাপ্পান্ন নম্বর ঘরের দ্বারে উপনীত হইল। ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, ঘরে দুইখানি খাট আছে, আর একখানি পরে আনিয়া দেওয়া হইবে। সে যাইয়া লোক পাঠাইয়া দিতেছে, যদি কোন প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলিতে হইবে। স্নানের ঘর পার্শ্বেই আছে—জল উপরে ট্যাঙ্কে পাম্প করা আছে। অতি দ্রুত এত কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিদ্যুতের বাতি জ্বালিয়া কাশেম বলিল, "আর রাত্রিও শেষ হইয়াছে।" সে বিদ্যুতের বাতি জ্বালিলেই কোথা হইতে আলোকের সূচী যেন ঠিক্‌রাইয়া গেল। সকলেই বিস্মিত হইল। সে আলো নেজমার অঙ্গুরীর হীরক হইতে বাহির হইল।

কাশেম বলিল, "হীরা?"

নেজমা যেন লজ্জিতভাবে বলিল, "আসিবার তাড়াতাড়িতে অঙ্গুরী খুলিয়া রাখিয়া আসিতে ভুল হইয়াছে।" সে সেই প্রথম কথা বলিল।

কাশেম বলিল, "খুলিয়া রাখ—যদি কেহ দেখিতে পায়, সন্দেহ করিবে।"

রসুলান কাশেমকে বলিল, "তুমি হাত মুখ ধুইবে না?"

কাশেম বলিল, "অগ্রে তোমরা সারিয়া লও।"

ততক্ষণে রসুলান বোরকা খুলিয়াছে।

তাহার কথায় নেজমাও বোরকা খুলিল।

কত দিন—যেন কত যুগ পরে কাশেম নেজমাকে দেখিল। তাহার মনে হইল, রসুলান সত্যই বলিয়াছে, এ রূপ দরিদ্রের ঘরে শোভা পায় না—যে মণি বহুমূল্য তাহা স্বর্ণেই বসাইতে হয়—নহিলে তাহার মর্য্যাদা থাকে না।

১৯

কাশেমের কথা শুনিয়াই নেজমা তাহার অঙ্গুলী হইতে বহুমূল্য হীরক-সজ্জিত অঙ্গুরী খুলিয়া ফেলিয়াছিল। স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে সেটি রসুলানকে দিতে গেল। রসুলান হাসিয়া বলিল, "ও বেগমের অলঙ্কার—দরিদ্রের নহে। আমি ও অঙ্গুরী লইব না।"

নেজমা বিষণ্ণভাবে রসুলানের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি—তুমিও কি আমাকে ঐ কথা বলিবে? আমি কি তোমার ভগিনী নহি?"

কথা বলিতে বলিতে নেজমার গলাটা "ধরিয়া আসিল" —তাহার চক্ষুতে জল আসিল। রসুলানের মনে হইল, সেই অশ্রুসজল চক্ষুর দীপ্তি সেই হীরকের দীপ্তি অপেক্ষা মধুর। সে সাগ্রহে নেজমার নিকট হইতে অঙ্গুরীটি লইল এবং তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "হাঁ, নেজমা, তুমি আমার ভগিনী।"

রসুলান মনে করিল, সে যে বিপদের সম্ভাবনা অবজ্ঞা করিয়া বেগম-মহল হইতে তাহার উদ্ধার সাধন করিয়াছে, তাহাই মনে করিয়া নেজমা তাহাকে ভগিনীর স্থান দিয়াছে। সে ভাবিল; নেজমা যদি তাহার ঐরূপ কার্য্যের কারণ জানিত, তবে সে কখনই তাহাকে সে জন্য এত কৃতজ্ঞতা জানাইত না; সে কাশেমের জন্যই বিপদ বরণ করিয়াছিল এবং এক বার সে কাযে প্রবৃত্ত হইবার পর যেন তাহার "জিদ" বাড়িয়া গিয়াছিল—মাদক দ্রব্য যেমন উহা সেবনকারীকে মত্ত করে, বিস্ময়কর কার্য্যে আগ্রহ তাহাকে তেমনই মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু রসুলান নেজমার মনের ভাব বুঝিতে পারে নাই। মানুষ স্বাভাবিক আগ্রহে সৈনিককে প্রশংসা করে—মনে করে বীর সৈনিক মানুষের প্রশংসনীয় সকল গুণের ও বৈশিষ্ট্যের প্রতীক,—সৈনিকের উচ্চ স্তরে উপনীত হইবার উপকরণ—অন্যের উপর তাহার প্রভাব। সেই প্রভাব মানুষ প্রহত করিতে পারে না। নেজমারও কাশেমের সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছিল। যেমন উগ্র অগ্নিতাপে অল্পক্ষণ মধ্যে নানা ধাতু গলিয়া মিশিয়া যে অষ্টধাতুতে পরিণত হয়, তাহাই দেবমূর্ত্তির উপকরণ, তেমনই তাহার বিস্ময়ের অগ্নিতে প্রশংসা প্রভৃতি মনোভাব এক হইয়া যাহাতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা প্রেম। আপনার প্রেমের মধ্য দিয়া সে তখন সব দেখিতেছিল—তাহার জগতের কেন্দ্রে কাশেম অবস্থিত। রসুলান যে কেবল তাহাকে সেই কাশেমের নিকট আনিয়া দিয়াছে, তাহাই নহে—সে কাশেমের প্রেমও পাইয়াছে। সেই জন্য রসুলান তাহার ভগিনী।

রসুলান স্নানের ঘরের তাকের উপর অঙ্গুরী রক্ষা করিল। তাহার পর সে নেজমার দিকে চাহিয়া বলিল,— "হইল ত?"

নেজমা প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "রসুলান, তোমার চক্ষু কি সুন্দর!"

রসুলান বলিল, "বাল্যকালাবধি ঐ কথা শুনিয়া শুনিয়া সময় সময় আমার মনে হইয়াছে—চক্ষু কি উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে হয় না? কিন্তু তাহার পর বুঝিয়াছি, যাহার প্রশংসার এক ব্যতীত দ্বিতীয় উপকরণ নাই, তাহার ঐ এক উপকরণই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তোমার মত রূপসীর কোন্‌টি অধিক প্রশংসনীয়, তাহা স্থির করা যায় না।"

"কিন্তু রূপ যে অনেক সময় বিপদের কারণ হয়, তাহা ত আমিও জানিয়াছি, তুমিও জানিয়াছ।"

"রূপ ত সম্পদও বটে। নারীর উহা অপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ আর কি আছে?"

"গুণ।"

"সে রূপের পরে লোককে আকৃষ্ট করে, সেই জন্যই ত কথায় বলে—

'পহিলে দর্শনধারী
পিছে গুণ-বিচারী।'

রূপ অঘটন ঘটায়।"

"রূপের জন্য মানুষের জীবনে যে ঝড় বহিতে পারে, তাহা সর্ব্বনাশের সঙ্গী।"

উভয়ে এইরূপ কথা হইতে লাগিল।

নেজমা দীর্ঘকাল এমন স্বচ্ছন্দে কাহারও সহিত কথা বলিতে পারে নাই। বেগম-মহলে কথা বলিবার পাত্র কেবল বাঁদীরা; তাহারাও কলের মত কায করিত, কথা বলিবার প্রয়োজন বড় হইত না। তাই সে যেন আপনার কণ্ঠস্বর আপনি ভুলিয়া গিয়াছিল। তথায় যে কথায় আদেশ ব্যক্ত হয়, তাহাই উচ্চে উচ্চারিত হয়—কিন্তু তাহা কর্কশ; আর সবই যেন সভায় আত্মগোপন করিতে চাহে। মানুষ তথায় কৃত্রিমতার মধ্যেই বাস করে। স্বাধীনতা তথায় সর্ব্বপ্রকারে সঙ্কুচিত। তাই মুক্তির আনন্দে আজ নেজমা আনন্দিতা। যে স্বাধীনতা কখন হারায় নাই, সে কখন তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। তাই গল্প আছে, য়ুরোপের কোন যুদ্ধে এক জন সৈনিক শত্রুহস্তে

বন্দী হইয়া দীর্ঘকাল বন্দী থাকিয়া যখন মুক্তি পায়, তখন সে স্বদেশে ফিরিবার পথে এক ব্যক্তিকে একটি পিঞ্জরে কতকগুলি পাখী লইয়া যাইতে দেখিয়া সেগুলি কিনিয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। যাহা হারাই নাই, তাহার মূল্য আমরা বুঝিতে পারি না। তাই নেজমার আজ আনন্দ, আর সেই জন্যই রসুলান সে আনন্দের স্বরূপ বুঝিতে পারে নাই।

নেজমার আনন্দের দ্বিতীয় কারণ তাহার মুক্তিলাভের পরে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা তাহার সমগ্র হৃদয় ব্যাপ্ত করিয়াই বিকশিত হইয়াছিল এবং তাহার সৌরভের মত্ততা তাহার সমগ্র সত্তা যেন আবিষ্ট করিয়াছিল। আজ কাহারও উপর তাহার বিদ্বেষ, কাহারও সহিত তাহার বিরোধ ছিল না। আজ তাহার পক্ষে সংসার আলোকময়, জীবন আনন্দ-মধুর। যেন বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিপদসঙ্কুল সাগর হইতে সে কূলে যে নিরাপদ স্থানে উপনীত হইয়াছে, তাহাই নন্দনকানন—তাহা বিকচকুসুমে শোভিত, বিহগ-বিরাবে মুখরিত, তথায় সুখ আছে দুঃখ নাই। প্রেমের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে যে সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছে, সে আজ তাহার নিকটে—তাহাদিগের এই মিলনে কি কখন বিরক্ত আসিতে পারে?

স্নানশেষে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া উভয়ে যখন স্নানকক্ষ ত্যাগ করিবে, তখন রসুলান বলিল, "অঙ্গুরী যেন ভুলিয়া না যাই।" সে তাহা লইল।

উভয়ে যখন স্নান-কক্ষ হইতে আসিল, তখন তাহারা দেখিল, শয্যায় শয়ন করিয়া কাশেম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, চিন্তা—এই তিনটির যে কোন একটি মানুষকে অবসন্ন করে; সে তিনের সম্মিলিত আক্রমণ ভোগ করিয়াছে। তাই রসুলান ও নেজমা যাইবার পর সে ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শয্যায় শয়ন করিলেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল।

রসুলান তাহাকে ডাকিবার উপক্রম করিতে না করিতে নেজমা মৃদুস্বরে বলিল, "ঘুম ভাঙ্গাইবে?"

রসুলান মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিল, "না। প্রবল শ্রান্তির ফলেই নিদ্রা আসিয়াছে। একটু বিলম্ব করি।"

উভয়ে কি করিবে স্থির করিতে না করিতে কিন্তু কাশেমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা যে মৃদুস্বরে কথা বলিয়াছিল, তাহাতেই সেই লঘু নিদ্রার অবসান হইল।

কাশেম চাহিয়া দেখিল। রসুলান তাহার একটি মাত্র বাক্সে সামান্য কয়টি বেশ আনিতে পারিয়াছিল। তাহারা ধনী নহে, কিন্তু তবুও দিল্লী ত্যাগ করিয়া যাইবার পর কাশেম তাহাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বেশ দিয়াছিল—সে সবও সে আনিতে পারে নাই। আজ সে স্বয়ং একটি ফিরোজা বর্ণের বেশ পরিধান করিয়া নেজমাকে যে বেশটি দিয়াছিল, তাহার বর্ণ গাঢ় সবুজ। সেই বেশে তাহাকে সদ্য আহরিত ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা ফুলের মত দেখাইতেছিল। কি সুন্দর!

কাশেম উঠিয়া বসিল।

রসুলান তাহাকে অঙ্গুরী দেখাইয়া বলিল, "এটি কোথায় রাখিবে—রাখ।"

কাশেম বলিল, "বাক্সে রাখ।"

সে তখন রসুলানের দুঃসাহসের বিষয় চিন্তা করিতেছিল। তাহার কি মনে ভয় নাই যে, সে এই সুন্দরীকে স্বামীর কাছে আনিয়াছে? সে বেগম-মহলের সকল বিপদ সম্ভাবনা তুচ্ছ করিয়া যে সাহসের পরিচয় দিয়াছে, ইহা কি সেই দুঃসাহসেরই পরিচায়ক নহে? কিন্তু যদি স্বামীর প্রেম দৃঢ়তর করিবার জন্যই সে তখন সেই সাহসের পরিচয় দিয়া থাকে, তবে আজ তাহার কার্য্যে সে কি সেই ভালবাসাই বিপন্ন করিতে পারে না?

রসুলান বলিল, "যাও, স্নান করিয়া আইস। আজ সকলেরই নিদ্রার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। শয্যার যে অভাব, তাহা অনুভূতও হইবে না।"

কাশেম হাসিয়া বলিল, "কতক্ষণ ঘুমাইবে?

"কেন?"

"সন্ধ্যার সময় যে ট্রেণ।"

"সে তুমি যাহাই কেন বল না—আজ বিশ্রাম না করিয়া যাওয়া হইবে না।"

সকলেরই বিশ্রামের প্রয়োজন কত অধিক তাহা কাশেম বুঝিল, কিন্তু উপায় কি? সে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "বিশ্রাম প্রাচুর্য্যের সঙ্গে থাকে—দারিদ্র্যের নহে। দরিদ্রের ভাগ্যে বিশ্রাম কোথায়?"

আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ও তাহাতেই তৃপ্তি অনুভব করা স্বামীর সঙ্গসুখে অভ্যস্তা রসুলানের যেন প্রকৃতিগত হইয়াছিল। সে বলিল, "কিসের অভাব?

অভাব ভাবিলেই অভাব। আহার্য্যের, বস্ত্রের প্রাচুর্য্য ও বিলাস কে চাহে? আমরা আমাদিগের মনে অভাবকে স্থান না দিয়াই তাহাকে পরাভূত করিয়াছি।"

"কিন্তু সে সেই পরাভবের প্রতিশোধ লইতে পারে, রসুলান।"

"পারে না। তোমরা—পুরুষরা বড় ভীরু—কবে কি হইতে পারে ভাবিয়াই ভয় পাও।"

"তুমি সে কথা বলিবার অধিকারী বটে। কারণ, তুমি যে সাহস দেখাইয়াছ ও দেখাইতেছিলে, তাহা কল্পনাতীত।"

"যাহা কল্পনাতীত, তাহা কি কখন সম্ভব হয়?"

"তাহাকেই অসাধ্য-সাধন বলে।"

রসুলান নেজমার স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিল, "কেন, সাহসের কি পুরস্কার নাই?"

কাশেমের মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল, "বলিতে পারি না"—কিন্তু সে তাহা না বলিয়া, "আমি স্নান করিতে চলিলাম"—বলিয়া চলিয়া গেল।

সত্য সত্যই তাহার ভাবনার—দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।

কাশেম চলিয়া যাইলে নেজমা রসুলানকে বলিল, "সত্যই, রসুলান, তোমার সাহস অসাধারণ।"

"সাহস! সাহস কি আমার? শুনিয়াছি, চন্দ্রের আলো তাহার নহে—সূর্য্যের প্রতিফলিত আলো। আমাদিগেরও তাহাই, নেজমা। স্বামীর সাহসে স্ত্রীর সাহস—নহিলে বেগম-মহলের সংবাদ কে জানিত?"

নিজামুদ্দীনে মেলা হইতে ফিরিবার পথে কাশেম যে তাহাকে নেজমার উদ্ধার সাধনে সহায় হইতে প্রতিশ্রুত করিয়াছিল, সেই কথা হইতে তাহাদিগের উদ্ধারের উপায় চিন্তা, দিল্লী ত্যাগ করিয়া নবাবের রাজধানীতে আগমনের সময় কাশেমের বাঁদীর পোষাক প্রস্তুত করান—তাহাকে বেগম-মহলে পাঠাইবার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা, সে সব রসুলান বিবৃত করিতে লাগিল। প্রত্যেক কাযই যে কাশেমের বুদ্ধিজাত, তাহা তাহার কথায় নেজমাও বুঝিতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে কাশেমের সম্বন্ধে তাহার প্রশংসা তাহার অনুরাগ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

রসুলান যখন সেই কথা বলিতেছিল, আর নেজমা শুনিতেছিল, তখন মোসাফেরখানার এক জন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন দেখিল, ঘরে দুই জন স্ত্রীলোক, তখন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইয়া বারান্দা হইতে বলিল, তাঁহাদিগের কি কি জিনিষের প্রয়োজন বলিলে তাহার ব্যবস্থা হইবে।

নেজমা অভ্যাসহেতু আপনার বোরকা সন্ধান করিতে উঠিল। রসুলান বলিল, "সাহেব গোসলখানায় গিয়াছেন ফিরিয়া আসিয়া কি প্রয়োজন, তাহা বলিয়া আসিবেন।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

কাশেম স্নানঘর হইতে আসিলে রসুলান তাহাকে মোসাফেরখানার ভৃত্যের কথা বলিল। শুনিয়া কাশেম বলিল, "এক বেলা আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

রসুলান বলিল, "আর এক বেলা?"

"তুমি কি সত্য সত্যই আজ যাইবে না?"

"না।"

কাশেম বলিল, "এই একটি ঘর।"

"দুইটির প্রয়োজন? মোসাফেরখানার লোক ত আর একখানা খাট আনিবে বলিয়া গিয়াছে। তাহারও প্রয়োজন নাই। আমরা দুই ভগিনী এক খাটেই ঘুমাইতে পারিব। কি বল, নেজমা?"

নেজমা কিছু বলিল না। সে স্বভাবতঃ মৃদুস্বভাব—সে ভাব সে তাহার মাতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল। রসুলান সে প্রকৃতির নহে। বিশেষ অবিভাবকদিগের নিকট হইতে দূরে স্বামীর গৃহে গৃহিণী হইয়া থাকিয়া তাহার চিত্তের দৃঢ়তা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহার মতই নেজমার মত প্রভাবিত ও তাহাকে চালিত করিতেছিল।

কাশেম ভাবিতেছিল। তাহার ভাবনা বর্ত্তমানেরও বটে ভবিষ্যতেরও বটে—তবে ভবিষ্যতের ভাবনাই অধিক। এতদিন যে চিন্তা মনের মধ্যে শরতের আকাশে লঘু মেঘের মত দেখা দিয়াছে, আজ তাহা নিদাঘ-দিগন্তে ঘন মেঘের মতই হইতেছিল। তাহার বক্ষে বুঝি বিদ্যুৎও ছিল। সে ভাবিতেছিল, নেজমা আসিয়াছে—সে নিতান্ত বিচার-বিবেচনাহীন হইয়া যে কথা বলিয়াছিল, তাহাতে অকারণ গুরুত্ব আরোপ করিয়া—নানা বিপদের মধ্য দিয়া সে—রসুলানের সাহায্যে—তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে। তাহাতে তাহার ইষ্ট সাধিত হয় নাই—বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা হইয়াছে। আর তাহাতে নেজমারও যে ইষ্ট সাধিত
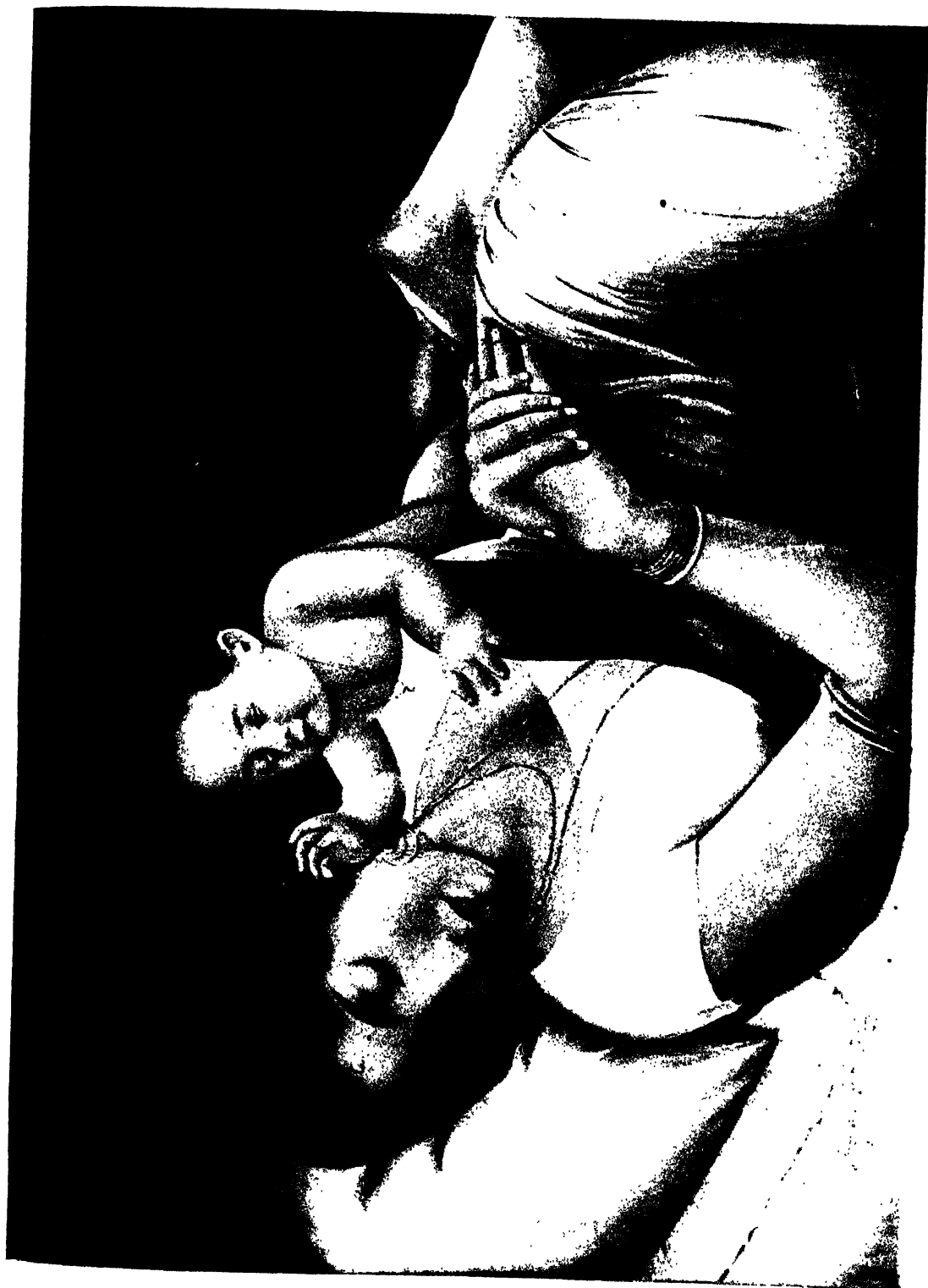
হইয়াছে, তাহা বলা যায় না এবং তাহার অনিষ্টই যে হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? ইহার পর নেজমার কি হইবে—সে তাহার দায়িত্ব কতদূর বহন করিতে পারিবে? সে নিঃসম্বল—কেবল নিঃসম্বল নহে—ঋণগ্রস্ত। সে রসুলানকে বিবাহ করিয়াছে, সে তাহার সব ভার বহন করিতে বাধ্য। আর নেজমার ভার? অকারণে সে সেই ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে যত ভাবিতেছিল, ততই সেই ভারের গুরুত্ব সে অনুভব ও উপলব্ধি করিতেছিল। সে কিরূপে তাহার ভার বহন করিবে? কি বলিয়া সে নেজমার পরিচয় দিবে? লোক কি মনে করিবে? লোকের কথা ধনীরা উপেক্ষা করিতে পারে—তাহারা সমাজকে অবজ্ঞা করিতে পারে; কিন্তু দরিদ্র তাহা পারে না। কারণ, দরিদ্রকে সমাজের বিধি-নিষেধ-শাসন মানিয়া চলিতে হয়। সমাজ তাহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবে, কে বলিবে? রসুলান এখন তাহার কার্য্যের সাফল্যে মত্ত হইয়া আছে। তাহাকে এখন এ সব কথা বুঝান যাইবে না—শুনিলেও সে বুঝিবে না। শুনাইবার অবকাশও নাই—সে এক বারও নেজমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে না। কিন্তু তাহাকে এ সব শুনাইতে ও বুঝাইতে হইবে, রসুলানকেও এসব শুনিতে ও বুঝিতে হইবে। সে জন্য অবসরের প্রয়োজন।

কাশেম রসুলানকে বলিল, "ভাল; তোমারই জয় হইল। আমরা আগামী কল্য বোম্বাই যাত্রা করিব।"

সে দুই বেলা আহারের ব্যবস্থা করিতে গেল। সে-ও শ্রান্ত হইয়াছিল; কিন্তু চিন্তার উত্তেজনা তাহাকে শ্রান্তি জয় করাইতেছিল।

যে ঘোড়া বহুক্ষণ শ্রম করে সে যখন মুক্তি পায়, তখন যেমন ভাবে তাহার বিশ্রাম উপভোগ করে, তিন জন আহারের পর তেমনই তাহাদিগের বিশ্রাম উপভোগ করিল। যখন সর্ব্বাগ্রে নেজমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অপরাহ্ণ। সে রসুলানকে জাগাইল। তাহার পর কাশেম উঠিল।

রসুলান কাশেমকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সহরে কি দেখিবার কিছুই নাই?"

কাশেম বলিল, "তাহা ত শুনি নাই।"

বাহির হইতে কাশেমের ইচ্ছা ছিল না। তাহার আশঙ্কাও যে ছিল না, তাহা নহে—নবাবের লোক নিশ্চয়ই সন্ধানে বাহির হইয়াছে, হয়ত সন্ধান পাইবে।

সে বোম্বাই নগরে উপনীত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তথায় যাইয়া—সামান্য সঞ্চয় নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বে তাহাকে অর্থার্জ্জনের উপায় করিতে হইবে। সে উপায়ের সন্ধানলাভ যে সহজ নহে, তাহা সে জানিত। কিন্তু সে কথা বলিয়া সে রসুলানকেও আতঙ্কিত করিতে চাহিল না। যে ভালবাসে সে সব চিন্তা আপনি লইয়া ভালবাসার পাত্রকে ভাবনামুক্ত করিতেই চাহে। তাহাতেই সে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ফুলের ফসল

ছোট এক-গুছি "করবী" কুসুম;
　　"ট্রেন" থামিয়াছে "ইষ্টিশানে"—
তুলিয়া নিলাম; কোথা তারে থুই?
　　চেয়ে দেখি যত যাত্রী পানে॥
ছোট এক মেয়ে ব'সেছিল চেয়ে
　　হাসিমুখে নিল সে ফুলগুলি—
পরিপাটি করি' একে একে একে
　　সাজালো তাহার খোঁপায় তুলি'!

* * * *

কাননের ফুল বৃন্তের 'পরে
　　ফুটেছিল কত মনের সুখে,
নিষ্ঠুর সম ছিঁড়িলাম তা'রে
　　অনুতাপে মরি দারুণ দুখে।
এবে দেখিলাম ফুলেলা আননে
　　রূপের কাননে পেল সে ঠাঁই—
খোঁপার বৃন্তে ফুটিল আবার!
　　মনে আর মোর দুঃখ নাই!

শ্রীরামেন্দু দত্ত

ইতিহাসের অনুসরণ

ভারতে মুসলমান-বিজয়

মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত-বিজয় ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা; কিন্তু এই ঘটনা নিবিড় রহস্য-জালে সমাচ্ছন্ন। এ সম্বন্ধে হিন্দু ঐতিহাসিকগণের লিখিত কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নাই। মুসলমানদিগের লিখিত কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সেই বিবরণ যে সম্পূর্ণ পক্ষপাতবর্জ্জিত ইহা বিশ্বাস করা কঠিন; এবং কি কারণে অবিশ্বাস্য তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে; বর্ত্তমানকালে আমরা সুস্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইতেছি যে, বিজয়ী-পক্ষ অনেক সময় আপনাদের নিষ্ঠুর, নীতিবিগর্হিত কার্য্যের সমর্থনের জন্য কতকগুলি সত্য তথ্য গোপন বা বিকৃত, এবং আপনাদের গৌরবসাধক কতকগুলি অতিরঞ্জিত কাল্পনিক কথার অবতারণা করিয়া নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা করেন। ফলতঃ, ইতিহাসের ধারা যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় না। সকল দেশের ইতিহাসেরই অল্পাধিক বিকৃতি এই ভাবেই সাধিত হইয়া থাকে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার উদ্ধার-সাধনের উপায় পাওয়া যায় না। যে সকল ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক-গবেষণাকারী নানা অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের চেষ্টা করেন, তাঁহারা অনেক সময় স্ব স্ব ব্যক্তিগত ঝোঁক ও ভ্রান্ত ধারণার ফলে ভ্রম-সংশোধনের চেষ্টায় নূতন নূতন ভুলের সৃষ্টি করিতেও কুণ্ঠিত নহেন; সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করিতে হইলে সকল সিদ্ধান্তই যে অভ্রান্ত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না।

ভারতে মুসলমান-বিজয়ের ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতি কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দী হইতে উত্তর-ভারতে রাজপুতদিগের রাজত্ব-কালের যুগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। এই সময়ে রাজপুত জাতিই আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সর্ব্বত্র রাজ্য স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। একথা সকলেরই সুবিদিত যে, রাজপুতরা চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। কতকগুলি আধুনিক ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে, তাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশীয় নৃপতিগণের বংশধর নহেন; তাঁহারা হূণ ও গুর্জ্জর জাতির বংশধর। এই হূণ বা হূন্নি জাতির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, হূণ জাতি মধ্য-এসিয়ার অন্যতম বর্ব্বর জাতি। ইহারা কাস্পিয়ান সাগরের সান্নিধ্যে বাস করিত। ইহারা মানব জাতির মঙ্গোলীয় (Mongolian) শাখা-সম্ভূত, এবং বর্ব্বর জাতি। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহারা তাতার (Tartary) দেশ হইতে চীনের প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে বাস করিত। ইহাদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা বৃষস্কন্ধ, ইহাদের নাসিকা চ্যাপ্টা, চক্ষু কোটরগত, এবং ইহাদের শ্মশ্রু-উদ্গম হইত না। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের বর্ণিত এই আকৃতির সহিত রাজপুতদিগের আকৃতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। এরূপ অবস্থায় রাজপুতরা যে হূণদিগের বংশধর, এরূপ ধারণা হয় না। ইহার পর য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা গবেষণা করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হূণ জাতির সহিত ক্ষত্রিয় জাতির শোণিত-সংমিশ্রণেই রাজপুত জাতির উদ্ভব। এই উক্তির সমর্থন করিতে হইলে যেরূপ নির্ভরযোগ্য প্রমাণের প্রয়োজন, সেরূপ প্রমাণের সম্পূর্ণ অভাব; অধিকন্তু তাঁহাদের প্রমাণ অতি দুর্ব্বল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে বিভিন্ন জাতির বা বর্ণের রক্ত-সংমিশ্রণের বিরোধী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত আছে; বৌদ্ধ যুগের শেষের দিকে সেই ব্যবস্থা, অর্থাৎ জাতিভেদ কতকটা শিথিল হইলেও উহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নাই; ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ত উহা হয়-ই নাই। এরূপ অবস্থায় কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রাজপুতরা হূণ বা গুর্জ্জরদিগের বংশধর, এইরূপ সিদ্ধান্ত আদৌ যুক্তিসহ নহে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহারা কোথায় পাইয়াছেন,—তাহা আবিষ্কার করা অসাধ্য। কতকগুলি হূণ দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে উত্তর এবং পশ্চিম-ভারতে আসিয়া বাস

রিয়াছিল,—এ কথা তথ্য হইতে পারে; কিন্তু রাজপুতরা যে তাহাদেরই বংশধর, ইহার প্রমাণ কোথায়? য়ুরোপীয়রা বলেন,—মিশ্র শোণিতসম্ভূত ঐ সকল হূণের বংশধরগুলিকে ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, তাহাদিগকে এক একটা ক্ষত্রিয়বংশজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন! কিন্তু ইহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তাঁহাদের কেতাবে নাই। কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে হিন্দুদিগকে জালিয়াৎ বলিয়াছেন! কিন্তু কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া ঐরূপ অশ্রদ্ধেয় কথা বলা ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি? আবার একদল য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, রাজপুতরা গ্রীক্‌দিগের বংশধর; অর্থাৎ রাজপুতরা যে ভারতীয় নহে, অন্য দেশের লোক ইহা প্রতিপন্ন ও প্রচার করিবার জন্য য়ুরোপীয়গণ অত্যন্ত আগ্রহবান; কিন্তু রাজপুতগণ প্রকৃতই ভারতীয়। কেবল দুই একটা নামের বা অভিখ্যার ধন্যাত্মক আংশিক সাদৃশ্য দেখিয়া উহাদিগকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়া অনুমান করিলে সে অনুমান ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনাই অত্যন্ত অধিক। ধ্বনিগত সাদৃশ্য দেখিয়া যদি কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, ক্যানিউট (Kanute) এবং কণিষ্ক একই ব্যক্তি ছিলেন, বাঙ্গালার গড়গড়ি অভিখ্যাত ব্রাহ্মণগণ প্রথম এবং প্রধান পোপ গ্রেগরীর বংশসম্ভূত, শান্তনু এবং সেন্ট এণ্ড্রুজ এক জাতীয়, তাহা হইলে যেরূপ হাস্যজনক ভ্রমে পতিত হইতে হয়, ইহাও সেইরূপ; যেহেতু, চাহমান বা চৌহান রাজপুতগণ আপনাদিগকে খিচি বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়, এবং হূণদিগের মধ্যে খিচি নামক একটা দল ছিল, অতএব চৌহান রাজপুতরা মঙ্গোলীয় হূণ, এরূপ সিদ্ধান্ত করাও কি হাস্যোদ্দীপক নহে? এখানে এ বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুতঃ, রাজপুতগণ হূণ বা গ্রীক-শোণিতসম্ভূত নহে, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়। রাজপুতরা শোণিতের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন,—ইতিহাসে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশ্র জাতিরা শোণিতের বিশুদ্ধি রক্ষায় কখন মনোযোগী হয় নাই।

যাহা হউক, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত যে যুগ আসিয়াছিল, আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে কেহ কেহ তাহা রাজপুত-যুগ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই কালে চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পরমার, প্রতিহার, চাহমান, গহড়বান, হৈহয়, চন্দেল্ল প্রভৃতি রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখা আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল হইয়া সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রায় সকল শাখাই শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু পরস্পর বিরোধে রত হইয়া ভারতের সামরিক শক্তি ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফলে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের ক্ষাত্র জাতিদের পক্ষে আর বাহির হইতে প্রচণ্ড আক্রমণে বাধাদানের তেমন অধিক শক্তি ছিল না। অবশেষে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্ষত্রিয়গণের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণগণ স্থানে স্থানে রাজ্য-শাসনের ভার লইয়াছিলেন। অধিকাংশ ক্ষত্রিয়-রাজই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছিলেন। পরস্পর বিবাদের ফলে ইঁহাদিগের শক্তিক্ষয় হওয়ায় ইঁহারা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমেও এই দোষ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। এই সুযোগেই গজনীর মামুদের পক্ষে ভারত আক্রমণ সহজ হইয়াছিল। ইসলাম ধর্ম্ম ৬২২ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পূর্ব্বে আরব দেশে প্রচারিত হইয়া তড়িৎ-বেগে পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি পশ্চিম-এসিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগ আয়ত্ত করিয়াছিল। আফগান রাজ্যে এবং ভারতে বহুকাল উহা প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই; তাহার কারণ, তখন আফগান রাজ্যের বহু স্থান রণকুশল হিন্দুদিগের দ্বারা শাসিত হইতেছিল। একটা উদাহরণ হইতেই ইহা পরিস্ফুট হইবে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু দেশে দাহির নামক রাজপুত-রাজা রাজত্ব করিতেন। এই স্থানের রাজপুতগণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা অহিংস ছিলেন। কিন্তু দেশের প্রজাসাধারণ বৌদ্ধ ছিলেন, এজন্য তাঁহারাও কতকটা হিংসাশূন্য ছিলেন। রাজপুত শাসকদিগের সহিত দেশের প্রজাসাধারণের প্রবল বিরোধ ছিল। সিন্ধুদেশের জলদস্যুরা সিংহল হইতে পারস্যগামী কয়েকখানি যাত্রী-জাহাজ লুণ্ঠন করে। পারস্যরাজ এজন্য ক্ষতিপূরণের দাবী করিলে রাজা দাহির এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রুদ্ধ পারস্যরাজ সিন্ধুপতিকে শিক্ষাদানের জন্য দাহিরের বিরুদ্ধে দুইবার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুইবারই পারসিক সৈন্যদলকে পরাভূত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। তৃতীয়বার পারস্যের শাসনকর্ত্তা (Hajjaj) হজ্জজ তাঁহার জামাতা মহম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বাধীনে এক বিপুল বাহিনী

প্রেরণ করেন। কাশিম সিন্ধুদেশে আসিয়া বৌদ্ধ জমিদার প্রভৃতিকে কুমন্ত্রণা দানে স্বকীয় দলভুক্ত করিয়াছিলেন। দাহিরের সৈন্যগণ যখন মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, তখন সিন্ধু দেশের বৌদ্ধগণ ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে দাহিরের রাজপুত সৈন্যদিগকে পরিবেষ্টন করিল। ফলতঃ (Rabar) রাবরের রণক্ষেত্রে দাহিরের বীর সৈনিকগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। দাহির রণক্ষেত্রে নিহত হইলে রাজমহিষী অসম সাহসের সহিত দুর্গরক্ষা করিতেছিলেন। যখন দুর্গরক্ষার আর কোন আশা রহিল না, তখন রাণী তাঁহার সহচরীবর্গে পরিবৃত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। কাশিম এই কৌশলে সিন্ধুদেশ জয় করিলেন। বৌদ্ধ সিন্ধু-প্রজাদিগের সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সিন্ধুদেশ যে পরাধীনতার নিগড়ে শৃঙ্খলিত হইয়াছিল,—তাহা হইতে আর তাহার উদ্ধার হয় নাই। যে বৌদ্ধগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই রাজ্যটি কাশিমের হস্তে তুলিয়া দিয়াছিল, কিছুকাল পরে তাহাদিগকেই বলপ্রকাশে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল! মহম্মদ বিন কাশিমও কোন কারণে খলিফার বিষদৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় খলিফার আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। সিন্ধু হইতে আরবগণ কয়েকটি হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল; * কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ঘটনা। ইহার পর ভারতে আর কিছু কাল মুসলমান-আক্রমণ হয় নাই।

সিন্ধু-বিজয় ব্যাপারে বুঝা যায় যে, হিন্দুস্থানে গৃহবিবাদে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পর-বিদ্বেষে বিদেশীদিগের পক্ষে ভারতীয় রাজ্যগুলিকে আক্রমণ করা সহজসাধ্য হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে এই সময়ে দেশাত্মবোধ অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। লোক ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের প্রেরণায় কার্য্য করিত। সেই জন্য কোন রাজ্য বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেই সেই রাজ্যের একদল প্রবল লোক আক্রমণকারীদিগকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইত না। দাহিরের সময় উহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ পাইলেও এই দেশাত্মবোধের অভাব ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল।

কাশিমের পর তিন শত বৎসর মুসলমানগণ আর ভারত আক্রমণ করিতে পারেন নাই। ক্ষমতা থাকিলে সে সুযোগ তাঁহারা ত্যাগ করিতেন না। তাঁহারা প্রথমে আফগান রাজ্যকে মুসলমান শাসনাধীনে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিন্ধুদেশ মুসলমানদিগের অধীন হইলেও আফগান রাজ্য হিন্দুদিগেরই অধীন ছিল। শুনা যায়, কণিষ্কের জনৈক বংশধর আফগান রাজ্য শাসন করিতেন। ইঁহারা তখন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। কাশিম কর্ত্তৃক সিন্ধু-বিজয়ের প্রায় শতাধিক বৎসর পরে পারস্য এবং তুর্কীস্থান হইতে সমাগত মুসলমান সেনাপতিরা ধীরে ধীরে উত্তর এবং পশ্চিম আফগান রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সকল স্থান হস্তচ্যুত হওয়াতে বৌদ্ধ এবং হিন্দুদিগের মনে কোন প্রকার ক্ষোভ বা দুঃখ হইয়াছিল—তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইঁহারা ক্রমশঃ পঞ্চনদ প্রদেশের দিকে ধাবিত হইলেন; কিন্তু স্বতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কোনরূপ চেষ্টাই ইঁহারা আর করেন নাই। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইয়াকুব বিন লইস নামক একজন মুসলমান সেনাপতি হিন্দুদিগের অধিকার হইতে কাবুল অঞ্চলটি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগে বোগ্‌দাদের আরব-রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ হইলে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। পারস্যের খোরাসান এবং মধ্য-এসিয়ার বোখারা অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে আলপ্‌তিগীন নামক জনৈক তুর্কী ক্রীতদাস গজনীর ভারতীয় শাসকদিগকে পরাজিত করিয়া গজনীতেই মুসলমান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। আলপ্‌তিগীন যে হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়া ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন তিনি ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণটি ছিলেন ঐ রাজ্যের মন্ত্রী। তিনি ঐ অঞ্চলের রাজা কণিষ্কের জনৈক বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইনি যুদ্ধবিদ্যায় সুদক্ষ ছিলেন না।

* এই স্থানের কমলা দেবী এবং দেবলা দেবীর কাহিনী ইতিহাসে বর্ণিত আছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। সেইজন্য সেই কাহিনীটি এখানে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইল না। কতকগুলি কাল্পনিক গল্পকে ইতিহাসের মর্য্যাদা দিলে ইতিহাসের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়—অনেক শিক্ষিত লোকও ইহা বুঝিতে পারেন না!

ভারতীয় রাজগণ ইঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না; সেই জন্য পঞ্জাবের প্রান্তবর্ত্তী স্থান গজনীর মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হইলেও ভারতের হিন্দুদিগের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই। আলপ্তিগীন তাঁহার বংশকে 'ইয়ামিনী' বংশ বলিয়া অভিহিত করেন। আলপ্তিগীনের মৃত্যুর পর তাঁহার ক্রীতদাস সবুক্তিগীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সবুক্তিগীন বহু তুর্কীকে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই সকল তুর্কী গজনী এবং তাহার সন্নিহিত জনপদগুলির হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মনে আতঙ্ক-সঞ্চার করিয়াছিল। কাবুল মুসলমানদিগের হস্তগত হইলে উহার ব্রাহ্মণ রাজবংশ (শাহাবংশ) উন্দ (Und) বা উদ্ভাণ্ডপুর নামক এক নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এই উদ্ভাণ্ডপুর বর্ত্তমান আটকের আট ক্রোশ উত্তরে সিন্ধুনদতীরে অবস্থিত ছিল। জয়পাল গজনীস্থিত তুর্কীদিগের সহিত বারংবার যুদ্ধ করিয়াও কখন বিশেষভাবে জয়ী হইতে পারেন নাই; বরং বহুবার পরাজিত হইয়াছিলেন। পরাজিত ব্রাহ্মণ রাজবংশীয় রাজা জয়পাল আফগান রাজ্যের অংশ তুর্কীদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতীয় অন্যান্য নৃপতি জয়পালের সাহায্যার্থ প্রথমে অগ্রসর হইলে ইতিহাসের ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হইত।

ইহার পর সবুক্তিগীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইস্মাইল তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু উহার সাত মাস পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মামুদ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। তিনি খলিফার নিকট হইতে সুলতান উপাধি লাভ করেন, এবং প্রতি বৎসর ভারত আক্রমণের ব্যবস্থা করেন। তিনি কতবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ দুষ্প্রাপ্য। কেহ কেহ বলেন, তিনি ২২ বার ভারত আক্রমণ করেন। কেহ কেহ বলেন, ভারত তৎকর্ত্তৃক সতের আঠার বার আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক উৎচীর "কিতাব উল-যামিনী" নামক গ্রন্থে উহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; তবে উহা মামুদের মৃত্যুর অল্পকাল পরে লিখিত। ফেরিস্তায় উহার বিবরণ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু উহা মামুদের অভিযানের অনেক পরে লিখিত; সুতরাং উহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না। ইহার পর "তৈমুন আকবর অব গির্দ্দিজী" নামক একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মূল পুস্তকখানি ফার্সি ভাষায় লিখিত। অধ্যাপক মহম্মদ নাজিম কর্ত্তৃক উহা প্রকাশিত হইয়াছে। কথিত আছে—এই গ্রন্থখানি সুলতান মামুদের মৃত্যুর কুড়ি পচিশ বৎসর পরে লিখিত হইয়াছিল। সেই জন্য অনেক ইতিহাসলেখক উহা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু উহার প্রদত্ত বিবরণ কোন কোন স্থানে অতিরঞ্জিত বলিয়া সন্দেহ হয়। ইহাতে প্রকাশ, ৩৯০ হিজিরায় অর্থাৎ ১০০০ খৃষ্টাব্দে মামুদ প্রথমে ভারত আক্রমণ করিয়া অনেকগুলি কেল্লা দখল করিয়াছিলেন। ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা কঠিন। কারণ, অন্য কোন ঐতিহাসিক এই অভিযানের উল্লেখ করেন নাই। অন্য সকলের মতে মামুদ ৩৯১ হিজিরার ৫ই রমজানে (১০০১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট তারিখে) দশ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার পিতৃবৈরী রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান করেন। রাজা জয়পাল তাঁহার বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করেন; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী হইতে হয়। তাঁহার কয়েকটি পুত্র এবং ভ্রাতাকেও মামুদ বন্দী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা জয়পাল মামুদকে করদানের অঙ্গীকারে পরে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত তেজস্বী নরপতি জয়পালের মনে এতই ধিক্কার জন্মিয়াছিল যে, তিনি স্বহস্তে চিতা সজ্জিত করিয়া সেই চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। গির্দ্দিজীতে কথিত হইয়াছে যে, সুলতান মামুদ শতদ্রু নদীর তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। অনেকের মতে ইহাই ভারতের বিরুদ্ধে মামুদের প্রথম অভিযান। ৩৯২ হিজিরার ৮ই মহরম (১০০১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নবেম্বর) রণক্ষেত্রে জয়পালের সহিত মামুদের শক্তিপরীক্ষা হইয়াছিল।

ইহার পরে মামুদ আর প্রায় সাত বৎসর কাল ভারত আক্রমণ করেন নাই; অন্ততঃ অন্য ইতিহাসে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু গির্দ্দিজী লিখিয়াছেন, ১০০৩ খৃষ্টাব্দের পর মামুদ ভাটিয়া বা ভাটিণ্ডা আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করেন। এই স্থানে তিন দিন ধরিয়া উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রামের পর ভাটিণ্ডা-রাজ বাজ

রাও সৈন্যদিগকে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধে পাঠাইয়া স্বয়ং সাসনা (Sasana) নদীতীরে গমন করেন। মামুদ তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলে বাজ রাও অপমানের ভয়ে আত্মহত্যা করেন, কিন্তু মরিয়াও অপমান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না; মামুদের সেনাপতি মৃত বাজ রাওয়ের মাথা কাটিয়া লইয়া মামুদকে উপহার দান করিলেন। এই কাহিনী নানা কারণে বিশ্বাসের অযোগ্য, এবং এই অভিযানের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। উৎবী ইহার কথা কিছুই বলেন নাই; ফেরিস্তাতেও এই প্রকার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার—এত বড় হিন্দুগ্লানির উল্লেখ নাই। ভাটিওয়ায় কোন ধন-রত্নের আকর্ষণ ছিল না; তবে পরস্বাপহারী অর্থগৃধ্নু মামুদ কোন্ লোভে সেখানে আকৃষ্ট হইবেন? মামুদ মধ্যে যে সাত বৎসর ভারত আক্রমণে বিরত ছিলেন,—তাঁহার প্রকৃতির সহিত এই সুদীর্ঘ বিরামের সামঞ্জস্য না থাকায় এই আক্রমণের কাহিনী রচিত হইয়া তাঁহার অশ্রান্ত ভারত আক্রমণের বার্ত্তা ঘোষিত হওয়া অসম্ভব নহে।

গির্দ্দিজীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ৩৯৬ হিজিরায় বা ১০০৬ খৃষ্টাব্দে মামুদ বক্রপথ ধরিয়া মুলতান আক্রমণ করিয়াছিলেন। মুলতানের রাজা আনন্দ পাল পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে পলায়ন করেন। মামুদ মুলতান অবরুদ্ধ করিলেন; শেষে উভয় পক্ষের সন্ধি হয়। কিন্তু এ ব্যাপারটির সহিতও সত্যের সম্বন্ধ স্বীকার করা কঠিন। উৎবী বা ফেরিস্তা কেহই উহার উল্লেখ করেন নাই। গির্দ্দিজীর মতে ইহার পর আর আনন্দ পালের সহিত মামুদের কোন সংঘর্ষ হয় নাই; কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকরা বলেন, ১০০৮ খৃষ্টাব্দে মামুদ মুলতানের জনৈক সর্দ্দার আবুল-ফৎ লোদীকে শাস্তিদানের জন্য ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে কঠোর শাস্তিই দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সুলতান মামুদের সহিত জয়পালের পুত্র আনন্দ (অনঙ্গ?) পালের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের অনেক হিন্দু রাজা আনন্দ পালকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য ও অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন; তথাপি আনন্দ পালকে যুদ্ধে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। মামুদ হিন্দুদিগের অনুসরণে নগরকোটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি জ্বালামুখীর প্রসিদ্ধ হিন্দুমন্দির বিধ্বস্ত করিয়া নগরকোট-দুর্গ অবরুদ্ধ করেন; তিন দিন পর দুর্গ শত্রুহস্তে নিপতিত হইলে মামুদ দুর্গসঞ্চিত বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। প্রকাশ, এই সময়ে ব্রাহ্মণ রাজা জয়পালের এক পৌত্র সুখপাল হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনি পরে, কি কারণে প্রকাশ নাই, ইস্‌লামধর্ম্ম ত্যাগ করেন; এই সংবাদে ক্রুদ্ধ মামুদ তাঁহার প্রতি দণ্ডবিধানের জন্য পুনর্ব্বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুখপালকে বন্দী অবস্থায় নিহত হইতে হইয়াছিল, বেচারা কেঁচে গণ্ডুষ না করিলে হয় ত বাঁচিয়া যাইতেন। মামুদ এই সময়ে মুলতান নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও আনন্দ পাল মামুদের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দুসৈন্য অপেক্ষা তুর্ক সৈন্যরা অধিক রণ-কুশল থাকায় তিনি অধিকাংশ যুদ্ধেই পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি নন্দন নামক নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। মামুদ ঐ নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন; তথাপি আনন্দ পাল মামুদের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন পালও মামুদের সহিত যুদ্ধে বিরত হন নাই।

৪০২ হিজিরায় (১০১২ খৃষ্টাব্দে) পরধনলোলুপ সুলতান মামুদ থানেশ্বর লুণ্ঠনের অভিসন্ধিতে বিপুল বাহিনীসহ গজনী হইতে ভারতে অভিযান করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিপতি ত্রিলোচন পাল এই সংবাদ শ্রবণে মামুদকে জানাইয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে ত্রিলোচন পাল তাঁহাকে ৫০টি হস্তী উপহার প্রদান করিবেন; কিন্তু থানেশ্বর-মন্দিরের অমূল্য হীরক-রত্ন যাঁহার লক্ষ্য, গোটাকতক হাতী দিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। মামুদের সৈন্যদল "রামের শিবিরে" উপস্থিত হইলে ত্রিলোচন পালের সৈন্যদল সুরক্ষিত স্থান হইতে মামুদের সৈন্যদলকে আক্রমণ করে। ইহাতে বহু তুর্কী সৈন্য নিহত হইলেও এই ক্ষতি মামুদকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। মামুদ থানেশ্বরে প্রবেশ করিয়া পুরী জনমানবহীন নিস্তব্ধ শ্মশানবৎ প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি তখন মনের সাধে হিন্দুর দেব-প্রতিমাগুলি চূর্ণ করিলেন। থানেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত জোগারওম্ নামক বিখ্যাত বিগ্রহকে মামুদ গজনীতে লইয়া যান, এবং তাহা একটি দর্গায় স্থাপন করেন, সম্ভবতঃ দর্গায়

তাহা পাদপীঠরূপে ব্যবহার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। * ১০১৪ খৃষ্টাব্দে বড় জয়পালের নন্দনগর অধিকার করিয়া উহার রাজাকে বন্দী করিবার উদ্দেশ্যে মামুদ পুনর্ব্বার ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন। রাজা বড় জয়পাল তাহা জানিতে পারিয়া বিশিষ্ট যোদ্ধৃবর্গের হস্তে দুর্গরক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং কাশ্মীরাভিমুখে প্রস্থান করেন। মামুদ নন্দপুরাধীশের নগরে উপনীত হইয়া উহার দুর্গ অবরুদ্ধ করেন। দুর্গরক্ষক সৈনিকরা অবশেষে নিরুপায় হইয়া মামুদের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়াছিল। মামুদ যথেচ্ছাক্রমে সেই স্থানের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। লুণ্ঠন শেষ করিয়া মামুদ রাজাকে ধরিবার জন্য কাশ্মীর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। গির্দ্দিজী বলেন, এই রাজার নাম বড় জয়পাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ত্রিলোচন পাল তখন নন্দনের রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ থানেশ্বরের রাজা বড় জয় পাল স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল নন্দ—নন্দন নহে। এই জটিল ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করা অসাধ্য। অনেক বিবরণ অনুমানে নির্ভর করিয়া রচিত বলিয়াই মনে হয়। উন্দ বা উদ্‌ভাণ্ডপুরের রাজা ত্রিলোচন পাল ১০২১ খৃষ্টাব্দে মামুদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। ত্রিলোচন পালের পুত্র ভীমপাল তাঁহার পর মামুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পরলোক-গমনে এই শাহী নামক ব্রাহ্মণ রাজবংশ বিলুপ্ত হইলে ১০২৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব মামুদের রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

মামুদ দুইবার কাশ্মীর রাজ্য জয় করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রতিহাররাজ রাজ্যপালের রাজধানী কণৌজ নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি মথুরা জয় করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন; পরে কণৌজ জয় করেন। কাপুরুষ রাজ্যপাল মামুদের আগমন-সংবাদ পাইয়াই রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া কুড়ি ক্রোশ দূরবর্ত্তী বারিনগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন; সুতরাং মামুদ অতি সহজেই কান্যকুব্জ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মামুদের প্রস্থানের পর রাজ্যপালের সামন্ত রাজগণ তাঁহার কাপুরুষতায় বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। চিণ্ডেল্লরাজ গণ্ডের পুত্র বিদ্যাধর তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। এই সংবাদ পাইয়া মামুদ চিণ্ডেল্লরাজ গণ্ডকে দণ্ডদানের জন্য পুনর্ব্বার গজনী ত্যাগ করেন। তিনি তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী বারিনগর বিধ্বস্ত করেন। ইহার পর তিনি বিদ্যাধরকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা সফল হয় নাই। তিনি বিফলমনোরথ হইয়াই স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ভারতবর্ষ আক্রমণে আর কখনও মামুদকে এভাবে বিফলমনোরথ হইতে হয় নাই।

ইহার কয়েক বৎসর পরে ৪১৩ হিজিরায় (১০২২ খৃষ্টাব্দে) মামুদ চিণ্ডেল্লরাজ গণ্ডকে (গির্দ্দিজীর মতে ইঁহার নাম নন্দ) দমন করিবার জন্য বিপুল সৈন্যদল সহ গজনী ত্যাগ করেন। যাত্রাপথে তিনি গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করেন। চারি দিন দিবা-রাত্রি অবরুদ্ধ রাখিয়াও মামুদ ঐ দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে দুর্গস্বামী রাজা অর্জ্জুন ৩৫টি হস্তী উপহার দিয়া মামুদের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। অতঃপর মামুদ কালাঞ্জর দুর্গে চিণ্ডেল্লরাজ গণ্ডকে (মতান্তরে নন্দ) অবরুদ্ধ করেন। মামুদ যথাসাধ্য চেষ্টাতেও এই দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। রাজা গণ্ড অবরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করা অত্যন্ত অশান্তিজনক বুঝিয়া অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করেন। মামুদ প্রায় তিন শত হস্তী লইয়া রাজা গণ্ডের (নন্দের) সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে মামুদ সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, পরে মামুদ ৪৫টি দুর্গ গণ্ডকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা বিজয়ীর জয়ের নিদর্শন নহে।

মামুদ কর্ত্তৃক মথুরা এবং বৃন্দাবন জয় বিশিষ্ট ঘটনা। ১০১৮ খৃষ্টাব্দের অভিযানে তিনি বৃন্দাবন জয় করিয়া বহু সুরম্য হর্ম্ম্য বিধ্বস্ত, এবং বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। অতঃপর মামুদ কর্ত্তৃক সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠনই সর্ব্বপ্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বিখ্যাত মন্দিরটি কাথিয়াবাড়ের সাগরতীরস্থ কোন নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক শিবলিঙ্গ এই মন্দিরের বিগ্রহ। বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ এবং মনিমাণিক্য এই মন্দিরে সঞ্চিত ছিল। মুসলমান সৈন্যমণ্ডলী এই নগর অবরুদ্ধ করিলে নগররক্ষক রাজপুরুষ মামুদের নাম

* গির্দ্দিজী ৭০-৭১ পৃষ্ঠা।

শুনিয়াই ভয়ে সপরিবারে নগর ত্যাগ করেন ; কিন্তু নগর-বাসীরা প্রাণপণে নগর রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই নগর কত দিন অবরুদ্ধ ছিল, সে সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। যাহা হউক, কিছু দিন পরে মামুদ নগরে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যদিগের হস্তে বহু ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ নিহত হইয়াছিল। তিনি প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গির্দ্দিজী প্রভৃতির মতে তিনি ঐ মন্দির অভিমুখে যাত্রা-কালে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন, এবং প্রত্যাগমন কালে রাজা পরমদেবের ভয়ে তাঁহাকে দুর্গম পথে চলিতে হইয়াছিল। পথের কষ্টে তাঁহার বিস্তর সৈন্য বিধ্বস্ত হয়। ইহা ভিন্ন সিন্ধু অঞ্চলে জাঠ এবং সৈহন (Saihon) অঞ্চলের ভাটিয়ারা তাঁহার সৈন্যগণকে নানাপ্রকার অসুবিধায় ফেলিয়াছিল। তাহাদিগকে প্রতিফলদানের উদ্দেশ্যে তিনি পুনর্ব্বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং কৌশলে জাঠ-দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহাকে মধ্য-এসিয়ায় সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সোমনাথ মন্দির-ধ্বংসের চারি বৎসর পরে মামুদের মৃত্যু হয়।

সুলতান মামুদ অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যুদ্ধের অনেক নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিয়া-ছিলেন। ১০২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জাঠদিগের নৌ-বাহিনী ধ্বংস করিবার জন্য স্বকীয় উদ্ভাবনী-শক্তিবলে একপ্রকার নৌকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি ভারত হইতে বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, এবং সেই অর্থে মধ্য-এসিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক অসমসাহসিক যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া ভারত আক্রমণের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম কয়েকটি আক্রমণের ভীষণতা দেখিয়া লোকের মনে এতই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কেহই জয়লাভের আশা করিতে পারিতেন না। সেই জন্য অনেকে যুদ্ধের পূর্ব্বেই রাজ্য বা রণস্থল হইতে পলায়ন করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সময়ে হিন্দুস্থান নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে বিবাদ লাগিয়াই থাকিত ; কাজেই তাঁহারা সকলে সম্মিলিত ভাবে মামুদের আক্রমণে বাধাদানের চেষ্টা করেন নাই। তাহার উপর বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে লোকের যুদ্ধের স্পৃহা কতকটা বিলুপ্ত হইয়াছিল। মামুদের আক্রমণের যে সকল বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে,—তাহা সমস্তই মুসল-মান ঐতিহাসিকের লেখনীপ্রসূত—হিন্দুর লিখিত কোন বিস্তৃত বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইহা প্রকৃতই ক্ষোভের বিষয়। মুসলমান ঐতিহাসিক উৎচীর বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, ফেরিস্তার বিবরণ অনেক পরে লিখিত। গির্দ্দিজীর জৈন্নুন আকবরের প্রদত্ত বিবরণ অনেক স্থলে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। সংগ্রামে কেহ কেহ স্বপক্ষের পরাজয়, বিশ্বাসঘাতকতা, কূট কৌশল প্রভৃতির প্রসঙ্গ গোপন করিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন। বর্ত্তমান যুগেও যুদ্ধ সম্বন্ধে এই নীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে ; উভয় পক্ষের যুদ্ধের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না ; সকলেই স্বপক্ষের ন্যায়নিষ্ঠারই উল্লেখ করেন। একথা সত্য যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান ধর্ম্ম আরবদেশে উদ্ভূত হইয়া খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম পাদেই পশ্চিম-এসিয়ায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পারস্য ও উত্তর-আফ্রিকা ঐ সময়মধ্যে মুস্লিমদিগের অধীন হইয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই সুদূর স্পেনেও ইস্লাম ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল ; কিন্তু ভারতে তত শীঘ্র ইহার প্রভাব অনুভূত হয় নাই। সত্য বটে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিন্ধুদেশে মুস্লিম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পর আর তিন শত বৎসর কাল মুসলমানগণের ভারত-বিজয়ের কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। মুসলমানগণ এই তিন শত বৎসর কাল ভারত আক্রমণে বিরত ছিলেন না ; কিন্তু কণৌজের গুর্জ্জর এবং প্রতিহার রাজবংশের শৌর্য্য-বীর্য্যে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। অবশেষে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম-পাদে গজনীর মামুদ ভারত আক্রমণ করিয়া ভারত-বর্ষে মুসলমান-অধিকার প্রতিষ্ঠার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পরবর্ত্তী ঘটনার বিবরণ ইতিহাসে বহুবার আলোচিত হইয়াছে ; তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

১
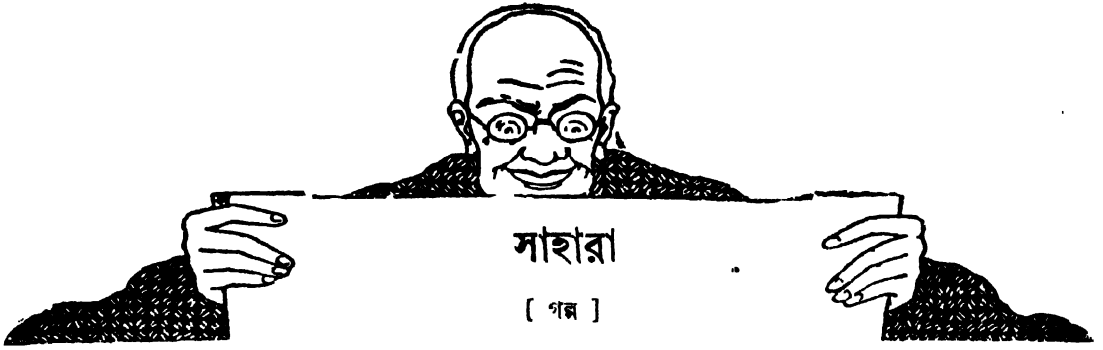
দু'টিমাত্র মানুষ লইয়া এই ক্ষুদ্র সংসারটি; বিপত্নীক মাতুল মহিম, ও পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয় জ্যোতি।

জ্যোতি কলেজে পড়ে, আর মহিম গুরু-গম্ভীর চালে সম্পত্তির দেখা শোনা করেন, এবং অকাল-বার্দ্ধক্যকে বরণ করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে মহিমের পত্নী-বিয়োগ হয়, তদবধি যেন কতকটা চেষ্টা করিয়াই, যৌবন-সীমা অতিক্রম করিবার পুর্ব্বেই তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বয়স এখন মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর; কিন্তু তিনি এমন চালে থাকেন যে, তাঁহাকে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ মনে করিলেও অসঙ্গত হয় না। মহিম নিরামিষাশী; তিনি খুব পুরাণ চালের ভাত খান, এবং নিরামিষ ঝোল, কাঁচকলা, ডুমুর, হিংচে, গিমে প্রভৃতি অখাদ্য তরিতরকারিগুলিই তাঁর প্রিয়-খাদ্য!—বলেন, বুড়া বয়সে এইগুলিই সুপথ্য। শীতকাল আসিলে সন্ধ্যার পর আর ঘরের বাহিরে যান না; গলায় মাফ্‌লার জড়াইয়া, পায়ে উলেন মোজা আঁটিয়া, রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে বসিয়া বুড়া মানুষের মতন খুক্-খুক্ করিয়া কাসিতে থাকেন। ভৃত্য মধু মুহুর্মুহু গড়গড়ায় কল্কে বদলাইয়া দিয়া যায়। তবে বন্ধু বান্ধব আসিয়া জুটিলে তাহাদের সঙ্গে ভাগবতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনায় সময়ের সদ্ব্যবহার করেন।

এই মামার ভাগিনেয় হইলেও জ্যোতি 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' এই প্রবাদ-বাক্যের মূর্ত্তিমান ব্যতিক্রম; আচার ব্যবহারে সে তাঁহার ঠিক বিপরীত। সে কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিয়া এক দিস্তা লুচি উদর-গহ্বরে প্রেরণ করে; দুধ আধ সের মাত্র খায়, এবং একজোড়া ডিম উদরস্থ করে। তাহার পর টেনিস্-সু' পায়ে দিয়া, র‍্যাকেট ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়ে।

সে ক্লাবে ব্রীজ খেলে, ডিবেটিং-সোসাইটিতে বক্তৃতা করে, ইউথ-লীগের প্রেসিডেণ্ট হয়, রোয়িংক্লাবের ক্যাপ্টেনী করে, সুইমারর্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী হয়, পুটিং দি ডিস্কাসের চ্যাম্পিয়ান হয়, ফুটবলের গোল-কীপারী করে, ছাত্র-সমিতির সভাপতি হয়, পাড়ায় বারোয়ারী পূজা হইলে সেই দলেরও মোড়লী করে, নাট্যসমিতির কোষাধ্যক্ষ হয়, এবং অবসর কালে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করে। চরিত্রগত সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও মাতুল ও ভাগিনেয়ের মধ্যে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন প্রগাঢ়। জ্যোতি মামাকে অত্যন্ত সম্মান করে; তাহার সম্মুখে কখনও চোখ-তুলিয়া কথা বলিতে পারে না। বাহিরে সে যেমন চঞ্চল; ভিতরে মহিমের কাছে তেমনই শান্ত, যৎপরোনাস্তি নিরীহ। মহিমও জ্যোতিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সংবাদপত্রে যেখানে খেলাধুলা, বা যে কারণেই হোক, জ্যোতির নাম দেখিতে পান, কাঁচি দিয়া সেটুকু কাটিয়া লইয়া একখানি মোটা-খাতার পাতায় আঠা দিয়া আঁটিয়া রাখেন। বন্ধুরা জ্যোতির বিবাহের কথা বলিলে সেই প্রস্তাবে তেমন কর্ণপাত করেন না; কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে বলেন—এম-এ-টা আগে পাশ করুক তো।

আসলে কিন্তু ইচ্ছাটা তা নয়, বোধ হয় মনে করেন, যত দিন না বিবাহ হইতেছে, তত দিনই জ্যোতির বহুমুখী প্রতিভা এইভাবে বিকাশ লাভ করিবে। বিবাহ হইলেই সেই মেয়েটাকে কেন্দ্র করিয়া জ্যোতি সৌর-মণ্ডলের গ্রহের ন্যায় তাহার আকর্ষণেই ঘুরিতে থাকিবে, এবং কিছু দিনের মধ্যেই সব প্রতিষ্ঠা হারাইবে। নারী জাতির উপর তাঁহার তেমন শ্রদ্ধা বা স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় না। দিবারাত্রি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বরং নারী জাতিকে মোহরজ্জু বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই নারীবিহীন শৃঙ্খলা-বিরহিত সংসারে সহসা এক দিন অতর্কিতভাবে নারীর আবির্ভাব্ হইল; তাহা যেমন তাঁহার অপ্রত্যাশিত, তেমনই অবাঞ্ছনীয়। হুগলী জিলার কোন এক গ্রামে মহিমের এক মাস্‌শাশুড়ীর বাড়ী ছিল। পত্নীর জীবিতাবস্থায় মহিম বিভিন্ন উপলক্ষে চারি পাঁচ বার সেখানে গমন করিয়াছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি আর তাঁহাদের কোন সংবাদ রাখিতেন না। সেই মাস্‌শাশুড়ী সহসা এক দিন এক তরুণীসহ মহিমের গৃহে আবির্ভূত হইলেন। মহিম তখন ভাগবৎ পাঠে তন্ময়; মধু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নিবেদন করিল—দু'টি মেয়েছেলে কোথা থেকে আমাদের বাড়ীতে এলেন।

বিস্মিত মহিম চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, "মেয়েছেলে? অ্যাঁ, আমাদের বাড়ী মেয়েছেলে? বলচিস্ কি রে? নম্বর ভুল ক'রে এ বাড়ীতে ঢোকে নি ত?"

মধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না, আপনার নাম বল্‌লেন যে!"

অগত্যা ভাগবতখানি মাথায় ঠেকাইয়া ও চশমাটা মুছিয়া-লইয়া তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন।

একটি বিধবা প্রৌঢ়া নীচের দালানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার কপাল পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠনে আবৃত। একটি তরুণী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার অনাবৃত মস্তকটি নতভাবে বুকের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িলেও প্রৌঢ়ার পিঠের দিকে তাহার মাথাটি প্রায় আধ ফুট উঁচু দেখাইতেছিল।

মহিম জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিতেই প্রৌঢ়া প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "পরিচয়ের পথ ভগবান যে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন বাবা, তাই আজ নতুন-ক'রে তোমার কাছে পরিচয় দিতে হ'চ্ছে!...আমি নির্ম্মলার সেজ-মাসী।"

বহু দিনের কথা, তবু মহিম তাহা ভুলিতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি প্রৌঢ়ার পরিচয় পাইয়াই তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিলেন, "আপনার এ অবস্থা হ'য়েছে দেখে বড় কষ্ট পেলুম মাসীমা! এটি কি মেয়ে?...আসুন, ওপরে বসবেন চলুন।"—তিনি অগ্রগামী হইলেন, মহিলা দু'টি তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

উভয়ে উপরে আসিয়া বসিলে প্রৌঢ়া (মঙ্গলা) তাঁহার দুঃখের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বিনাইয়া বিনাইয়া যে আত্মকাহিনী বিবৃত করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, আট বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। হাতের নোয়া, সিঁথির সিন্দূর ঘুচিয়াছে, তাহাতে দুঃখ নাই; স্বামী পুণ্যাত্মা ছিলেন, তাঁহাকে দুঃখ-কষ্ট পাইতে হয় নাই। চারটি ছেলের মধ্যে একটি চলিয়া গিয়াছে, আর দু'টি আন্দামানে নির্ব্বাসিত। অবশিষ্ট একটিকে লইয়াই তিনি সংসার করিতেছিলেন, সেটিও আজ সাত মাস হইল অন্তরীণে আবদ্ধ হইয়াছে। গৃহ তাঁহার শূন্য। সঙ্গের এই মেয়েটি তাঁহার নিজের মেয়ে নয়, সে তাঁহার দেবর কন্যা—পিতৃমাতৃহীনা অনাথা। অবশেষে মঙ্গলা বলিলেন, "বাবা, সংসারে একমুঠো ভাতের অভাব নেই সত্যি, কিন্তু সংসারের কি দশা হ'য়েছে তা শুনলে ত। ওর বিয়ের চেষ্টা কে ক'রবে বল দেখি! কে এমন ব্যথার ব্যথী আছে যে, এই দুর্দ্দিনে এত বড় ভার—" প্রৌঢ়ার কণ্ঠরোধ হইল, মুখের কথা আর শেষ হইল না।

মহিম অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তা সত্যি বটে!"

কতকটা আত্মসংবরণ করিয়া মঙ্গলা বলিলেন, "বিপদ ত কম নয় বাবা! পাড়াগায়ে ঝি-বউ নিয়ে বাস করা দায় হ'য়ে উঠ্‌ছে। বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই দেখে কয়েক দিন থেকে গাঁয়ের নিষ্কর্ম্মা বখাটে ছোঁড়াগুলো নানা রকমে জ্বালাতন ক'রে তুলেছে। হতভাগাদের পেটে অন্ন জোটে না, প্রাণে সখের সীমে নেই! মল্লি ত লজ্জায় ভয়ে কাট হ'য়ে গিছ্‌ল। আমিও বাবা এই ডাগর মেয়ে নিয়ে আর দেশে থাকৃতে ভরসা পেলুম না। আমি ত এই বুড়োমানুষ, কোন বিপদ ঘট্‌লে কি ই বা আমি ক'রতে পারব?"

মহিম সংক্ষেপে বলিলেন, "তা তো বটেই।"

মঙ্গলা একটু থামিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোমার খবর-টবর আশুর কাছে প্রায়ই পাই কি না; তাই ভাবলুম, তোমার আশ্রয়েই এসে পড়ি; কোল্‌কাতায় চেনাশুনা লোক আর ত কেউ নেই। এখানে কাছে-পিঠে যদি একটা ছোটখাট বাড়ী ভাড়া ক'রে-দিয়ে একটু দেখাশোনা ক'রতে পার বাবা, তাহ'লে একটু চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে দেশে চ'লে যেতে পারি।"

প্রস্তাবটা শুনিয়া মহিম একটু হাসিলেন; বলিলেন, "কোল্‌কাতা সহরটাও তত ভাল নয় মাসীমা! যত দিন

মেয়েটির বিয়ে দিতে না পারেন, এখানেই থাকুন। বাসা ভাড়া ক'রে সেখানে আপনার একা-থাকার প্রস্তাবে আমি রাজী হ'তে পারছিনে। না, তা সঙ্গত নয়।"

২

বৈকালে জ্যোতি বাড়ী ফিরিল। বাড়ীতে ঢুকিয়াই দেখিল—অভাবনীয় ব্যাপার! ছোট মামা কোটর ত্যাগ করিয়া দালানে বসিয়া একটি মহিলার সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছেন! উপরের তিনখানি ঘরের দুই পাশের ঘর দু'খানি মহিম ও জ্যোতির; মাঝের ঘরখানি খালি পড়িয়াছিল। সেই ঘরেই মঙ্গলার জিনিষ-পত্র তুলিয়া রাখা হইয়াছিল; মঙ্গলা সেই ঘরের দুয়ারে পিঠ দিয়া বসিয়া ছিলেন। জ্যোতিকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এইটিই বুঝি তোমার ভাগ্নে? খাসা ছেলে তো!" প্রৌঢ়ার এই মন্তব্য শুনিয়া জ্যোতি থমকিয়া দাঁড়াইল; ইনি কে, সে তা জানে না, কিন্তু তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া সে ঘরে প্রবেশ করা সঙ্গত মনে করিল না। মহিমের উত্তরের প্রত্যাশায় সে দাঁড়াইতেই মহিম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "জ্যোতি, ইনি তোমার দিদিমা।"

মাতুলের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া, জ্যোতি দুই পা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই ঘরের ভিতর তাহার চক্ষু পড়িল। সে দেখিল, যেন অজন্তার গুহার একখানি বহু পুরাতন প্রাচীর-চিত্র সহসা ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডস্পর্শে প্রাণবন্ত হইয়া সেই ঘরে আসিয়া জুটিয়াছে! জ্যোতির সহিত চোখোচোখি হইতেই মল্লিকা মাথা নামাইল; চক্ষু ভূমিসংলগ্ন হইল।

প্রণাম শেষ করিয়া জ্যোতি মিনিট-পাঁচেক সেই স্থানে দাঁড়াইয়া-থাকিয়া পরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। গায়ের জামা খুলিতে খুলিতে মৃদু হাসিয়া আপন-মনেই বলিল, "উনি ত শুনলুম, আমার একটি দিদিমা, কিন্তু দিদিমার সঙ্গিনী—ওটি কে? দোহাই বাবা বিধাতা পুরুষ, ও যেন মাসী-টাসী না হয়। অমন চমৎকার চোখ-দু'টি মাসী-টাসীর থাকবার কোন সার্থকতা নেই; হাঁ, সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে থামিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার চিন্তার একটা খোরাক জুটিল। স্নান করিয়া জ্যোতি সাধারণতঃ আল্‌গা গায়েই উপরে যায়; আজ কিন্তু কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। সে ভিজা তোয়ালেখানি গায়ে জড়াইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে আপন-মনেই বলিল, "এ মন্দ নয়। ওদের ঘরের সামনে দিয়েই ছত্রিশ বার আমাকে আনাগোনা ক'রতে হবে।" এই কথা বলিতে না বলিতে সিঁড়ির বাঁকে জ্যোতি মল্লির একেবারে ঠিক সাম্‌নে পড়িয়া গেল! মল্লির কাঁধে চওড়া লালপেড়ে গামছা, বাঁ-হাতে সাবান, ডান হাতে কতকগুলা কাপড়-চোপড়।

জ্যোতির লম্বা-চওড়া দেহের পক্ষে সেই সিঁড়ির বিস্তার তেমন সঙ্কীর্ণ না হইলেও দুই জনের পাশাপাশি চলিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নয়।' মল্লি যতটা পারিল পথ ছাড়িয়া কোণ-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল; জ্যোতি কাত হইয়া উপরে উঠিতে গেল, কিন্তু উভয়ের এতখানি সতর্কতা সত্ত্বেও জ্যোতির হাতখানা মল্লির হাতে ঠেকিয়া গেল।

দু'জনে চোখোচোখী হইলে জ্যোতি কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "সিঁড়িটা বড্ড—ইয়ে—সরু কি না তাই, তা আমার কিন্তু আগেই নীচে নেমে যাওয়া উচিত ছিল।"

মল্লি নির্ব্বাক্ ভাবে নতমুখে নীচে নামিয়া গেল।

৩

মঙ্গলা দিবসের অধিকাংশ সময় জপ আহ্নিকেই অতিবাহিত করেন। দিন-কুড়ি পরে এক দিন দৈবাৎ মহিমের খাওয়ার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই সময় তিনি প্রত্যহ পূজার্চ্চনায় রত থাকেন বলিয়া মহিমের অপরূপ আহার সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা ছিল না। তিনি মহিমের আহার্য্য দ্রব্যপূর্ণ থালার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি কি এখন মাছ খাও না মহিম? আগে ত খেতে।" মহিমের অন্তরে একটা বিপ্লব চলিতে-ছিল; তিনি ঢোক-গিলিয়া বলিলেন, "ভাল রান্না হ'লে খেতে পারি; কিন্তু কে বা আছে, আর কে-ই বা রাঁধে!"

মঙ্গলা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা সত্যি।" ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "যুগান্তর হ'ল নির্ম্মলা চলে গেছে, তখন তোমার বয়সই বা কি? তার পর এত দিন আবার যদি সংসারী হ'তে, তাহ'লে সংসারটা আর এমন ছন্নছাড়া হ'ত না।—এখন তোমার বয়স কত হ'ল বাবা?"

চিরসত্যাশ্রয়ী মহিমের গলার কাছে কেমন একটা

কষ্টদায়ক শ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল, তথাপি বলিলেন, "তা আটত্রিশ পার হ'য়ে গেছে।"

মঙ্গলা বলিলেন, "মোটে এই? তা'হলে ত তোমার বয়সী ছেলেরা আজকাল প্রথম পক্ষেই বিয়ে ক'রচে।"

মহিম আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। মিথ্যা কথাটা মুখ হইতে বাহির হইয়া যাওয়ায় অনুতাপে তাঁহার চোখ-মুখ জ্বালা করিতেছিল।

পরদিন মঙ্গলার আদেশে মল্লি যখন দুই-তিন রকম আমিষ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া মহিমের পাতের পাশে সাজাইয়া দিয়া গেল, তখন মহিম আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না, নিদারুণ বিতৃষ্ণা বোধ হইলেও সেগুলি বিনা-প্রতিবাদে উদরস্থ করিলেন।

ইহার পর মহিমের ব্যবহারে বেশ একটা স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষিত হইল। মহিম তাঁহার অকাল-বার্দ্ধক্যের বাহিক খোলসটি ধীরে ধীরে খুলিয়া ফেলিলেন। তিনি এখন প্রচুর মাছ-মাংস খান, হাল-ফ্যাসানে ফিট-ফাট কাপড় পরেন, সিনেমা দেখেন, দুই-এক কলি গানও সময়ে সময়ে তাঁহার কণ্ঠে গুঞ্জরিয়া উঠে, সান্ধ্য বায়ুসেবনে আনন্দলাভ করেন। ভাগবতের আসর আর পূর্ব্বের মত জমিয়া উঠে না। বন্ধুরা তাঁহার এই পরিবর্ত্তন ক্ষুব্ধ চিত্তে লক্ষ্য করেন।

জ্যোতি তাঁহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারে না; আপন-মনেই বলে, "এবারের বসন্তের বাতাসটা ছোট মামাবাবুর গায়েই লেগেছে দেখছি! এ হ'ল কি? পদ্মলোচনা অজন্তাসুন্দরীর নেত্র পাতের ফল না কি?"

তাহার ও মল্লির ব্যবধান এখনও সেইরূপই গভীর। মল্লি মহিমের গৃহিণীহীন সংসারের গৃহিণীপণা পুরাপুরিই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এই গৃহিণীত্বের অন্তরালে সে আপনার সত্তা সম্পূর্ণ গোপন করিয়াই রাখে।

জ্যোতির অনুপস্থিতিতে সে তাহার ঘরে আসিয়া বিছানা ঝাড়িয়া, জামা-কাপড় গুছাইয়া, বইগুলি সাজাইয়া রাখিয়া যায়। নিতান্ত প্রয়োজন হইলেই দুই-একটা কথা বলে; কিন্তু অনাবশ্যক কথা একটিও বলে না। শুধু জ্যোতির মেডেল, কাপ, শিল্ডগুলির সম্বন্ধে তাহার ঔৎসুক্যের অবধি নাই। মল্লি সেগুলি প্রতিদিন ঝাড়িয়া-মুছিয়া সযত্নে সাজাইয়া রাখে।

এক দিন কলেজ হইতে ফিরিয়া জ্যোতি দেখিল, নীচে হইতে একটা কাচের আলমারী তাহার ঘরে আসিয়াছে, এবং কাপ, শিল্ড, মেডেলগুলি তাহাতে পরিপাটীরূপে সাজান রহিয়াছে।—এ মল্লির কাণ্ড, ইহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

জ্যোতি হাসিয়াই অস্থির; আচ্ছা পাগল বটে মল্লি! তাহার পর তাহার মনে হইল, এতখানি দরদের সঙ্গে এগুলি যে সাজাইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে একটু ধন্যবাদ দেওয়া তাহার অবশ্য-কর্ত্তব্য।

জ্যোতি ঘরের বাহিরে আসিতেই দেখিতে পাইল, মল্লি মাঝের ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছে। সুদীর্ঘ কেশরাশির আড়ালে তন্বী মল্লি যেন ঢাকা পড়িয়াছে। জ্যোতিকে দেখিয়া সে কুণ্ঠার সহিত চিরুণী সমেত হাতখানা নামাইয়া লইল।

জ্যোতি সচকিতভাবে তাহার দিকে একবার চাহিল, তাহার পর হাসিমুখে বলিল, "ক'রেছেন কি? কেউ যদি দেখে, হাসবে যে!"

মল্লি ঈষৎ সলজ্জ হাসির সহিত বলিল, "কেন, হা'সবার কি আছে?"

জ্যোতি বলিল, "নেই? লোকে বলবে, লোকটা কি দাম্ভিক! কবে কি পেয়েছে, তারই অহঙ্কারে ফু'লে উঠেছে।"

মল্লি বলিল, "কৈ, কারুকে ত এখানে আপনার কাছে আসতে দেখিনি।"

জ্যোতি মৃদু হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "ওরে বাব্বা, আমার বন্ধুদের এখানে আনতে পারি—এই শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে? তারা এক একটা ডাকাত!"

মল্লি নিঃশব্দে হাসিয়া মুখ নামাইল।

আট-দশ দিন পরের কথা। মল্লি দালানের একপ্রান্তে অবস্থিত ছাদে উঠিবার সিঁড়িতে বসিয়া পশমের কি একটা বুনিতেছিল; জ্যোতি তাহার ঘরের দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্লেড দিয়া পেন্সিল কাটিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে মল্লির কর্ম্মতন্ময় মুখখানির পানে চাহিয়া পেন্সিলে ব্লেড চালাইতে চালাইতে অঙ্গুলির ডগার অনেকখানি হঠাৎ কাটিয়া গেল।

একটা অস্ফুট শব্দ শুনিয়া মল্লি চোখ তুলিয়া চাহিল। জ্যোতির আঙুল হইতে ঝর্-ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছিল।

দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ বোনা ফেলিয়া ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আসিল। রক্তের পরিমাণ দেখিয়া সে ভয় পাইয়া গেল। শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল, "কি ক'রে এমন হ'ল? উঃ, কি রক্তই প'ড়ছে! কি ক'রব এখন? জামাইবাবুকে ডা'কব?"

জ্যোতি ব্লেডটা ফেলিয়া-রাখিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! মামাবাবু কি ক'রবেন? ভয় পাচ্ছেন কেন? এমন কিছু হয়নি। আপনি একটু টিন্‌চার আইডিন আনুন দেখি। হাতটা একটু টেনে বেঁধে দিন, তাতেই রক্ত বন্ধ হ'য়ে যাবে।"

মল্লির মুখ ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছিল, শিহরিয়া বলিল, "টিন্‌চার আইডিন দিলে যে অসহ্য জ্বালা ক'রবে। তার চেয়ে একবার ডাক্তারের কাছে যান না।"

মল্লির শঙ্কাব্যাকুল মুখ দেখিয়া জ্যোতি কৌতুক অনুভব করিতেছিল, বলিল,"ডাক্তার এসে কি ক'রবে, বলুন ত! এই একটুখানি কেটে গেছে, এরই জন্যে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে? আপনার কথা শুনে হাসি পায়। রক্ত দেখে আপনি ভয় পেয়েছেন তাই, নইলে ভয়ানক কাণ্ড এমন কিছু হয়নি; দিন তো আঙুলটা একটু বেঁধে, সেরে যাবে। খেলতে গিয়ে কত সময় কত যায়গায় কেটে যায়, তার কাছে এ তো কিছুই নয়।"

মল্লি আর কথা বলিল না, আইডিন লইয়া আসিল। কিন্তু তুলিটা ক্ষতস্থানের কাছে লইয়া গিয়াও কিছুতেই তাহাতে ঠেকাইতে পারিল না, বলিল, "এতো নিষ্ঠুর কাজ কি ক'রে আমি ক'রব? আমার গা শির-শির করছে। লোকে কথায় বলে· -কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে, এ যে তার চেয়েও ভয়ানক! আমি যেন আপনার অতি-বড় শত্রু র…"

জ্যোতি তুলি সমেত মল্লির হাতটা খপ্ করিয়া ধরিয়া তুলিটা ক্ষতস্থানে ঠেকাইয়া দিল। মল্লি তুলি ফেলিয়া চকিতে একবার জ্যোতির দিকে চাহিয়া, আহত হাতখানা মুখের কাছে আনিয়া জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগিল।

জ্বালা একটু কমিলে জ্যোতি মৃদু হাসিল; কৃতজ্ঞতা ও তৃপ্তিতে কণ্ঠস্বর প্লাবিত করিয়া বলিল, "শত্রু নয়, বন্ধু বলুন। কেটে ত কত সময়েই যায়, কিন্তু কে আর এতখানি দরদ ঢেলে সেবা করে!"

মল্লি কি জানি কেন চোখ তুলিয়া জ্যোতির পানে চাহিল না, নতমুখে অস্ফুট স্বরে বলিল, "কি যে বলেন, সেবা ত কতই ক'রলাম!"

এই প্রথম দিন পরস্পরের সাহচর্য্যে দু'জনের এতক্ষণ কাটিল।

৪

মল্লির বিবাহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। পাত্র যে না মিলিল তা নয়, কিন্তু মল্লির পিতৃকুলের পরিচয় পাইয়া সকলেই পিছাইয়া পড়ে। এত বড় বিপ্লবী ঘরের মেয়েকে ঘরের বৌ করিতে কেহই ভরসা পায় না। মঙ্গলার অভিমান, জ্যোতির মত ছেলে ঘরে থাকিতে মহিম ঘটক লাগাইয়া পাত্র খোঁজেন! ইহা তাঁহার প্রাণে লাগে। কিন্তু মুখ-ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না; ভাবেন, মহিমের মনেও ওই ভয় আছে কি না কে জানে? সাহস করিয়া কথাটা বলিলে হয়ত মুখের উপরেই 'না' বলিয়া বসিবেন। সে বড়ই বিশ্রী শুনাইবে।

এমনই করিয়া পূর্ণ একটি বৎসর কাটিয়া গেল। মঙ্গলা নিজের শরীরের অবস্থা বুঝিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আর ত মল্লিকে অনূঢ়া রাখা চলে না। মৃত্যু নয়, সে ত তাঁর মুক্তি; কিন্তু তাঁর অভাবে জগতে যে মল্লির দাঁড়াইবার স্থান নাই!

এই সময় কলিকাতায় ম্যানিঞ্জাইটিস্ রোগের প্রকোপ দেখা দিয়াছিল। মঙ্গলার এক দিন সামান্য একটু জ্বর-ভাব দেখা গেল, এবং সেই রাত্রি হইতেই তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। রোগ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, ম্যানিঞ্জাইটিস্‌ই বটে!—চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না; কিন্তু তৃতীয় দিন তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইল। একটি কথাও তিনি বলিলেন না, চক্ষু মেলিয়া একবার চাহিয়াও দেখিলেন না।

অশৌচের কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল; অন্তরীণাবদ্ধ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃপক্ষের অপার করুণায় মায়ের পারলৌকিক কার্য্য শেষ করিতে আসিবার অনুমতি পাইল। শ্রাদ্ধাদি শেষ হইলে বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে সে জ্যোতিকে বলিল, "মল্লির জন্য বড্ড ভাবনা নিয়েই যাচ্ছি। আপনাদের আশ্রয়েই ও এতদিন অবস্থ আছে, —তবু ত মা ছিলেন; আমরা ওর হতভাগ্য দাদা—একটি

মাত্র ছোট বোন, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থাই করতে পারিনি" —ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, "যদি অপরাধ না নেন, তাহ'লে বলি, মল্লিকে আপনিই নিন, ও আপনার অযোগ্য হবে না, এ ভরসাটুকু আমার আছে।"

জ্যোতির বুকের রক্ত যেন ছলাৎ করিয়া উঠিল; কিন্তু প্রশান্ত হাসির সঙ্গে সে বলিল, "কিন্তু প্রকাশ বাবু, আপনার বোনটি বয়স্থা অর্থাৎ তাঁরও একটা মতামত প্রকাশের বয়স হ'য়েছে; সুতরাং আমি যে তাঁর অযোগ্য নই—সেটা তাঁরই বিচার্য্য।"

প্রকাশ বলিল, "জ্যোতি বাবু, আপনি রমণী-রঞ্জন। আপনাকে স্বামী পেলে কোন মেয়েই অসুখী হবে না।··· বেশ ত, মল্লি ত আর ছোট্টটি নেই; তাকে এক দিন জিজ্ঞেস ক'রেই দেখবেন।"—একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "জামাই বাবুকে ও কথা ব'লতে আমার ভরসা হ'ল না। উনি শান্তিপ্রিয় লোক, এই ক'দিনে আমার জন্যে পুলিশের উপদ্রব যা সহ্য ক'রেছেন, তাতেই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন।"

জ্যোতি বলিল, "বেশ, আপনি যখন অনুমতি দিয়ে যাচ্ছেন, তখন আমি তাঁর মত জানতে চাইব; তবে তিনি এখন বড় শোকার্ত্তা, এখন কিছু দিন থাক্।"

৫

আরও সাত-আট দিন কাটিয়া গিয়াছে। জ্যোতি মল্লির কাছে এখনও কথাটা উত্থাপন করিতে পারে নাই। মল্লির শোকাচ্ছন্ন মুখ দেখিয়া তাহার মায়া হয়; ইহারই মধ্যে তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিতে মনে ব্যথা লাগে। কথাটা শুনিয়া মল্লিই বা কি মনে করিবে? ছি!

এক দিন মহিম বাড়ী নাই দেখিয়া সেই দিনই বৈকালে জ্যোতি মল্লির কাছে প্রস্তাব করিবে স্থির করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, মল্লি ঘরে নাই। হয় ত কাপড় কাচিতে গিয়াছে। জ্যোতি দালানে একটু বিচলিতচিত্তে পাদচারণ করিতে লাগিল, মল্লির প্রতীক্ষায়।

অকারণেই ঘুরিতে ঘুরিতে মহিমের ঘর খোলা দেখিয়া সে অন্যমনস্কভাবে সেখানে প্রবেশ করিল। বোধ হয় বারো চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে জ্যোতি এ-ঘরে আসে নাই। এই কক্ষে এমন গাম্ভীর্য্য ও ধর্ম্মতত্ত্বের ছাপ ছিল যে, জ্যোতি তাহা সহিতে পারিত না, এবং এই জন্যই এদিকে ঘেঁসিত না।

আজ এ-ঘরে ঢুকিয়া, টেবিলের উপর সংরক্ষিত বইগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জ্যোতি মৃদুহাস্যে অনুচ্চ স্বরে বলিল, "আর কি এদের আগের মত আদর আছে!"

বইগুলি নাড়িতে নাড়িতে সে যেন সাপ দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। এ কি! বৃদ্ধ ঋষি বাৎসায়ণ এখানে প্রবেশ করিলেন কি কৌশলে? জ্যোতির কৌতূহল বাড়িয়া গেল; এটা ওটা নাড়িতে নাড়িতে দেখে কেবল বাৎসায়ণই নন, হ্যাভেলক ইলিস, বার্টএণ্ড রাসেল, মারী ষ্টোপস ইত্যাদি অনেকেই আছেন।

জ্যোতি ভ্রূকুঞ্চিত করিল; দন্তে অধর দংশন করিয়া সে বইগুলা নাড়িতে লাগিল। এ সকল সরস কাহিনীর সহিত মামা বাবুর ঘনিষ্ঠতার কারণ কি? অন্যমনস্ক ভাবে বইগুলা নাড়িতে নাড়িতে একখানার ভিতর হইতে আল্‌গা কাগজের একটা কোণ বাহির হইয়া আসিল; খুলিয়া দেখিল—সেটা মল্লির ছবি!

একবার পাটনায় মল্লির বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল; বরকর্ত্তা কনের ফটো চাহিলে জ্যোতিই এই ছবি তুলিয়া দিয়াছিল। জ্যোতির হাত হইতে বইখানা মেঝের উপর পড়িয়া গেল। মল্লিকে লইয়া এ কি দুর্জ্ঞেয় রহস্য সৃষ্টি করিয়াছেন ছোট মামা?

জ্যোতির মাথার ভিতর কেমন করিতে লাগিল। ভূমিকম্প হইতেছে কি? না, এ সাইক্লোন? কি এ? পায়ের তলার মাটী দুলিতে লাগিল! বিশ্ব-প্রকৃতি কি উল্কার বেগে ধ্বংসের পথে ধাবিত হইতেছে!

জ্যোতি নিজের ঘরে গিয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। মহিম তার পিতৃতুল্য, সে তাঁহাকেই মাতা-পিতা-একাধারে জানে। মল্লিকে লইয়া তাঁর গোপন অভিসার চলিয়াছে! অবিশ্বাস্য হইলেও ইহা কঠোর সত্য। মহিমের কামনার ধন মল্লি, মহিমের লালসার বস্তু মল্লি,—মহিমের গোপন ধ্যানের প্রেয়সী এই মল্লি!···

যাহার জন্য মহিমের এই উগ্র কামনা, তাহাকে ও জ্যোতি গ্রহণ করিতে পারে না। ছি ছি ছি! এ কথা ভাবিতেও যে ঘৃণা হয়! সে ত পশু নয়। মাতুলের লুব্ধ দৃষ্টি যে নারীর প্রতি নিবদ্ধ, জানিতে পারিবার পর আ

তাহাকে বিবাহ করিবার চিন্তা করাও পাপ। এত বড় অপরাধ কদাচ সে করিতে পারিবে না। মহিম মল্লিকে কামনা করেন,—তিনিই তাহাকে লউন। সে মহিমের সন্তান তুল্য,—প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

"আপনার কি অসুখ কচ্ছে?"—মল্লির কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

জ্যোতি শিহরিয়া উঠিল। তাহার অন্তরে বাহিরে কি অগ্নি-পরীক্ষা চলিতেছে? মুখ না তুলিয়া সে মৃদুকণ্ঠে বলিল "না!"

মল্লি একটু থামিয়া বলিল, "তবে অমন ক'রে র'য়েছেন যে! কোন দুঃসংবাদ পেয়েছেন কি?"

দুঃসংবাদ? হাঁ, দুঃসংবাদ বৈ কি! জ্যোতির জীবন-মন নিঃশেষে নিংড়াইয়া শুষ্ক হইয়া গেল, আশা ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত তাহার বিকশিত যৌবন-প্রসূন সন্ধ্যার কমলের ন্যায় শোভাহীন, মলিন ও শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছে; ইহা নিদারুণ দুঃসংবাদ ভিন্ন আর কি?

জ্যোতি এবারও মুখ তুলিতে ভরসা পাইল না। নত-মুখেই বলিল, "না, আপনি ভাবছেন কেন? আমার মাথা ধরেছে।" বলিয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িল। মল্লি তথাপি নড়িল না; কি যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া তাহার চোখের সামনে গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। সে একটু মৌন থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "ওডিকলোনের জল দিয়ে মাথাটা কি ধুয়ে ফেল্‌বেন? না হয় স্মেলিং-সল্টের শিশিটাই এনে দিই।"

জ্যোতি চোখ তুলিয়া চাহিল না; বলিল, "না, তেমন-কিছু হয়নি। এমনই একটু শুয়ে-পড়েছি। আপনি ভাববেন না।"

ইহার পর জ্যোতিকে আর কি অনুরোধ করা যায়? অগত্যা মল্লি নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেল।

রাত্রে মহিম আসিয়া জ্যোতির কাছে বসিলেন; তিনি তাহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়াছেন। প্রথমে জ্যোতির শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিয়া শেষে বলিলেন, "দেখ, এত দিন মাসীমা ছিলেন কোন কথা ছিল না। কিন্তু এখন মল্লির এ ভাবে থাকাটা ভারী বিশ্রী দেখাচ্ছে। এটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না কিন্তু।"

জ্যোতি নির্ব্বাক্ ভাবে মহিমের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহিম বলিলেন, "আমি মনে কচ্ছি, এই ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি তোমার সঙ্গে মল্লির বিয়েটা দিয়ে ফেলি। মাসীমারও সেই রকমই ইচ্ছে ছিল।"

জ্যোতি শুইয়াছিল, সবেগে উঠিয়া বসিল; দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "উনি ছোট মামীমার বোন,—আমার মাতৃস্থানীয়া। আমাকে ও কথা আপনি বলবেন না। আপনিই ওঁকে বিবাহ করুন।"

মহিম বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; রুদ্ধকণ্ঠ হইতে শুধু বাহির হইল, "সে কি? জ্যোতি! কি বলছ?......"

জ্যোতি আবার শুইয়া পড়িল; বলিল, "আমি যা বলেছি, তার পর আর এ আলোচনা চলে না ছোট-মামা বাবু! তবে এভাবে থাকা সত্যিই খুব খারাপ দেখাচ্ছে; আপনি ওঁকে যত শীগ্‌গীর পারেন বিবাহ করুন।"

* * * *

পরদিন জ্যোতি শুনিতে পাইল—মহিম পাশের ঘরে মল্লির সহিত কথা বলিতেছেন। আলাপের মাঝামাঝি কতক অংশ তাহার কাণে প্রবেশ করিল; সে শুনিল, "আমি অস্বীকার করছি না মল্লি, যে তোমার ওপর আমার প্রচণ্ড আসক্তি আছে। কিন্তু তাকে দমন করবার শক্তিও আমার আছে। আমি আপনাকে সংযত ক'রে রাখবার জন্যে ঠিক ক'রেছিলুম—তোমাকে জ্যোতির হাতে সমর্পণ ক'রব। কিন্তু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম—হতভাগাটার কথা শু'নে! এই চুয়াল্লিশ বছর বয়সে পত্নীহারা হ'য়েও যে প্রাণশক্তি আমার এ দেহে আছে, ছাব্বিশ বছর বয়সেও ওর তা নেই! ও যেন একেবারেই বুড়ো হ'য়ে গেছে,—আশী বছরের বুড়োর মত ওর মন জড়তায় আচ্ছন্ন—জরাজীর্ণ! জ্যোতি বল্‌লে, আমারই উচিত তোমাকে বিয়ে করা!...কিন্তু এখন আমার বয়স অনেক—বয়সে তুমি আমার চেয়ে অসম্ভব রকম ছোট! জ্যোতির ও-কথা আমি মনেও ঠাঁই দিতে পারি নে;...তবে এমনি কঠিন জায়গায় তুমি এসে দাঁড়িয়েছ, যেখানে আর একটি বেলাও তোমার রাখা চলে না। যা-হোক একটা-কিছু করতেই হবে তাড়াতাড়ি।—তুমি কি বল?"

মল্লির নিস্পৃহ কণ্ঠে শোনা গেল—"আপনি গুরুজন, যা'

ভাল বোঝেন করুন। আমার মতামতের জন্যে আপনি আগ্রহ প্রকাশ ক'রবেন না, আমার মতামত সত্যিই কিছু নেই; আমি কে এবং কি, তাও আমি ত ভুলতে পারিনি।"

অগত্যা মহিম মল্লিকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর জ্যোতি, যাহা-হোক একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় মাতুলের আশ্রয় ত্যাগ করিল। চাকুরীর মোহ তাহার ছিল না; সে পশমী কাপড়ের এজেন্সী লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আঘাতটা তাহার মনকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছিল; তাই নানা কর্ম্মে দিবারাত্রি ব্যাপৃত থাকিয়া বেদনাটাকে সে ভুলিবার চেষ্টা করিত। তথাপি অবসর সময়ে বা নিদ্রাহীন নিশীথে মল্লির সান্ধ্য কমলের মত ম্লান মুখখানি তাহার মনে পড়িত। মনের এই দুর্ব্বলতাটুকু সে পরিহার করিতে পারিত না। জ্যোতি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে জানিবার পর যে কয় দিন জ্যোতি বাড়ী ছিল, মল্লি আর তাহার পানে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে পারে নাই। তাহার শোকাচ্ছন্ন মুখের স্মৃতি এখনও জ্যোতিকে মর্ম্মাহত করে। কি জানি, কি ভাবিয়াছিল সেই সরলা পল্লী-বালিকা মল্লি!···কেমন করিয়া সে বিশ্বাস করিবে যে, সুস্থ মস্তিষ্কে কেহ নিজের হৃৎপিণ্ডে করাত চালাইতে পারে? মহিম তাহার গুরুজন, মল্লির কে? মল্লি যে তাহাকে এত ভালবাসিত, জ্যোতি কোন দিন তাহা ধারণাও করিতে পারে নাই! যে দিন সে মহিমকে স্পষ্ট জবাব দিল, মল্লিকে চিনিতে পারিল ঠিক তার পর দিন! কিন্তু যে ঢিল সে ছুড়িয়াছিল, তখন তাহা আর ফিরাইবার উপায় ছিল না।

* * * *

মহিমের বারংবার পত্র পাইয়া বছর-দেড়েক পরে জ্যোতি পূজার সময় বাড়ী আসিল।

মল্লি বাঙ্গালীর মেয়ে; প্রণত জ্যোতির মাথায় হাত দিয়া বলিল, "এস বাবা! সুখে থাকো।"—কিন্তু কথাটা বলিতেই তাহার বুকের ভিতর কে ছুরি মারিল! বঙ্গবধূ হইলেও সে মানবী।

মহিম আসিয়া দাঁড়াইলেন। খানিকটা গল্প-সল্প করিবার পর তিনি সরিয়া পড়িলেন। যাইবার সময় মল্লিকে বলিলেন, "ওগো, পশ্চিমে ভাল মাছ-টাছ পাওয়া যায় না, জ্যোতি যে ক'দিন থাকে, ওকে ভাল ক'রে খাওয়াও।"

মল্লি মহিমকে দেখিয়া অল্প অবগুণ্ঠন দিয়াছিল; ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তিনি অদৃশ্য হইলে জ্যোতি বলিল, "ছোটমামা বাবু যেন বড্ড রোগা হ'য়ে গেছেন!"

মল্লি বলিল, "অতিরিক্ত উপোস করেন যে! এই ত নবরাত্রি যাচ্ছে।"

জ্যোতি উৎসুক হইয়া বলিল, "ন' দিন? কি খান?"

মল্লি বলিল,—"কিছু না। সারাদিন শুকিয়ে থেকে রাত্তিরে একটা ডাব, আর দুটো সন্দেশ।"

জ্যোতি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "কি বিপদ! শরীর থাকবে কি ক'রে?"

আহারে বসিয়া কথায় কথায় জ্যোতি জানিতে পারিল, মহিম পুনরায় নিরামিষ-ভোজী হইয়াছেন,—গুরুর আদেশে। একার জন্য কে আর ও-সব ঝঞ্ঝাট সহ্য করে, মল্লিও তাই আমিষের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে।

জ্যোতির বুকে কথাটা কাঁটার মত খচ-খচ করিয়া উঠিল।—বেচারী মল্লি!

৭

পূর্ব্বে মল্লি ও তার জেঠাই-মা যে ঘরে থাকিতেন, আজ-কাল মহিম সেই ঘরে লেখাপড়া করেন।

বিষাক্ত শল্যের মত মহিমের রুক্ষ কণ্ঠ জ্যোতির কাণে বাজিল, "আহা, কি করো ছেলে-মানুষী! সরো। আচ্ছা জ্বালাতন!···না, পড়ব না! চব্বিশ ঘণ্টাই তোমার সঙ্গে মাথামুণ্ড গল্প নিয়ে কাটিয়ে দেব!"

একটা চাপা অনুনয়ের শব্দ জ্যোতির কাণে গেল।

ঘটনাটা পরিষ্কার করিয়া দিলেন মহিম; তেমনই উচ্চ তেমনই কঠোর স্বরে বলিলেন, "জ্যোতি বাড়ী আছে ব'লে যদি এতই লজ্জা, তবে হুড় করতে এসেছ কেন? তোমাকে পই-পুই বলেছি, ওসব ছেলেমানুষী আমার ভাল লাগে না, তবুও শোন না! কাজের সময় বিরক্ত করা মোটেই আমি পছন্দ করি নে। যাও এখন এখান থেকে—।"

প্রায় আধঘণ্টা পরে জ্যোতি বারান্দায় বাহির হইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় মল্লি দাঁড়াইয়া আছে থামে মাথা হেলাইয়া, সামনের গ্যাসের আলো তার

বেদনা-পাণ্ডুর মুখে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হইতেছে। গালের উপর দু'টি রজতধারা চিক্-চিক্ করিতেছিল।

জ্যোতি শুব্ধ হইয়া রহিল,—মল্লি কাঁদিতেছে!… অভিমানের কান্না নয়, ব্যথিতের রোদন,—বুক-নিংড়ান রক্তধারা তার ঐ চোখের জল! কিন্তু এই অশ্রধারার জন্য দায়ী কে? মহিম নিশ্চয়ই নন। এ জ্যোতির কৃতকর্ম; এ অশ্রধারার জন্য এ জগতে একমাত্র দায়ী সে নিজে!

ও-পাশের বাড়ীতে একটি তরুণী তখন হারমোনিয়মে সুর দিয়া দরদভরা কণ্ঠে গাহিতেছিল,—

"ছিল তিথি অনুকূল
শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল
পরাণ জ্বলে!"

শ্রীমায়াদেবী বসু।

অন্ধকার সবাকার চিত্ত বৃন্দাবন

মনে পড়ে বন-মাঝে শ্যামের মুরলী বাজে
আকুল করিয়া প্রাণমন,—
শুনি' সে বাঁশির গান ত্যজি' লাজ-কুল-মান
পাগলিনী গোপবধূগণ;

চঞ্চল মলয়-বায়, যমুনা উজান ধায়
ধেনুগণ করে হাম্বারব,—
ব্রজধামে শত শত কিশোর-কিশোরী যত
বাঁশরীর রবে মত্ত সব!

মনে পড়ে রাধিকার গোপন সে অভিসার
দুরু দুরু কাঁপে তা'র প্রাণ;
প্রাণের দয়িত লাগি সারা নিশি রহে জাগি'
নিশিভোরে মান অভিমান।

দুইটি তরুণ হিয়া যৌবনের সুধা পিয়া
মাতাইল বৃন্দাবন ধাম,
তাদের বিরহ-ব্যথা মধুর মিলন-কথা
স্মৃতিপটে জাগে অবিরাম!

আজো আছে বৃন্দাবন তরুণ তরুণীগণ
নাই শুধু প্রাণের বিকাশ,—
নাই সে বাসন্তীমেলা রাসলীলা হোলী-খেলা
অফুরন্ত যৌবন-উচ্ছ্বাস!

কোথা সেই রসরাজ, বিনোদিনী রাধা আজ?
কোথা সেই আত্ম-নিবেদন?
চারিদিকে হাহাকার, তা'রি মাঝে অন্ধকার
সবাকার চিত্ত-বৃন্দাবন।

হৃদয়-যমুনা হায় নীরবে শুকায়ে যায়!
ভাবের তরঙ্গ নাহি উঠে;
জীবনের মধুমাস অকাল ক'রেছে গ্রাস,
প্রাণের প্রবাহ নাহি ছুটে।

এখনো মাঠের প'রে রাখালেরা খেলা করে,
রাখালরাজেরে নাহি চিনি;
আজো শুনি ক্ষণে ক্ষণে বেণু বাজে বনে বনে,
দেখি না ত রাই উন্মাদিনী!

কলসী ভাসায়ে জলে গোপী নীপতরু-তলে
কা'রো তরে নাহি করে দেরী,
বিজন নদীর তীরে সখীরা কাঁদিয়া ফিরে
ব্রজের দুলালে নাহি হেরি!

স্মরি' অতীতের কথা মনে জাগে গূঢ় ব্যথা,
আঁখি মোর করে ছল ছল;—
একের বিরহে হায় জীবন বিফলে যায়,
সকলের চোখে ঝরে জল।

শ্রীনীলরতন দাস (বি-এ)।

যুদ্ধের কথা

আমি কিছুদিন পূর্ব্বে লিখেছিলুম যে, যুদ্ধের বিষয়ে আর কথা কইব না। কিন্তু এ কথা ছাড়ব বল্লেই কি ছাড়া যায়!

এ যুদ্ধ অবশ্য আমাদের দেশে হচ্ছে না, হচ্ছে ইউরোপে। ইংলণ্ডের মারফৎ যে ইউরোপের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা পলিটিক্যালি ইংলণ্ডের অধীন; হয়ত এ যুদ্ধের ফলে সে অধীনতা থেকে মুক্ত হব। কিন্তু তারপর কার অধীন হব, কিম্বা স্বদেশে anarchy হবে কি না, তা কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু পলিটিক্স্ হচ্ছে সভ্যতার একটি অঙ্গ—সম্ভবতঃ উত্তমাঙ্গ। এ যুদ্ধ জার্ম্মাণরা সুরু করেছে Democracy ধ্বংস করবার জন্য। কিন্তু Democracy শুধু একটা বিশেষ রাষ্ট্রতন্ত্র নয়, আসলে ওটা হচ্ছে বিশ্বমানবের একটি মনোভাব, যার উপর Democracy প্রতিষ্ঠিত। এ মনোভাব ইউরোপ গত দু'শো বৎসর ধরে' গড়ে' তুলেছে। ডেমোক্রাসির ধ্বংস মানে ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস; কারণ, ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা liberalism হ'তে উদ্ভূত। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।

আমরা সেই জাতকেই সভ্য বলি, যে জাতের স্ব স্ব ধর্ম্ম, নীতি, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্রকলা, বিরাট মঠ, মন্দির প্রভৃতি আছে।

আমরা যে আমাদের অতীত নিয়ে গৌরব করি, তার কারণ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বেদবেদান্ত, নানা দর্শন, কাব্য, সঙ্গীতশাস্ত্র ও চিত্রবিদ্যার সম্যক চর্চ্চা করেছিলেন; এবং তাঁদের রচিত কাব্য, দর্শন প্রভৃতি নগণ্য নয়।

এ যুদ্ধে আমাদের মন ইউরোপের কাব্য, দর্শন প্রভৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই নবজাত সভ্যতার প্রাণ হচ্ছে liberty। অর্থাৎ শুধু পলিটিক্যাল স্বাধীনতা নয়,—চিন্তার স্বাধীনতা, মনের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার বাণীই ইউরোপের নব-বাণী। এবং ইউরোপে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তা এই মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মনোভাব-কেই আমি liberalism বলি।

এই liberalism-এর ভিতর 'বসুধৈবকুটুম্বকম্' এই মনোভাব আস্তে আস্তে গড়ে' উঠছিল। এই liberalism নষ্ট করাই Hitlerএর উদ্দেশ্য। এই নব-সভ্যতা ও তার অন্তর্নিহিত মনোভাব দ্বারা আমরাও যে অনু-প্রাণিত,—তার পরিচয় নিত্যই পাওয়া যায়।

আমরা হরিজনকে জাতে তুলতে চাচ্ছি, অর্থাৎ জাতি-ভেদের অত্যাচার দূর করতে চাচ্ছি; এক কথায় জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদ করতে চাচ্ছি।

আমরা সোশ্যালিজম্ প্রবর্ত্তন করতে চাচ্ছি, মানুষ মাত্রকেই শিক্ষিত করতে চাচ্ছি।

আমরা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়েছি। এর মোদ্দা কথা হচ্ছে—সকলকেই মানুষ হিসেবে দেখতে শিখেছি,—জনগণকেও, স্ত্রীলোকদেরও। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করাই হচ্ছে liberalism-এর বড় কথা।

আমরা স্বরাজ লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছি। ইংরিজীতে যাকে বলে nationalism, তাও liberalism-এর এক অঙ্গ।

তারপর Democracy হচ্ছে liberalism-প্রসূত। মানুষমাত্রেরই রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে অস্পষ্ট মতামত আছে, সেই মতামতকে স্পষ্ট স্বীকার ও গ্রাহ্য করাই Democracyর মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা পূর্ব্বে সভ্য ছিলুম বলে—এই সব সভ্য মনোভাব কতকটা আত্মসাৎ করতে পেরেছি।

আমরা দূর থেকে যতটুকু জানতে পাই, তার থেকে মনে হয়, জার্ম্মাণী এই যুগসঞ্চিত সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, আর প্রায় কৃতকার্য্য হ'য়েছে। পুরাকালে হূণ নামক নরপশুর দল যে ভাবে ভারতবর্ষের যুগসঞ্চিত সভ্যতা নষ্ট করতে ব্রতী হ'য়েছিল,—একালে জার্ম্মাণীও সেই ভাবে ইউরোপের সভ্যতা নষ্ট করতে ব্রতী হয়েছে।

Liberalism অবশ্য ইউরোপে হঠাৎ আবির্ভূত

হয়নি। বিরোধী মতের সঙ্গে লড়াই ক'রে জয়যুক্ত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী যাকে বলেন—violence, তা' হচ্ছে শক্তির অপপ্রয়োগ ও দুষ্টপ্রয়োগ।

জার্ম্মাণী একটি শক্তিশালী সভ্য দেশ। আর ইউরোপীয় সভ্যতাও জার্ম্মাণীর কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী। জার্ম্মাণরা হূণ নয়, শুধু শক্তির দুষ্টপ্রয়োগে তাদের সমতুল্য।

জার্ম্মাণ জাতের একটি গলদ ছিল। তাদের পণ্ডিতদের চিন্তা এ-জাতের ক্ষত্রিয়দের কর্ম্ম কখনও প্রতিহত করেনি। যুদ্ধ যে অনেক রাজনৈতিক সমস্যার আশু সমাধান করে, এ তো প্রত্যক্ষ সত্য; এবং জার্ম্মাণীর শাসনকর্ত্তারা ও গুরু-পুরোহিতেরা উভয়ে মিলে সমগ্র দেশটাকে প্রত্যক্ষদর্শী ক'রে তুলেছে। এর নাম তারা দিয়েছে real politics; আর এই real-ই সকল রকম ideal-এর মূলোচ্ছেদ ক'রছে। জার্ম্মাণী জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ইউরোপের একটি অগ্রগণ্য দেশ; সুতরাং জার্ম্মাণী ইউরোপীয় সভ্যতা ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে কেন?

আমি ইউরোপীয় নব সভ্যতাকে liberalism বলেছি। জার্ম্মাণী এই নব সভ্যতার পরিপন্থী। কেন?—তার বিচার করতে হলে—জার্ম্মাণীর গত তিনশ' বৎসরের ইতিহাসের হিসেব দিতে হয়। এ প্রবন্ধে সে আলোচনার অবসর নেই। আমি কোন বাহ্য ঘটনার আলোচনা করতে চাইনে; কেবলমাত্র এ জাতির মনোভাবের পরিচয় দিতে চাই।

জার্ম্মাণী কখনও liberalism-কে প্রশ্রয় দেয়নি। আমি পূর্ব্বে ব'লেছি—এ যুগের nationalism liberalism-এর একটি অঙ্গ। এ মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন গ্রাহ্য, জাতি-স্বাতন্ত্র্যও তেমনি গ্রাহ্য। উভয়েই হচ্ছে ব্যক্তির ও জাতির আত্মোন্নতির উপায় মাত্র। এর জন্যই এক জাতির পক্ষে অন্য জাতিকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া কর্ত্তব্য। Internationalismএর যে-সকল বিধি-নিষেধ ইউরোপে এতদিন মান্য ছিল—সে-সবই এই মনোভাব থেকে প্রসূত। বড় মাছটা ছোট মাছ খায়, এ মাৎস্য ন্যায়ের উপরে নব সভ্যতা গ'ড়ে উঠতে পারে না।

জার্ম্মাণী নব-কল্পিত nationalismএর অবাধ স্ফূর্তির পক্ষে এ জাতীয় inter-nationalismকে অন্তরায় জ্ঞানে জার্ম্মাণী অন্ধ nationalism-এর ভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মাৎস্য ন্যায়কেই ধর্ম্ম ব'লে গ্রাহ্য করেছে। এ যুদ্ধের প্রথম থেকেই জার্ম্মাণী এই যুদ্ধ-ধর্ম্মের অনুসরণ করছে। তার একটি সংক্ষিপ্ত ফর্দ্দ দিচ্ছি।

প্রথমে জার্ম্মাণী চেকো-শ্লোভাকিয়া গ্রাস করেছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী Chamberlain তা'তে কোন আপত্তি করেননি। হয়ত সে সময় ইংলণ্ড Russiar সঙ্গে যোগ দিলে এ যুদ্ধ এমন ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠত না।

তারপর জার্ম্মাণী অষ্ট্রিয়া গ্রাস করেছে বিনা-যুদ্ধে।

তারপর জার্ম্মাণী পোলাণ্ড জয় ক'রেছে,—Chamberlainএর বিপক্ষতা সত্ত্বেও। কিন্তু ইংলণ্ড Polandএর কোনও সাহায্য কার্য্যতঃ করতে পারেনি। Russiaও এই সুযোগে অর্দ্ধেক পোলাণ্ড অধিকার করেছে।

তারপর Russia ফিনল্যাণ্ড নামক একরত্তি দেশের অর্দ্ধেক গ্রাস করেছে। তারপর জার্ম্মাণী ডেনমার্ক গ্রাস করেছে। ডেনমার্ক ক্ষুদ্র দেশ, তার পক্ষে জার্ম্মাণীর সঙ্গে লড়ে' আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। ফলে ডেনমার্ক আত্মসমর্পণ ক'রেছে জার্ম্মাণীর কাছে।

তারপর জার্ম্মাণী নরওয়ে আক্রমণ ক'রেছে এবং খুব সম্ভব সে দেশকে প্রথমে বিধ্বস্ত ও শেষে আত্মসাৎ করবে। ইংলণ্ড নরওয়ের কোন সাহায্য করতে পারেনি।

তারপর জার্ম্মাণী হল্যাণ্ড আক্রমণ ও অধিকার ক'রেছে।

তারপর জার্ম্মাণী বেলজিয়াম আক্রমণ ও আত্মসাৎ ক'রেছে।

এ সব দেশই জার্ম্মাণীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ও আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ। এই ছোট দেশগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত।

হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ভারতবর্ষে এসেছিল আর অনেক ভূভাগ করায়ত্ত ক'রেছিল। ডেনমার্কের অধিবাসীরা অর্থাৎ দিনেমাররা শ্রীরামপুরের পত্তন ক'রেছিল। অপর দেশগুলির লোক, যতদূর জানি, কখন ভারতবর্ষে ব্যবসা ও লুঠতরাজ করতে আসেনি।

আজ জার্ম্মাণী ফ্রান্স আক্রমণ করেছে, এবং প্রথম ধাক্কায় জয়যুক্ত হ'য়েছে। ফলে জার্ম্মাণরা ইংলণ্ড আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করছে।

আজকের দিনে কাল কি হবে আজ তা বলা যায় না। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নীরব থাকাই ভাল।

ইউরোপের পূর্ব্বোক্ত খণ্ডরাজ্যগুলি যে এতদিন আত্মবশ ছিল এবং যথেষ্ট আত্মোন্নতি ক'রেছিল, তার মূলে ছিল সেই সভ্য মনোভাব,—যাকে আমি liberalism বলেছি। কারণ, এদের কারও আত্মরক্ষা করবার শক্তি ছিল না। ইউরোপের বড় রাজ্য তিনটি—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী—যখন খুসী তখনই এদের গ্রাস করতে পারত।

আমি যে সভ্যতাকে নব-সভ্যতা বলেছি, সে সভ্যতা ইউরোপীয়রা একমাত্র ইউরোপের জন্যই গড়েছিলেন,—বিশ্ব-মানবের জন্য নয়। এই একদেশদর্শিতাই ছিল এ সভ্যতার প্রধান দোষ।

এসিয়া ও আফ্রিকার উপর ইউরোপীয়গণ যে প্রভুত্ব বিস্তার ক'রেছে, তার মূলে ছিল প্রভু-মনোভাব। প্রভু মনোভাবের সঙ্গে পশু-মনোভাবের নাড়ীর যোগ আছে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এ ভূভাগের মানুষকে তাঁরা কখন মানু জ্ঞান করেন-নি। তাঁদের liberalism সকলের প্রতি প্রযোজ্য নয়। আজকের দিনেও ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে (তিমিরে সেই তিমিরেই রাখতে চান।

এ নব সভ্যতার বাণী বুদ্ধদেবের বা যিশুখৃষ্টের বাণীর মত সর্ব্বলোকগ্রাহ্য বাণী নয়। ইউরোপীয় সভ্যতা যদি কোনকালে ধ্বংস হয়,—তবে এই প্রভু-মনোভাবের ফলে মারামারি কাটাকাটি ক'রেই ধ্বংস হবে।

প্রমথ চৌধুরী।

মানস-প্রিয়া

ক্লান্ত নয়নে ব্যথা নেমে আসে পায় না তোমার দেখা,
চঞ্চল করি চঞ্চলে অয়ি, রেখে গেলে মোরে একা।
যে দিন হেরিনু তোমা নিরুপমা
সুনীল-বসনা অয়ি মনোরমা,
মনে প'ড়ে গেল অতীতের স্মৃতি সুদূর স্বপ্নসম,
তব অলকের পুলক-পাখায় উড়ে গেল মোহ-তমঃ।

ভেবেছিনু তোমা ওগো প্রিয়তমা আপন করিয়া লব
নিঃশেষে দিব যা-কিছু আমার পুরাতন অভিনব;
বুঝিলে না হায় নয়নের ভাষা
দূরে চলে গেলে বাড়ায়ে নিরাশা
উদাসীন করি বাড়ালে স্বপন গোপনতা গেল গোণা
স্মৃতিতে তোমার হ'লো ম্লান মণি, বৃথা হলো ধূলিকণা।

যখন নামিবে আকাশের বুকে গোধূলির ছায়া প্রিয়া
মন-হারা দেহে অজানা ব্যথায় গুমরি উঠিবে হিয়া;
ঘরে-ফেরা পাখী, নদী-কলতান
বিশ্বের বুকে মিলনের গান
বিরহ-বিধুর বক্ষের মাঝে সৃজিবে কঠোর কারা,
সাঁঝের শ্যামল ধরণীর বুকে রবে তরু লতা-হারা।

গুমরি গুমরি মরিবে সে স্মৃতি; তিলে তিলে যাবে চলি
রক্তিম আভা, অবশ বক্ষে যদি নাহি পড় ঢলি,
অপরাধ যদি ক'রে থাকি প্রিয়া,
ক্ষমা ক'রো সব তব গুণ দিয়া
কামনার যত কলুষ কালিমা দীপ্তিতে হোক্ ম্লান
মম হৃদয়ের যা-কিছু হে প্রিয়ে তুমি তো সকলি জান।

শোন শোন অয়ি সুন্দরি মোর, তোমারে লয়েছি চিনে,
রাতে তুমি মম হৃদয়ের ধন—নয়নের ধন দিনে।
দেখ আজি সাঁঝে পূজার লাগিয়া
কত শত ফুল এনেছি তুলিয়া
এস নামি প্রিয়ে তব রূপ নিয়ে, রূপে দিব মোর ডালি,
দিব বিলাইয়ে চরণের ছায়ে অন্তর করি খালি।

শ্রীউমানাথ সিংহ।

রবারের গাউন

ওহিয়োর আকরন্ সহরে রবারের বিরাট কারখানা। সম্প্রতি এই সহরে বিলাসিনীদের এক বিলাস-আসর বসিয়াছিল। সে আসরে

রবারের গাউন

বিলাসিনীরা রবারের তৈয়ারী বিচিত্র বেশে উদয় হইয়া নৃত্য ছন্দে রামধনুর দৃশ্য-বিভ্রম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ছবিতে ঐ রূপসীর অঙ্গে যে বেশ-ভূষা, তাহা আগাগোড়া রবারে তৈয়ারী। নাচিতে গিয়া রূপসী গাউনের প্রান্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন ; তাই আসিয়াছেন কারিগরের কাছে—'ভালকানাইজ,' করিয়া গাউনটিকে নিখুঁত ভাবে মেরামত করিয়া তুলিবেন।

—

কয়লা ও লবণে তৈয়ারী বেল্ট

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কয়লা এবং লবণ মিশাইয়া তাহা দিয়া নূতন এক রকম ধাতু তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই ধাতু দিয়া নূতন রকমের বেল্ট, সাস্‌পেণ্ডার, গার্টার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হইতেছে। এ বেল্ট খুব নমনীয় ; ঘামে বা এসিডে ইহাতে মরিচা ধরে না—অক্ষত দেহে বহু বৎসর ব্যবহারযোগ্য থাকে। এ ধাতুকে নানা

কয়লা-লবণের বেল্ট

রঙে রাঙানো হইতেছে, এবং কাচিলে সে রঙ ওঠে না, বা গার্টার প্রভৃতি ঘামে ও জলে বিবর্ণ হয় না।

— —

কেশের দীপ্তি

বিলাসিনীর বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্ত এক নব-উপায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। মাথায় কেশে যদি প্রদীপ্ত ছটার ঘটা সম্পাদন করিতে

মাথার কেশে বিজলী প্রভা

চুলে আলোর ফুল

কয়লা-বাষ্পে মোটর চলে

ছবিতে দেখুন একখানি দোতলা-বাসের সঙ্গে একটি ট্রেলার আঁটা। এই ট্রেলারের বুকে একটি এঞ্জিন আছে আর আছে একটি ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কের মধ্যে কাঠ-কয়লা পুরিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে যে ধূম্র-বাষ্পের সৃষ্টি হয়, ঐ ধূম্র-বাষ্প-যোগে বাস চলে। পেট্রোলে মোটর-গাড়ী যেমন বেগে ও স্বচ্ছন্দে চলে, এ বাসের গতিও ঠিক তেমন হয়, কোনো বৈলক্ষণ্য

ট্রেলার
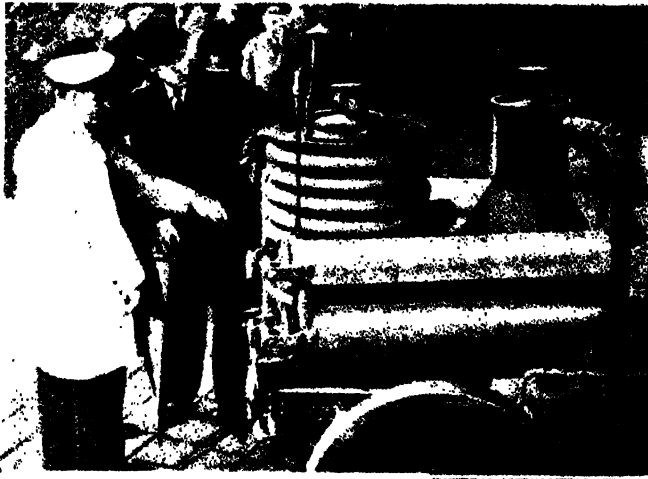
চান্, 'জ্বলন্ত ল্যাকার' ব্যবহার করুন। এ বস্তুটি এ শতাব্দীর নবতম আবিষ্কার! স্প্রেতে করিয়া এই তরল-ল্যাকার মাথার কেশে বর্ষণ করুন, কেশে বিজলী-দীপ্তির বিকাশ হইবে। সে দীপ্তিতে আঁধার-ঘর আলো হইয়া উঠিবে। কায়দা করিয়া মাথার কেশে এ ল্যাকার ছিটাইতে পারিলে বিজলী-প্রভায় বহু নক্সা ফুটিবে। পাখীর ছাঁদে, ফুলের ছাঁদে, প্রজাপতির ছাঁদে ল্যাকার ছিটান, মাথার কেশে বিজলী-প্রভায় পাখী, প্রজাপতি, ও ফুলের বাহার খুলিবে।

বাস্ ও ট্রেলার

ঘটে না। ট্রেলারের সঙ্গে একটি পাইপ দিয়া বাসের সংযোগ আছে; ঐ পাইপের মধ্য দিয়া গ্যাস আসিয়া বাসে গতি সঞ্চার

করে। লণ্ডনে এ বাস চালাইয়া ধূম্র-বাষ্পের শক্তি পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞেরা পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। এ যুদ্ধ-বিগ্রহে পেট্রোলে টান্ পড়িলে কয়লা-বাষ্পে বাস ও ট্যাক্সি প্রভৃতি চালাইতে বেগ পাইতে হইবে না।

জলের বুকে রক্ষা-কবচ

আমাদের দেশে সাঁতার-কাটিবার সময় অনেকে জলের বুকে কোঁচার কাপড় মেলিয়া দিয়া তার প্রান্ত মুড়িয়া বেলুনের মত ফাঁপাইয়া তাহা ধরিয়া থাকেন। ভিজা কাপড়ে এই ফাঁপা গোলক রচিয়া তার সাহায্যে জলে নিরাপদে ভাসা যায়—ডুবিবার কোনো ভয় থাকে না। এমনি প্রণালীতে একটু রকমফের করিয়া সম্প্রতি কালি-ফোর্ণিয়ার সমুদ্র-বক্ষে নর-নারী নিরাপদে সাঁতার কাটিতে-ছেন! চার-গজ মাপের ভালো মশলিন কিম্বা নয়ানসুক কাপড় লম্বালম্বিভাবে কাটিয়া বালিশের ওয়াড়ের মতো তিন দিকে তিন লাইন মুড়ি-সেলাই দিবেন—তাহাতে খুব মজবুত হইবে! একটা দিক খুলিয়া রাখিবেন। যেদিক খোলা থাকিবে, সেই দিকে শক্ত করিয়া 'হেম' দিবেন। তার পর জলে নামিয়া এই থলি বা ওয়াড় জলে ভিজাইয়া লইয়া বাতাসের মুখে ধরিয়া থলিটিতে বাতাস ভরিতে হইবে,—ভরিয়া ক্ষিপ্র টানে

কাপড়ের থলিতে বাতাস-ভরা

খোলা দিকটা জলের মধ্যে সজোরে ডুবাইয়া-লইয়া এ-দিক মুড়িয়ে চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলুন। বাতাসে ভরিয়া এ থলি বেলুনের মতো ফুলিয়া উঠিবে; তখন এই কাপড়ের থলি লইয়া যেমন খুশী জলে ভাসুন—ডুবিবার ভয় নাই।

বোমা-ভয় বারণ

যুদ্ধে এই মারণ-যজ্ঞে সমুদ্র-বক্ষে জাহাজ চালানো নিরাপদ নয়। জাহাজের খোলা ডেকে বা ব্রিজে নাবিকের বা কোনো কর্মচারীর পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা বিপজ্জনক। কোথায় আকাশ হইতে কখন্ বোমা পড়িবে, সে বোমায় নিমেষে প্রাণটা অমনি বাহির হইয়া যাইবে! অথচ জাহাজকে নিরাপদে পরিচালনা করিবার জন্ম ব্রিজে রক্ষী রাখা প্রয়োজন। বোমার ভয়-নিবারণের জন্ম দু'চারখানি সমুদ্রপোতে লেটার-বক্সের ধরণে ইস্পাতের বাক্স বসানো হইয়াছে। এই বাক্সের গায়ে কতকগুলি রন্ধ্র আছে—বাক্সের মধ্যে নাবিক বা কর্মচারী নিরাপদে বসিয়া থাকে, এবং ঐ রন্ধ্র-পথে চোখ রাখিয়া সমুদ্র-পথ দেখিয়া কাপ্তেনকে খপরবার্তা দেয়। ইস্পাতের বাক্সটি খুব মজবুত; দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য। উহার উপর বোমা পড়িলে
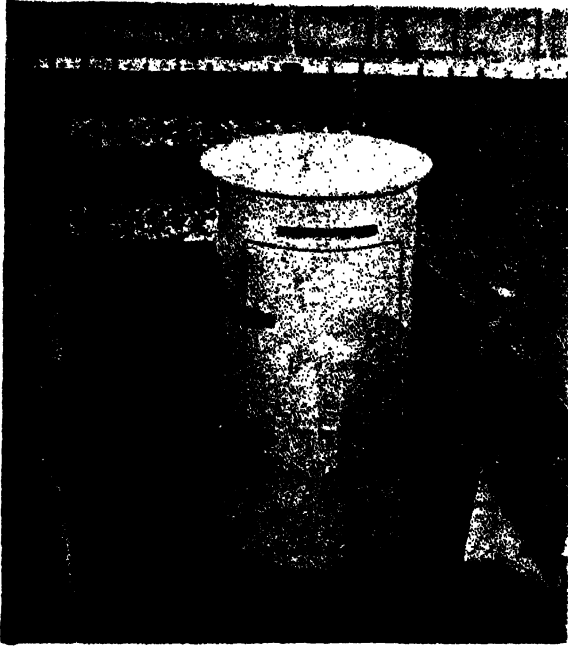
বোমা-বারণ বাক্স

বাক্স ভাঙ্গিবে না এবং বাক্সমধ্যে উপবিষ্ট রক্ষীরও এতটুকু আঘাত লাগিবে না।

অগ্নি-নির্ব্বাণ ট্রাক

পেট্রোল বা সেলুলয়েড-ফিল্মে আগুন লাগিলে সে-আগুন নিমেষে দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠে! সে আগুন নিবানো সহজ নয়। সম্প্রতি খুব সহজে এই ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত-নিবারণের উপায় মিলিয়াছে। ট্যাঙ্কে কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড্ গ্যাস ভরিয়া জল দিবার মোটা হোজে ভরিয়া সেই গ্যাস অগ্নিযজ্ঞে নিক্ষেপ করুন, নিমেষে দিগন্তব্যাপী অগ্ন্যুৎপাতের অবসান ঘটিবে।

ক্লিপ-দেওয়া ঘড়ি

একালে রিষ্ট ওয়াচের বিপুল পসার। কিন্তু রিষ্ট-ওয়াচ হাতে আঁটিতে হইলে তার জন্ম ব্যাণ্ড চাই। সম্প্রতি আমেরিকায় যে রিষ্টওয়াচ তৈয়ারী হইতেছে, তাহার জন্ম ব্যাণ্ডের কোনো প্রয়োজন নাই। এ রিষ্টওয়াচের সঙ্গে টাইট্‌ভাবে ক্লিপ সংলগ্ন আছে। এই ক্লিপ-সাহায্যে সার্টের কাফে ঘড়ি আঁটুন, ওয়েষ্টকোটের পকেটে আঁটুন, টাইক্লিপের মতো নেকটাইয়ে আঁটুন; মেয়েরা আঁটুন হাতব্যাগে, মাথার চুলে, কিম্বা ব্লাউশে বা আঁচলে। ওয়াচ টাইট ভাবে সংলগ্ন থাকিবে—পড়িবে না! আংটি-ঘড়ি বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তার দাম এত বেশী যে, অনেকের পক্ষে তাহা সুদুর্লভ!

হাতের কাফে ঘড়ি

অদৃশ্য চশমা

বহু ভামিনীকে দায়ে পড়িয়া চশমা লইতে হয়, অথচ চোখে তাঁরা চশমা আঁটিতে চান না—পাছে চশমার চাপে কমনীয় মুখখানিকে কুশ্রী দেখায়! তাঁদের দুঃখ-মোচনের জন্ম আমেরিকার চশমাওয়ালারা নূতন চশমা গড়িতেছেন। এ চশমার লেন্স এমন ভাবে তৈরী যে, চোখে এ চশমা আঁটিলে বুঝা যাইবে

অদৃশ্য লেন্স

চশমা

কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড্ ট্রাক্

না, চোখে চশমা আছে! ফ্রেম ও চশমার নাসাদণ্ড দেখা যাইবে, কিন্তু সেগুলি দেখাইবে ঠিক মুখপদ্ম-ভূষণের মতো। চশমার কাচ আদৌ দেখা যাইবে না। ছবিতে দেখুন—রূপসীর চোখের উপর চশমার কাচ প্রত্যক্ষ হয় কি?

ব্যায়াম-যন্ত্র

ঘোড়ায় চড়া এবং নৌকার দাঁড় টানা—এ দু'টিতে ব্যায়াম হয় চমৎকার! ঘরে বসিয়া এ দু'টি ব্যায়াম সাধিবার জন্য নূতন যন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। যন্ত্রটি কজার ভাবে চলে। ইহাতে বসিবার আসন আছে—পা রাখিবার জায়গা আছে—সামনে বাইসিকলের হ্যাণ্ডেলের মতো দুটি হ্যাণ্ডেল আছে। আসনে বসিয়া দু' হাতে হ্যাণ্ডেল দু'টি ধরিয়া যথাস্থানে দুই পা রাখিয়া, শুধু ঐ হ্যাণ্ডেল ধরিয়া হাতলদণ্ড সামনে পিছনে পরিচালনা করুন। ঘোড়ায় চড়া এবং নৌকার দাঁড় টানার সাধ মিটিবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম-সাধনায় দেহখানিও সুন্দর ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে। এ যন্ত্রের সুবিধা এই যে, নিরালা ঘরে ইহা লইয়া ব্যায়াম-সাধনা চলিবে। যন্ত্রটি মুড়িয়া রাখিতে খুব বেশী জায়গা লাগিবে না।

ঘোড়ায় চ'ড়ে দাঁড় টানো

উড়ন-যন্ত্র

উড়ন-যন্ত্র

এ যুদ্ধে সেনাদল কখন পাহাড়ে চড়িবে, সে পাহাড় হইতে কখন কোথায় লাফ দিবে, তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই! পাহাড় হইতে লাফ দিতে গিয়া নীচে হয়তো গভীর খাদ কিম্বা জলা; পঙ্ক-কর্দম, কিম্বা অগাধ জল মিলিবে। কাজেই ঝাঁপ দিয়া তারা যাহাতে নিরাপদ-ভূমিতে অবতরণ করিতে পারে, সেজন্য নিউইয়র্ক-বাসী জর্জ্জ বোথিজাট এক-রকম উড়ন-যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক পাখার ঝুলনদণ্ডের মতো একটি দণ্ডের সঙ্গে দু'খানি প্রোপেলার জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—আর আছে ঐ সঙ্গে হালকা-ওজনের একটি গ্যাসোলিন্-এঞ্জিন। বেল্ট ও লগেজ গায়ে আঁটিয়া এ যন্ত্রসংলগ্ন আসনে বসিয়া নিজের হাতে অতি সহজে এ যন্ত্র চালাইয়া দু' এক মাইল উড়িতে উড়িতে ভূতলে অবতরণ করা যায়, বেঘোরে পড়িয়া আহত বা নিহত হইবার ভয় নাই!

৪

চেতনা লাভের পর অভয়াচরণবাবু যথাসাধ্য চেষ্টায় সংযত ও শান্ত হইলেন। প্রতুলবাবু বরকর্ত্তার নিকট হইতে বাড়ী ফিরিয়া যখন সকল কথা তাঁহাকে জানাইলেন, তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "জ্ঞান বুঝি এই ভাবে তার বিদ্বেষের পরিচয় দিলে? তা' যা সে ভাল বোঝে করুক; তার অসন্তোষের ভয়ে আমি তো আর বানরের গলায় মুক্তামালা পরাতে পারিনে। জ্ঞানের ছেলের হাতে আমার নয়নমণি শেফালীকে সমর্পণ করা তা'ছাড়া আর কি? রণুটা লেখাপড়া তো করলেই না, বিদ্যার আদরও সে বোঝে না;—আলস্য ও বিলাসিতাই তার সম্বল। কারণ, সে জমিদারের ছেলে! যাক ও কথা, এখন বিয়ের কি হবে? লগ্ন দেরীতে; দেখ, যদি একটি সৎপাত্র এই সময়ের মধ্যে খুঁজে আনতে পার। বিয়ে তো আজই দিতে হবে।"

তাঁহার কথা শুনিয়া সন্তোষ বলিল, "সে কি দাদামণি! এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? আজ এই রাত্রির মধ্যে যোগ্য পাত্র সংগ্রহ করা কি সম্ভব? আজ রাত্রিতে বিয়ে হবে কি ক'রে?"

অভয়াবাবু—"ছেলেমানুষ তুমি—অনর্থক তর্ক ক'রো না। বিয়ে আজ দিতেই হবে—তা' যাকে ধ'রেই হোক। আজ রাত্রিতে বিয়ে দিতে না পারলে মান-সম্ভ্রম সব নষ্ট হবে; এমন কি, সমাজচ্যুত হ'তে হবে।"

সন্তোষ—"এই রকমই যদি সমাজের বিধান হয়, তবে সে বিধান অত্যন্ত নিষ্ঠুর; সেই নিষ্ঠুর, যুক্তিহীন বিধান পালনের জন্য শেলীর সারা জীবনের সুখ-শান্তি,—তার জীবনটা পর্য্যন্ত নষ্ট করতে হবে? সমাজ যদি অবুঝ হয় ত সে সমাজে কাজ নেই দাদামণি; আমি এ ভাবে তার বিয়ে দিতে দোব না।"

অভয়াবাবু—"চুপ কর। ছেলেমানুষ তুমি, এ অনধিকার-চর্চ্চা তোমায় শোভা পায় না। তুমি সমাজ, ধর্ম্ম, এ সকলের কিছুই মর্ম্ম বোঝ না।"

সন্তোষ—"হিন্দুশাস্ত্রে এ-রকম কুবিধি থাকতে পারে না; এ-সব দেশাচার ভিন্ন যে অন্য কিছু নয়—তা সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারা যায়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ আমি করবোই।"

অভয়াবাবু—"দেশাচারই যদি হয়, তা'ও তো অগ্রাহ্য করা যায় না। ও-সব না মানলে সমাজ টি'কবে কি ক'রে? আর আমার দিদিমণির মঙ্গল কামনা আমার চেয়ে কেউ বেশী করে না;—দেশাচারবিরুদ্ধ কাজ করলে তা'র অকল্যাণ হবে।"

সন্তোষ—"আমার কথায় আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না দাদামণি! কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি—ও-সব ভ্রান্ত ধারণা—এ-রকম ক'রে কখনও কল্যাণ হ'তে পারে না।"

অভয়াবাবু বিরক্তিভরে বলিলেন, "যাও, আর মিছে সময় নষ্ট ক'রো না। আমার চেয়ে শেফালীর বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী আর কে আছে? আমি যা' করব, তাতেই ওর ভাল হবে।"

পিতামহ উত্তেজিত হইতেছেন; অথচ ডাক্তার বাবু ইসারায় জানাইতেছেন, উত্তেজনা উঁহার পক্ষে ক্ষতিকর। নিরুপায় হইয়া সন্তোষ স্তব্ধ হইল। কিন্তু এই বিভ্রাটের উপর প্রকৃতি দেবীও বিরূপ হইয়া উঠিলেন। অপরাহ্নের অভ্র শুভ্র খণ্ড খণ্ড মেঘস্তর একত্র মিলিত হইয়া এখন নিবিড়কৃষ্ণ জলদরাশি নৈশাকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। বৃদ্ধ স্বীয় জামাতাকে যখন পাত্রের সন্ধানে যাইতে বলিয়াছিলেন, সেই সময়েই পবনদেব ভীমবেগে সাড়া দিয়াছিলেন। এখন বায়ুর তাড়নায় নিবিড় মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিয়া

অপ্রান্তভাবে বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। গাঢ় কৃষ্ণ মেঘে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশ হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইতেছিল, আবার পরক্ষণেই পৃথিবী ঘোর মেঘান্ধকারে আবৃত হইতেছিল; আর সঙ্গে সঙ্গে কি ভীষণ বজ্রনির্ঘোষ! এ যেন ঝড় নহে, প্লাবন নহে, যেন প্রলয়ের সূচনা! কাল-বৈশাখীর এই আকস্মিক অদ্ভুত খেয়ালে সকলকেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতে হইল।

সময়ের গতি অবাধ, এদিকে বৃষ্টিরও বিরাম নাই। বৃদ্ধ অভয়াচরণবাবু দুশ্চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। প্রতুলবাবু চঞ্চল হৃদয়ে ঘরে বাহিরে ঘুরিতে লাগিলেন, বিবাহের লগ্ন যে উত্তীর্ণ হইয়া যায়! চিন্তার সমুদ্রে কূল না পাইয়া অবশেষে অভয়াচরণবাবু সন্তোষকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতা হ'তে তোমার যে কয়েক জন সহপাঠী বন্ধু এসেছে, তাদের সকলেই কি বিবাহিত?"

সন্তোষ—"না। ও কথা জিজ্ঞাসা করচেন কেন?"

অভয়াবাবু—"অবিবাহিত কেউ কেউ থাক্‌লে, ওদেরই মধ্যে কোন কায়স্থ-সন্তানকে বর মনোনীত করব।"

সন্তোষ সবিস্ময়ে বলিল, "তা' কি ক'রে হবে? ওদের তো সে জন্যে এখানে আনা হয় নি।"

অভয়াবাবু ঈষৎ বিরক্তিভরে বলিলেন, "সে কথা তোমায় ভাব্‌তে হবে না; বল, কায়স্থ ছেলেদের মধ্যে কে কে এখনও অবিবাহিত।"

সন্তোষ বলিল, "দু'জন মাত্র, প্রমথ আর সুনীল। প্রমথর বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে আছে; আর সুনীলের সম্বন্ধে ও-কথা উঠ্‌তেই পারে না।"

অভয়াবাবু—"উঠ্‌তেই পারে না কেন? সুনীল ছেলেটি তো খাসা। সে কুলীন না হ'লেও দত্তরা সদ্বংশ। আমার মনে হয়, ওর হাতে শেফালীকে সম্প্রদান করাই ঠিক।"

সন্তোষ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে হ'তেই পারে না। কত কষ্টে ওর বাপকে রাজী ক'রে তবে এই একটা রাত্রির জন্য ওকে আন্‌তে পেরেছি। এখন না ব'লে-ক'য়ে তার মা-বাপের অজ্ঞাতসারে তার সঙ্গে হঠাৎ বোনের বিয়ে দেওয়া কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে? কথাটা তার দিক্ থেকেও ভেবে দেখা দরকার।"

অভয়াবাবু—"তা কি হবে? এমন বিপদেও কি সে ভদ্রলোকের মানরক্ষা করবে না?"

সন্তোষ—"আমার তো মনে হয় না যে, সে এখন বিয়ে করতে চায়। আর তা' ছাড়া, সে তা'র বাবার কথার বিরুদ্ধে কখনও চলে না। তাঁর মত না নিয়ে কি ক'রে সে বিয়ে করবে?"

অভয়াবাবু—"আমাদের কুলের মেয়ে পেলে দত্তবংশের মর্য্যাদা বাড়বে বই কম্‌বে না। আর সুনীলের বাবা উপস্থিত থাকলে এমন অবস্থায় কখনও অমত করতেন না।"

সন্তোষ—"তা' আমি অত জোর ক'রে বল্‌তে পারিনে। দত্ত সাহেব যে-রকম রুক্ষ মেজাজের লোক, হয় তো বিয়েটা মান্‌তেই চাইবেন না।"

অভয়াবাবু—"নিশ্চয় মান্‌বেন,—আমার দিদিমণিকে বধূরূপে পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। সুনীলকে তুমি রাজী কর।"

সন্তোষ—"সুনীল কিছুতেই মত দেবে না; সে তা'র বাবার আজ্ঞা না পেলে কি ক'রে জীবনের এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ ক'রে বস্‌বে?"

অভয়াবাবু—"ভদ্র পরিবারকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য পিতৃ-আজ্ঞার অপেক্ষা করতে হয় না।"

সন্তোষ—"মৃত্যুশয্যাশায়ী বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করা যদি এত বড় অন্যায় হয় তো বন্ধুর বোনের বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে দেশাচারের পীড়নে হঠাৎ বিয়ে করাতে দোষ হয় না কেন?"

এই কথা শুনিয়া অভয়াবাবু পাংশুবর্ণ হইলেন, ও "বাবা গো" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াই আবার সংজ্ঞাহীন হইলেন। শেফালিকা তাঁহার পদসেবা করিতেছিল; ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা, এ কি ক'রলে? দাদামণিকে মার্‌লে?"—বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় তাহার উভয় গণ্ড প্লাবিত হইল; সন্তোষ অনুতপ্ত হৃদয়ে ডাক্তার বাবুর নির্দ্দেশমত রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইল।

ডাক্তার বাবু অল্প পরেই শেফালীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ভয় নেই মা, তোমার দাদামণি শীঘ্রই সুস্থ হবেন।"

ইহা শুনিয়া শেফালিকা ব্যাকুল কণ্ঠে সন্তোষকে বলিল, "দাদা, আমার মত অভাগিনীর ভাগ্যে সুখ আসতে পারে কি? সুখীই যদি হব তো ছেলে-বেলায় বাবা-মা দু'জনকেই হারাব কেন? তা' না হ'লে এমন বিপদই বা এ সময়

ঘটবে কেন? আমার আর সুখে কাজ নেই, দাদামণিকে বাঁচাও।"

শেফালী পিতামহীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি নিজে যান। লেখাপড়া শিখেছেন, ভদ্রবংশের ছেলে, আপনার কথা তিনি ঠেলতে পারবেন না। তিনি যেন বিশ্বাস করেন, বিয়ে হয়ে গেলেও আমি স্ত্রী ব'লে তাঁর ওপর কোনও দাবী করব না। আমার দাদামণির মানরক্ষা হোক, তাঁর মর্য্যাদা অটুট থাক, আর কিছুই আমি চাইনে। আমার কথা কা'কেও ভাবতে হবে না।"

শেফালীর কথা শুনিয়া শান্তিদেবী তাঁহার জামাতা প্রতুলবাবুর সঙ্গে চলিলেন, এবং সুনীলকে অন্য দিকে ডাকাইলেন। লজ্জাশীল সুনীল অবনত মস্তকে সবই শুনিল; কিন্তু সে অনেক আপত্তি করিল। তাহার পিতা এ বিবাহে সম্মত হইবেন না, এবং অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন, এ কথাও জানাইল। তাহার নিজের মনও তখন প্রস্তুত নহে। কিন্তু তাহার যুক্তি, আপত্তি সকলই ভাসিয়া গেল; শান্তিদেবীর কাতর প্রার্থনায়- সুনীলকে বরাসন গ্রহণ করিতে হইল।

অভয়াবাবুর যখন জ্ঞান হইল, তখন কন্যা সম্প্রদান হইতেছে। সেই কথা শুনিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্থির ভাবে শুইয়া রহিলেন। মনে মনে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন—নবদম্পতির শুভমিলন যেন ব্যর্থ না হয়।

শুভদৃষ্টির সময় শেফালিকা তাহার লজ্জাবনত নয়ন সুনীলের দিকে ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, সুনীলের কাতর দৃষ্টি অবনত, সে মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল না। শেফালিকা ব্যগ্র চিত্তে সুনীলের সৌম্য মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইল। সে তাহার পিতামহীর নিকট শিখিয়াছিল, স্বামীই হিন্দু রমণীর একমাত্র জাগ্রত দেবতা। স্বামী বিরূপ হইলেও সতী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না—হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে তাহার পূজা ভুলিতে পারে না। সকল দেবতাকে স্মরণ করিয়া সে সুনীলের চরণে আত্মনিবেদন করিল; কাতর ভাবে প্রার্থনা জানাইল—সুনীলের পিতা যেন তাহাকে বধূরূপে গ্রহণ করেন।

সুনীল কিন্তু একবারও চক্ষু তুলিল না। দেখিল না যে, কাহাকে সে বিবাহ করিল। দেখিলে বুঝিতে পারিত, সে সত্যই ভাগ্যবান—তাহার উপেক্ষিতা সত্যই বাঞ্ছনীয়। শেফালিকার অঙ্গরাগ তপ্তকাঞ্চনের মত উজ্জ্বল নহে; শ্বেত পুষ্পের মত সম্পূর্ণ শুভ্র না হইলেও স্নিগ্ধ। তাহার চোখের চাহনি করুণ অথচ আলোকোজ্জ্বল। তাহাতে জ্ঞানের আভা বিকশিত। কেশগুচ্ছ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রূযুগল যেন চিত্রকরের সযত্নঅঙ্কিত; অধরোষ্ঠ পাতলা, সুলোহিত, মুখ সদা-হাস্যপ্রফুল্ল। দীর্ঘাবয়বা কৃশাঙ্গী শেফালিকার সমগ্র মূর্ত্তি যেন ঔদার্য্যমণ্ডিত। কিন্তু সুনীল কিছুই দেখিল না, কিছুই জানিল না।

হোমের সময় উদ্বাহ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে সুনীল আরাধ্য দেবতার নিকট তাহার অন্তরের নিবেদন জানাইল, "আমার সঙ্কল্প যদি সাধন করিতে না পারি, হে দেব, আমায় ক্ষমা করিও। আমার শরীর এখানে আছে, মন নাই; আমার রসনা যাহা উচ্চারণ করিতেছে, আমার অন্তরে তাহার প্রতিধ্বনি নাই। আমার মনেও পাপ নাই।"

বিবাহ-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইল। বরকন্যাকে যখন বৃদ্ধ পিতামহের নিকট লইয়া যাওয়া হইল, অভয়াবাবুর সমস্ত শরীর তখন যেন অসাড়; তিনি অতি কষ্টে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল- বহু বৎসরের শোকের উচ্ছ্বাস তাঁহার আর দমন করিবার শক্তি হইল না।

ঝড় থামিয়া গিয়াছে, মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, নিয়তির লীলার প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। কিন্তু সুনীল, শেফালিকা ও অভয়াবাবুর অন্তরের ঝটিকার বিরাম নাই। চারি দিক নিস্তব্ধ, পুরী নিদ্রালস; বাতায়ন-পথে স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ-সম্পাতে বাসর-ঘর যেন প্লাবিত হইতেছিল। মৃদু সমীরণ পরিশ্রান্ত পুরবাসিগণকে যেন চামর ব্যজন করিতেছিল। রাত্রি গভীর হইলে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু সুনীল ও শেফালিকার চক্ষুতে তখনও নিদ্রা নাই। শেফালিকা আজ নিস্পন্দ, অসাড়; অবগুণ্ঠনাবৃতভাবে সে শয্যার এক প্রান্তে পড়িয়া ছিল, এবং নলিন নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া আকাশ-পাতাল কি যে ভাবিতেছিল, তাহা সেই জানে। কিন্তু সে তাহার ভাগ্যাকাশে পুঞ্জীভূত নিবিড় কৃষ্ণ মেঘস্তরে আলোকের ক্ষীণ রশ্মিও দেখিতে পাইল না। সেই তরুণ বয়সেই সে অচলা ভক্তি সহকারে ঈশ্বরে

নির্ভর করিতে শিখিয়াছিল; তাই জীবনের এই কঠোর পরীক্ষায় সে হতাশ হয় নাই—ভগবৎচরণে সে তাহার অন্তরের সকল বেদনার বাণী নিবেদন করিয়া আজ শান্তি-লাভের চেষ্টা করিতেছিল।

সুনীলেরও মনে তখন সবেগে ঝটিকা বহিতেছিল। পরদিন প্রভাতে কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার পিতাকে সে কি বলিবে? তাহার পিতার প্রকৃতি তাহার অজ্ঞাত নহে; এ বিবাহ যদি তিনি মঞ্জুর না করেন, তাহা হইলে সে কি করিবে? আর যদিই বা পিতা তাহার সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া শেফালিকাকে বধূ বলিয়া গ্রহণে আপত্তি না করেন, তবেই বা তাহার কর্ত্তব্য কি? কিছুই সে স্থির করিতে পারিল না। একবার সে চঞ্চল হৃদয়ে গৃহসংলগ্ন বারান্দায় পাদচারণ করে, শ্রান্তিবোধ করিলে আবার শয্যায় শয়ন করিয়া বাতায়ন-পথে নির্নিমেষ নেত্রে চন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকে। যেন সেই চন্দ্রমণ্ডলে তাহার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত আছে! ঘড়িতে ঠং ঠং শব্দে রাত্রি দুইটা বাজিতেই শেফালিকা চমকিয়া উঠিল। সে নববধূসুলভ লজ্জা দমন করিয়া মৃদুস্বরে সুনীলকে বলিল, "একটু স্থির হ'য়ে শুয়ে' থাক্‌লে ঘুম আস্‌বে। আপনার কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে?"

সুনীল বিরক্তিভরে উত্তর দিল, "তোমার ঘুমের বুঝি ব্যাঘাত করচি, তা' আমি না হয় বারান্দায় যাচ্ছি।"

এ কথায় অবগুণ্ঠনের অন্তরালে শেফালীর লজ্জারুণ মুখে যে বেদনার আভাস ফুটিয়া উঠিল, সুনীল তাহা দেখিতে পাইল না; তাহার উক্তিতে যে কাতরতা ছিল, তাহাও সে লক্ষ্য করিল না।

শেফালী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল, "আমার জন্য নয়। আপনি অতিথি, আপনার পরিচর্য্যাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।"

সুনীল এবার ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে কিঞ্চিৎ শ্লেষভরেই বলিল, "অতিথিসেবার ঘটায় আর কাজ নেই। বাড়ীতে ডেকে এনে যে বিপদে ফেলেছ, আমার যা' সর্ব্বনাশ করেছ, তা'র ওপর আর দরদ দেখিয়ে কর্ত্তব্য পালন করতে হবে না। কর্ত্তব্যটা তোমরা আঠার আনা পালন করেছ; আর কেন?"

শেফালী অচঞ্চল স্বরে উত্তর দিল, "আপনার তো কোন অনিষ্ট হয়নি। আপনার তো কোনও দোষ নেই; সকল ঘটনার বিবরণ শুন্‌লেও কি বাবা আপনাকে ক্ষমা কর্‌বেন না? আর যদি তিনি আপনার এ বিবাহ স্বীকার না করেন, তা' হ'লেও আপনি আজকার রাত্রির এই অপ্রীতিকর ঘটনা একটা দুঃস্বপ্ন ব'লে অনায়াসেই তো ভুল্‌তে পারবেন।"

সুনীল বিরক্তিভরে বলিল, "আর বক্তৃতায় কাজ নেই। পাড়াগেঁয়ে কুণো মেয়েদের এমন কি শিক্ষা আছে যে, এই সব ব্যাপারের গুরুত্ব তারা বুঝতে পারবে?"

শেফালী ব্যথিতভাবে বলিল, "এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি আপনার কাছে এই অঙ্গীকার করচি যে, এই বিয়ের জন্য আপনার ওপর কোন দিন কোন দাবীই আমি কর্‌ব না। আমি আপনার জীবনের পথ থেকে আজীবন দূরে স'রে থাকব, আপনার সুখের পথের কণ্টক হব না। আপনাকে যে কাজে বাধ্য হ'তে হয়েছে, সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটু ঘুমিয়ে নিন, আপনার শ্রান্তি দূর হোক—এই আমার মিনতিপূর্ণ অনুরোধ।"

সুনীল আর তাহার কথার প্রতিবাদ করিল না, করিতে পারিল না। এত কঠোরতা, এরূপ রূঢ়তা, এই প্রকার অপমানের পরও শেফালিকা নম্রভাবে মিনতি সহকারে যে উত্তর দিল, তাহা শুনিয়া সুনীল বিস্ময়ে মৌন রহিল। সে শয্যায় শয়ন করিয়া অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইল।

নিশাবসানে প্রত্যূষে শেফালিকা শয্যাত্যাগ করিল। বিবাহকালে শুভদৃষ্টির সময়েও বাষ্পাকুল নয়নে সে সুনীলের মুখমণ্ডল সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায় নাই। এখন উষালোকে সে নির্নিমেষ নেত্রে স্বামীর সৌম্য সুন্দর মুখ দেখিয়া লইল। কয়েক মিনিট পরে সে নিদ্রিত স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

৬

বিবাহের রাত্রিটা অভয়াবাবু স্বপ্নাবিষ্টের মত কাটাইয়াছিলেন। অতীতের সুখ-দুঃখের স্মৃতি তাঁহার মন পুনঃ পুনঃ ব্যাকুল ও বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল। প্রথম যৌবনের

কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, এবং শৈশবেই তাহাদের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার পর তাঁহার পুত্র বিমলাচরণ ও কন্যা প্রতিমার জন্ম। কত যত্নে, কত সন্তর্পণে তিনি তাহাদের পালন করিয়া তুলিলেন। সামাজিক প্রথার দাস পুণ্যকামী অভয়াচরণ অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে গৌরীদান করিয়া তাহাকেও হারাইয়া-ছিলেন। শ্বশুরকুলের প্রথানুযায়ী তাঁহাদের বধূ পিত্রালয়ে যাইতে পারিত না, এজন্য তিনি প্রতিমাকে গৃহে আনিতে পারিতেন না; তথাপি বৈবাহিক সম্ভ্রান্তবংশীয়, জামাতা প্রতুলচন্দ্র ব্যবসায়ে ধনী হইয়াছেন, ভাবিয়া কন্যার কল্যাণ কামনায় তিনি সকল কষ্টই সহ্য করিয়াছিলেন। পুত্র বিমলের প্রতি তিনি হৃদয়ের সকল স্নেহ ঢালিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অভয়াবাবুর চেষ্টা বিফল হইল না। পুত্র বিমল সকল গুণের অধিকারী হইয়া পিতামাতার গভীর স্নেহের উপযুক্ত হইল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বিমল স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিতে লাগিল। সে মেধাবী ও বুদ্ধিমান, সকল বিষয়েই স্বাধীন ভাবে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সেই পথে চলিত। এইজন্য যখনই সে বিবেকের অনুশাসনে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করিত, তখনই পিতার অপ্রীতিভাজন হইত। মতবিরোধের ফলে পিতা-পুত্রে মনান্তর হইত। বিমলের মাতা শান্তিদেবী নিরুপায় হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতেন।

বিমল কণকপুর ইংরেজী স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইলে, তাহার পিতামাতা বিষম সমস্যায় পড়িলেন। প্রজাবৎসল জমিদার অভয়াচরণ বাসগ্রামের প্রতি অনুরক্ত, জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইতে সম্মত ছিলেন না; তাঁহার গুণবতী পত্নী শান্তিদেবী তাঁহার চিরসঙ্গিনী,—অথচ উচ্চশিক্ষার জন্য বিমলকে কলিকাতায় যাইতেই হইবে। পিতামাতা তাহার মাতামহের বাড়ীতে রাখিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু বিমল সম্মত হইল না। "ও বাড়ীতে অত লোকের গোলমালে আমার থাকা পোষাবে না" বলিয়া সে আপত্তি জানাইল। তখন স্থির হইল, সে কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া সেখানে বাস করিবে। অভয়াবাবু শান্তিদেবীকে পুত্রের সহিত যাইতে বলিলেন; কিন্তু পতিসেবাই তিনি পরমধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে অভয়া-বাবুর পরিচর্য্যার ত্রুটি হইবে বুঝিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অথচ কি করিয়াই বা তিনি একমাত্র পুত্র নয়নের মণি বিমলকে ছাড়িয়া থাকিবেন? বিমল বলিল, "আমি একাই যাব, তোমরা কি চিরজীবন আমাকে আগ্‌লে বেড়াবে না কি? কত ছেলে তো হোষ্টেলে থেকেই লেখা-পড়া শিখচে।"

শান্তিদেবীর ইচ্ছা ছিল, নূতন বাড়ী কিনিয়া বিমল সেই বাড়ীতে থাকিবে; কিন্তু কলিকাতায় বাড়ী কিনিলে পাছে সহরের প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়, এই ভয়ে বাড়ী না কিনিয়া অভয়াবাবু নবনির্ম্মিত একটি বাড়ী ভাড়া লইলেন। বিমলের পিতামাতা প্রথমে তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, এবং তাহার নিকট কিছু দিন বাসও করিয়া-ছিলেন। পরে পুরাতন ভৃত্য ভোলানাথ ও বহু দিনের বিশ্বাসী এক জন পাচককে রাখিয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া-ছিলেন।

কলেজে বিমলের সহাধ্যায়ীদের অধিকাংশই কলিকাতা-বাসী, কয়েক জন ভিন্ন জিলার অধিবাসী। নবাগত যে সকল ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকে, অন্যান্য ছাত্রদিগের সহিত তাহাদের পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না; যাহারা সঙ্গিহীন রহিল, অমলকুমার রায় তাহাদের অন্যতম। অমলকুমার দূর হইতে সতৃষ্ণ নয়নে বিমলকে দেখিত, যেন বিমলের হৃদয়ের কোন অজ্ঞাত সৌন্দর্য্য তাহাকে আকৃষ্ট করিত। অমলের প্রীতির আকর্ষণ বিমল উপেক্ষা করিতে পারিল না, কারণ, অকপট প্রণয় চুম্বকধর্ম্মী; বিমল অমলের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইল। কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচ আসিয়া এই দুইটি তরুণ হৃদয়ের অবাধ মিলনের আনন্দে বাধা দান করিল।

প্রায় এক মাস পরে, এক দিন সন্ধ্যাকালে বিমল তাহাদের বাসার অদূরবর্ত্তী পার্কে ভ্রমণ করিতে করিতে বুঝিতে পারিল, অমল তাহার অনুসরণ করিতেছিল। বিমল কৌতূহলী হইয়া অমলকে নিকটে আহ্বান করিল, এবং অদূরবর্ত্তী বেঞ্চে বসিয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। সেই দিন উভয়ে পরস্পরের হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া যে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইল, তাহা দিন দিন দৃঢ় হইল।

অমলের পিতা ব্যারিষ্টার মিষ্টার অনিল রায় আইন-ব্যবসায়ে উন্নতি-সোপানে পদার্পণ করিয়া যৌবন কালেই ইহলোক ত্যাগ করেন ; কিন্তু তিনি আর্থিক আয়-ব্যয় সম্বন্ধে অত্যন্ত হিসাবী ছিলেন বলিয়া সেই অল্প দিনের উপার্জ্জনেই কলিকাতায় একখান বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার উপর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল বলিয়া মৃত্যুকালে তিনি বিশেষ-কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। অমলের মাতা উচ্চশিক্ষিতা ও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। স্বামীর মৃত্যুর পরই তিনি ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিলেন, এবং দাস-দাসীদেরও অনেককেই বিদায় করিলেন। এমন কি, ব্যয়হ্রাসের জন্য কন্যা রমাকেও আর স্কুলে না পাঠাইয়া গৃহে রাখিয়া স্বয়ং তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন ; এবং তাহার কোন কোন বিষয়ের শিক্ষার ভার অমলের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু এইরূপ মিতব্যয়ী হইয়াও সংসারের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে না পারায় অগত্যা কঠোর পরিশ্রমে সেলাইয়ের কাজ করিয়া তিনি কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অমলকুমারের শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। পুত্র সানন্দে পদব্রজে দূরস্থিত কলেজ যাইত, এবং নবমবর্ষীয়া কন্যা পড়াশুনা করিয়া যে-টুকু সময় পাইত, মাতার গৃহস্থালীর কার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করিত। বুদ্ধিমতী রায়-গৃহিণীর ব্যবস্থাগুণে কেহ তাঁহাদের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা জানিতে পারিত না।

অমল পদব্রজে কলেজ যায় ইহা জানিতে পারিয়া বিমল নিজের গাড়ীতে তাহাকে লইয়া কলেজে যাতায়াতের জন্য উৎসুক হইল। কিন্তু এই প্রস্তাবে অমলের পারিবারিক গৌরবে ও আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিতে পারে ভাবিয়া বিমল বন্ধুকে তাহার মনের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইল। অনেক চিন্তার পর বিমল একটা উপায় স্থির করিল ; এক দিন সে অমলকে বলিল, "আমি ভাই এক দিন তোমাদের বাড়ীতে যাব—তোমার মা যদি নিজে রেঁধে আমায় খেতে দেন এই লোভে।"

বন্ধুর প্রস্তাব শুনিয়া অমল "হাঁ, তা, এ আর এমন কি—" কুণ্ঠিত ভাবে এইটুকু বলিয়া কথাটা শেষ না করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বিমল তাহার কুণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ও-সব কিছু শুনচি-নে ; আমি তোমার মা'র কাছে গিয়ে তাঁকে 'মা' ব'লে ডেকে খেতে চাইব, দেখ্‌ব, কেমন তিনি না বলেন। আমি কি তোমার মতন তাঁর ছেলে নই ?"

অমলের মা প্রফুল্ল চিত্তে পুত্রবৎ স্নেহে বিমলের অভ্যর্থনা করিলেন। সে যে স্নেহময়ী মাতার প্রবাসী পুত্র। বন্ধুদ্বয়ের মিলনের পথে তখন পর্য্যন্ত যে সামান্য বাধা ছিল, এবার তাহাও অপসারিত হইল। অতঃপর প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত দিবসের অধিকাংশ সময় উভয়ে একত্র থাকিত ; বিমল অমলকে সঙ্গে লইয়া কলেজে যাতায়াত করিত। তাহাদের পড়াশুনা, খেলা, ভ্রমণ—সবই একসঙ্গে চলিত। কেবল ছুটীর সময় বিমল গ্রামের বাড়ীতে যাইত। তখন অমলের মনে হইত, কলিকাতা মহানগরী যেন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে !

দুই বৎসর পরে বন্ধুদ্বয় উচ্চস্থান লাভ করিয়া এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, এবং উভয়েই বৃত্তি পাইল। অভয়াবাবুর ইচ্ছা যে বিমল ডাক্তার হয়, কারণ, পল্লীগ্রামে সুচিকিৎসকের বড়ই অভাব। জমিদার স্বয়ং চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হইলে পল্লীর দীন-দরিদ্র প্রজাবর্গের অসীম উপকার হয়। উদারচেতা বিমলাচরণ পিতার আগ্রহানুসারে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইল। বিমলকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইতে দেখিয়া অমলও ডাক্তারী পড়িবার সঙ্কল্প করিল। পুত্রের এই কামনা পূর্ণ করিবার জন্য অমলের মাতা অধিকতর উদ্যম সহকারে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রস্তর-শিল্প, চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি বিদ্যায় তাঁহার যে অভিজ্ঞতা ছিল, এবার তাহার অনুশীলন করিতে লাগিলেন। ইহাতে আর্থিক স্বচ্ছলতা হওয়ায় রমাকে তিনি পুনর্ব্বার স্কুলে ভর্ত্তি করিলেন। রমা দ্বিগুণ আগ্রহ ও উৎসাহে পাঠাভ্যাস করায় ক্রমেই উন্নতি করিতে লাগিল, এবং অবশেষে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল।

এই ভাবে সুখে ও নিরুদ্বেগে একে একে পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু এই সুখ যেন নিয়তির অসহ্য হইল ; ভাগ্যহীনা বিধবার কপাল আবার ভাঙ্গিল। অমল ও বিমল যখন ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময় এক দিন অমল হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হইল। বিজ্ঞ

চিকিৎসকগণের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া জ্বর দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। দশ দিন পরে রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসকগণ প্রকৃত রোগ ধরিতে পারিলেন; বুঝিতে পারিলেন, অমলকুমারের জ্বর সাধারণ জ্বর নহে, তাহা ভীষণ ব্যাধি টাইফয়েড!

বিমল আহার, নিদ্রা, পরীক্ষার পাঠ, সব ত্যাগ করিয়া বন্ধুর পরিচর্য্যায় রত হইল। অমলের মাকে আশ্বাস দেওয়া, শঙ্কাতুরা রমাকে উৎসাহিত করা, চিকিৎসকদের সহিত পরামর্শ, তাঁহাদের বিধান পালন করা—সকল ভারই সে স্বয়ং গ্রহণ করিল। কলেজের অধ্যাপকগণ সুচিকিৎসক; কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মেধাবী বিমল ও অমলকে তাঁহারা অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, অমলের চিকিৎসার জন্য তাঁহারাও অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। রোগারম্ভের সতের দিন পরে সকলেই হতাশ হইলেন। পরদিন প্রভাতে মৃত্যুপথযাত্রী অমল চেতনালাভ করিয়া চক্ষু মেলিয়া তাহার শয্যাপ্রান্তে তাহার মাতা, রমা, তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও বিমলকে সাশ্রুনয়নে উপবিষ্ট দেখিল। অমল রোগজীর্ণ কম্পিত হস্তে মাতা ও রমার হাত দু'খানি টানিয়া তাহা বিমলের হাতে রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমি তো তোমাদের সকলকে ছেড়ে চল্লাম, মা'কে ও রমাকে তোমার কাছেই রেখে যাচ্ছি, তুমি দেখো। আর রমার সকল ভার তোমাকেই দিচ্ছি, বন্ধুর শেষ প্রার্থনা অগ্রাহ্য ক'রো না, ভাই!"

তাহার কথা শুনিয়া সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বিমল অতি কষ্টে অশ্রুসম্বরণ করিয়া সংযত স্বরে বলিল, "এ সব কি বল্‌ছ ভাই! মা'র মনে ব্যথা দিও না। তুমি কোথায় যাবে? ভয় কি? তুমি শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বে।"

অমল অতিকষ্টে অস্ফুট স্বরে বলিল, "যেতে তো চাইনে; এই সুন্দর পৃথিবী, জীবনের এত আশা, উদ্যম,—উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, প্রাণ কি ছেড়ে যেতে চায়, ভাই! কিন্তু বুঝতে পারছি, সব শেষ হ'য়ে এসেছে। কত কথা ব'লবার ছিল, কণ্ঠ চিরনীরব হ'য়ে আসচে, অন্ধকার দেখ্‌চি সব। তুমি রমাকে নেবে জান্‌তে পারলে মৃত্যুতে আমি শান্তি পাব, নৈলে......"

বিমল উচ্ছ্বসিত অশ্রুভার অতি কষ্টে দমন করিয়া গাঢ়-স্বরে বলিল, "তুমি ভাব্‌ছ কেন? তোমার কোনও ইচ্ছা কি পূর্ণ করতে আমি কখন কুণ্ঠিত হয়েছি? তুমি মন স্থির কর। ও-সব ভেবে ব্যাকুল হ'য়ো না।"

রোগী স্থির হইল; তাহার কোটরগত নিষ্প্রভ নেত্র মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইল, রোগকাতর মুখে আনন্দের ম্লান-জ্যোতি—যেন অস্তোন্মুখ শ্রান্ত তপনের শেষ ক্ষীণ রশ্মি-জাল! অমল শান্ত স্থির দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিয়া চির বিদায় লইবার শেষ মুহূর্ত্তে মায়ের হাতখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "মা!"—সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তিম নিশ্বাস বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া নিঃসারিত হইল। তাহার মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট মুখে আনন্দ ও প্রশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

অমলের মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া বাত্যাতাড়িত লতার ন্যায় ধরাশায়িনী হইলেন। সকলের বহু চেষ্টায় চেতনা লাভ করিয়া তিনি স্তম্ভিত ভাবে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল—জগতের সকল বন্ধন অমল ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে—চারি দিকে কি বিরাট শূন্যতা! জীবনে যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, আশার, আকাঙ্ক্ষার বস্তু, যাহা কিছু সত্য, সব যেন শূন্যে বিলুপ্ত হইয়াছে! অমল ও রমাকে কোলে লইয়া তিনি বৈধব্যযন্ত্রণা ভুলিয়াছিলেন; আজ অমলকে হারাইয়া সেই পুরাতন শোক যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। কোন সান্ত্বনা তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল না। জ্যেষ্ঠা কন্যার শত চেষ্টাতেও তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন না; উঠিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। অবশেষে বিমল আসিয়া দরদভরা কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিলে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বিমলের কাতর অনুরোধে তিনি উঠিলেন; বিমলের অবিরাম চেষ্টায় তাঁহার শোক যৎকিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। বিমল তাঁহার বুকের ভিতর যেন অমলের শূন্য আসন অধিকার করিল। মায়ের প্রাণে সান্ত্বনাদানের জন্য অমল যেন বিমলকেই তাহার প্রতিনিধি রাখিয়া গেল।

রায়-গৃহিণী কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহার কন্যা জামাতার উপর তাঁহার সকল ভার অর্পণ করিয়া বিমল কয়েক সপ্তাহ পরে আবার কঠোর পরিশ্রমে শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পরীক্ষার পর সে আশা করিল, সগৌরবে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

এক দিন অমলের মাতাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা উমার

শিশু পুত্রটিকে কোলে লইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিমল তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "মা, এবার আমি বাড়ী যাব, আপনার অনুমতি চাইতে এলাম। আপনাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হ'য় না; কিন্তু বাবা-মা আমাকে অনেক দিন দেখেন নি, তাঁরা আমার পথ চেয়ে আছেন।"

অমলের মা স্নেহোদ্বেলিত স্বরে বলিলেন, "যাবে বৈ কি বাবা, মায়ের ছেলে মায়ের কাছে যাও। আমার মত অভাগীর কাছে যে আস্‌বে সেই যাবে; তুমি থেকো না বাবা! ভয় হয়, পাছে তোমার কোন অমঙ্গল ঘটে।"

বিমল বলিল, "না মা, আপনার কাছে আমার কোন অমঙ্গলের ভয় নেই—আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।" অমলের মা গাঢ় স্বরে বলিলেন, "মঙ্গলময় তোমায় সুস্থ রাখুন, সুখী করুন।"

অমল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইবার সময় নিভৃতে রমার দেখা পাইল; সে রমাকে বলিল, "রমা, অমলের শেষ কামনা আমি নিজের ইচ্ছায় অপূর্ণ রাখ্‌ব না। কিন্তু তা'র আগে তোমার মতও ত জানা দরকার। আমি জানি, অমল তোমার অনিচ্ছায় জোর ক'রে তোমাকে আমার হাতে দিতে চাইত না।"

রমা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া লজ্জাবিজড়িত কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "আমি—আমি আর কি বলবো? আমি জানিনে তোমাকে আম্—আমার কি অদেয় আছে। আমি ত আর কারেও জানি না।"—সে ঝুপ্ করিয়া বসিয়া-পড়িয়া প্রসারিত উভয় হস্তে বিমলের পদধূলি গ্রহণ করিল। কিন্তু মাথা তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; আর কিছু বলিতেও পারিল না; যেন 'নিমিষের তরে সরমে বাধিল, মরমের কথা হ'ল না।'

বিমল কনকপুরে তাহার পিতা-মাতার নিকট চলিয়া গেল। গৃহে ফিরিয়া প্রথম কয়েক দিন সে তাহার শ্রান্ত দেহ ও ভারক্লিষ্ট হৃদয়কে শান্তি দান করিবার চেষ্টা করিল। সে তাহার প্রিয় উদ্যানে ও ভবনের নিভৃত কক্ষে বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিন্তু সে শান্তি লাভ করিতে পারিল না; অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা তাহার হৃদয়ে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। অবশেষে এক দিন মধ্যাহ্নে অভয়াবাবুর বিশ্রাম কালে সে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল; শান্তি-দেবীও তখন তাঁহার কাছে বসিয়াছিলেন। বিমলাচরণ পিতামাতাকে তাহার সহপাঠী প্রিয়বন্ধুর শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধে সকল কথাই জানাইল। অভয়াবাবু যে সময় কলিকাতায় ছিলেন, সেই সময় অমলকে বহুবার দেখিয়াছিলেন, তাহার শান্ত প্রকৃতি ও বিনীত ব্যবহারে তিনি আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। অমলের রোগের বিবরণ শুনিয়া তাঁহার ভাবপ্রবণ কোমল হৃদয় অমলের জননীর প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল; বিশেষতঃ, পুত্রশোক যে কিরূপ দুঃসহ বেদনাদায়ক, তাহা তিনি জানিতেন। সকল বিবরণ শুনিয়া বেদনায় শান্তিদেবীর চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইল; একমাত্র কৃতী পুত্র বিধবা জননীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে চলিয়া গিয়াছে, এই চিন্তায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন। ক্রমে বিমল তাঁহাদিগকে মৃত্যুশয্যাশায়ী অমলের শেষ অনুরোধের কথা জানাইল, এবং অবশেষে রমার সকল কথাই বলিল। এই সকল কথা শেষ করিয়া সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া উচ্ছ্বাসভরে বলিল, "বাবা, মা, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সত্যরক্ষা কর্‌তে পারি। আগামী ফাল্গুনমাসে রমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শেষ হবে; তার পর—তার পর আমি যাতে অঙ্গীকার পালন করতে পারি, আশা করি, আপনারা তা'র ব্যবস্থা করবেন।"

বিমলের কথায় অভয়াবাবু বিচলিত হইয়া কহিলেন, "অসম্ভব! আমাদের অকলঙ্ক কুল, বঙ্গজের ঘরে কি ক'রে তোমার বিবাহ হ'তে পারে?"

বিমল কুণ্ঠিতভাবে অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "বঙ্গজ হ'লেও ওঁরা উচ্চবংশীয়, বঙ্গজ সমাজে শ্রেষ্ঠ কুলীন।"

"বঙ্গজের আবার কুল! ও-সব আমি মানি না। আমাদের উচ্চ বংশের তুমি একই ছেলে; আমি আমার সমান ঘরের মেয়ে আনব।"—তাঁহার মুখে দৃঢ়তা পরিস্ফুট।

বিমল বলিল, "বাবা, আমি যে মৃত্যুশয্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কুলের চেয়ে কি সত্য বড় নয়?"

অভয়াবাবুর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল; তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমার স্পর্দ্ধা বড় বেশী হ'য়েছে দেখ্‌ছি! আমাকে নীতি শিক্ষা দিতে এসেছ? ওরা গোড়া থেকেই এই মতলবে ছিল, তোমায় ছেলেমানুষ পেয়ে মৃত্যুকালে তোমার এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছে। ঐ প্রতিশ্রুতি তোমায় রক্ষা করতে হবে না; তা অগ্রাহ্য করলে দোষ হয় না।

এ বিয়ের কথা ভুলে যাও, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।"

পিতার কথা শুনিতে শুনিতে বিমলেরও মুখ আরক্তিম হইল, তাহাতে আসন্ন ক্রোধের চিহ্ন দেখিয়া শান্তিদেবী প্রমাদ গণিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি তো বাবা রমার ভার নিতে রাজী হয়েছ মাত্র, সে জন্যে নিজে তাকে বিয়ে করবার কি দরকার? আমি সৎপাত্র দেখে নিজের মেয়ের মত ক'রে তার বিয়ে দিয়ে দেব; তুমিও অমলের পরিবর্ত্তে তার দাদার কাজ করতে পারবে।"

বিমল ব্যথিত স্বরে বলিল, "না মা, সে হয় না। অমল যখন রমার হাত আমার হাতে দিয়ে এই অনুরোধ করেছে, তখন তার প্রাণের ইচ্ছা আমি ঠিকই বুঝেছি। রমা যখন সম্মত আছে, তখন আমি তাকেই বিয়ে করব।"

শান্তি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "ছি বাবা, গুরুবাক্য অমান্য করা কি উচিত? ওঁর চেয়ে হিতৈষী তোমার আর কে আছে?"

বিমল তথাপি বলিল, "সত্যপালনের জন্য আমি সবই করব। আর মনে মনে রমাকে যখন পত্নীত্বে বরণ করেছি, তখন তা'কে বিয়ে আমি করবই। তোমরা এতে আর আপত্তি ক'রো না মা!"

অভয়াবাবু অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন, "এ বিয়ে করলে তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আমার ঘরে বঙ্গজ বধূর স্থান নেই; এই আমার শেষ কথা।"

বিমল দৃঢ়স্বরে বলিল, "বেশ, তাই হবে, কিন্তু আমার সত্য ভঙ্গ হবে না।"

এই কথা বলিয়া ক্ষোভে দুঃখে বিচলিত চিত্তে বিমলাচরণ সেই স্থান ত্যাগ করিল। তার পর যে কয় দিন সে বাড়ী ছিল, পিতাপুত্রে আর বাক্যালাপ হইল না। দুই-এক দিন পরে কর্ত্তার মেজাজ নরম দেখিয়া শান্তিদেবী তাঁহাকে বলিলেন, "কি করছ? জিদ্ ও সমাজের প্রথার জন্যে কি ছেলেকে ত্যাগ করবে? কালের গতি কি রোধ করা যায়? আর সত্যই বিমল যখন রমাকে চায়, তখন তার সুখের জন্য আমাদের কি এটুকু করা উচিত নয়?"

অভয়াবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ও-সব অনাচার আমি সইব না। ছেলেরা বিয়ের জন্যে আগে থেকে বৌ ঠিক করবে কি? বিয়ে হ'ল না, মন্ত্রপাঠ হ'ল না; কোন নিয়ম পালন করা হ'ল না; সমাজের ব্যবস্থা অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর বেশী বকিও না, ও-সব কথা আমাকে বলা বৃথা।"

কয়েক দিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল, বিমল ডাক্তারী পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। খবর পাইয়াই সে পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদ লাভের আশায় তাঁহাদের প্রণাম করিতে গেল। অভয়াবাবু বলিলেন, "জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এইবার দেশে এসে ডাক্তার হ'য়ে ব'সে তুমি দেশের ও দশের কল্যাণসাধনে মন দাও।"

বিমল বিনীতভাবে বলিল, "আমারও তো সেই সাধ, সেই ইচ্ছা।"

অভয়াবাবু সোৎসাহে বলিলেন, "খুব ভাল কথা; তোমার মনের মত সেবা-গৃহ করিয়ে নেও, অর্থচিন্তা তোমাকে করতে হবে না।"

অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া অভয়াবাবু বলিলেন, "তোমার মা বহুদিন বড়ই একা একা আছেন; এইবার ঘরে বউ আনা দরকার। আমি সৎপাত্রীর সন্ধান করেছি। তোমার বিয়ে দিয়ে এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব।"

বিমল বলিল, "অন্য পাত্রী খোঁজ করার কি দরকার? আমি তো রমা ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না। বন্ধুর মৃত্যুকালে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে সাক্ষী ক'রে যে সত্য ক'রেছি, তা' ভাঙ্গবার শক্তি আমার নেই, বাবা!"

অভয়াবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আর আমার আদেশ পালন বুঝি তোমার শক্তির অতীত?"

বিমল নরম সুরেই বলিল, "আপনার অবাধ্য আমি নই, হ'তেও চাইনে। আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়াও আমার পক্ষে সুখের হবে না, তাতে শান্তিও পাব না; কিন্তু আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করবার উপায় নেই।"

অভয়াবাবু এ কথায় ভীষণ উত্তেজিত হইয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "তবে তোমার আর এখানে থাকবার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। এখনই আমার বাড়ী থেকে তোমাকে চ'লে যেতে হবে।"

বিমল ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "বেশ; তবে বিদায় দিন।"

সে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে অভয়াবাবু পা' দু'খানা টানিয়া-লইয়া সক্রোধে বলিলেন, "ও-সব ভণ্ডামির আর দরকার নেই, এখন পথ দেখ।"—বিমল ব্যথিত চিত্তে পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া তখনই প্রবাস-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। পুত্রের গৃহত্যাগকালে শান্তিদেবী অশ্রান্ত ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিমল তাঁহাকে সহানুভূতিভরে বলিল, "কেঁদো-না মা, আমি কখন তোমাদের পর হ'ব না। আমার প্রাণ চিরদিনই তোমার কাছে প'ড়ে থাকবে; আর আমাদের কাছে তুমি যদি কখনও যেতে পার, তখন দেখ্‌বে, তোমাদের প্রতি আমার মনের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। পার তো আমার কাছে যেও, মা!"

বিমল কলিকাতায় রায়-গৃহে উপস্থিত হইল। সকল কথা শুনিয়া অমলের মা বলিলেন, "কাজ নেই, বাবা, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। যে নিজের ছেলে রাখতে পারল না, সে বাপ মা'র কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে সুখী হবে, এ ধারণা আমার নেই বাবা! না। অমলের অন্তিম অনুরোধ রোগীর প্রলাপ ব'লেই মনে কোরো; সে যদি জান্‌ত যে এমন হবে, সে কখনও এ ইচ্ছাকে মনে স্থান দিত না। মা আমি, তার মনের পরিচয় কি আমার অজ্ঞাত ছিল? এমন কাজ তুমি ক'রো না বিমল!"—রমাও স্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিয়া বিমলকে প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দান করিয়া বলিল, "আমার জন্য ভেবো না। আমার প্রধান কর্ত্তব্য মায়ের সেবা করা। মা'কে ফেলে তো আমি কোথাও যেতে পার্‌ব না। বিয়েতে আমার কাজ নেই, তুমি বাড়ী ফিরে যাও।"

কিন্তু বিমলের সঙ্কল্প তথাপি অটুট রহিল। সে প্রথমেই চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিল। সে বুঝিল, উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করিয়া সংসারের ভার বহন করা তাহার অসাধ্য। যাহা হউক, ডাক্তারী ভাল করিয়া পাশ করায় তাহার চাকুরী জুটিতে বিলম্ব হইল না; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকারে সে Assistant Surgeonএর পদে নিযুক্ত হইল।

ফাল্গুনের এক শুভলগ্নে বিমল ও রমার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতার সম্মতি লাভের জন্য বিমল শেষ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু পিতা তাহার পত্রের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন মনে করিলেন না! বিবাহের পর আবার তার করিয়া সে পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিল; কিন্তু তাহারও কোন উত্তর সে পাইল না। বিমলের তার পাইয়া অভয়াবাবু ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া শান্তিদেবীকে বলিলেন, "স্পর্দ্ধা দেখ একবার, স্বেচ্ছায় কুল-ভ্রষ্ট হ'ল, আবার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হ'য়েছে! এত ক্ষতির উপর এ কি কম অপমান?"—প্রতিবাদ নিস্ফল জানিয়া শান্তিদেবী নির্ব্বাক্‌ রহিলেন।—তাঁহার প্রাণ চাহিল কলিকাতায় গিয়া নবদম্পতিকে গৃহে লইয়া আসিবেন; কিন্তু তাহা অসম্ভব। অগত্যা গোপনে একখানি পোষ্টকার্ডে নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া তাহা ডাকে পাঠাইলেন; কিন্তু সেই আশীর্ব্বাদ-পত্রে নাম স্বাক্ষর করিতেও সাহস করিলেন না। বিমলাচরণ মায়ের হস্তাক্ষর চিনিত, সেই আশীর্ব্বাদই সে বহুমূল্য রত্নের ন্যায় গ্রহণ করিল।

বিবাহের পরই বিমলাচরণ রমা ও তাহার মাতাকে লইয়া নূতন কর্ম্মস্থান আগ্রায় উপস্থিত হইল। আগ্রার ডাক্তারবাবু রমাপ্রসাদ ঘোষ সেই অঞ্চলের খ্যাতনামা চিকিৎসক। তিনি অল্প বয়সেই চিকিৎসা-ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশ হইতে নূতন ডাক্তার আসিয়াছে শুনিয়া অবিলম্বে তিনি বিমলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং কয়েক দিনেই উভয়ের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইল। তিনি তাহাদিগকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া যথেষ্ট আদর-যত্ন করিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের বন্ধুত্ব-বন্ধন এরূপ সুদৃঢ় হইল যে, বিমল জীবনে এই প্রথম ভ্রাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইল।—রমাপ্রসাদবাবু বিমলের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন।

অবশেষে বিমলকে যখন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে যাইতে হইল, তখন রমাপ্রসাদবাবুর গৃহই তাহার স্থায়ী বাসস্থান হইল। অবকাশ পাইলেই বিমল আগ্রায় রমা-প্রসাদবাবুর বাড়ীতে আসিত, না হয়, উভয় পরিবার এক-যোগে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিতেন। কখনও বা রমাপ্রসাদবাবু সপরিবারে বিমলের কর্ম্মস্থলে গমন করিয়া কিছু দিন কাটাইয়া আসিতেন। কেবল রমাপ্রসাদবাবু যখন বাঙ্গালা দেশের স্বীয় বাস-গ্রামে যাইতেন, বিমলাচরণ তখন তাঁহার সঙ্গে যাইত না। সোণার বাঙ্গালার পল্লী-জীবনের কথা স্মরণ করিতেও তাহার

রুদ্ধ দুঃখ, কষ্ট ও বেদনা সবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত; প্রিয় জন্মভূমির শোকে সে কাতর হইত। সে কত বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে, কত মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করে, কিন্তু কনকপুরের শান্ত-সুন্দর পল্লীশোভা তাহার নিকট স্বর্গের সুষমা-তুল্য চিত্তাকর্ষক। কনকপুরের মায়া কাটাইবার জন্যই বিমল চরণ বঙ্গপল্লী হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিত।

বিমলের জীবন পশ্চিমাঞ্চলে বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল। কেবল রমার মাতা যখন কয়েক বৎসর পরে ইহলোক ত্যাগ করিলেন, তখন বিমল মনে বড়ই বেদনা পাইল। মাতৃবৎসল বিমল শাশুড়ীর সেবায় মাতৃপূজার আনন্দ লাভ করিত; এখন সে-সুখেও সে বঞ্চিত হইল। রমা নিজের শোক ভুলিয়া অপরিসীম যত্নে, সেবায় বিমলের ক্ষোভ-দুঃখ প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্ত্রীর প্রেমে ও পুত্র-কন্যার যত্নে বিমলাচরণ শীঘ্রই আত্মসম্বরণে সমর্থ হইল। তাহার প্রাণে সুখ ও শান্তি ফিরিয়া আসিল।

এইরূপে সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর কাটিয়া গেল। সত্যরক্ষার জন্য প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাইয়া দশরথ শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজপতি অভয়াচরণ এমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, একমাত্র পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াও তিনি অচলবৎ অটল রহিলেন। বিমলের গৃহত্যাগের পর কনকপুর হইতে সকল আনন্দ যেন অন্তর্হিত হইল। এখন আর পূজাপার্ব্বণে কনকপুরে উৎসব নাই; কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা-তেই পূজা-পার্ব্বণের অবসান হয়। কিন্তু শোকক্লিষ্টা শান্তি-দেবীর বিলাপ করিবার সান্ত্বনাটুকুও আর নাই! তবু তাঁহার পুরাতন ভৃত্য ভোলানাথের চেষ্টায় বিমলের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন; তাহাতেই মনকে কোন রকমে প্রবোধ দিয়া তিনি পতিসেবায় জীবনের দিনগুলি অতি-বাহিত করিতেছেন। ভোলানাথের নিকট তিনি রমার রূপ-গুণের কথা শুনিয়াছেন; তাঁহার সাধ হইত, পুত্রবধূকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাপিত বক্ষ শীতল করেন। কিন্তু তাঁহার সেই সাধ পূর্ণ হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না; তিনি ভয় পাইতেন। তাঁহার কন্যাই যখন বহু চেষ্টাতেও অভয়াবাবুর মন নরম করিতে পারিল না, তখন স্বামীর নিকট মনের বাসনা প্রকাশ করিতে শান্তিদেবীর বিন্দুমাত্র সাহস হইত না।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল; হঠাৎ এক দিন কো[illegible] অপরিচিত নারীর লিখিত একখানি পত্র ডাকযো[illegible] শান্তিদেবীর নামে আসিল। পত্রখানি দেখিয়াই অভয়াবা[illegible] চমকিয়া উঠিলেন; কোন অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কা[illegible] তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণা[illegible] শান্তিদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া পত্রখানি তাঁহার হাতে দিলেন, এবং বলিলেন, "শীগ্‌গির খোল তো। কে তোমা[illegible] মাতাঠাকুরাণী ব'লে চিঠি লিখেছে দেখ। এই পত্র দেখেই আমার মনটা হঠাৎ কেমন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।"

অভয়াবাবুর উদ্বেগ-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া শান্তি-দেবীও শঙ্কাকুলা হইলেন। কম্পিতহস্তে তিনি প[illegible] খুলিয়া সর্ব্বপ্রথমেই লেখিকার নামের উপর দৃষ্টিপাত করি-লেন। তিনি কাতরভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেই অভয়াবাবু বলিলেন, "তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই ঐ পত্র কে লিখেছে, তা আগেই আমি অনুমান ক'রেছি। বিমল ভাল আছে তো? কি লিখেছে দেখ; আমার মন বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে।" হায় পুত্রস্নেহ!

শান্তিদেবী ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিলেন; তাঁহার কণ্ঠস্বর আবেগে কম্পিত হইতে লাগিল,—

"শ্রীচরণকমলেষু,

মা জননী আমার,

আপনাকে মা বলিয়া ডাকিবার ও আপনার ক্রোড়ে স্থান পাইবার সৌভাগ্য ত কোন দিনও আমার হয় নাই, হয় ত এ জীবনে হইবেও না। তাই আজ অন্তিম শয্যায় শুইয়া মায়ের স্নেহ-শীতল কোলে স্থান পাইবার শেষ আশায় এই পত্র দিতেছি, আর পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্টি 'মা' নাম উচ্চারণের শেষ বাসনা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছি। মা, আপনার মৃত্যুপথযাত্রী এই দুঃখিনী কন্যার এই পত্র পাইয়াই পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া দয়া করিয়া এখানে আসিবেন, আমার অন্তিম কালের এই মিনতি।

আপনাদের পুত্র-বিচ্ছেদের কারণ আমি; সে অপরাধ আমার স্বেচ্ছাকৃত না হইলেও মার্জ্জনা লাভের জন্য আমি বড়ই ব্যাকুল। পিতা-পুত্রের পুনর্মিলন দেখিয়া যাইতে না পারিলে আমি ইহলোকের মত পরলোকেও শান্তি পাইব না। আজ চৌদ্দ বৎসর আমার বিবাহ হইয়াছে; বিবাহিত জীবনে আমি স্বর্গসুখের অধিকারিণী হইয়াছি। আমার এ

কথা সম্পূর্ণ সত্য। স্বামীর ভালবাসা, আপ্রাণ যত্ন, এবং দুইটি স্বাস্থ্যবান পুত্র কন্যা লাভ করিয়া পৃথিবী আমার নিকট স্বর্গে পরিণত হইয়াছে, মা! এমন সুখের, আনন্দের জীবনে বঞ্চিত হইয়া স্বর্গে যাইতেও আমার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু জীবন আমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে, পৃথিবীর সহিত আমার সকল সম্বন্ধ ঘুচিবার সময় নিকটবর্ত্তী; এই আসন্ন কালে জীবনের একমাত্র ক্ষোভ দূর করিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমি আপনাদের মিলন-কামনা করি। আমি সন্তানের জননী, তাই সন্তানের সহিত বিচ্ছেদের বেদনা কত গভীর, কিরূপ মর্ম্মভেদী, তাহা আমি বুঝিতে পারি। এই জন্যই আজ আমি জীবনে সর্ব্বপ্রথম, স্বামীর অজ্ঞাতসারে এই একটি কার্য্য করিলাম,—এই পত্রখানি আপনাকে লিখিলাম।

"আমার পুত্র সন্তোষের বয়স এখন দশ বৎসর; আর কন্যা শেফালী মাত্র পাঁচ বৎসরের। আমার অবর্ত্তমানে মাতৃহারা শিশু-দুইটির মুখের দিকে চাহিবার আর কে আছে, মা? তাহাদিগকে আপনাদের হাতেই সমর্পণ করিয়া যাইতে চাই। সদয়হৃদয় পিতৃদেব ত বহু অনাথের আশ্রয়; তিনি কি এই মাতৃহারা শিশু দু'টিকে আশ্রয় দিবেন না? ইহারা কি আপনাদের স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে স্থান পাইবে না? তিনি কি তাঁহার মৃত্যু-শয্যাশায়িনী কন্যার এই অন্তিম প্রার্থনায় বিমুখ হইতে পারিবেন? আমার আশা হইতেছে, সকল কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই কোমল হইবে; তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া মাতৃহারা পৌত্র-পৌত্রীকে একটু স্নেহ করিবেন।

"আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি আপনাদের সহিত আপনাদের পুত্রের পুনর্মিলন না হয় তো বোধ হয় ইহজীবনে আর তাহা হইবে না। আমার স্বামী কিরূপ অভিমানী, কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহা আপনারা ভালই জানেন। পিতার চরিত্রের দৃঢ়তা, সঙ্কল্পের অটলতা তাঁহার চরিত্রেও বর্ত্তমান। আমার মৃত্যুতে শোকে তিনি বড়ই অধীর হইবেন; তখন আর যে তিনি আপনাদের নিকট প্রত্যাগমন করিবেন, আপনাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন, এ আশা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও করিতে পারিতেছি না; তাই মৃত্যুশয্যায় আমার মনে একবিন্দুও শান্তি নাই।

"মা, আসিবার সময় এই পত্রখানি আপনি সঙ্গে আনিবেন ও আমার স্বামীকে ইহা দিবেন। তাহা হইলে আমি তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই পত্র-লেখার পাপ হইতে মুক্তি পাইব বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমি আপনাদের পথ চাহিয়াই নিঃশেষিত-প্রায় জীবনের বাকী দিন-কয়টি গণিতেছি, মা! ইহাই আমার শেষ নিবেদন। আপনারা উভয়ে আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন।

আপনাদের স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী
ভিখারিণী পুত্রবধূ রমা।"

রমার জীবনের অন্তিম সময়ে লিখিত কাতরোক্তিপূর্ণ, এই মর্ম্মস্পর্শী পত্রখানির প্রতি ছত্র শুনিতে শুনিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কঠোরহৃদয় অভয়াবাবুর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি আবেগ-ভরে বলিলেন, "মেয়েটা কি মায়াবিনী! আমি আজই সেখানে রওনা হব; তুমি যেতে চাও তো শীঘ্র জোগাড়-যন্ত্র শেষ ক'রে প্রস্তুত হও।"

শান্তিদেবী পুত্র, পুত্রবধূ ও তাহাদের পুত্রকন্যার কল্যাণ-কামনায় কুলদেবতাদের স্মরণ করিলেন, এবং তাঁহাদের চরণে রমার আয়ুবৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়া তাড়াতাড়ি যাত্রার আয়োজন করিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীনীলিমা দেবী।

অরসিকেষু

অপরের মনে ব্যথা দেছি বটে,—হয় তো পেয়েছি দুখ;
অপরেও দেছে আঘাত অনেক,—হয় তো ভেঙ্গেছে বুক।
সত্য কথারে মিথ্যা বলিয়া হয় তো দিয়াছি ছেড়ে,
অপরের গ্রাস নিয়েছি হয় তো নিজের বলিয়া কেড়ে।
প্রাত্যহিকের ঘৃণ্য সে গ্লানি বয়েছি হয় তো কাঁধে,
পরেরে শাসন করেছি হয় তো অল্প অপরাধে!
লোভেতে পড়িয়া মান খোয়াইয়া হয় তো বা কোনো মতে—
বেত্রাহত কুকুরের মতো ঘুরিয়াছি পথে পথে!
কিন্তু তাতেও আত্মা তেমন যায়-নি মরমে মরে',—
যতো মরিয়াছে অরসিক-জনে রস নিবেদন করে'!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

বিমান আক্রমণ ও তাহার প্রতিকার

আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ বোমা-নিক্ষেপক ধ্বংসকুশল বিমান। আকস্মিক আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া দৈনন্দিন জীবনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করা, হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, গৃহ-হর্ম্ম্যাদি নষ্ট করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংযোগসূত্রগুলি ছিন্ন করা, এবং কলকারখানার ক্ষতি করা, সেতু, রেলপথ ধ্বংস করা প্রভৃতি ভীষণ কার্য্যে ইহার উপযোগিতা। এইরূপ ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, ব্যাপক সংগঠন-প্রণালী দ্বারা আত্মনির্ভরতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, আদেশানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহের পূর্ব্ব হইতে অনুশীলন-সাহায্যে আপনাদিগকে সুনিয়ন্ত্রিত করা একান্ত আবশ্যক। পরিত্রাণের প্রধান সহায় উপযুক্ত আশ্রয়, গ্যাস-মুখোস, ফায়ার-ব্রীগেড, এবং চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা।

যুদ্ধের সময় জনসাধারণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সামরিক ও বেসামরিক উভয় শ্রেণীর লোকেরই কর্ত্তব্য আছে। বেতনভোগী সামরিক বিভাগ আইনতঃ যেমন তাহার কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য, তেমনি বেসামরিক যোগ্য ব্যক্তিগণ স্বদেশবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কর্ত্তব্যসম্পাদনে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। বিশেষতঃ, যদি উপযুক্তরূপে শিক্ষিত নাগরিকগণ স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইয়া সামরিক বিভাগকে যথাশক্তি সাহায্য না করে, তাহা হইলে কার্য্যে সুফল লাভ করা সম্ভব নহে। এজন্য পরস্পরের সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন।

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের ভার সামরিক বিভাগের উপর ন্যস্ত আছে। কিন্তু উহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও যদি শত্রুপক্ষের বিমানবাহিনী নাগরিকগণকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে বেসামরিকগণ কর্ত্তৃক কার্য্যোপযোগী দল গঠন করা ব্যতীত প্রতিকারের উপায় নাই। এইরূপ দল গঠন করিতে বিপদের সূচনার বহু পূর্ব্ব হইতে রীতিমত শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন।

ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ তিন প্রকার বোমা নিক্ষেপকারী বিমানের মধ্যে শেষোক্ত প্রকার অতি ভীষণ। উহা ৪০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৫০ মণ) ভারসহ ঘণ্টায় ৩০০ মাইল উড়িতে পারে। বিপক্ষবাহিনীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত আক্রমণকালে দিবাভাগে সাধারণতঃ উহারা ইংরাজী 'ভী' (v) অক্ষরের আকারে ২০০ গজ ব্যবধানে ৩ হইতে ৫০টি এক সঙ্গে থাকিয়া প্রায় ২০০০০ ফিট ঊর্দ্ধ হইতে বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু রাত্রিকালে সব সময় এই সকল নিয়ম পালন করিবার আবশ্যক হয় না। দেখা গিয়াছে, ৩০০০০ হইতে ৫০০০০ পর্য্যন্ত জনপূর্ণ এক বর্গমাইলে এক টন্ বোমা পড়িলে রাত্রিকালে ১০০০ এবং দিনে ২৫০০ লোক হতাহত হয়; এবং হত ও আহতের সংখ্যা প্রায় সমান।

বিমান হইতে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার বোমা নিক্ষিপ্ত হয়:—

(ক) সজোরে ও ভীষণ শব্দে স্ফোটনশীল একটি বোমা (High Explosive Bomb) ৫০০ পাউণ্ডেরও (ছয় মণের) অধিক ভারী। উহা তিন প্রকারে ক্ষতি করে—

(১) পুরু আবরণ অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিদের ও গৃহগুলি ধ্বংস করে।

(২) বারুদ স্ফুটনের কঠিন ধাক্কা দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া কক্ষের গ্যাস-প্রতিরোধক শক্তি নষ্ট করে।

(৩) ছাদ বিদীর্ণ করিয়া নীচে নামিয়া সমস্ত বাড়ী ভাঙ্গিয়া উড়াইয়া দেয়।

(খ) আগুনে বোমার (Incendiary Bomb) ওজন ২ পাউণ্ড হইতে ৬০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইলেও ছোটগুলিই বেশী ব্যবহৃত হয়, কারণ, তাহাতে অল্প ব্যয়ে অধিক সংখ্যক গৃহে অগ্নিসংযোগ করা যায়। উহা পুরু ছাদ ভেদ করিতে পারে না, কিন্তু ছাদ পাতলা হইলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিজে জ্বলিতে থাকিবে এবং অপরকেও জ্বালাইয়া দিবে। এইরূপ বোমা জল অথবা অগ্নি-নির্ব্বাপক যন্ত্রের (fire extinguisher) সাহায্যে সহজে নির্ব্বাপিত হয় না।

(গ) বিষাক্ত ও প্রদাহজনক গ্যাসপূর্ণ বোমা (Gas Bomb) নিক্ষিপ্ত হইবার পরে কোন শক্ত পদার্থের সংঘর্ষণে চূর্ণ হইলে তাহা হইতে তরল অথবা বাষ্পীয় গ্যাস বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয় এবং বিপদের উৎসরূপে অবস্থান করে। এইরূপ একটি বোমার ওজন ৫০ পাউণ্ড এবং উহার মধ্যে ৭ পাঁইট তরল পদার্থ থাকে। ইহা ব্যতীত তরল গ্যাস উপর হইতে জলকণার আকারে নিম্নে বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু ২০০০ ফিটের অধিক ঊর্দ্ধ হইতে এইভাবে গ্যাস বিক্ষিপ্ত হইলে বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। উহার নীচে নামিয়া আসাও বিমানের পক্ষে নিরাপদ নয়। সুতরাং এই ভাবে গ্যাসের প্রয়োগ নিতান্ত বিরল।

(ঘ) অনেক সময় শত্রুপক্ষকে সর্ব্বপ্রকারে বিপদগ্রস্ত করিয়া চরম সীমায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত এক সঙ্গে উক্ত তিন প্রকার বোমাই নিক্ষেপ করা হয়। সাধারণতঃ এই অবস্থায় আক্রান্ত পক্ষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

বোমার একটি খণ্ড কেবল এক জন লোকেরই ক্ষতি করিতে পারে। তাহার পার্শ্বস্থিত অন্য ব্যক্তির কোন বিপদ হয় না। সুতরাং কোন জনতার মধ্যে বোমা বিস্ফুরিত হইলে হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী হয় না। তদ্ভিন্ন, নিকটবর্ত্তী লোকগুলি তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুইয়া পড়িলে তাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ বোমা ফাটিবার পর কিছু উপরে উঠিয়া তাহার পর একটু দূরে ছিটকাইয়া পড়ে। কিন্তু কোন স্থানে গ্যাস প্রয়োগ করিলে তাহা বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়, এবং তথাকার সমস্ত লোকই নিঃশ্বাসের সহিত সেই দূষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে।

সুতরাং হতাহতের সংখ্যা অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পায়। এই সুবিধার জন্য নানা প্রকার কঠিন, তরল এবং বাষ্পীয় গ্যাস এখন যুদ্ধের প্রধান উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। উহা ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য; যথা,—

(১) বিষাক্ত ও প্রদাহজনক গ্যাসের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আহত ও হত্যা করা।

(২) রাস্তা, ছাদ প্রভৃতি উন্মুক্ত স্থানসমূহ দূষিত করিয়া পরোক্ষভাবে আহত ও হত্যা করা।

(৩) পানীয় জল, খাদ্য ও পরিচ্ছদ দূষিত করিয়া ব্যবহারের অযোগ্য করা।

(৪) দুশ্চিন্তা, ভয় ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়া শক্তি হ্রাস করা।

গ্যাসের ভীষণ প্রতিক্রিয়া হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নাগরিকগণ নিজেরা যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিতে পারে; তজ্জন্য বিমান-আক্রমণে পূর্ব্বসাবধানতা (Air Raid Precautions) সম্বন্ধে তাহাদিগকে কিছু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এইরূপ লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য—

(১) গ্যাসগুলি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা।

(২) গ্যাস-মুখোস (Respirator) কখন্ কিরূপভাবে ব্যবহার করিতে হয় তাহা অভ্যাস করা।

(৩) গ্যাস-প্রতিরোধক্ষম কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার উপকারিতায় নির্ভরক্ষম হওয়া।

(৪) গ্যাস-প্রতিষেধক উপায়গুলির যথারীতি প্রয়োগ বিষয়ে কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করা।

(৫) বিমান আক্রমণের সময় এবং উহার পূর্ব্বে ও পরে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা শিক্ষা করা।

গ্যাসের সংস্পর্শ পরিহারের নিমিত্ত প্রত্যেক গৃহস্থের নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে একটি অথবা দুইটি নিরাপদ কক্ষ (Refuge Room) সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখা কর্ত্তব্য।

(১) একতলায় বায়ুরোধক (Air-tight) কক্ষই ভাল।

(২) কক্ষের মধ্যে যেন সহজে যাতায়াত করিতে পারা যায়। উহার দুইটি দরজা থাকা আবশ্যক; কারণ, ঘরের উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া পড়ায় একটি দ্বার বন্ধ হইলে দ্বিতীয়টি কাজে লাগে।

(৩) কক্ষের জানালা অল্প এবং আকারে ছোট হইবে। জানালার বাহিরে খোলা স্থান থাকিবে না; শক্ত জমি থাকিলে বোমা ফাটিয়া উহার খণ্ড ছিটকাইয়া পড়িয়া ক্ষতি করিবে। নরম জমি থাকিলে সে ভয় নাই। বাহিরে জানালার উপর একটি কঠিন আবরণ থাকিবে। সার্শির কাচে আঠা দিয়া দুই ধারে কাগজ আঁটিয়া বাহিরে কার্পেট কিম্বা কম্বল ঝুলাইয়া দিতে হইবে।

(৪) ছাদে এবং কক্ষের চতুর্দ্দিকে বালিপূর্ণ বস্তা সাজাইয়া রাখিলে বোমার শক্তি হ্রাস হইবে।

(৫) যে দিক্ হইতে বাতাস প্রবাহিত হয়, সেই দিকের কক্ষ অসুবিধাজনক। কারণ, বাতাসের চাপে ছোট ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়া গ্যাস ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। গরম জলের সাহায্যে খবরের কাগজের মণ্ড তৈয়ারী করিয়া ছিদ্রগুলি বন্ধ করিতে হইবে, অথবা আঠা দিয়া কাগজ আঁটিয়া দিতে হইবে।

(৬) কক্ষের দ্বার গ্যাসরোধক্ষম হইবে।

(৭) সমগ্র বাড়ীতে যাহাতে অধিক গ্যাস প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে যে, এরূপ রুদ্ধ কক্ষে বেশী লোককে দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখা চলে না। কোন কক্ষে ৫০ জনের অধিক লোকের আশ্রয় লওয়া উচিত নহে। ক্ষুদ্র কক্ষে ক্রমবর্দ্ধিত উত্তাপ এবং আর্দ্রতার জন্য অধিক লোকের বেশীক্ষণ থাকা চলে না। সুতরাং লোকের সংখ্যানুযায়ী কক্ষ বড় হওয়া আবশ্যক।

গ্যাসরোধক্ষম দরজা (Air lock)

গ্যাসরোধক্ষম কক্ষের দ্বার খুলিয়া প্রত্যেকবার সেখানে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে সঞ্চিত গ্যাসের কিয়দংশ সেই কক্ষে প্রবেশ করে; উহা প্রতিরোধের জন্য গ্যাসরোধক্ষম দরজা তৈয়ারী করিতে হয়। কামরার দুই বিপরীত দিকে এইরূপ দুইটি দরজা করা উচিত। কিন্তু দুইটি দরজা একই সময়ে খোলা উচিত নয়। দরজা দুইটির ব্যবধানে কামরাটি যত বড় হইবে, বাহিরের গ্যাস ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথাকার বায়ু দূষিত করিতে তত অধিক সময় লাগিবে। ন্যূনপক্ষে উহা ৪ ফুট হওয়া আবশ্যক; কিন্তু সেখানে অধিক ব্যক্তির যাতায়াতের প্রয়োজন হইলে উহা ১০ ফুট হওয়া চাই। ষ্ট্রেচারের সাহায্যে আহত ব্যক্তিকে প্রবেশ করাইতে হইলে উহা ১৪ ফুট হওয়া প্রয়োজন।

এইরূপ দরজা অয়েল-স্কিন (Oil skin), কম্বল কিম্বা ক্যাম্বিস দ্বারা তৈয়ারী করিয়া কাঠের কাঠামোতে (Frame) আঁটিয়া স্থির রাখিবার জন্য প্রায় ২০ ডিগ্রী হেলাইয়া দিতে হইবে। পরদাটি সর্ব্বদা সমানভাবে বিস্তৃত রাখিবার জন্য আড়াআড়ি ভাবে এক ফুট অন্তর একটি করিয়া সরু লম্বা কাঠ আঁটিতে হইবে। ভিতরের কাঠগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হইবে, নতুবা কাঠামোর সহিত ফিট করিবে না। প্রয়োজন না হইলে পরদাটি গুটাইয়া রাখা ভাল। মধ্যে মধ্যে ব্লিচিং পাউডার-মিশ্রিত জল অথবা কেবলমাত্র জল দ্বারা পরদাটি ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

বিমান আক্রমণ-সঙ্কেত (Air Raid warnings)—

যুদ্ধের সময় বিমান আক্রমণের কোন সম্ভাবনা থাকিলে তথ্যাবিষ্কারকগণ (Intelligence Service) কর্ত্তৃপক্ষকে পূর্ব্বেই তাহা জানাইয়া থাকে। তখন পর্য্যবেক্ষকগণ (Observer Corps) কখন্ কোথায় আক্রমণ হইতে পারে নিপুণভাবে তাহা লক্ষ্য করিতে থাকে, এবং আক্রমণকারী নিকটে আসিলে কর্ত্তৃপক্ষকে তাহা জানাইয়া দেয়। তৎপরে যথাসময়ে বিপদসূচক সঙ্কেত জ্ঞাপনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষই দায়ী।

(ক) প্রাথমিক সতর্কতা (Preliminary Caution)—বিভিন্ন এ আর পি কেন্দ্র (A. R. P.), পুলিশ, ফায়ার-ব্রীগেড, ইলেকট্রিক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, জল-সরবরাহ-কেন্দ্র, বড় বড় কল-কারখানা, পোতাশ্রয় প্রভৃতি যাহাতে যথাসময়ে প্রস্তুত হইতে পারে, তজ্জন্য বিমান আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে তাহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হয়।

(খ) আক্রমণ সঙ্কেত (Action Warning)—প্রকৃত আক্রমণ আরম্ভ হইলে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে বিপদসূচক সঙ্কেত পাইবামাত্র পূর্ব্ব-ব্যবস্থা অনুসারে চতুর্দ্দিক হইতে সঙ্কেত-ধ্বনি

কার্য্যকরী হাসপাতাল অথবা অন্য কোন স্থান হইতে এখানে আনীত হয়, এবং যত দিন না উত্তমরূপে সুস্থ হইয়া বাড়ী যাইতে পারে, তত দিন এই স্থানে থাকে।

প্রতিষেধক কক্ষ (Anti-gas Cleansing Room)

প্রাথমিক সাহায্য-কেন্দ্র, সাময়িক কার্য্যকরী হাসপাতাল, প্রধান হাসপাতাল প্রভৃতি স্থানে প্রতিষেধক কক্ষের বিশেষ প্রয়োজন। যদি কেহ গ্যাসের সংস্পর্শে আসে, তখন প্রতিষেধক-কক্ষে যাইয়া নিজেকে পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বিলম্বে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গ্যাসমুক্ত করিবার নিমিত্ত এই স্থানে অথবা প্রাথমিক সাহায্য-কেন্দ্রে কোন রোগীকে ২০ মিনিটের অধিক সময় রাখা উচিত নয়। গ্যাসমুক্ত হইবার পরে যাহাতে সকলে পরিষ্কার পোষাক পরিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা থাকিবে।

(১) যদি চক্ষুতে গ্যাস লাগে, তাহা হইলে এক পাঁইট গরম জলে ১০ গ্রেণ সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট মিশ্রিত করিয়া অথবা উহার অভাবে এক পাঁইট গরম জলে এক চামচ লবণ মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা চক্ষু উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে।

(২) শরীরের কোন স্থানে তরল গ্যাস লাগিলে, এক ভাগ ভেসিলিন্ ও দুই ভাগ ব্লিচিং পাউডার একত্র মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে দুই মিনিট মাখাইয়া রাখিয়া পরে ভালরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

(৩) তৎপরে সাবান ও জলের সাহায্যে চারি মিনিট ধরিয়া শরীর উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে।

(৪) পরিশেষে শুষ্ক পোষাক পরিধান করিবে।

শোধন কার্য্যাবলী (Decontamination Service)

(১) শোধনকারী দল (Decontamination Squad) বিমান আক্রমণের পরে, যে সকল স্থানে বিপদের উৎসরূপে গ্যাস বর্ত্তমান থাকে, সেই সকল স্থান পরিষ্কার করিয়া দেয়। উন্মুক্ত স্থান, নিম্নভূমি, রাস্তা, বাড়ীর বহির্দ্দেশ প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হয়। কোন দূষিত স্থানকে গ্যাসমুক্ত করা অসুবিধাজনক হইলে সাধারণকে সাবধান করিবার নিমিত্ত তথায় বিপদসূচক কাষ্ঠফলক অথবা অন্য কোন চিহ্ন রাখা আবশ্যক।

(২) শোধন-কেন্দ্রে (Decontamination Centre) নানা স্থান হইতে দূষিত পোষাকাদি আনয়ন করিয়া শোধন করা হয়। প্রাথমিক সাহায্য-কেন্দ্র, প্রতিষেধক-কক্ষ, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থান হইতে রোগী ও আহত ব্যক্তির গ্যাসযুক্ত পোষাক এখানে প্রেরিত হয়। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে অথবা অন্য কোন স্থানে পোষাকাদি শোধন করিবার বন্দোবস্ত থাকে না বলিয়া নাগরিকগণের সমস্ত পোষাক সংগৃহীত হইবার পরে এই স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল দ্রব্যের নির্ভুল তালিকা রাখিবার জন্য ও প্রত্যেক পোষাকে টিকিট লাগাইবার জন্য কেরাণীর আবশ্যক। সকল দ্রব্য যাহাতে প্রকৃত মালিকের নিকট প্রেরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ কেন্দ্র সহর হইতে দূরে লোকালয়শূন্য স্থানে হওয়া প্রয়োজন; নতুবা গ্যাস উড়িয়া নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিগণকে বিপন্ন করিতে পারে।

পোষাকাদি শোধন করিবার প্রণালী

(ক) সাধারণ পোষাক—

(অ) বাষ্পীয় গ্যাস দ্বারা দূষিত হইলে—

(১) পশমের পোষাক অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা উন্মুক্ত বায়ু রৌদ্রে প্রসারিত করিয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে শোধিত না হইলে, তরল গ্যাস দ্বারা দূষিত হইলে যেরূপ করা হয়, সেইরূপ করিতে হইবে। (২) সূতার সাধারণ পোষাক সাবান-জল দ্বারা অন্ততঃ ১৫ মিনিট কাল পরিষ্কার করিতে হইবে।

(আ) তরল গ্যাস দ্বারা দূষিত হইলে—

(১) পশমের পোষাক বিশেষ যন্ত্রে বাষ্পের সাহায্যে শোধিত করা হয়। (২) সূতার সাধারণ পোষাক অন্ততঃ এক ঘণ্টা সোডা-মিশ্রিত গরম জলে সিদ্ধ করিতে হয়।

(খ) জুতা—

(১) রবারের জুতা দূষিত হইলে অবিলম্বে শক্ত বুরুশের সাহায্যে ব্লিচিং পাউডার দ্বারা ভালরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে; তার পরে দুই ঘণ্টা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। (২) চামড়ার জুতা আদৌ দূষিত হইতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ উহা সিদ্ধ করিলে অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। অন্য প্রকারে শোধন করাও দুরূহ ব্যাপার। যদি এমন অবস্থা হয় যে, চামড়ার ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় নাই, তখন দুই ভাগ ব্লিচিং পাউডার এক ভাগ ভেসিলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যেকের জুতা ব্যবহারের পূর্ব্বে উহা উত্তমরূপে লাগাইতে হইবে, এবং সাবধানে ব্যবহার করিবার পরে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

(গ) গ্যাস-মুখোস—

(১) বাষ্পীয় গ্যাস দ্বারা দূষিত হইলে উহা রৌদ্রপূর্ণ উন্মুক্ত বায়ুতে ২৪ ঘণ্টা প্রসারিত করিয়া রাখিয়া দিলে গ্যাসমুক্ত হইবে। (২) তরল গ্যাস দ্বারা দূষিত হইলে বিভিন্ন অংশকে পৃথক করিয়া রবারের অংশগুলিকে তিন ঘণ্টা গরম জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। অন্যান্য অংশগুলিকে দুই ভাগ ব্লিচিং পাউডার ও এক ভাগ ভেসিলিনে মিশ্রিত করিয়া ১০ মিনিট তাহা মাখাইয়া রাখিয়া পরে উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

(ঘ) ষ্ট্রেচার (Stretcher)

বাষ্পীয় গ্যাস দ্বারা দূষিত হইলে রৌদ্রপূর্ণ মুক্ত বায়ুতে অধিকক্ষণ রাখিলে শোধিত হইবে। অয়েলস্কিন্ (Oilskin) দ্বারা সমস্ত ষ্ট্রেচারখানি এবং রবার দ্বারা হাতল চারিটি আবৃত করিয়া রাখিলে শোধন করা সুবিধাজনক, নতুবা তরল গ্যাস দ্বারা দূষিত হইলে ক্যাম্বিস খুলিয়া অন্ততঃ এক ঘণ্টা গরম জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, এবং লম্বা কাঠ দু'খানি ব্লিচিং পাউডার জলে মিশ্রিত করিয়া ভালরূপে মার্জ্জনা করিতে হইবে।

আহতবাহী গাড়ী (Ambulance Service)

কোন রোগীকে এক স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে হইলে এইরূপ গাড়ী ভিন্ন উপায় নাই। রাস্তা হইতে কিম্বা সাহায্য-কেন্দ্র হইতে অথবা এক হাসপাতাল হইতে অন্য হাসপাতালে রোগীকে লইয়া যাইবার সময় এইরূপ গাড়ীর বিশেষ প্রয়োজন।

অধিক সংখ্যক রোগীকে বহন করিবার নিমিত্ত মোটর-বাস্ অথবা লরীকে সাময়িকভাবে কার্য্যকরী করিয়া লইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

অগ্নি-নির্ব্বাপক সম্প্রদায় (Fire Fighting Unit)

বিমান আক্রমণের সময় অগ্নিকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ, যখন প্রজ্বলনশীল বোমা ব্যবহৃত হয়, তখন অত্যধিক সংখ্যক বাড়ীতে একই সময়ে অগ্নি-সংযোগ হইয়া থাকে। এই অগ্নি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ব্বাপিত করিবার জন্য ফায়ার-ব্রীগেডের বিশেষ প্রয়োজন। কোন স্থানের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে তাহা বিস্তার লাভ করিয়া ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা প্রথম কর্ত্তব্য।

গ্যাস-নিরূপণকারী দল (Gas Detection Service)

আঘ্রাণ, দর্শন, প্রদাহজনক প্রভাব এবং রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা গ্যাস নিরূপণ করা হয়। ইহাদের মধ্যে আঘ্রাণ ও রাসায়নিক পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য। অপর দুইটি দ্বারা নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা সব সময় সম্ভব হয় না।

বিমান-আক্রমণের পরে কোথায় কোন্ গ্যাস কিরূপভাবে কতখানি অবস্থান করিতেছে, তাহা স্থির করিবার জন্য গ্যাস-নিরূপণ-কারী দল অনুসন্ধান করিয়া প্রধান এ-আর-পি কেন্দ্রে সংবাদ প্রেরণ করিলে তাহারা শোধনকারী দলের সাহায্যে তাহা নষ্ট করিবার বন্দোবস্ত করিবে। ঠিকমত সংবাদ পাইলে তাহাদের কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়; নতুবা বিলম্ব হইতে পারে, এবং বিলম্ব হইলে অধিক বিপদের সম্ভাবনা।

রক্ষাকারী পোষাক (Protective Clothing)

বিমান আক্রমণের সময় প্রাথমিক সাহায্যকারী দল, উদ্ধারকারী দল, স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতি যাহাদিগকে কর্ত্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত বাধ্য হইয়া বাহিরে থাকিতে হয়, তাহাদের জন্য এমন পোষাক আবশ্যক যাহা ভেদ করিয়া প্রদাহজনক গ্যাস শরীরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। রণপোতে ব্যবহৃত অয়েলস্কিন (Oilskin) কাপড় সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। ঠাণ্ডা অপেক্ষা গরম আবহাওয়াতে গ্যাস সকল দ্রব্যের মধ্যে দ্বিগুণ গতিতে প্রবেশ করে। সুতরাং অয়েলস্কিন অতিশয় পাতলা হওয়া উচিত নয়। তবে অল্পমাত্র দূষিত স্থানে পোষাক অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড়ের করিয়া কিছু পরিবর্ত্তন করা চলিতে পারে। অয়েলস্কিনকে যতবার সিদ্ধ করিয়া শোধিত করা হয়, ততই তাহার রক্ষা করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়, এবং ছয়বার সিদ্ধ করিবার পরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

ভাল অয়েলস্কিনকে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক গ্যাস চারি ঘণ্টাতে বিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু পাতলা কাপড় প্রায় দুই ঘণ্টাতে বিদ্ধ হইয়া যায়। রবারের পোষাক সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উহা ব্যবহার করা অতীব কষ্টকর। দেখা গিয়াছে, গ্রীষ্মের সময় ভারতবর্ষে অয়েলস্কিন কাপড়ের পোষাক পরিধান করিয়া ১০ মিনিট পরিশ্রম করিলে শারীরিক উত্তাপ প্রায় ১০৩ ডিগ্রীতে উঠিয়া যায়, এবং শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং রবারের পোষাক ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অধিক দূষিত স্থানে নিরাপদে কার্য্য করিতে হইলে নিম্নলিখিত পোষাকের বিশেষ প্রয়োজন—

অয়েলস্কিনের জ্যাকেট (কোট্)
" ট্রাউজার (পাজামা)
" হুড্ (টুপি)
" গ্লাভ্স্ (দস্তানা)
রবারের জুতা (হাঁটু পর্য্যন্ত)
গ্যাস-মুখোস।

শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ (বি-এ)

সমাপিকা

যবে মোরে যেতে হবে—
এই ধরণীর স্নেহ-অঞ্চল,
ব্যথা, আনন্দ, হাসি চঞ্চল
মিনতি-ভরা ও নয়নযুগল তখনো কি চেয়ে রবে?
যবে মোরে যেতে হবে!

যদি কভু পড়ে একটি পত্র বৃন্ত হইতে খসি—
বিরহে তাহার সারা বনানী উঠে যেন নিঃশ্বসি!
চকিতে কখন তমাল-শাখায়
বিভল পাপিয়া গীতি ভুলে যায়,—
মর্ম্মর-তানে ব্যাকুল বেদনা ওঠে যেন উচ্ছ্বসি।

শিথিল বৃন্ত হবে না মিলন-মালিকা তোমার গলে?
মোর স্মৃতি-মেঘে প্রহর তোমার
ক্ষণেকের লাগি হবে না আঁধার—
কাজল-নয়ন উঠিবে না ভরি' বিরহের আঁখি-জলে?
উৎসব-দীপ অম্লান রবে তব প্রাঙ্গণ তলে?

শ্রীকালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

অপরাহ্ণে

ফুরায়ে আসিছে দিন, ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা,
দীর্ঘ হলো ছায়া।
সোণার স্বপন হরি' এ নয়নে নৃত্য করে
মরীচিকা মায়া।
যাত্রা করিলাম হায় জানি না ধরিয়া কা'র
অভিশাপ শিরে,
সারা পথখানি মোর ভ'রে গেছে ব্যর্থতায়,
দেখি পিছু ফিরে।
পুঞ্জীভূত হ'য়ে আজ নিস্ফল প্রয়াস যত
করে পথ রোধ,
ইঙ্গিতে বলিছে যেন 'বৃথা চেষ্টা আর কেন ?
থাম রে নির্ব্বোধ !'
ফলাফল ভাবি নাই, কোন্ দিকে এসে চ'লে
গেছে দিনরাত।
আজ অবসর পেয়ে আগে পিছে চেয়ে চেয়ে
করি অশ্রুপাত।
হেম-মৃগ অনুসরি কেটে গেল জীবনের
শ্রেষ্ঠ দিনগুলি।
জীবনের সার্থকতা সন্ধান করিনু আমি
জীবনেরে ভুলি।
পায়ে ঠেলিয়াছি যত উপভোগ্য, ভোগে তারে
করিনি সফল,
বাসনা করিয়া জয় তাই বলি ত্যাগে তারে
করিনি উজ্জ্বল।

আজি মনে পড়ে হায় বৃথাই গিয়াছে কত
বাসন্তী শর্ব্বরী,
অনাদরে উপেক্ষায় ঝরিয়া গিয়াছে কত
রসাল-মঞ্জরী।
আজি মনে পড়ে কত হারায়েছি রসোল্লাস
শারদ উষার,
করি নাই উপভোগ তৃণদলে আলোকের
পুলক-সঞ্চার।
হায় রে হইল বন্ধ্যা মধুর শ্রাবণ সন্ধ্যা
করি নাই ভোগ,
কলরবে মুখরিত পরিজন-সভাটিতে
দিই নাই যোগ।
পাইনিক' অবসর হেরিতে নয়ন ভরি'
লেগেছে যা ভালো,
দুই ই হারায়েছি আমি কুলায়ের কবোষ্ণতা,
আকাশের আলো।
ছুটিয়া এসেছে শিশু সোহাগ করিতে তারে
পাইনি সময়,
ভুলে গেছি চিরদিন রবে না সে তরু-অঙ্গে
হ'য়ে কিশলয়।
হারায়েছি কত বারই প্রমোদের আমন্ত্রণ
উৎসবের মেলা,
স্বল্পে তুষ্ট জীবনের অগাধ বিশ্রাম সুখ,
কল্পনার খেলা।

সকল প্রয়াস মোর ব্যর্থ হ'য়ে এতদিনে
দিল অবসর,
অশ্রুপাত করি তাই পুঞ্জীভূত ভ্রান্তিভরা
জঞ্জালের 'পর।
ত্যজিয়া শ্যামল শুচি জীবন, খুঁজিয়াছিনু
হেম কল্পতরু,
দিনান্তে দিগন্তে এসে কি লাভ হইল শেষে ?
সুরু হলো মরু।

শ্রীকালিদাস রায়।

২

মোটর-গাড়ীর একখানি টায়ার তৈয়ারী করিতে কত উপাদানের প্রয়োজন, শুনিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না! টায়ারের কারখানা খুলিতে হইলে শুধু রবারের আবাদ করিলেই চলিবে না, সেই সঙ্গে চাই তুলার ক্ষেত; লৌহ, কয়লা ও জিঙ্কের খনি; গন্ধক বা সালফার-ডিপজিটের রাশি এবং গ্যাশের ভাণ্ডার। একখানি গাড়ীর চারটি টায়ারে তুলার আঁশ লাগে প্রায় ১০০০ মাইল-দীর্ঘ; ইস্পাতের তার লাগে প্রায় ড়শো ফুট। ই সঙ্গে চাই ল! সালফার ং জিঙ্ক-অক্সা- প্রভৃতি শাইয়া আর ছটি নব-উপাদানের প্রয়োজন। এই মিশ্র াদানটির নাম মার্কাপটোবেনজোথিয়াজেল এবং ইবেটানাফ্থিলপারা-ফেনিলেনেডিয়ামাইন!

তরল-লাটেক্সে সূতা মিশাইয়া স্নানের বেশ

টায়ার-নির্ম্মাণে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ৭৮টি প্রদেশের মধ্যে ৩৯টি প্রদেশকে বিভিন্ন উপাদান জোগাইতে হয়। মণ্টানা হইতে আসে গিলশোনাইট; টেনেশি হইতে আসে হার্ডউড নামে কাঠের চাক্‌লা; ইণ্ডিয়ানা হইতে হোয়াইটিং; ওহিয়ো হইতে লিদার্জ প্রভৃতি। সব-কয়টি উপাদানের তালিকা দিলে রসায়ন ও ধাতু-বিজ্ঞানের একখানি মোটা অভিধান সঙ্কলিত হইবে! মার্কিণের বাহিরে নানা দেশ হইতেও নানা বস্তুর জোগান আসে। ভারতবর্ষ হইতে যায় শেলাক্ বা গালা; আফ্রিকা ও ফিলিপাইন দ্বীপ হইতে যায় তালের তৈল; সাউথ-সী হইতে নারিকেল তৈল; স্পেন হইতে সোলা বা কর্ক; কলম্বো হইতে এ্যাসবেষ্টশ; এবং চীন হইতে টাঙ্গ-নামে

রবার-বেলুন

রবারের পাত

এক-প্রকার মিশ্র ধাতুর তৈল।

মার্কিণের এক সুবৃহৎ টায়ার-কারখানার হিসাবে দেখিতে পাই, টায়ারের জন্য এ-কোম্পানি বছরে তুলা কেনে সাতাশ লক্ষ মণ; কালো কার্ব্বন কেনে পঁচিশ লক্ষ মণ; জিঙ্ক-অক্সাইড একাশী হাজার চারিশত মণ; এবং গন্ধক চার
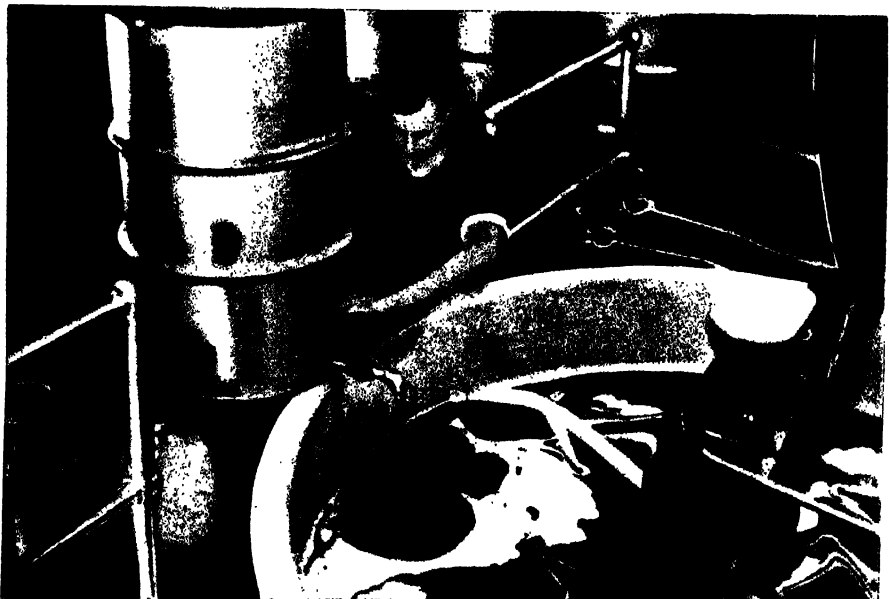
রবার রঙ্ করা

হাজার একশ-ছিয়াত্তর মণ। এ যুগে এই বিবিধ উপাদানের সহযোগিতায় টায়ারের পরমায়ু বাড়িয়াছে অসম্ভব-রকম। টায়ার-কোম্পানিরা বলেন, পুরা-কালে বিক্রয় করিবার সময় টায়ারের সম্বন্ধে গ্যারাণ্টী দেওয়া হইত ৩০০০ মাইল খাশা চলিবে; এখন সে-গ্যারাণ্টীর মাত্রা চব্বিশ-পঁচিশ হাজার মাইলে দাঁড়াইয়াছে।

এক-একটি কারখানা প্রায় ৩০ একর-পরিমিত জমি লইয়া গঠিত। তার মধ্যে ১২৫ একর জমি জুড়িয়া কারখানা; ১৬৫ একর জমি প্রাঙ্গণের মতো মুক্ত অবাধ রাখা হয়; এবং ১৪ একর জুড়িয়া থাকে নীল কাচের সার্শি আঁটা মস্ত হল্। এই হলে ইট-কাঠের, মাটির বা টিনের দেওয়াল নাই। দু'মাইল জুড়িয়া টানেল আছে। সেই টানেল-পথে ৭৫খানি ট্রাক্ এবং ৩০০ ট্রেলার-গাড়ী যাবতীয় কাঁচা রশদ বহিয়া যাতায়াত করিতেছে।

কি করিয়া টায়ারের সৃষ্টি হয়, বলি।

নির্য্যাস জমাইয়া রবারের পাত তৈয়ারীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই পাত ছোট-বড় নানা আকারের হয় এবং বহু পাত জড়ো করিয়া কাপড় বা চটের গাঁটের মতো গাঁট বাঁধা হয়। এক একটি গাঁটের ওজন একশো-পঁচিশ সের।

রবারের খেলনা

রবারে তৈরী আয়নার ফ্রেম

গাঁট খুলিয়া রবারের পাত বাহির করিয়া প্রথমেই সে পাত কাটার যন্ত্রে ফেলিয়া বৈদ্যুতি ব্লেডের তাপে গরম করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাগ

হোজের গায়ে রিং আঁটা

ময়দা মাখিয়া যেমন লুচির লেচি কাটা হয়, কাদার মতো এই পিণ্ড-রবারের তাল তেমনি বরফীর ছাঁচে (বরফীর মতো ছোট-আকার নয়, নিশ্চয়!) খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটা হয়। কাটিয়া সেগুলি র‍্যাকে রাখিয়া শুকাইয়া লয়। শুকাইলে তাহা দেখিতে হয় ট্যান্-করা চামড়ার মতো!

এই রবারকে এখন দেওয়া হয় "মিক্সারের" (mixer) মধ্যে নানা উপাদানের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া লইবার জন্য। এ-মিশ্রণের পরে রবারকে লাটেক্স বলিয়া আর চেনা যায় না। মিশ্রণ কার্য্য চুকিলে যে-কম্পাউণ্ড তৈয়ারী হয়, সে কম্পাউণ্ড যায় রাসায়নিকের হাতে। এবং এই রাসায়নিকের যাদু-মন্ত্রে সে-কম্পাউণ্ড নব-কলেবরে উদয় হয়।

নকল-পথে টায়ার চালাইয়া শক্তি-পরীক্ষা

বড়-বড় কারখানায় টায়ার গড়িতে কেমিক্যাল লাগে প্রায় ৯০০ বস্তা।

এই রাসায়নিক হইলেন রবার-কারখানার বিধাতা-পুরুষ। কোয়ালিটি বুঝিয়া বিভিন্ন মিশ্র রবার-কম্পাউণ্ডকে বাছিয়া ইনিই তাদের চিকিৎসা করেন; নানা প্রক্রিয়ায় খুঁৎ সারিয়া এই কম্পাউণ্ডকে নিখুঁৎ করিয়া লন। খুঁত সারিবার পর বিভিন্ন কারিগরের হাতে রবার গিয়া পৌঁছায় এবং তখন টায়ারের গড়ন সুরু হয়।

একখানি টায়ারের বুক চিরিয়া কাটুন, দেখিবেন—কত রকমের জোড়া-তালি দিয়া তাহাতে পাঁচটি বিচিত্র section বা স্তর রচিত হইয়াছে। দেখিবেন, উপরের কভারের (bead) নীচেই আছে ব্রেকার। রবারের সহিত আরো দু'চারি-রকম তন্তু (fabrics) মিশাইয়া এই ব্রেকারের সৃষ্টি। ব্রেকারের জন্যই পথে চলিতে টায়ারের জোড় কাটে না, নড়ে না; সে জোড় খুলিয়া যায় না।

কভার এবং ব্রেকারের পরেই টায়ারের দেহ (body) বা কাঠামো। এটি টায়ারের ভিত্তি। টায়ার এই কাঠামোর জোরেই গাড়ীর ভার বহিতে পারে। কাঠামো বা বডি আশ্চর্য্য রকম নমনীয়। রবারে ইন্‌শুলেট দড়ি বা পাত দিয়া এই কাঠামো তৈয়ারী হয়। চাকার রিমের সঙ্গে টায়ারের যে-অংশ ফিট্ করে, তাহাকে বলে বীড (Bead)। রবারের মধ্য দিয়া ইস্পাতের তার (imbedded) চালাইয়া এই বীডের সৃষ্টি। বীড্-তার থাকার জন্য রিমের সঙ্গে টায়ার টাইট্‌ভাবে আঁটিয়া থাকে। টায়ারের কাঠামোর সঙ্গে এই বীডকে টাইট্‌ভাবে আঁটিয়া রাখার জন্য তারের সঙ্গে ক্লিপার নামে এক-রকম বস্তু কষিয়া জড়ানো হয়।

কভার বা bead ; বডি বা কাঠামো; কভারের নীচে ব্রেকার ; বীড্ এবং এই ক্লিপার—এই পাঁচটি বস্তু রবারের পঞ্চপ্রাণ—five toes of a tyre! এ পাঁচটি বস্তু কিন্তু কারখানার পাঁচটি বিভিন্ন জায়গায় তৈয়ারী হয়।

২৮৩ পৃষ্ঠার ছবিগুলি চাহিয়া দেখুন। একটিতে দেখিবেন, বড়-বড় পুলে ইস্পাতের তার রহিয়াছে। টায়ারের মধ্যকার এই তারই রিমের সঙ্গে টায়ারকে সুদৃঢ়ভাবে আঁটিয়া রাখে। তারপর অন্য ছবিতে দেখিবেন, সুতার অজস্র লহর। তরুণী ঐ সুতার হারগুলিকে সুশৃঙ্খল-পর্য্যায়ে ফ্রেমে সাজাইতেছেন। এ সুতাও টায়ারের দেহ-গঠনে অত্যাবশ্যক। তার পর সুতায় তারে জড়িত মিশ্রিত রবারের পাতগুলিকে যন্ত্রের চাপে গায়ে-গায়ে আঁটিয়া এক ও অটুট করিবার পালা। এ পাত তৈয়ারী হইলে শক্তিমান যন্ত্রযোগে টায়ারের যোগ্য-আকারে এ-পাতকে সমানভাবে ছাঁটিয়া-কাটিয়া চাঁচিয়া-ছুলিয়া মসৃণ ও সুসমঞ্জস করা হয়। চাঁচিয়া-ছুলিয়া কাটিয়া-ছাঁটিয়া সে পাতকে সমান-সমতল করা হইলে বিল্ডিংড্রাম-যন্ত্রে আঁটিয়া (২৮১ পৃষ্ঠা) সুগোল-আকারে গড়িয়া লাতে
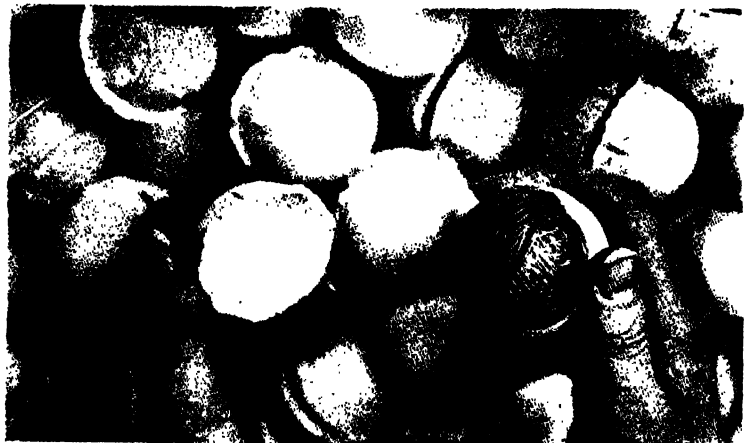
টেনিশ-বলের সৃষ্টি

আচ্ছাদনীর দুটি খোল

গাটাপার্চার আবরণ

পেয়ালার ছাঁচে রবার কাটা

রবার-বরফীর ছাঁচ
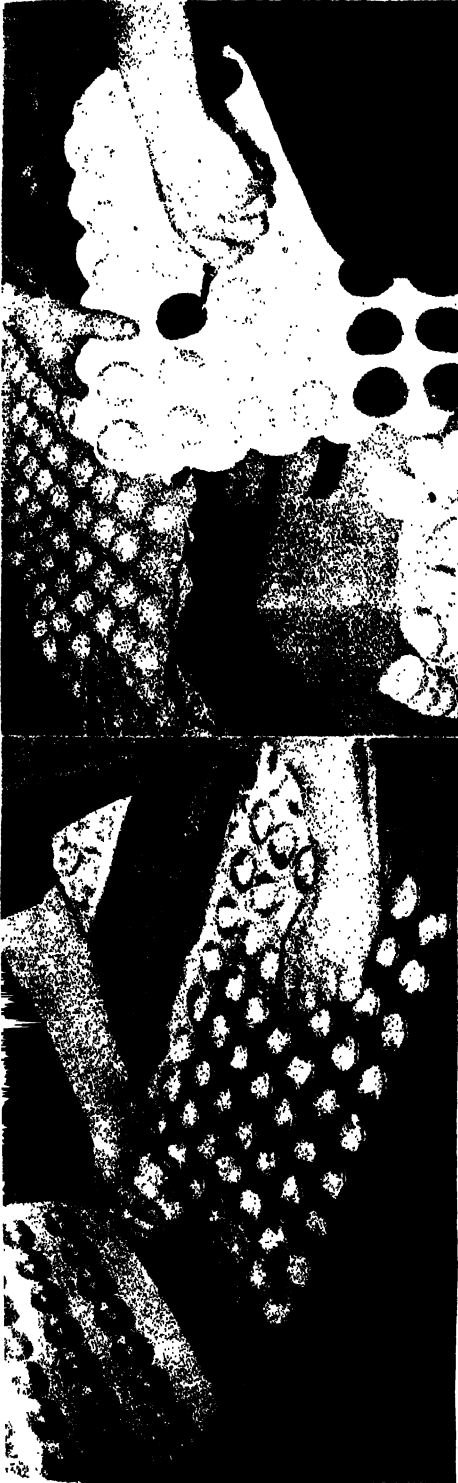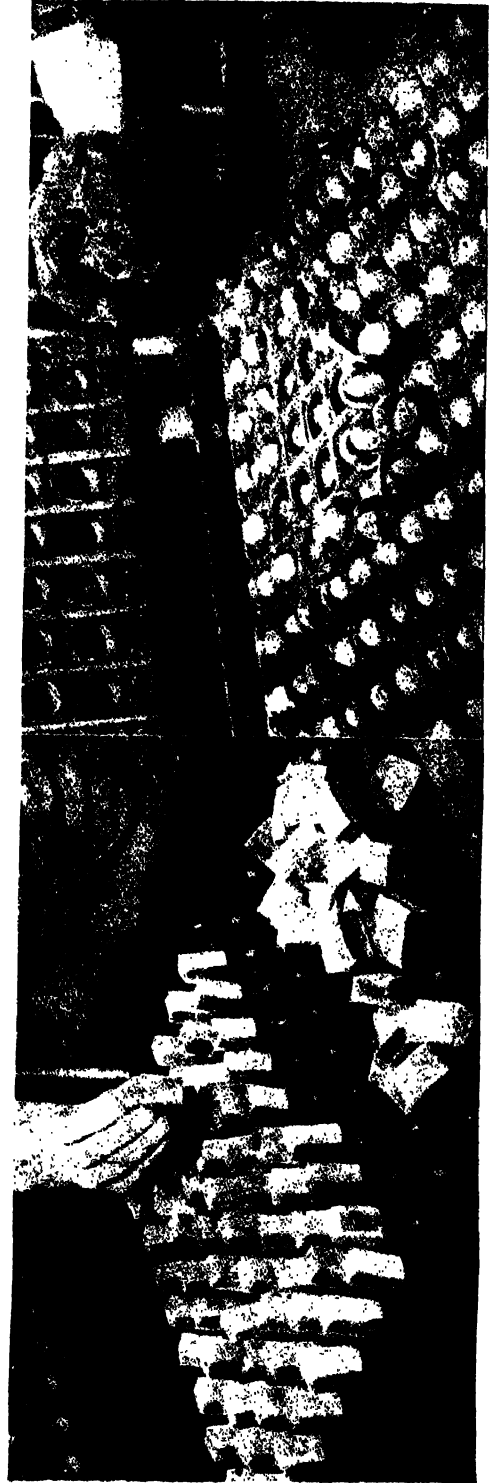
বলের ভিত বা আঁটি

হয়। গড়া হইলে এয়ার-ব্যাগ দিয়া চাপিয়া রবার-চক্রগুলিকে 'ভালকানা-ইজ' করিবার জন্য পিপার মত বড় পাত্রে নিমজ্জিত করিবার পালা (২৮১ পৃষ্ঠা)। ভালকানাইজ করার কারণ, কোথাও কোন রন্ধ্র বা ফাঁক না থাকে! ভালকানা-ইজ হইলে ছাঁচে ফেলিয়া তাপে এবং চাপে ডিজা-ইন-মাফিক্ গড়িয়া তোলা হয়। ডিজাইন-মাফিক গড়ন হইলে বড়-হলে সেগুলিকে সারবন্দীভাবে সাজাইয়া তাদের পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় কোথাও কোনো খুঁত পাইলে চিহ্নিত করিয়া সেগুলিকে পাঠানো হয় কারিগরের কাছে খুঁত সারিবার জন্য। এ-পরী-ক্ষায় যে-টায়ার পাশ হয়, সেগুলির গায়ে আবরণ দিয়া বিক্রয়ের জন্য তাহা মজুত রাখা বা চালান করা হয়।

কামান-গাড়ীর টায়ার

রবারের জুতা—এক-এক পাটিতে ৫২ টুক্‌রা রবার আছে

টায়ার-পরীক্ষার কথা বলিয়াছি। সে-পরীক্ষার অর্থ তাদের দেহ-পরীক্ষা! টায়ারের দেহ কোথাও অমসৃণ না হয়, কোথাও এতটুকু ঢিলাঢালা বা ফুলা না থাকে, টায়ারের সর্ব্বাঙ্গ নিটোল আছে কি না এ সবের যেমন পরীক্ষা লওয়া হয়, তেমনি পথে কাঁটা-খোঁচা, খানা-খোন্দল, কাঁচ বা পেরেক প্রভৃতির আঘাতে টায়ার না মচ্‌কায়, টায়ার না ফাঁশে, না ফাটে; সে-সব আঘাত টায়ারের গায়ে না বাজে; এ-সব আঘাত টায়ার অবহেলায় তুচ্ছ করিতে পারে কি না, তাহারো পরীক্ষা লওয়া হয়। সে পরীক্ষার জন্য কারখানার পরীক্ষাগারে
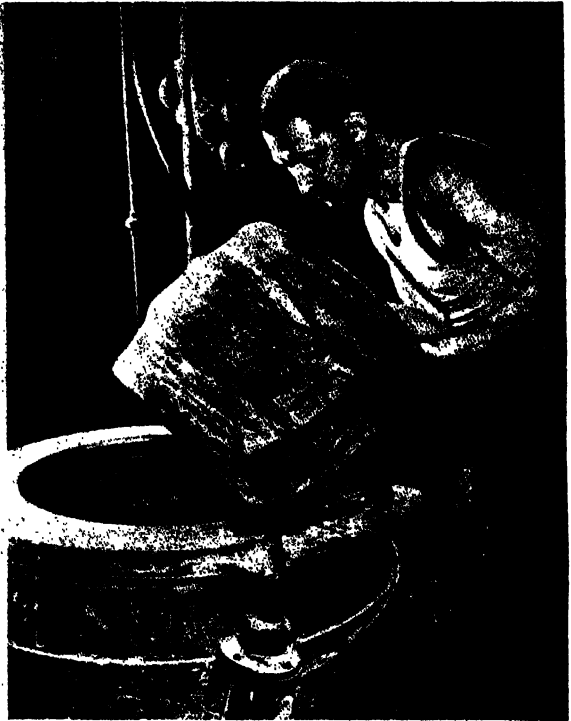
১। ড্রামে ফেলিয়া পাতকে সুগোল করা
২। ছাঁচে ফেলিয়া টায়ারের রূপ গঠন

১। এয়ার-ব্যাগ সাহায্যে ভালকানাইজ
২। টায়ার-পরীক্ষা

তৈয়ারী হয়, তার সৃষ্টিতে জটিলতা নাই! যেমন খুশী আকারের হোজ পাইপ তৈয়ারী হইলে বিবিধ যন্ত্র-যোগে হোজের গায়ে শীসার পাত বা তারের রিঙ বিজড়িত করা চলে। এ-যন্ত্রে পর-পর দুটি জ্যাকেট আছে। উপরের জ্যাকেটে থাকে শীসার বা রিঙের পাত,—নীচের জ্যাকেটে পরানো হয় রবার-হোজ; তার পর যন্ত্র চালাইয়া দেওয়া হয়। একজনমাত্র লোক হাতে শুধু রবারের হোজ ধরিয়া থাকে এবং যন্ত্রটি চলিলে একসঙ্গে ঐ শীসার পাত বা রিঙ নামিয়া আসে; রবার হোজ তার নীচে আসিয়া পড়ে এবং কুশলী-যন্ত্রের চাপে হোজের গায়ে পাত আসিয়া আঁটিয়া ধরে। যন্ত্রযোগে এমনি আঁটা রবার ও পাত সরিয়া-সরিয়া যন্ত্রের অপর মুখাগ্রে পাত-আঁটা দেহ লইয়া বাহির হয়। এ কাজও নিঃশব্দে দ্রুততালে সম্পাদিত হয়।

বিশেষজ্ঞেরা আজ রবারকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন যে, তাহা তাপে গলে না, শীতে গুটাইয়া যায় না;—তাছাড়া কোনো রকম এসিডে তার এতটুকু অপচয় বা অনিষ্ট ঘটে না! এসিডে সর্ব্ব-ধাতুর ক্ষয়-অপচয় ঘটে, কিন্তু রবারের অঙ্গ এমন হইয়াছে যে, এসিডের কাছেও সে অক্ষয়-অমর। হাইড্রোক্লোরিক এসিড রাখিবার জন্য যে আধার তৈয়ারী হইতেছে, সেগুলির ভিতর-দিকে আগাগোড়া রবার-লাইনিং দেওয়া। এ আধার রচিত হইলে ভিতর-দিকটায় আঠা লাগাইয়া রবারের মিহি পাত আঁটিয়া দেয়; রবারের দৌলতে এসিডের পাত্র যেমন অটুট-অক্ষত থাকে, তেমনি এসিডও চুঁয়িয়া যায় না, ক্ষয় বা লয় হয় না। পাত্রে যতখানি এসিড রাখিবেন, ততখানি ঠিক তাহাতে মজুত থাকিবে।

তার পর খেলার বল; ক্রিকেট-বল, টেনিস-বল। এ সব বলের রচনাতেও অসাধারণ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সব বল শুধু রবার দিয়া তৈয়ারী হয় না, এ-বলের রচনা-কার্য্যে তৃণশস্যাদিরও প্রয়োজন।

রবারের কর্ম্মে

যন্ত্র-সাহায্যে বল্ ওজন

প্রথমে চাই আঁঠির মতো কঠিন ও সুগোল ভিত্তি বা core অর্থাৎ sac. এলুমিনিয়ামের ছাঁচে লাটেক্স-কম্পাউণ্ড ঢালিয়া এই ভিদ্ বা core বা sac তৈয়ারী করা হয়। ছবিতে (২৭৯ পৃষ্ঠা) বরফীর মতো যে লাটেক্স-কম্পাউণ্ড দেখিতেছেন, গোল খাঁজ-কাটা ছাঁচে ওগুলিকে ফেলা হয়। তার পর

গোল ভাবে কাটিয়া সেগুলিকে ভালকানাইজ করিতে হয়। আর একটি ছাঁচে থাকে গাটাপার্চা। এই গাটাপার্চায় বলের আবরণ নির্ম্মিত হয়। গাটাপার্চার লম্বা পাত হইতে গোল সাইজে এ আবরণ কাটিয়া লওয়া হয়। ওদিকে খাঁজ-কাটা ছাঁচে লাটেক্স-কম্পাউণ্ড জমাট বাঁধিলে সেগুলির গায়ে-মাথায় চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম সুতা জড়াইয়া লইতে হয়। জড়ানো হইলে গাটাপার্চার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খোলে সুতা-জড়ানো লাটেক্স-কম্পাউণ্ড ভরিয়া মুখে-মুখে জুড়িয়া দেয়। জোড়া হইলে সেগুলিকে ছাঁচে পুরিয়া প্রথমে তাপ ...াপ দেয়; পরে তাহাতে বরফ-জল দিবা মাত্র আচ্ছাদনীর ... ভাগ কষিয়া 'কাপে-কাপে' আঁটিয়া দুর্গের মতো বলকে ... করিয়া তোলে। তার পর প্রত্যেকটি বলকে ...র মাপে ওজন করিবার পালা। প্রত্যেকটি বলের ...ওয়া চাই ১.৬৮ ইঞ্চি; ওজন ১.৬২ আউন্সের বেশী ... না। যাঁরা বল খেলেন, তাঁরা বোধ হয় এতখানি ...ধায় কারিগরির কথা কল্পনাও করিতে পারিবেন না! টেনিশ-বলের আবরণের জন্য নরম মসৃণ পশমী কাপড় লাগে। ছবি দেখিলে বুঝিবেন, এ কাপড় কাটিয়া যন্ত্রযোগে কত সহজে তাহা দিয়া বল মোড়া হয়।

এসিড়-পাত্রে রবারের কোটিং

সাঁতারের বিবিধ বিচিত্র পোষাক, মেয়েদের বেল্ট, গাউনের বন্ধনী প্রভৃতিও রবারে রচিত হইয়া আজ যে সুষমা-স্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তার আর সীমা-পরিসীমা নাই। রবারের জুতা এত সহজে এবং এত শীঘ্র তৈয়ারী হইতেছে যে, দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়! অথচ এক-এক জোড়া রবারের জুতায় রবার লাগে ১০৪ খণ্ড (pieces)। রবারকে গলাইয়া প্রথমে প্রকাণ্ড জমাট-পিণ্ড করা হয়; তার পর এই পিণ্ড-রবার যন্ত্রের চাপে পাত হইয়া যন্ত্রযোগেই সরিয়া-সরিয়া ষোল হাত ঘুরিয়া জুতার কলেবর ধরিয়া বাহির হয়। পাত-রবার গিয়া যে যন্ত্রে পড়ে, সেখানে বাঁধা-মাপের শোল্ হয়; অপর যন্ত্রে জুতার বডি বাহির হয়; পরে এই শোল্ ও বডি গিয়া আর-এক যন্ত্রে মিলিতেছে, এবং সে-যন্ত্রের চাপে শোল্ ও বডি গায়ে-গায়ে আঁটিয়া যায়; আঁটা বডি-শোল অন্য যন্ত্রে যায়—সেখানে সরু পাতে জোড়া-তালি লাগিয়া বডি-শোল কায়েমী ভাবে আঁটিয়া মজবুত বনিয়া উঠে। তার পর কোনো যন্ত্রে ফিতার রন্ধ্র-ভেদ—কোনো যন্ত্রে নক্সা-কাটা,—কোনো যন্ত্রে বর্ণভূষা—এমনি করিয়া প্রত্যহ প্রায় দশ-হাজার বিশ-হাজার জোড়া জুতা তৈয়ারী হইতেছে।

প্রতি-সাইজের জন্য স্বতন্ত্র ছাঁচ আছে এবং যে-সাইজের জুতা চাই, অনুরূপ যন্ত্রে রবারের পাত ফেলিয়া দিলেই সেই মাপের জুতা বনিয়া উঠে!

সাঁতারের পোষাক-নির্ম্মাণে প্রায় আধ-মাইল দীর্ঘ তরল লাটেক্স লাগে। এই তরল লাটেক্সকে প্রায়

তিন-মাইল লম্বা সুতার সহিত মিশাইয়া জমাট করা হয়। যে রঙ চান, সেই রঙের পাত দিয়া এ-পোষাক তৈয়ারী হইবে। এ পোষাক এত হাল্কা যে, গায়ে দিলে পোষাক পরিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! এইভাবেই আজকাল খুব হাল্কা বর্ষাতি-কোট প্রভৃতিও তৈয়ারী হইতেছে।

পাশ্চাত্য মহিলার বডিশ্ বা কর্শেট। পূর্ব্বে তিমির হাড় দিয়া কঠিন কর্শেট তৈয়ারী হইত। তাহাতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেও 'পরো পরো মা গহনা পরো' নীতি মানিয়া বেশভূষার জন্য এ-অস্বাচ্ছন্দ্য পাশ্চাত্য মহিলারা নিঃশব্দে সহ্য করিতেন। এখন রবারের কল্যাণে মেয়েদের কর্শেট এমন স্বচ্ছন্দ হইয়াছে যে, দেহখানিকে আঁটিয়া নিটোল নিভাঁজ করিলেও সে কর্শেট বা বডিশের জন্য চাপ পড়িয়া নিশ্বাস বন্ধ হইয়া এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না।

নিত্য-প্রয়োজনে এবং বিলাস-ভূষণে রবার আজ আমাদের ষোড়শ-উপচার জোগাইতেছে। তাছাড়া আধি ব্যাধিতে প্রাণ-রক্ষা করিতেও রবার আজ কতখানি সহায়, সেই কথা বলিয়া আমরা রবারের স্তুতি-কথা শেষ করিব।

শ্বাসযন্ত্রের বিকৃতি-বৈকল্য ঘটিলে কিম্বা অন্য রোগে শ্বাসকষ্ট ঘটিলে চিকিৎসকেরা রবারের শরণ গ্রহণ করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতে আজ সমর্থ হইয়াছেন। অণ্টারিয়োর একটি বালক—তার বয়স ছ' বৎসর; পক্ষাঘাত রোগে তার জীবন-সঙ্কট হইয়াছিল। সেখানকার হাসপাতালের বিচক্ষণ চিকিৎসক "জেনারেল টায়ার এবং রবার কোম্পানির" দ্বারা রবারের রিং এবং স্পঞ্জ-রবারের ফ্ল্যাপ নির্ম্মাণ করাইয়া বালক-রোগীর দেহে আঁটিয়া তার শ্বাসগ্রহণে স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়াছেন। তাছাড়া রবারের তৈয়ারী নিশ্বাস-ব্যাগের (breathing-bag) সাহায্যে অক্সিজেন-বাষ্প দিয়া রোগীর প্রাণ-রক্ষা-কার্য্য আজ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুলভে সম্পাদিত হইতেছে। এরোপ্লেনে চড়িয়া বহু উর্দ্ধে উঠিলে আরোহীর দারুণ শ্বাসকষ্ট ঘটিত। এখন রবারের ব্যাগে অক্সিজেন-বাষ্প ভরিয়া রবারের নলে সে বাষ্প গ্রহণ করায় বিমান-বিহারী প্লেনযাত্রীকে আর শ্বাসকষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

এই রবার আজ মানব-সমাজকে বহু কল্যাণে বিভূষিত করিতেছে। রবার-বণিক-সম্প্রদায়কে লক্ষ্মী দেবী আজ বহু ঐশ্বর্য্য-সম্পদে বিভূষিত করিয়াছেন। এক কথায়, রবার যেন আজিকার পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর নর-নারীকে নব রূপে নব বেশে সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। এক জন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন—Rubber is remaking our world. এ-কথা এতটুকু অত্যুক্তি নয়! তার নিত্য-প্রয়োজনের বস্তুকে অল্পব্যয়ে সহজ-প্রাপ্য করিয়া তুলিয়াছে। গাড়ীর চাকা হইতে সুরু করিয়া রোগের পরিচর্য্যায় পর্য্যন্ত রবার আমাদের জীবনকে গতি দিয়াছে, স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছে, এবং বহু-সঙ্কটে পরিত্রাতার বেশে উদয় হইয়া আমাদের জীবন-যাত্রার প্রণালীকে সহজ ও সুখদ করিয়া তুলিয়াছে।

রবারের রিং ও ফ্ল্যাপ্

পাখাওয়ালা

[গল্প]
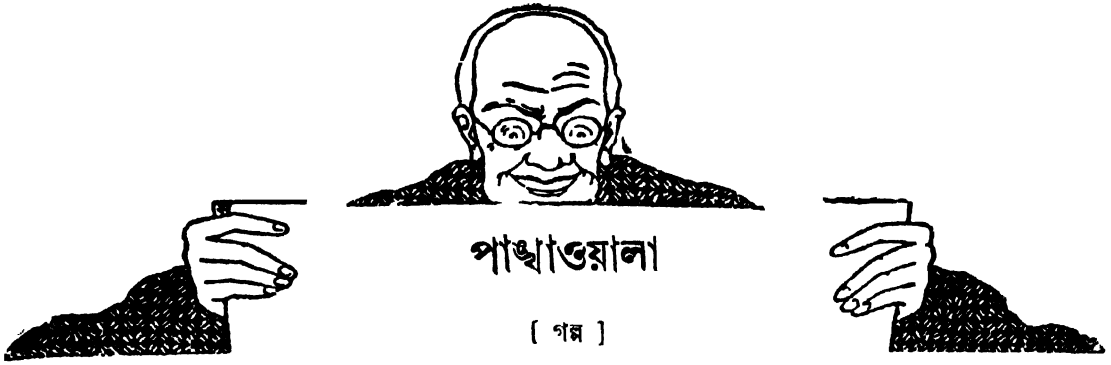
১

আমরা তখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম। আমাদের সে-কালের সেই 'ফোর্থ ক্লাস' একালে 'ক্লাস সেভেন' নাম ধারণ করিয়াছে। তখন শ্রেণী গণনা হইত উপর হইতে নীচে; এখন হইতেছে—তলা হইতে মাথার দিকে। কিন্তু সে কথা থাক। একালের মত সে-কালেও আমাদের ফোর্থ ক্লাসে দুইটি 'সেক্সন' ছিল। আমি ছিলাম 'বি' সেক্সনের ছাত্র—প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে! আজ বার্দ্ধক্যে জীবনোপান্তে উপনীত হইয়া সেই বিস্মৃতপ্রায় ছাত্রজীবনের দুই-একটি কথার আলোচনা করিতে বসিয়াছি; একালের পাঠকদের ভাল লাগিবে কি?

তখন 'ইলেক্ট্রিক ফ্যান' বা বিজলী-পাখার আবির্ভাব হয় নাই। স্কুলের সকল ক্লাসেই সুদীর্ঘ টানাপাখা পাখা গুটাইয়া কড়িকাঠে ঝুলিত, এবং ফাল্গুন মাসে দোলের ছুটির পর হইতে আশ্বিন মাসে পূজাবকাশের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত ছাত্রদের বিদ্যাভার-প্রপীড়িত মস্তকের উর্দ্ধে আন্দোলিত হইত। শীতকালে সাড়ে-চার কি পাঁচ মাস তাহার বিশ্রাম। হর্‌জীবন কাহার নামক বৃদ্ধ আমাদের ক্লাশের পাখা টানিত। শুনিয়াছিলাম, সে নাকি ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল ঐ একই ক্লাসে পাখা টানিয়া অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিত। একই ক্লাসে থাকিয়া সে নির্ব্বিকার চিত্তে, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে এই একঘেয়ে কর্ত্তব্য পালন করিত। প্রতিবৎসর নূতন নূতন ছাত্রের দল তাহার চালিত পাখার বায়ু-হিল্লোলে স্নিগ্ধ হইয়াছে। সুদীর্ঘ [illegible] বৎসরে সেই ক্লাসে কত নূতন শিক্ষকের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও কথা কি তাহার স্মরণ থাকিত? কখন কখন সে দুঃখপ্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বলিত, "বাবু, তিরিশ বরষ হাম সরকারি কামমে হ্যায়; সরকার বাহাদুর হাম্‌কো ছোড়্‌তা নেহি, পিন্‌সিল ভি দেতা নেহি! ক্যা করে, নসিব!"—সঙ্গে সঙ্গে সে ললাট স্পর্শ করিত।

একবার গ্রীষ্মাবকাশে স্কুল বন্ধ হইলে সে দেশে চলিয়া গেল। আষাঢ় মাসে স্কুল খুলিলে আমরা ক্লাসে উপস্থিত হইয়া সেই খোট্টা হর্‌জীবন কাহারের পরিবর্ত্তে হরিজীবন নামক এক বাঙ্গালী যুবককে পাখা টানিতে দেখিলাম। সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, বৃদ্ধ দেশে ফিরিয়া পরলোকে প্রস্থান করায় এই বাঙ্গালী যুবক হরিজীবন তাহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। হর্‌জীবনের পরিবর্ত্তে নূতন লোকের আবির্ভাবে আমাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। তথাপি বৃদ্ধ হর্‌জীবনের মৃত্যু-সংবাদে মনে ব্যথা পাইয়াছিলাম। এই সুদীর্ঘ কাল পরেও সে কথা স্মরণ আছে।

নূতন পাখাওয়ালাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করা হইলে সে যখন বলিল, তাহার নাম হরিজীবন রায়, তখন ক্লাসের সকল ছাত্রের কণ্ঠ হইতে একযোগে হাসির তুফান ছুটিল! হর্‌জীবনের পরিবর্ত্তে হরিজীবনের আবির্ভাবে হাস্যরসের কি উপাদান ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু শিশুচিত্তের খেয়াল অতি বিচিত্র, এবং যুক্তির উপর তাহার বনিয়াদ নির্ভর করে না।

যাহা হউক, ঠিক সেই সময় 'স্যার' আমাদের ক্লাশে প্রবেশ করিয়া তাঁহার আসনে সমাসীন হইলেন; তাঁহার আবির্ভাবে আমাদের হাসির উৎস-মুখ সহসা রুদ্ধ হইল।

'স্যার' চেয়ারে বসিয়াই গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত হাসি-তামাসা চল্‌ছিল কেন? এটা কি হাসি তামাসার আড্ডা?"

স্যারের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, আমাদের কাহারও ততখানি সাহস ছিল না; কারণ, আমরা জানিতাম, ক্লাশের